পরিচারিকা।

সচিত্র মাসিক পত্রিকা।

(নব পর্য্যায়)

রাণী শ্রীনিরুপমা দেবী সম্পাদিত।

সহঃ সম্পাদক—শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

পঞ্চম বর্ষ।

প্রথম খণ্ড।

১৩২৭ সনের অগ্রহায়ণ—১৩২৮ সনের বৈশাখ।

কোচবিহার।

কোচবিহার সাহিত্য-সভা কর্ত্তৃক প্রকাশিত

কোচবিহার ষ্টেট্ প্রেসে

শ্রীমন্মথনাথ চট্টোপাধ্যায় দ্বারা মুদ্রিত।

বার্ষিক মূল্য দুই টাকা, বার আনা।

পরিচারিকা।
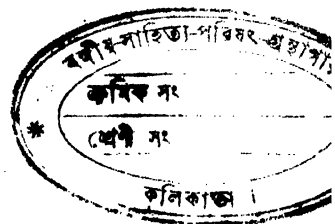
পঞ্চম বর্ষ—প্রথম খণ্ড।

১৩২৭ সনের অগ্রহায়ণ—১৩২৮ সনের বৈশাখ

বর্ণানুক্রমিক সূচী।

লেপ্টন্যান্ট মহারাজ কুমার হিতেন্দ্রনারায়ণ।

শোক-স্মৃতি

——:o:——

স্বর্গীয়

লেপ্টন্যাণ্ট মহারাজকুমার হিতেন্দ্রনারায়ণের

শ্রাদ্ধ-বাসরে।

মৃত্যুঃ সর্ব্বহরশ্চাহমুদ্ভবশ্চ ভবিষ্যতাম্
কীর্ত্তিঃ শ্রীর্ব্বাক্ চ নারীণাং স্মৃতির্মেধা ধৃতিঃ ক্ষমা।

*
* *

যদ্‌যদ্বিভূতি মৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেব বা
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোহংশসম্ভবম্।

*
* *

সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ। গীতা।

আমি সর্ব্বহর মৃত্যু, যাহারা জন্মিবে তাহাদের সম্বন্ধে আমি উৎপত্তি, নারীগণের আমি কীর্ত্তি, শ্রী, বাক্, স্মৃতি, মেধা, ধৃতি।

যে যে বস্তু ঐশ্বর্য্যযুক্ত, শ্রীযুক্ত, গুণাতিশয়, তাহাদিগকে আমার তেজোংশসম্ভূত বলিয়া জানিবে।

সমুদায় ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমারই শরণাপন্ন হও, আমি তোমাকে সমুদায় পাপ হইতে মুক্ত করিব; শোক করিও না।

কোচবিহার,
৭ই অগ্রহায়ণ, ১৩২৭।

শোক-স্মৃতি।

কি দুরদৃষ্ট আমাদের। আমরা অকালে আর একটি রত্ন হারাইলাম। এই সে দিন, ৭ বৎসর আজও পূর্ণ হয় নাই, কোচবিহারের সর্ব্বজনপ্রিয় নৃপতি রাজরাজেন্দ্র নারায়ণের অকাল স্বর্গারোহণে যে হৃদিবিদারক হাহাকার ধ্বনি কোচবিহারে উত্থিত হইয়াছিল, সে শোকাবেগ কথঞ্চিৎ প্রশমিত না হইতেই আজ আবার নিয়তির একি নিদারুণ শেলাঘাত! আমাদের অতিপ্রিয় মহারাজকুমার জিতেন্দ্র নারায়ণ শত সহস্র প্রাণকে গভীর শোকে নিমগ্ন করিয়া অকালে মহাপ্রস্থান করিলেন। মহারাজকুমার দার্জ্জিলিং শৈলে অবস্থান করিতেছিলেন, অকস্মাৎ কাল ইনফ্লুয়েঞ্জা তাঁহাকে আক্রমণ করিল, সুচিকিৎসকের সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া বিগত ২১শে কার্ত্তিক, ৭ই নভেম্বর রবিবার প্রাতে তিনি লোকান্তরিত হইলেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়স মাত্র ৩০ বৎসর হইয়াছিল। ১৮৯০ খৃঃ অব্দে ১লা জুলাই তাঁহার জন্ম, জীবন মধ্যাহ্নে উপনীত না হইতেই শৌর্য্য সূর্য্য অস্তমিত হইল। অমন সুকান্তি, বলিষ্ঠ দেহ, বীরোচিত বীর্য্য, কোচবিহারের গর্ব্ব, বঙ্গের শ্লাঘার বস্তু, এত সত্বর যে শেষ হইয়া যাইবে কে ভাবিয়াছিল। এ অভাব, দুর্দ্দমনীয় শোক কি সহ্য করিবার। একের অভাবে আজ চতুর্দ্দিক অন্ধকার, হৃদয়শতধাকারী মহাশোকে এরাজ্য আজ সমাচ্ছন্ন! রাজপরিবার, প্রকৃতিবর্গ, কর্ম্মচারীবৃন্দ, কোচবিহারবাসী, দীনদুঃখী শত সহস্র প্রাণ কি মর্ম্মন্তুদ হাহাকারে আজ আত্মহারা! সকলেই মহারাজকুমারের গুণে মুগ্ধ! তাঁহার অভাব কত প্রাণে কত প্রকারে শেল বিদ্ধ করিতেছে। [illegible] তিনি কেবল প্রিয়তম সহোদর নহেন, অকৃত্রিম বন্ধু, দক্ষিণ হস্ত, মন্ত্রণা-[illegible] পক্ষে তিনি কেবল রাজবংশাবতংশ বলিয়া প্রিয় নহেন, তাঁ[illegible], [illegible] বিশেষ আশ্রয়, ভরসাস্থল! দীনদুঃখীর নিকটে তিনি দানবীর দেবতা, শৌর্য্যহীন বঙ্গের তিনি আদর্শবীর, দেশের আশা! তাঁহার অভাব কি পূর্ণ হইবার!

দান, দয়া, দাক্ষিণ্য, বীরত্বের জন্য কোচবিহার রাজবংশ চিরপ্রসিদ্ধ; পুণ্যশ্লোক নৃপতি নৃপেন্দ্রনারায়ণ এ বংশের গৌরব-সূর্য্য, পূর্ব্বপশ্চিম তাঁহার যশঃপ্রভায় উদ্ভাসিত, প্রাচ্য-প্রতীচ্যের বিশেষ বিশেষ গুণাবলী তাঁহাতে সমভাবে পরিপুষ্ট পরিস্ফুট হইয়া এ মর-জগতে নৃপতি নৃপেন্দ্রকে অমর করিয়াছে; জিতেন্দ্র তাঁহার উপযুক্ত পুত্র, পিতৃপরিচয়ের প্রকৃষ্ট স্থল। বঙ্গের ইতিহাস ভুল করিয়া লিখিয়া বসিয়াছিল বঙ্গের শেষবীর প্রতাপ. বীরবর নৃপেন্দ্রনারায়ণ ইতিহাসের সে উক্তি ব্যর্থ করিয়া টিরাই অভিযানের সমর-প্রাঙ্গণে মৃত্যুকে তুচ্ছ করিয়া যেমন শৌর্য্যবীর্য্য সাহসীকতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন, তাহা প্রতাপশালী প্রতাপেরও শ্লাঘা, সে বীরত্বে কেবল যে বঙ্গের বহুকালের ভীরুতা-অপবাদ অপনোদিত হইয়াছিল, তাহা নহে, বর্ত্তমান রণনীতিবিশারদ বহু বীর সেই রণকলা-কৌশলে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পিতার উপযুক্ত পুত্র হিতেন্দ্র নারায়ণও সে সৌভাগ্য হইতে বঞ্চিত নহেন; তিনি জগতের মহাকুরুক্ষেত্রে লেফ্‌টন্যান্ট পদে বৃত হইয়া সমর-প্রাঙ্গণে যেরূপভাবে বীরত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, ১৯১৬ খৃঃ অব্দে ফ্লানডারে নোসাফলের যুদ্ধে ব্রিটীশ-বাহিনী যখন বিষম বিপন্ন, আতঙ্কিত, তৎকালে মহারাজকুমার নিজের প্রাণের মায়া তুচ্ছ করিয়া যে প্রকারে ব্রিটীশ যুদ্ধ-উপকরণবাহী রেলগাড়ীকে (British ammunition columnকে) নিরাপদ স্থানে পৌঁছাইয়া দিয়া সর্ব্বরক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা এক কল্পনাতীত ব্যাপার! বীরত্বের ইতিহাসে এক অত্যুজ্জ্বল ঘটনা! যে বংশ একসময় নিজ বাহুবলে আসাম হইতে বঙ্গোপসাগর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ফ্লানডারের যে দিনের ঘটনা সেই বীরবংশাবতংসের পক্ষেই সম্ভব। যুদ্ধকালে তাঁহার আরও এরূপ কার্য্যকুশলতায় মুগ্ধ হইয়া প্রধান সেনাপতি তাঁহার যুদ্ধ-বিবরণী-পত্রে মহারাজকুমারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করিয়া গুণগ্রাহিতার পরিচয় প্রদান করিয়াছিলেন। জগতের মহাসমর! কত শত শত বীরশ্রেষ্ঠ সমবেত যে ক্ষেত্রে সেখানে সুযশা হওয়া কম শ্লাঘার কথা নহে।

কেবল রণক্ষেত্রে নহে অন্যান্য কার্য্যকলাপেও তাঁহার অশেষ শৌর্য্যের পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যাইত। শিকারে তিনি সুনিপুণ, স্থিরলক্ষ্য; বীরোচিত ক্রীড়ায় তিনি আদর্শ ছিলেন। কর্ম্মে তাঁহার উৎসাহ অদম্য ছিল। লোকহিতব্রতে তিনি মুক্তহস্ত, কোন কার্য্য উপস্থিত

(নব পর্য্যায়)

'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৫ম বর্ষ। অগ্রহায়ণ, ১৩২৭ সাল। { ১ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা।

নিবেদন।

— ঃ*ঃ —

যাঁহার ইচ্ছায় জীবন, যাঁহার কর্ম্মসিদ্ধিতে জীবনের সাফল্য, যিনি কর্ম্মাধ্যক্ষঃ সর্ব্বভূতাধিবাসঃ—সকলের আশ্রয়, যাঁহার দীপ্তিতেই সকলে দীপ্তিমান্, যাঁহার প্রভায় সকলে প্রভান্বিত,—সর্ব্বমিদং বিভাতি, যিনি সমস্ত জীবের প্রাণশক্তি,—জীবনং সর্ব্বভূতেষু, তাঁহারই ইচ্ছায়, অনুকম্পায় 'পরিচারিকার' জীবনের আর একটি বৎসর অতীত হইল। এ জন্মাদনে আবার নবোদ্যমে নব-উৎসাহে কর্ম্মে প্রবৃত্তি তাঁহারই নিদেশে। নিত্যের কর্ম্মে নিবৃত্তি কোথা? নিত্যোনিত্যানাং, চেতনশ্চেতনানাম্—যিনি নিত্যের নিত্য, চেতনের চেতন তিনিই হৃদয়ে নিত্য-চৈতন্যের ব্যবস্থা করিয়া নিত্য-বস্তুর মাধুর্য্য-আকর্ষণে পরিচারিকাকে কর্ম্মানন্দে সেবাধর্ম্মে নিযুক্ত করুন। ভালমন্দ ফলাফল বিচারে কি প্রয়োজন!

ফলমত উপপত্তেঃ,—তাঁহা হইতেই জীবের কর্ম্মফল; বাগ্‌বিতণ্ডা বিচার-আচার সমস্তই ন্যস্ত হউক তাঁহাতে,—সর্ব্বতোভাবে সে শরণাপন্ন হ'ক তাঁহাতে—তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হউক! তাঁহার আশীর্ব্বাদে হৃদয়-শোণিত-তরঙ্গের তালে তালে সে সাহস সংগ্রহ করিয়া যেন বলিতে পারে—

"চলে যাব কর্ম্মক্ষেত্র মাঝখান দিয়া
বহিয়া অসংখ্য কাজে একনিষ্ঠ হিয়া,
সঁপিয়া অব্যর্থ গতি সহস্র চেষ্টায়
এক নিত্য ভক্তি বলে; নদী যথা ধায়
লক্ষ লোকালয় মাঝে নানা কর্ম্ম সারি
সমুদ্রের পানে ল'য়ে বন্ধহীন বারি।"

প্রিয়তমা।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ষড়বিংশ পরিচ্ছেদ।

পরদিন প্রাতে আকাশে মেঘ ছিল না, মেঘমুক্ত তপন রক্তিম আলোকে চারিদিক হাসাময় করিয়া তুলিয়াছেন। লিয়েনের শয়নকক্ষের জানালার কাচ ভেদ করিয়া সে আলোক তাহার গৃহের দৃশ্য উজ্জ্বল বর্ণে রঞ্জিত করিয়াছিল। ঘুম ভাঙ্গিতেই এই সুখময় চিত্র দেখিয়া লিয়েনের তন্দ্রালু চক্ষু দুটি হাসিয়া উঠিল। ঘন ঘোর দুর্য্যোগের পর অনাবিল সূর্য্যোদয়, আর তাহার জীবনের তিমির রাত্রিরও যে আজ অবসান হইয়াছে এ কথাও তখনি মনে পড়িয়া গেল। আনন্দ ও আলোকের সমান ছটায় উদ্ভাসিত হৃদয়ে, করযোড়ে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ প্রার্থনা করিয়া সে শয্যা ত্যাগ করিল।

সেদিন হানা সবিস্ময়ে দেখিল, প্রভুপত্নী আজ বাছিয়াবাছিয়া সুন্দর পরিচ্ছদ পরিধান করিলেন, ভায়োলেট রঙ্গের পাৎলা রেশমী পোষাকে জুলিয়েনকে বড় সুন্দর দেখাইয়াছিল। এই পোষাকটি পরিলে আল্‌রিক বলিতেন—"আজ লিয়েনকে বড় ভাল দেখাইতেছে।" তাই সে সেইটিই পড়িল।

তাহার পর লিয়োকে আনিয়া প্রসাধনান্তে তাহাকেও সুন্দর পোষাক পরাইয়া দিল। পূর্ব রাত্রিতে লিয়ো হপ্‌মার্শেলের ঘরেই ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, অধিক রাত্রিতে ভৃত্যেরা তাহাকে তাহার ঘরে দিয়া যায়। সাজসজ্জা শেষ হইলে লিয়েন তাহার হাত ধরিয়া বসিবার ঘরে চলিল।

সেখানে প্রাতভোজনের টেবিলে বৃদ্ধ বসিয়াছিলেন, এবং তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া ফ্রোলন। জুলিয়েনের স্মরণ হইল, তাহার বিবাহের পরদিন প্রভাতে তাহাকে এখানে এই ভাবে দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়াছিল। সে তাহার দিকেই চাহিয়া ছিল, হঠাৎ হপ্‌মার্শেলের সুতীক্ষ্ণ হাসিতে মুখ ফিরাইয়াই শুনিল, তিনি বলিলেন, "একি এ'কে তুমি না কি? আমাদের মাননীয়া লেডী, ব্যারণেস্ মাইনো,—হাঁ তিনিই ত বটেন! কোথা হইতে গো? কাল যে তুমি বড় তেজ দেখাইয়া শোন্‌ওয়ার্থ ত্যাগ করিতেছিলে, আজ যে দয়া করিয়া আবার এখানে পদধুলি দিয়াছ দেখিতেছি?"

লিয়েন উত্তর দিল না দেখিয়া একটু থামিয়া বৃদ্ধ আবার,—"ভাবিয়াছিলে যে চলিয়া যাইবার ভয় দেখাইলেই বাড়ীশুদ্ধ লোক তোমায় থাকিবার জন্য সাধিবে, কিন্তু জানিও মাইনোরা সে পাত্রই নয়, তাদের স্বভাব এখনও এমন হয় নাই যে এক কথায় তোমার পায়ে ধরিয়া খোসামোদ করিবে। কিন্তু হঠৎ মান ভাঙ্গিল কেন বল দেখি? একেবারে এত জাঁকজমকে বাহির হইয়াছ—তাহারই বা মানে কি? তা যাক্, পোষাকটা পরায় তোমাকে ঠিক্ তোমার মায়ের মতই সুন্দর দেখাইতেছে!"

এত কথার পরও লিয়েন কোন উত্তর দিল না দেখিয়া কিছু আশ্চর্য্য ও বিরক্তভাবে বৃদ্ধ ফ্রোলনের দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "কি লন্, তুমি যে এখনও দাঁড়াইয়া, কোন নূতন খবর আছে না কি? ব্যাপারটা কি বল ত, তোমায় অমন ভূতের মত দেখাইতেছে কেন?"

সত্যই তখন ফ্রোলনের মুখ অত্যন্ত বিবর্ণ, চোখ বসিয়া কোণে কালী পড়িয়াছে। সে মৃদুস্বরে বলিল, "কালিকার ঝড়ে হাওয়ান হাউসের চাল উড়িয়া গিয়াছে।"

"বটে, তা বেশ হইয়াছে! —সে পাপ বাড়ীখানার চিহ্ন পর্য্যন্ত মুছিয়া গেলে আমি নিশ্চিন্ত হইতাম। কিন্তু তুমি কি বলিতে চাও যে—"

"হাঁ মহাশয়, রাত্রিতে তাহার বড় কষ্ট গিয়াছে, সারা রাত্রি বৃষ্টি—"

উগ্রভাবে হপ্‌মার্শেল বলিলেন, "তার আমি কি করিব? বলিবামাত্র ত সে ঘর মেরামত করা যায় না। তাহাকে অন্য কোন জায়গায় সরাইয়া রাখ গিয়া।"

রুদ্ধস্বরে ফ্রোলন্ বলিল, "তাহাকে আর সরাইতে হইবে না সে আপনি যাইতেছে।"

বিস্মিতভাবে বৃদ্ধ বলিলেন, "সে কি? ডাইনী কি তবে আবার চলিবার শক্তি ফিরিয়া পাইয়াছে না কি?"

"চলিতে? না না, সে আজ এ পৃথিবী হইতেই চলিয়া যাইতেছে। আপনারা সকলে তাহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করুন প্রভু, আজ সে সুখ দুঃখের অতীত স্থানে চলিয়াছে—"

"সে কি, আজই? ফ্রোলন্,—"

"হাঁ, এ রাত্রি আর কাটিবে না।"

"ওঃ,"—নিষ্ঠুর বৃদ্ধের পাষাণ হৃদয়দ্বারেও এবার যেন একটা ঘা লাগিল। ঐ অনন্ত দুর্গতির মধ্যে মরণোন্মুখিনী নারীর প্রথম জীবনের অপরিমেয় সুখ, তাহার অতুল রূপময় যৌবন, দুঃখের ছায়াশূন্য সদ্যোবিকশিত পুষ্পের ন্যায় সরল প্রাণ;—আজ পলকের মধ্যে মনে উদয় হইয়া পাপিষ্ঠের চিত্তকেও আলোড়িত করিয়া তুলিল। তিনি ফ্রোলনের দিক হইতে মুখ ফিরাইয়া অন্যমনস্কভাবে চাহিয়া রহিলেন। কিন্তু সে অল্পক্ষণ মাত্র; খানিক পরেই জুলিয়েনের দিকে চাহিয়া বলিলেন, "আমি এতক্ষণ ঐ চিম্‌নীর দিকে চাহিয়া সেই কথাই ভাবিতেছিলাম, বুঝিলে প্রিয় লেডি, ঐ খানেই আমার সে প্রেমলিপিখানি পুড়িয়া গিয়াছে। আহা, আমার সে যৌবনের সুখ-স্মৃতি, সেটি নষ্ট করিয়া তোমার কি লাভ হইল বল ত? যাক্, এখন ঐ তোমার হাতে, যে হাতে না বলিয়া পরের জিনিষ খুঁজিয়া লওয়ার সমস্ত হিসাব দুরস্ত, সেই হাতে আমায় এক পাত্র চকোলেট করিয়া দিবে কি?"

নিঃশব্দে এক পাত্র পানীয় লিয়েন তাঁহার সম্মুখে আগাইয়া দিল। আজ বৃদ্ধের করস্পর্শ করিতে ঘৃণা ও ভয় দুই উপস্থিত হইয়াছে। হতভাগিনী লিলির দুর্দ্দশা ও মৃত্যুর নিদানভূত ঐ যে দুখানি শীর্ণ—বক্রাঙ্গুল হস্ত, তাহা স্পর্শ করিবার মত মনের বল এখন তাহার ছিল না।

এই সময় ব্যারণ প্রবেশ করিলেন। দ্বার হইতেই জুলিয়েনকে দেখিয়া তাহার চক্ষু হাসিয়া উঠিয়াছিল, ঘরে আসিয়া প্রফুল্ল স্বরে বলিলেন, "এই যে লিয়েন্, তুমি আগেই আসিয়াছ?" পরে ঘড়ি খুলিয়া দেখিয়া বলিলেন, "না, আমারই বিলম্ব হইয়া গিয়াছে। কাকা, এখনি একজন লোক ডচেসের নিমন্ত্রণ পত্র লইয়া আসিয়াছিল, তাহার সহিত কথা কহিতেই আমার বিলম্ব হইয়াছে। ডচেসের ওখানে আজ কনসার্ট পার্টি আছে, আপনারও নিমন্ত্রণ আছে দেখিলাম, যাইবেন ত?"

"নিশ্চয় যাইব, তোমাদের এই লক্ষ্মীছাড়া হতভাগা বাড়ীতে বসিয়া বসিয়া আমার বিরক্তি ধরিয়াছে, একটু কিছু বদল পাইলে বাঁচি,—কিন্তু ডচেস্ ত এ কথা কাল কিছুই বলিলেন না আমায়?"

ব্যারণ বলিলেন, "না, গাড়ীতে আমায় বলিয়াছিলেন যে একদল উৎকৃষ্ট গায়কসম্প্রদায় আসিয়াছে—একদিন তাহাদের গান শুনিতে হইবে। কিন্তু সেটা যে আজই হইবে,—তাহা তো বলেন নাই। ফ্রোলন যে, খবর কি লন্?"

লনের উত্তরের পূর্ব্বেই মার্শেল বলিয়া উঠিলেন, "ও বলিতেছে যে কালিকার ঝড়ে ইণ্ডিয়ান হাউসের চাল উড়িয়া গিয়াছে।"

"আঃ কি বিপদ! কত রাত্রিতে চাল উড়িল,—সে তখন কোথায় ছিল? বড় কষ্ট গিয়েছে ত তাহার!"

সজল নয়নে ফ্রোলন্ বলিল, "হাঁ প্রভু।"

"দ্যাখ দেখি লন্, এ তোমার অন্যায় হইয়াছে, তখনি জানান উচিত ছিল। যাক্ এখন কি বন্দোবস্ত করিয়াছ?"

"আর তাহার জন্য কোন বন্দোবস্তের প্রয়োজন নাই প্রভু।"

বিস্মিতভাবে ব্যারণ বলিলেন, "সে কি—তার মানে ?"

খুক্ খুক্ করিয়া হাসিতে হাসিতে বৃদ্ধ বলিলেন, "লন্ বলিতেছে, ডাইনীটা নাকি আজই মরিবে।"

চমকিয়া ব্যারণ বলিলেন, "মরিবে ? লন্' ডাক্তার এ কথা বলিয়াছে কি ?"

"আজ্ঞা কালই তিনি শেষ সংবাদ দিয়া গিয়াছেন, আজ অবস্থা আরও মন্দ, এখন শুধু—"

বাধা দিয়া ব্যারণ বলিলেন, "আজ ডাক্তার গিয়াছিল ?"

"না, আর দরকারও নাই।"

"নিশ্চয় দরকার আছে! আচ্ছা তুমি যাও,—আমি ডাক্তার লইয়া যাইতেছি, আর চালের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু আচ্ছাদনের ব্যবস্থা করিতে হইবে।"

এইবার বিরক্তভাবে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন, "তুমি কি যে বল রাওয়েল! ঐ পাপিষ্ঠা যাদুকরীকে আমি কখনো বাড়ীতে মরিতে দিব না।"

"সে কি কথা! মরিতে কোথায় পাঠাইব তাহাকে ?"

"কেন সরকারী গোরস্থানে পাঠাও না, একটু পরেই ত সে মরিবেই।"

"সরকারী গোরস্থানে ? ছিঃ তাহা হইতে পারে না কাকা, যথারীতি যত্নে যদি সে না বাঁচে—তবে ঐ হাউসের পার্শ্বে যেখানে গিল্‌বার্ট কাকার সমাধি আছে,—সেইখানেই তাহার জন্য সমাধির ব্যবস্থা করিব।"

"ঐ অখৃষ্টিয়ান স্ত্রীলোককে আমার ভ্রাতার পার্শ্বে সমাধি! রাওয়েল, কি বল তুমি ?"

"হাঁ কাকা তাহাই হইবে! জীবনে আমি তাহার প্রতি এতটুকু সুব্যবহার করি নাই, তাই মরণের পর,—যা পারি যা হয়—ততটুকু করিতেই হইবে।"

ভ্রাতুষ্পুত্রের প্রতি সর্পের ন্যায় ক্রুর হিংস্র দৃষ্টিপাত করিয়া নিষ্পীড়িত দন্তে হপ্‌মার্শেল বলিলেন, "বটে আজ তবে তুমি তাহার বন্ধু হইয়াছ দেখিতেছি। কিন্তু মনে রাখিও, সে তোমার কাকারও পরিত্যক্তা—বিশ্বাসঘাতিনী, কাল স্বয়ং তুমিও সে অন্তিম ইচ্ছাপত্র পাঠ করিয়াছ।"

"ইচ্ছা পত্র ?—জানিনা তাহার অর্থ কি, আর কে ভাল কে মন্দ—অন্তরের হিসাব আমরা কতটুকু জানি কাকা ? আর আজ তাহার বিচারের অধিকারও আমাদেয় নয়,—সে এখন যাঁহার নিকট চলিয়াছে তিনিই জানেন যে—"

"হাঃ হাঃ রাওয়েল, তুমি কি বলিতে চাও সে মরিয়া স্বর্গে যাইবে ?"

"হাঁ সে সেইখানেই যাইবে, যেখানে আমার গিসবার্ট কাকা তাঁহার জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় সামগ্রীর জন্য বাহু বাড়াইয়া দাঁড়াইয়া আছেন।"

"বাঃ বেশ, তোমার দিব্যদৃষ্টির তেজ আছে রাওয়েল, মৃত গিসবার্টের আত্মাকে পর্য্যন্ত দেখিয়াছ তুমি ! কিন্তু তোমার এই মাথা পাগ্‌লামীর খেয়ালে আমি চলিতে পারি না ত, ঐ প্রেতিনীর নারকী আত্মা যে আমার বাড়ীর চারিপাশে ঘুরিয়া বেড়াইবে, এই ঘরে—আমার গায়ে তাহার বাতাস লাগিবে, ইহা আমার সহ্য হইবে না। আমি তাহাকে এখনি সরাইয়া দিব ও তার জারজ সন্তানটাকেও এখনি মঠে পাঠাইব। ওরে, কেহ গিয়া কোর্টচ্যাপ্‌লিংকে ডাকিয়া আন্।"

এইবার উগ্রকণ্ঠে রাওয়েল্ বলিলেন, "না তাহার আসিবার কোন প্রয়োজন নাই ! এ শোনওয়ার্থ আমার, আমার বাড়ীতে তাহার মৃত্যুর ব্যবস্থা আমিই করিব। আর গেব্রিয়েল্ তাহার মঠে যাইবার কোন প্রয়োজন নাই, তাহাকে আমি আর্টস্কুলে দিয়া পরে ভালভাবে চিত্র-শিল্প শিক্ষার ব্যবস্থা করিব।"

এমন সময় ফ্রোলন সহসা অর্দ্ধস্ফুট আর্ত্তস্বরে কাঁদিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে দেয়ালের দিকে টলিয়া পড়িতেছে দেখা গেল। জুলিয়েন ব্যস্তভাবে নিকটে গিয়া তাহার পতনোন্মুখ দেহ টানিয়া একখানা আরাম চেয়ারে বসাইল।

কিন্তু ততক্ষণে ক্রোধান্ধ বৃদ্ধ চীৎকারস্বরে বলিতেছিলেন, "বটে এতদূর ? শোন্‌ওয়ার্থ তোমার—কিন্তু গেব্রিয়েল তোমার নয় তা ভুলিয়া যাইতেছ যে ? সে পোপের ধর্ম্মমঠে উৎসর্গীত, তাহার উপর তোমার কোন ক্ষমতা নাই।"

তেমনি সতেজে ব্যারণ বলিয়া উঠিলেন ;—ক্ষমতা আছে কি না তাহাও আমি ভাবিয়াছি, আইন আমার অজানা নয়। অপ্রকৃতিস্থ,—ডাক্তারে যাঁহাকে পক্ষাঘাতের রোগী বলিয়া স্থির

করিয়াছিল,—সেই ব্যক্তির মৃত্যুর ঠিক পূর্ব্বে যে উইল সম্পাদিত হয়, আইনে তার কোন মূল্য নাই। তাহাতে কি কোন ডাক্তারের সার্টিফিকেট বা স্বাক্ষর আছে? সে উইল অসিদ্ধ।"

এইবার বৃদ্ধ পাগলের ন্যায় আসন ছাড়িয়া লাফাইয়া উঠিলেন। হাতের লাঠি মাটিতে ঠুকিয়া চীৎকারস্বরে বলিলেন "তবে রে অপদার্থ! এ আইন জ্ঞান তোর কতদিন হইয়াছে? তোর নূতন মন্ত্রী যে কে, তাহাকে আমি জানি না? হতজ্ঞান—স্ত্রৈণ, এত দিন পরে একটা লাল-চুল স্ত্রীলোক তোকে এমনভাবে ক্রীতদাস করিয়াছে? হায় হায় আমার স্বর্গের দুহিতা লোকলোমভূতা উচ্চহৃদয়া ভ্যালেরিকে যে হৃদয়ে স্থান দাও নাই, আজ সেইখানে ঐ গর্ব্বিতা কুৎসিতা অপদস্থ ট্রেচেনবার্গকন্যাকে রাণী করিয়া বসাইয়াছ?"

বলিতে বলিতে পদস্খলিত হইয়া তিনি চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। প্রভুদ্বয়ের বচসায় ফ্রেলন হতবুদ্ধিভাবে সেই চেয়ারটায় বসিয়া তাঁহাদের প্রতি চাহিয়াছিল। সহসা তাহার দিকে দৃষ্টি পাড়তে বৃদ্ধ আবার গর্জ্জন করিয়া বলিলেন "এ কি লন্, তুমি ত বেশ সুস্থ হইয়াছ দেখতেছি, তবুও আসনে বসিয়া আছ যে! না শোনওয়ার্থে বসিয়া চাকরদাসীদের নিকটও আমার এই সব অপমান সহ্য করিতে হইবে?"

প্রভুদের সম্মুখে ওভাবে বসিয়া থাকা অন্যায়, ফ্রোলনও তাহা সর্ব্বান্তঃকরণে স্বীকার করিল এবং বৃদ্ধের পদতলে বসিয়া কাতরভাবে মার্জ্জনা ভিক্ষা করিল, তাঁহার ক্রোধ অনেকটা শান্ত হইল। তখন তাহার প্রতি সদয়ভাবে বলিলেন "বুঝিয়াছি, তুমি বড় অন্যমনস্ক স্ত্রীলোক যাক্ এখন তুমি আমার চেয়ারটা ঠেলিয়া আমার নিজের ঘরে লইয়া চল, আমি আর এখানে থাকিতে চাই না।"

হপ মার্শেলের চক্রাসন চলিল; যাইবার সময় ফ্রোলন, ব্যারণদম্পতির প্রতি কৃতজ্ঞ দৃষ্টি-পাত করিয়া মাথা নীচু করিয়া গেল।

জুলিয়েন এতক্ষণ দূরে বসিয়া নীরবে অন্য দিকে চাহিয়াছিল, এইবার মৃদুপদে স্বামীর নিকট আসিয়া তাঁহার টেবিলের উপর প্রসারিত হাতখানি তুলিয়া লইয়া ওষ্ঠে স্পর্শ করিল। পিতৃব্যের সহিত বচসায় ব্যারণ অন্যমনস্ক ও অবসাদগ্রস্তভাবে টেবিলের উপর মাথা রাখিয়া চক্ষু মুদিয়াছিলেন। লিয়েনের স্পর্শে সহসা চমকিয়া বসিয়া উঠিলেন "অঃ তুমি—লিয়েন!" বলিতে বলিতেই হাতদুটি তাহার দিকে আগাইয়া দিলেন।

লজ্জিতভাবে হাসিয়া একটু সরিয়া লিয়েন সাদরে সে হাত দুখানি ধরিল। তাহার পর স্নিগ্ধ মধুর স্বরে বলিল "কেন অত বিবাদ করিলে রাওয়েল ?"

"বিবাদ কি সাধে করি, কাকার অন্যায় কথা শুনিলে না ? বল আমি কি অন্যায় বলিয়াছিলাম যে তিনি অত রাগ করিলেন ?"

"তোমার অন্যায়, না তুমি আজ ঠিক অন্যায়ের প্রতিকূলেই কথা বলিয়াছ, ব্যারণ মাইনোর উপযুক্ত কথা তাহা ; কিন্তু সংসারের শান্তি—"

"তাহা আমি শুধু তোমার নিকটেই পাইতে চাই লিয়েন, আমার এই স্বস্তিহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবনটাকে যদি ক্ষমার চক্ষে দেখিতে পার,—ঘৃণা না করিয়া যদি একটু ভালবাসা—"

"পাগল হইয়াছ রাওয়েল ?"

"না না আমি এখনও বুঝিতে পারি না লিয়েন, আমার দেওয়া তত অপমান—তত দুর্ব্যবহার, তুমি এক কথায় ভুলিবে কিসে ? কোন্ কথায় কোন্ কাজে তুমি আমার কাছে কি সহৃদয়তা পাইয়াছ, বা আমার এই বাড়ীটাতে পর্য্যন্ত তুমি কি সম্মান ভোগ করিয়াছ—"

"তাহা আমি জানি না, কিন্তু হঠাৎ এসব কথা তোমার মনে হইল কেন বল দেখি ?"

"মানুষ প্রকৃতিস্থ হইলেই প্রকৃত কথা তাঁর স্মরণে উদয় হয় ; বল লিয়েন, আমায় ক্ষমা করিবার মত তুমি কি পাইয়াছ ? কোন্ গুণে আমায় ভালবাসিতে পারিবে ?"

"পারিব, তুমি এই কথা বলিতেছ রাওয়েল ?"

"হাঁ, এখানে ভবিষ্যৎ বরং সাজে, কিন্তু অতীত যে কত অশোভন—কত অসম্ভব তাহা বুঝিতেছ না কেন ? কে তোমার কথা বিশ্বাস করিবে যে তুমি আমায় ভালবাসিতে পারিয়াছ ?"

"কাহাকেও বিশ্বাস করিতে হইবে না,—আমি কাহাকেও সে কথা বলি নাই,—এখন চুপ করিবে কিনা বল ?" লিয়েনের মুখে লজ্জা উৎকণ্ঠার ছায়া পড়িয়া অর্দ্ধাবৃত চন্দ্রের ন্যায় অপরূপ সুষমাময় দেখাইতেছিল। মুগ্ধ ব্যারণ ব্যাকুল চক্ষে তাহার প্রতি চাহিয়া বলিলেন,— "তবে তুমি বল,— সত্য কথা বল।"

"কোন মিথ্যাকথা ত বলি নাই, কি বলিব বল।"

"বল আমায় ঘৃণা কর না !"

"দ্যাখ—আবার ঐকথা ! যাও— তুমি আমার হাত ছাড়, আমি এখানে থাকিব না—"

তাহাকে ক্রোড়ের নিকট টানিয়া সবলে বাহুবদ্ধ করিয়া ব্যারণ বলিলেন, "না, যাইতে দিব না, আর কোথাও পলাইতে দিব না। কিন্তু বল বল আমায় একটু ভালবাস ?"

"ছি ছি—কর কি ? ছাড় ছাড় ;—কি মানিক, লিয়ো আমার ! কি হয়েছে ধন ?

লিয়ো এতক্ষণ ঘরে খেলা করিয়া বেড়াইতেছিল সহসা পিতার আদরের মধ্যে মাতাকে দেখিয়া বালক হতবুদ্ধভাবে সেইদিকে চাহিয়া আছে দেখা গেল। তাহার চক্ষুদুটি অপ্রতিভ ও ম্লান। লিয়েন ছুটিয়া আসিয়া তাহাকে কোলে লইয়া চুম্বন করিতে লাগিল। তখন তাহার কাণের কাছে মুখ দিয়া বালক বলিল, "মা, বাবা তোমায় মারেন নি ত ?"

নিকটে আসিয়া মাইনো বলিলেন, "হাঁ রে পাজি ছেলে, আমি তোর মাকে মারিয়াছি—তুই তার কি করিবি ?" বলিয়াই তাহাকে নিজের কাছে লইবার জন্য হাত বাড়াইলেন।

শিশু মাতাকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া বলিল "না তোমার কাছে যাব না যাও।"

"তবে মা-ছেলেকে একসঙ্গে তাড়াইয়া দিব—তা জানিস ?—"

লিয়ো বলিল, "দাও না, আমরা রুডিস্‌ডর্কে চলিয়া যাইব। কেমন মা ?"

লিয়েন মৃদু হাসিয়া তাহাকে চুম্বন করিল ; ব্যারণ বলিলেন, "মায়ের বচনগুলিও শিখিয়াছ দেখিতেছি ! হাঁ লিয়েন, একটা কথা, আমি মনে করিয়াছিলাম যে কিছুদিন তোমাকে ও লিয়োকে লইয়া উস্কার শাসনে গিয়া থাকিব ; কিন্তু ঐ দুর্ভাগ্য বালক গ্রোব্রয়েলের জন্য আমার এখন দিনকত বিলম্ব হইবে, ইতি মধ্যে—তুমি লিয়োকে লইয়া গেলে হয় না ? বল ত কাল পরশুই সে বন্দোবস্ত ঠিক্ করি।"

লিয়েন চমকিত হইল ; এখনই স্বামীকে ছাড়িয়া থাকা ? সে বিচলিতভাবে বলিল, "আমি একা ? সেখানে—তুমি কতদিনে যাইবে রাওয়েল্ ?"

হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "ওঃ যাইতে তবে তোমার নিজের ইচ্ছা নাই ? তাহা হইলে তাড়াতাড়ি কি ? আমি মনে করিয়াছিলাম যে ইহার পর হইতে কাকার সঙ্গে যে ঠোকা-ঠুকি চলিবে আমার তাহার মধ্যে পড়িয়া তোমার পক্ষেও যদি কিছু বিরক্তি বা কষ্টের কারণ ঘটে—তাই—"

বাধা দিয়া লিয়েন বলিল, "না না তাঁহার কোন কথায় আমি কথা কহিতে চাই না ত, যে টুকু একদিন সে অন্যায় করিয়াছি,—তখন যে বড় অসহ্য হইত! কিন্তু আর তাহা ঘটিবে না, তুমি দেখিও।"

তাহার গণ্ডদেশে অঙ্গুলি আঘাত দিয়া ব্যারণ বলিলেন, "ওগো নিপুণা গৃহকর্ত্রী, তোমার কাছের আরাম টুকু আমার নিজেরও যে অল্প বাঞ্ছনীয় তা মনে করিয়ো না; নারীর প্রাণের সেবা যত্ন লাভ—আমার জীবনে বোধহয় ঘটেও নাই,—এখানে থাকিবার জন্য অমন করুণভাবে অনুনয় করিতেছ কাহার কাছে?—ভাল লিয়েন, তোমার রুডিস্‌ডর্কে কে এমন মিষ্টভাষী,—ট্রেচেনবার্গদের গর্ব্ব ও তেজের কথাই ত শুনিয়া আসিয়াছি, তাহার মধ্যে তুমি এ বিনয়ের মধুর ভঙ্গী কোথায় শিখিলে বল ত?"

লজ্জায় মুখ ফিরাইয়া লিয়েন মৃদু হাসির সহিত বলিল, "কেন, ম্যাগনসের কথা তোমায় ভাল লাগে নাই? আমাদের মধ্যে সেই ত নিরীহ—তাহারই স্বভাব মিষ্ট।"

"ঠিক্ বলিয়াছ। অঃ অনেক দিন তাঁহার সহিত দেখা হয় নাই লিয়েন, থাম এই ব্যাপারটা চুকিয়া যাক্, তারপর দিনকত তোমাদের লইয়া রুডিসডর্কেই যাইব।

বেলা অধিক হইয়া যাইতেছে, ভৃত্যেরা একথা স্মরণ করিয়া দেওয়ায় তাহারা প্রাতর্ভোজনে বসিলেন। আহার শেষে ব্যারণ বলিলেন "ডচেসের বাড়ীর নিমন্ত্রণের কথা শুনিয়াছ ত? প্রস্তুত থাকিও, তোমায় আমার সঙ্গিনী হইতে হইবে।"

ডচেসের নামে লিয়েনের প্রফুল্ল মুখ পলকের জন্য নিষ্প্রভ হইয়াছিল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ সে ভাব দূর করিয়া সে বলিল "তুমি যেখানে লইয়া যাইবে সেইখানেই যাইব কিন্তু তিনি যদি বিরক্ত হন্?"

"হন্ হইবেন! সে ভাবনায় ত আমি গেলাম! না তোমার যাইতে হইবে লিয়েন, একথা ভুলিও না আর সে শুধু ধনীসম্প্রদায়ের সভা, সাজসজ্জা দস্তুরমত করিয়ো বুঝিলে?"

মৃদুস্বরে লিয়েন বলিল "বুঝিয়াছি।"

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ।

ইহার পরই ব্যারণ একাকী ইণ্ডিয়ান হাউসের দিকে চলিয়া গেলেন। গত রাত্রির ভীষণ ঝাত্যায় সেই পরম রমণীয় স্থানটি একান্ত শোভাশূন্য হইয়া গিয়াছে। চারি পার্শ্বের শ্যামল শোভাময় কদলী বৃক্ষগুলি ভূতলশায়ী, নেবুর পাতা আমের ডাল চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে একটি প্রকাণ্ড অশ্বত্থগাছ আমূল উৎপাটিত হইয়া উলটাইয়া পড়িয়াছে। বানর কয়টা সারা-রাত্রি ভিজিয়া এখন পত্রহীন শাখায় বসিয়া রৌদ্রে পিঠ শুকাইতেছে।

হতশ্রী আবরণ শূন্য গৃহখানির দিকে চাহিয়া ব্যারণ বুঝিলেন যে তাহার সম্পূর্ণ সংশোধন এখন অসম্ভব তাই ভৃত্যগণকে আদেশ দিলেন—গৃহে যে কোন আচ্ছাদনী আছে তাহাই আনিয়া চালার উপর ঢাকিয়া দেওয়া হউক্।

বেশী বিলম্ব হইল না, শোন্ ওয়ার্থের সমস্ত লোক মিলিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই গৃহখানি আচ্ছাদিত করিয়া ফেলিল। আশ্রয়শূন্য পাখীরা ও বানরেরা অনবরত কিচিমিচি বাধাইয়া স্থানটি অশান্ত করিয়া তুলিয়াছিল, ভৃত্যেরা তাড়াদিয়া তাহাদের তাড়াইয়া দিল। গাছ পালা সরাইয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হইলে স্থানটি আবার নির্জ্জন শান্ত—রোগীর পক্ষে আরামদায়ক হইয়া উঠিল।

ব্যারণ ঘরে গিয়া বসিয়াছিলেন। ডাক্তার রোগীকে পরীক্ষা করিয়া জীবনের কোন আশা না দিলেও রুগ্নার স্বস্তির জন্য অনেক ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। প্রভুর দাসদাসীরা আসিয়া লিলির সেবায় ব্যস্ত হইল। কিন্তু মিথ্যা! আর দুইদিন পূর্ব্বেও এ অনুগ্রহের বিন্দুমাত্র পাইলে যাহার মৃত্যুশয্যা স্বচ্ছন্দ বা শান্তিময় হইত, আজিকার এ অজস্র বর্ষিত করুণাধারা এখন আর তাহার স্পর্শে আসিল না; লিলি তখন সম্পূর্ণ অজ্ঞান। সুদূর দেশের সেই নির্ম্মল পুষ্পটি নির্ম্মম অত্যাচারের পদতলে দলিত হইয়া শুখাইয়া গিয়াছে। দ্বাদশ বর্ষ ব্যাপী ভীষণ যন্ত্রণার পর অন্তিমশয্যাশায়িনী আসন্নমরণা হতভাগিনী, তবু সেই অপরিসীম রূপের ছায়াটুকু দেখিয়াই রাওয়েল বিস্মিত হইলেন। ভৃত্যবর্গও বিস্মিত নয়নে তাহাকে দেখিতেছিল। বৃদ্ধা কুরূপা ডাকিনী বলিয়া যাহাকে তাহারা জানিত, ভয়ে যাহার ছায়া মাড়াইতে সাহস করিত না, সে এই বালিকাকৃতি অপরূপা সুন্দরী নারী? দাসীরা ছুটিয়া গিয়া—"হিন্দুস্থানের হুরী" দেখিবার জন্য অন্যান্য দাসীদের ডাকিয়া আনিল।

ব্যারণ স্তব্ধভাবে পাশের চেয়ারে বসিয়াছিলেন। এই নির্দ্দোষী অনাথা যে তাহার পিতৃব্যের প্রাণাধিকা ছিলেন ;—তাঁহার নির্ব্বোধ অনাস্থার জন্যই তাঁহার এতদুঃখ এ অকাল মৃত্যু উপস্থিত হইয়াছে। মাঝে মাঝে তাঁহার দীর্ঘনিঃশ্বাস উদ্গত হইতেছিল।

বহুক্ষণ পরে রুগ্নার শয্যার নিকট জানু পাতিয়া ব্যারণ, রাজরাণীর সম্মেন তাহার অঙ্গুলি চুম্বন করিয়া ধীরে ধীরে সে কক্ষ ত্যাগ করিলেন। দ্বারপার্শ্বে বালক গেব্রিয়েল অবসন্নভাবে পড়িয়াছিল; তাহাকে তুলিয়া পরম স্নেহভরে আশ্বাস দিয়া তিনি ম্লান বদনে শোনওয়ার্থে প্রবেশ করিলেন।

হলে আসিয়া শুনিলেন হপ্‌মার্শেল আজ আর এখানে আহারে আসিবেন না, এখানে না কি ইণ্ডিয়ান হাউসের বাতাস আসিতেছে—তাই তিনি নিজের ঘরের পর্দ্দা টানিয়া কপাট বন্ধ করিয়া সেই ঘরে লুকাইয়াছেন। খাদ্য সেইখানেই গিয়াছে।

অগত্যা তিনি লিয়েন লিয়ো ও তাহার মাষ্টার,—সকলে মিলিয়া আহারে বসিলেন। আহারান্তে তিনি চিঠি লিখিতে বসিলেন ও লিয়েন ইণ্ডিয়ান হাউসের উদ্দেশে চলিলেন, জুলিয়েন যখন রোগিণীর নিকট দাঁড়াইল, তখন তাহার শ্বাস মাত্র অবশিষ্ট, তাহাও বোধহয় ক্রমে মৃদু হইয়া আসিতেছে। সম্মুখে একখানি চেয়ারে বসিয়া গেব্রিয়েল,—একদৃষ্টে মাতার মুখের প্রতি চাহিয়া, তাহার দুই চক্ষু ছাপাইয়া জলধারা নামিতেছে। রাত্রি জাগরণে কষ্টে দুঃখে তাহাকেও মৃতপ্রায় দেখাইতেছিল।

"তুমি একা গ্রেব্রিয়েল? জোশন কোথায়?" লিয়েনের কথার সঙ্গে সঙ্গেই অপর পার্শ্ব হইতে ছুটিয়া আসিয়া লন বলিয়া উঠিল, "এই যে মা, এই যে তোমার লন্,"—বলিয়াই সে আবেগ ভরে লিয়েনের পদতলে বসিয়া পড়িল ও বসনপ্রান্ত চুম্বন করিতে করিতে বলিল, "স্বর্গের দূতী,—জগদীশ্বরের করুণা! তোমায় আর কি বলিব জানি না যে গো!"

ম্লান হাসিয়া লিয়েন তাহার হাত ধরিয়া বলিল, "ছিঃ লন্; পাগ্‌লামি করিয়ো না শোন, গেব্রিয়লকে কিছু খাওয়াইয়াছ কি? তাহাকে বড় কাতর বোধ হইতেছে।

একটু দুধ খাওয়াইয়াছি; খাইতে কি পারে? তবু তোমার নাম করিয়া বলায় একটু খাইল। ও যে বুঝিয়াছে মা, তুমিই উহার জীবনের অভিশাপ মোচন করিয়াছ।"

"একটু নিশ্বাস ফেলিয়া লিয়েন বলিল, "আমি না লন,—আমার স্বামী করিয়াছেন!"

ফ্রোলন বলিয়া উঠিল, "না না লেডি, তা নয়। আমি সব বুঝিয়াছি. আজ সকালে যখন আমাদের যুবা প্রভুকে দেখি, তখনই বুঝিলাম যে আজ তাঁহার জীবন অন্য পথে ফিরিয়াছে। তিনি তোমায় চিনিয়াছেন। যে তোমায় চিনিবে—আঃ মা আমার, এত মধুরতা কি আর কোথাও আছে? তোমার জন্যই সব তুমিই গেব্রিয়েলের উদ্ধারকর্ত্রী।"

লনের কথায় বিশেষ মন না দিয়া লিয়েন গেব্রিয়েলের নিকটস্থ হইয়া বলিল, "সমস্ত দিন কি এখানে বসিয়াই আছ? একটু বাহিরে বেড়াও না গেব্রিয়েল! আমরা সকলেই ত ইঁহার কাছে রহিলাম,—তুমি ততক্ষণ বিশ্রাম কর গিয়া।"

বিনা বাক্যব্যয়ে গেব্রিয়েল তখনি উঠিল, কিন্তু বাহিরে গিয়া যে জানালা দিয়া মাতার মুখখানি দেখা যাইতেছিল, তাহারই অদূরে বসিয়া রহিল!

সে চলিয়া গেলে ফ্রোলন বলিল, "উঁহার শুভাদৃষ্ট যে এই সময় আপনি এখানে আসিয়াছিলেন; নতুবা আজও দুর্ভাগ্যের পক্ষে কি দিন আসিত!"

"সবই ভগবানের খেলা লন্. আর দয়ালু ব্যারণ—"

"না না লেডি, তা নয়! ভগবান ছাড়া এখানে যদি আর কাহারও নাম করিতে হয় ত সে একা আপনি, ব্যারণের নিজের ইচ্ছা"—বলিতে বলিতে ফ্রোলন্ থামিয়া গেল, সে স্পষ্ট বুঝিল যে স্বামীর নিন্দায় লিয়েন অসন্তুষ্ট হইতেছে। তাড়াতাড়ি কথা ফিরাইয়া বলিল, "যাক্ সে সকল সম্প্রতি লিলির সম্বন্ধেই একটা কথা বলিব আপনাকে।"

উৎসুকভাবে লিয়েন বলিল, "কি কথা?"

ফ্রোলন্ বলিল, "বলিতেছি মা, আপনি পূর্ব্বাপর অনেক কথাই শুনিয়াছেন, অল্পকথাতেই বুঝিতে পারিবেন এখন। আমি ঐ পদকটির কথা বলিব ঐ যে উঁহার গলায় রহিয়াছে—"

ব্যগ্রকণ্ঠে লিয়েন বলিলেন, "হুঁ হাঁ যেটাকে এখন পর্য্যন্ত সে মুঠায় চাপিয়া রহিয়াছে—"

"অমনি চিরদিনই করে—মনে আছে আপনার সেই সে দিন যখন কোর্ট চ্যাপলিন ওটা খুলিতে চান, তখন ও কেমন অস্থির হইয়া পড়ে!—কেন হইবেনা, উঁহার মধ্যেই যে উঁহার সর্ব্বস্ব লুকানো আছে। আহা লিলির সেই অকস্মাৎ পীড়ার কথা আপনার স্মরণ আছে কি?—সে যে চুরি করিয়া শোন্ ওয়ার্থে পলাইত—"

"সব মনে আছে, তুমি বলিয়া যাও।"

এ সেই অসুখের পূর্ব্বের ঘটনা! জানেন ত গিলবার্ট প্রভু শয্যাগতভাবে বহুদিন পড়িয়া ছিলেন, আর কুচক্রী মার্শেল ও তাঁর ভণ্ড ধর্ম্মযাজক বন্ধু দিবারাত্রি তাঁহার কাণে এই হতভাগিনীর নামে অপবাদের বিষ ঢালিত। সেই সঙ্গে নির্ব্বোধ স্বামীও যোগ দিয়া ইহার অদৃষ্টকে দুর্ভাগ্যের চরমে তুলিয়া দেন; সেই সময়ের কথা বলিতেছি সেদিন কোর্ট চ্যাপলেন কি যেন করিতে সহরে গিয়াছিলেন, আমার স্বামী জ্বরে পড়িয়া প্রভুর কাছে যাইতে পারেন নাই, আমি একাই তাঁহার সেবার জন্য উপস্থিত ছিলাম।"

"আর হপ্‌মার্শেল কোথায় ছিলেন?"

তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল, সব দিকেই সেদিন সুযোগ ছিল মা, তাই আমার মনে হইতেছিল যে আজ যদি একবার লিলিকে আনিয়া ইঁহার সহিত দেখা করাইতে পারি! মেয়েটির কান্না যে বড় অসহ্য হইয়াছিল লেডি, বিশেষ সেই নির্দ্দোষা শিশুটির জন্য আরও—হাঁ প্রভুর ঘুম ভাঙ্গতে তিনি আমায় জানালা খুলিয়া দিতে বলিলেন। সেদিন তাঁহাকে অনেকটা সুস্থ ও প্রফুল্ল দেখিয়া আমার যেন সাহস আসিল, বলিলাম, "প্রভু লিলি একবার আপনাকে দেখিতে চায়।" আঃ মা, সেই মিথ্যাবাদীদের অবিরত কুমন্ত্রণায় তাঁহার মাথা খারাপ হইয়াছিল, লিলির নামে তাঁহারও মুখ বিকৃত হইল। কিছুক্ষণ চুপ্ করিয়া থাকিলেন; তাহার পর কি মনে হইল—ইঙ্গিত করিয়া আমায় তাহাকে লইয়া আসিতে বলিলেন। তারপর আমি যত শীঘ্র সম্ভব তাহাকে লইয়া গেলাম। সে সব কথা আর কি বলিব, সে দৃশ্য যে আমার মনে আঁকা আছে!"

ক্ষোভে স্তব্ধ হইতেই লিয়েন বলিল, "তারপর কি হইল?"

এক ফোঁটা চোখের জল কাপড়ে মুছিয়া ফ্রোলেন বলিল, "প্রথমটা ইহাকে দেখিয়া প্রভুর মুখ লাল হইয়া উঠিল, তাঁহার চক্ষে বিরক্তিভাব লক্ষ্য করিতেই লিলি কাঁদিয়া উঠিল; আপনার দেশের ভাষায় কত কি যে বলিতে লাগিল, তাহা আমি না বুঝিলেও প্রভু সে ব্যাকুল বেদনা বুঝিলেন, দুই হাত বাড়াইয়া লিলিকে একেবারে বুকের মধ্যে টানিয়া লইলেন। সে যে কি দৃশ্য, আপনাকে আমি বেশী কি বলিব বলুন, আপনার মত সহৃদয় প্রাণ কি তাহা অনুভব করিতে না পারে? আমি স্তম্ভিত হইয়াছিলাম, লিলিও অজ্ঞানের মত নিশ্চলভাবে পড়িয়াছিল

কিন্তু প্রভুর আমার বুদ্ধিবৃত্তি তখনও সজাগ ছিল—বরং উপস্থিত কাণ্ডজ্ঞান যেন সহসা আরও মাথা তুলিয়াছিল। তিনি হাত দিয়া আমায় লিখিবার সামগ্রী আনিতে বলিলেন। তাহার পর একখানি চিঠি লিখিয়া নাম স্বাক্ষর করিয়া তাহাতে নিজের আঙ্গটির শিল ছাপিয়া দিলেন সেই আঙ্গটিটা লেডি, আপনার স্মরণ আছে কি? কপ মার্শেলের হাতের ঐ আঙ্গটি সেদিন বাগানে পড়িয়া যায়, গেব্রিয়েল তাহা কুড়াইয়া পাইয়াছিল, সেই—"

"হাঁ, তিনি বলিয়াছিলেন যে সেটি তাঁর ভ্রাতার শেষ উপহার।"

ঠিক্, সেটা আমি ভাল করিয়াই চিনি, আমিই সাহায্য করি শিল করিবার সময়। তার পর চিঠি খামে পূরিয়া তাহাতে আমাদের যুবা প্রভুর শিরোনাম দিয়া আমার হাতে দিলেন। লিলি এতক্ষণ নীরবে এই সকল দেখিতেছিল, এইবার সে পত্র আমার হাতে পড়িতেই সে লাফাইয়া পড়িয়া আমার নিকট হইতে সেখানা কাড়িয়া লইল। প্রভু ইসারায় তাহাকে কি বলিলেন, বোধ হয় যত্ন করিয়া রাখিতে। লিলি তখন তার গলায় চেন লাগানো ঐ পদকটা খুলিয়া তাহার মধ্যে যা কিছু ছিল সব ফেলিয়া দিয়া চিঠিখানি তাহাতে বন্ধ করিয়া ফেলিল। প্রভু তাহার পাগলের মত মূর্ত্তি দেখিয়া একটু হাসিয়া তাহাকে লইয়া যাইতে ইঙ্গিত করিলেন। সে কি সহজে আসিতে চায়? তাঁহার দুটি পা ধরিয়া কি কান্নাই যে কাঁদিতে লাগিল! পাছে কেউ আসিয়া পড়ে বলিয়া আমার ভয়ও ছিল, কত করিয়া বলিতে লাগিলাম—তবু সে নড়িতে চায় না। অবশেষে প্রভু কি সামান্য ইঙ্গিত করিতেই সে তৎক্ষণাৎ আমার সঙ্গে চলিয়া আসিল।"

এইখানে ফ্রোলন একটু থামিতেই লিয়েন বলিয়া উঠিল, "তারপর? তার পর তুমি আর কোন দিন তাহাকে লইয়া গিয়াছিলে কি?"

"না, আর তেমন সুবিধা পাইলাম কৈ! কিন্তু মা এবার তাঁহার দেখা পাইয়া লিলি যেন পাগল হইয়া গেল। আমায় বলিয়া যখন না পারিল, তখন নিজেই পলাইয়া শোনওয়ার্থের দুয়ারে উপস্থিত হয়, সে দিন আমি ধরিয়া আনি কিন্তু তারপর যেদিন আমায় লুকাইয়া আবার সেখানে যায়, সেই দিনই তাহার এই দুর্দ্দশা হইল, সন্ধ্যার সময় চাকরেরা একেবারে তাহার অচেতনা দেহ আনিয়া দিয়া গেল। সে কথা আপনাকে ত বলিয়াছি?"

মৃদুস্বরে লিয়েন প্রশ্ন করিল, "আর জ্ঞান হয় নাই?"

ফ্রোলন বলিল "মুখে আর কথা ফুটিল কৈ ? তবু ছেলেটি লইয়া প্রফুল্ল হইত। প্রভুর মৃত্যু সংবাদ ত উহাকে দিই নাই আমি। কিন্তু একদিন ঐ হতভাগা পাদ্রী আসিয়া সে কথা বলিয়া দিল ; উঃ কি সে হৃদয়ভেদী চীৎকার ! তাহার প্রাণ যেন তখনি বাহির হইয়া গেল ! ভীষণ মূর্চ্ছা, আমি ত মৃত্যুই মনে করিয়াছিলাম কিন্তু ডাক্তার বলিল, 'না মরে নাই।' তারপর আর ভাল করিয়া চৈতন্য সঞ্চার হয় নাই, ভিতরে যে জ্ঞানটুকু ছিল, তাহাও পাগলের মত।"

সচমকে নিশ্বাস ফেলিয়া লিয়েন বলিল, "এমন দুঃখের কথা খুব কম শোনা যায়,—কিন্তু ফ্রোলন, সে চিঠিখানি তুমি ব্যারণকে দাও নাই কেন ?"

বিনীত স্বরে ফ্রোলন বলিল, "একটু ভাবিয়া দেখুন মা, বড় বড় বিশ্বাসী লোকদের কথা ঠেলিয়া ব্যারণ কি এই দাসীগণের কথা মানিতেন ? তাহাতে গেব্রিয়েল আর তাহার দুঃখিনী জননীর প্রতি তাঁহার চিরদিনের বদ্ধমূল ঘৃণা ; সহজে আমার বলিতেই দিতেন না হয় ত। মোটের উপর আমি ইহাদের নিকটে আসিয়া যেটুকু সেবা করিতে পারি তার সেটুকুও বন্ধ হইত। মনের ভাব লুকাইয়া আমি যে তাঁহাদের নিকট ইহার প্রতিকূল কথা চিরদিনই বলিয়া থাকি, নতুবা হপ মার্শেল কি আমায় এ দেশে রাখিতেন ?"

"তা জানি, তবু তোমার উচিৎ ছিল যাঁর পত্র তাঁকে দেওয়া।"

লন্ বুঝিল লিয়েন আবার বিরক্ত হইয়াছে। তখন সে ভীতভাবে বলিল, "বিপদ্‌ আরও ছিল মা, ঐ পদকটিতে হাত দিলেই ও কেমন করিয়া উঠিত, তাহাও আপনি স্বচক্ষে দেখিয়াছেন। এখন পর্য্যন্ত উহার হাত ঐ খানেই আছে দেখুন না। কিন্তু আর না— এইবার আপনি ওটি লইয়া যান, মৃত্যুর পরই কোর্ট চ্যাপ্‌লিন উহা খুলিয়া লইবে।"

"না ফ্রোলন্ এখন না, দেখিতেছ—ও কেমন আশঙ্কার সহিত পদকটি চাপিয়া আছে আমি এখন উহাতে হাত দিতে পারিব না। উহার সব শেষ হইয়া গেলে আমায় খবর দিও, রাত্রি হোক যাই হোক্, আমি তখনি চলিয়া আসিব।—" কথাগুলি বলিবার কালে লিয়েন লিলির শায়িত দেহের প্রতিই চাহিয়া ছিল, ফ্রোলন কর্ত্রীর মুখের করুণ দৃষ্টি অনুসরণে সেই দিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া বলিল ; "আহা মা, ও যদি জীবনে একদিনও তোমার পরিচয় পাইয়া যাইত !"

নিঃশ্বাস ফেলিয়া লিয়েন বলিল, "এখন সে যাঁহার নিকট চলিয়াছে আর কারও পরিচয়ে উহার প্রয়োজন নাই। কষ্ট আমাদেরই যে ত্রদিন যত্ন করিতে পাইলাম না। দেখ লন্ দেখ, এতর পরও উহার মুখের মাধুর্য্য একটুকু নষ্ট হয় নাই। কি সুন্দর চাঁচর চুল!—"

মুহূর্ত্ত মধ্যে ফ্রোলনের চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হইয়া উঠিল, লিলির চুলে হাত দিয়া রুদ্ধস্বরে বলিতে লাগিল, "এই চুল আমার প্রভু যে কত ভালবাসিতেন!—তাই মা আমি এতদিন এই বারটি বৎসর কত যত্ন করিয়া এ চুল তেমনি সুন্দর রাখিয়াছি। বলুন আপনি, ইহা দেখিয়া তিনি আমার উপর সন্তুষ্ট হইবেন না কি? আজ তাঁহার নিকট গিয়া দাঁড়াইবে,—তখন তিনি লন্‌কে—"

ফ্রোলন উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিল। লিয়েনের চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন, বেদনা বা সান্ত্বনার উপোযোগী কোন কথাই মুখ দিয়া বাহিরে আসিল না। অল্পক্ষণ পরে ফ্রোলনই বলিল, "ইহার দুঃখের দিন ত ফুরাইল—এখন শুধু সেই আনন্দময় সুখের দিনগুলি স্মরণ হইতেছে। ভারতবর্ষ হইতে যখন এ এখানে আসিল, শোনওয়ার্থে ইহার মন বসিত না—তাই প্রভু এ বাড়ীখানি ইহার পছন্দমত করিয়া তৈরি করাইয়া দেন। এই মুখের এক একটি কথার মূল্যই কম ছিল সেদিন? লিলির মুখে এতটুকু মলিনতা প্রভুর প্রাণে সহিত না। তাহারি মধ্যে কি আর বলিব লেডি, সে ভালবাসার যে বর্ণনা হয় না। এ একদিন বড় অভিমানী মেয়ে ছিল, আর প্রভু আমার সে মান দেখিলে যেন আত্মহারা হইতেন। সাধ করিয়া ইহার হাসিমুখকে ভারি করিতেন আবার তখনি শত সাধ্যসাধনায় সে হাসি ফুটাইতে তাঁর যে কি সুখই হইত!"—

ফ্রোলন আসিতে লিয়েন বলিল "কিন্তু লন্ তুমি একটু ভুল কর নাই কি? পূর্ব্বে যদি তুমি বুঝিয়াছিলে তবে ইঁহাদের সাবধান কর নাই কেন?"

ফ্রোলন বলিয়া উঠিল, "ভুলিয়া যাইতেছেন যে সে সময় ছিল কোথায়? প্রভু রোগশয্যায় পড়িতেই না সমস্ত বিপদ বেড়িয়া আসিল। আর লিলি, দেখুন মা, আমার বিশ্রী চেহারার জন্য এও আমায় পছন্দ করিত না তখন, ক্রমে সে ভাব দূর হয় বটে কিন্তু আমি তুচ্ছ—অতি তুচ্ছ দাসী বৈ ত আর কিছু নই, আমার এমন চেষ্টা একটু প্রকাশ পাইলে কি ঘটিত বলুন ত?"

ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া লিয়েন বলিল "তা বটে!"

রোগিণীর অস্থিরতা ক্রমশঃ স্থির হইয়া আসিতেছিল। খানিকক্ষণ বসিয়া লিয়েন উঠিয়া দাঁড়াইল, ফ্রোলন বলিল "জাগাইয়া দিব কি?"

"কোন প্রয়োজন নাই।" বলিয়া লিয়েন বাহির হইয়া আসিল। বাগানের মধ্যে ক্ষুদ্র আসনখানির উপর বসিয়া গেব্রিয়েল, বালকের সেই স্পন্দনহীন কাতর দৃষ্টি দেখিয়া লিয়েনের প্রাণও যেন স্তব্ধ হইয়া উঠিল। কষ্টে মনোভাব দমন করিয়া তাহার নিকটে গিয়া বলিল "ঘরে গিয়া একটু শোওনা বাবা!"

চমকিয়া গেব্রিয়েল তাহার পানে মুখ তুলিতেই লিয়েন তাহাকে কোলে টানিয়া বলিল—"ওরে তুই আজ হইতে লিয়োর মতই আমায় মা বলিস্ গেব্রিয়েল!"

শোকাচ্ছন্ন হতবুদ্ধি বালক সহসা এ মর্ম্মস্পর্শী স্নেহের প্রকাশকে যেন চিনিতেই পারিল না বিহ্বলের ন্যায় তাহার প্রতি চাহিয়া রহিল। অশ্রুজল সিক্ত সান্ত্বনাস্পর্শ তাহার সর্ব্বাঙ্গে অমিয়হস্ত বুলাইতেছিল, সান্ত্বনার শান্তিটুকু তাহার অনুভবে না আসিলেও সহানুভূতির নয়ন-জলধারা গিয়া তাহার রুদ্ধ হৃদয়কে ভাসাইয়া দিল, সে ব্যাকুল আর্ত্তনাদে কাঁদিয়া বলিল, "আমার মা যে আজ সত্যই চলিয়া যাইতেছেন মা?"

সে চীৎকারে ফ্রোলনও ছুটিয়া আসিয়া বলিল "কি?—কি হইয়াছে গেব্রিয়েল?"

চক্ষু মুছিয়া লিয়েন বলিল "কিছু না, তুমি উহাকে কিছু খাওয়াইয়া বিছানা ঠিক করিয়া দাও ফ্রোলন, আমি বলিয়া যাইতেছি,--গেব্রিয়েল একটু বিশ্রাম করিবে। কেমন গেব্রিয়েল আমার কথা তুমি রাখিবে ত?"

"নিশ্চয় রাখিবে; গেব্রিয়েল, দেবীর গল্প শুনিয়াছ ত? উনিই তোমার পক্ষে সেই দেবী উঁহার কথা তোমায় রাখিতেই হইবে,—চল।"

ফ্রোলন তাহাকে ঘরে লইয়া গেলে, বিষণ্ণ হৃদয়ে ধীরপদে লিয়েন বাড়ী প্রবেশ করিল। এইমাত্র যে সকল কথা শুনিল, তাহা স্বামীকে জানাইবার জন্য তাহার চিত্ত চঞ্চল হইয়াছিল। কিন্তু উপরে আসিয়া শুনিল যে তাহার আসিতে বিলম্ব হওয়ায় ও কে একজন লোক দরকারী চিঠিপত্র লইয়া আসায় বস্ত্রাদি পরিবর্ত্তন শেষ করিয়া ব্যারণ নীচে চলিয়া গিয়াছেন। হায়!

আসিয়া জানাইল, যে ব্যারণ তাহাকে আদেশ দিয়া গিয়াছেন ব্যারণেস্ আসিলে অবিলম্বে সাজ-সজ্জা শেষ করিয়া তিনিও যেন নীচে যান। কর্ত্রীর বেশভূষা আজ বাহুল্যতর ও শীঘ্র শীঘ্র করিতে হইবে জানিয়া সে আর একজন দাসীকে ডাকিয়া আনিয়াছে।

লিয়েনের মন তখন বড় অবসন্ন, বসনভূষণ প্রসাধন, তিক্ত লাগিতেছিল। কিন্তু স্বামীর অনুরোধ স্মরণ করিয়া সজ্জাগৃহে প্রবেশ করিল ও কলানিপুণা হানার সযত্নবিন্যস্ত সমস্ত অঙ্গরাগ নিঃশব্দে ধারণ করিয়া গেল। দাসীরা সানন্দমুখে তাহার সৌন্দর্য্যের প্রশংসা করিতেছিল কিন্তু তাহাতে লিয়েনের সর্ব্বাঙ্গে কাঁটা দিল; রূপ! হায় হায়, ধরণীর লোকললামভূত পিশাচ রূপকে আজি সে কি ভাবে দেখিয়া আসিয়াছে!

ক্রমশঃ —

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

নারী-মঙ্গল।

-:*:—

জাগো নারী গৌরব-মঙ্গলে জাগো!
বাংলার ভগিনী, বাংলার মা গো!
গৃহকারা-বন্দিনী, স্বার্থের পণ্যা,
প্রমোদের সঙ্গিনী, আভরণ-গণ্যা,
অধিকার বঞ্চিতা, লাঞ্ছিতা, জাগো!
বাংলার ভগিনী, বাংলার মা গো!

কোথা বিধি-বন্ধনে অন্তর সুপ্ত!
প্রভু-আঁখি-রঞ্জনে প্রাণধারা লুপ্ত!
লাজ-অবগুণ্ঠিতা, কুণ্ঠিতা জাগো!
বাংলার ভগিনী, বাংলার মা গো!

পায়ে পায়ে ধর্ম্মের শৃঙ্খল-বন্ধ,
যুগ যুগ মর্ম্মের তমসায় অন্ধ,
দেহশোভা-সজ্জিতা, লজ্জিতা, জাগো !
বাংলার ভগিনী, বাংলার মা গো !

পুরুষের বন্দিনী পিঞ্জর কক্ষে,
পরমনোরঞ্জিনী, তৃষাতুর বক্ষে,
প্রাণহীন অন্ধের বন্ধনে জাগো !
বাংলার ভগিনী, বাংলার মা গো !

স্তনধারা-বঞ্চিতা-সন্তান-ধাত্রী,
চিরব্যাধি-সঞ্চিত দেহ দিবারাত্রি,
হেলাভয়-শঙ্কিতা, কম্পিতা, জাগো !
বাংলার ভগিনী, বাংলার মা গো !

জাগো দেবী বিশ্বের গৌরব-তীর্থে !
দীনহীন নিঃস্বের অবশিত চিত্তে !
নিখিলের নন্দিতা, বন্দিতা, জাগো !
বাংলার ভগিনী, বাংলার মা গো !

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ ।

ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ।

ভারতবর্ষীয় নারীদের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে কিছু বলিবার জন্য আমাকে অনুরোধ করা হইয়াছে। নিজেকে আমি একজন ভবিষ্যৎ-বাদিনী বলিয়া প্রতিপন্ন করিতে চাই না—অনাগতের আলোচনায়—সগৌরব অধিকারও আমার কিছু নাই। তবে এটা ঠিকই বুঝিয়াছি যে ভারতীয় নারীর ভবিষ্যতের প্রশ্নটা ইংরেজ জন-সাধারণের কাছে বেশ একটা কৌতূহলের বস্তু। তাই আমার খোলাখুলি সরল ধরণে এ সম্বন্ধে অনেক কথাই আমিও বলিয়াছি—এবং আমার "মতো" আরো আরো অনেকেও বলিয়াছেন। ইংরেজ জন-সাধারণের আমাদের কথা জানিবার এই যে গুরু আগ্রহ ইহার কারণ আমার এই মনে হয় যে আমরা—ভারতীয় নারী—ইঁহাদের সহবতে তেমন ঘনিষ্ঠ-ভাবে আজও পরিচিত হইতে পারি নাই। আমাদের সম্বন্ধে তাঁহাদের অন্তরে এখনও একটা দ্বিধাবাদ আছে—তাইতেই ইঁহারা যখন তখন ডাকিয়া আমাদেরই মুখে আমাদের সকল কুল-অকুলের নিকাশ বুঝিয়া নিতে চাহিতেছেন—বিশ্বের কাছে আমাদের অস্তিত্বের ন্যায্য দাবীটাকে ষোল আনা প্রমাণ করিয়া দিতে বলিতেছেন। আপনাদের পাদ্রী প্রচারকদের অনেকে এবং ভারত প্রবাসী ইংরেজ দলের কেউ কেউ আমাদের চিত্র আঁকিয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছেন কিন্তু খাঁটি ছবিখানি টানিয়া দিতে একেবারেই ব্যর্থ হইয়াছেন। অবশ্য মন্দ কিছু করিবেন ভাবিয়া যে তাঁহারা তুলি ধরিয়াছিলেন—তা নয় আমাদের পূরা পূরি শুভাকাঙ্ক্ষা লইয়াই ছবি আঁকিয়াছিলেন—আর সে জন্য আমরাও তাঁহাদের কাছে অবশ্যই কৃতজ্ঞ রহিব। পরন্তু একথাও এখানে অবশ্য করিয়া বলা উচিত যে ভারতবাসী আমরা পাদ্রী সাহেবদিগের নিকট অপরিমেয় ঋণে ঋণী। আমাদের ক্ষতের ব্যথা তাঁহাদেরও বুকে বাজিয়াছিল, আমাদের মঙ্গল কামনা করিয়া তাঁহারা অনেক কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন হয় তো বা কেউ প্রাণ সমর্পণও করিয়াছিলেন।

* বিলাতে Mrs. N. C. Sen এর প্রদত্ত ইংরাজী বক্তৃতা হইতে গৃহীত। শ্রীযুক্ত পরিচারিকা সহকারীর অনুরোধে অনূদিত। বিমল।

এ সকল তাঁহাদের সদ্ ইচ্ছা ও শুভ চেষ্টার জন্য শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার নিবেদন আমরা অবশ্যই জানাইব কিন্তু ন্যায়ের মর্য্যাদা মানিতে গিয়া এ কথাও আমাকে মোটামুটি ভাবে বলিতে হইবে যে তাঁহারা এত করিয়াও আমাদের মর্ম্মের অন্তঃপুরে প্রবেশ লাভ করিতে পারেন নাই। তাহার কারণ আমাদের ধর্ম্ম ও সভ্যতাকে তাঁহারা দেখিয়াছেন ছোট করিয়া সে সনাতন সার সত্য ও সভ্যতা অনুশীলন করিয়া, বিশ্লেষণ করিয়া দেখিয়া বুঝিবার কষ্ট স্বীকার তাঁহারা করেন নাই, খ্রীষ্টধর্ম্ম ও প্রতীচ্য সভ্যতার বাহিরেও যে একটা বিরাট কিছু মাথা উচু করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে পারে এ ধারণা তাঁহাদের নাই। অজ্ঞানতায়ই তাঁহারা আমাদের অনুকম্পা দেখাইয়াছেন। কিন্তু আমাদের আদিমের মত এমন একটা গরিমাময় অতীত যাদের আছে এমন কোনো আত্মসম্মানকারী জাতিই তো সে অনুকম্পার যাজ্ঞা করে না।

খৃষ্টান পাদ্রী এবং আর আর যে দুই চারটী কল্যাণেচ্ছু প্রতীচ্য কর্ম্মী আমাদিগকে ভাল করিয়া চিনিবার প্রয়াস না করিয়াই আমাদের মঙ্গলের জন্য আমাদের মধ্যে কর্ম্ম করিতে আসিয়াছেন তাঁহাদের কথা ত গেল এই। এখন আমাদের ভবিষ্যৎ বলিবার আগে স্বদেশের আমার অতীত ও বর্ত্তমানের দুই চার কথা বলা কর্ত্তব্য মনে করি।

ভারতীয় মহাজাতির—যে সকল বিভিন্ন দলের সমাহারে এই মহাজাতির গঠন হইয়াছে—সকলেই তাহারা সেই অতি পুরাকালের। এক সময়ে এই সকল জাতি সভ্যতার শীর্ষস্থানীয় ছিল। আপনাদের অনেকের কাছেই এটা কিছু নুতন কথা নয় কারণ ভারতের সহিত আপনাদের অধিকাংশেরই পরিচয় অতিশয় ঘনিষ্ঠ। আমাদের আদিম সাহিত্য ইহার জীবন্ত প্রমাণ স্বরূপ দাঁড়াইয়া আছে। প্রায় ৫০০০ বৎসর পূর্ব্বে আমাদের সভ্যতার সূত্রপাত হইয়াছিল এ কথা আপনারা সকলেই জানেন। যদি ভারতবর্ষ ভাগ্য বৈগুণ্যে পৃথিবীর একটা পূব দেশ না হইত, প্রকৃতি যদি তার এমন উষ্ণ না হইত—সন্তানেরা যদি তার হইত গৌরবর্ণ—তপ্ত সূর্য্য যদি তাদের গায়ে আগুনের হল্‌কা না হানিয়া যাইত তাহা হইলে বুঝি পশ্চিম,—ভারতকে চিনিতে পারিত অনেক বেশী ভাল করিয়া। যদিও আমি বিশ্বাস করি যে এদেশও ওদেশের জনগণের পরস্পরকে সোজাসুজি ভাল বলিয়াই জানিতে চিনিতে পারা উচিত কারণ তাঁরা এবং আমরা একই আর্য্যবংশ হইতে জন্মিয়াছি। কিন্তু পশ্চিমের লোকের পক্ষে আমি যেমন "মিসনারী"দের প্রসঙ্গে বলিয়াছি—খৃষ্টান ভিন্ন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী

লোকদিগকে খাঁটি করিয়া চিনিতে পারা বড়ই কষ্টকর। সে যাই হ'ক এদেশের দাতা যাঁরা ধনী, আমাদের আত্মার অনন্ত নরক হইতে পরিত্রাণের জন্য খৃষ্টান প্রচারকদিগকে আমাদের দেশে পাঠাইয়া দেন। আমি বলি এই অর্থ তাঁহাদেরই দেশের অভাবগ্রস্তদিগের সাহায্যে ব্যয় করিলে এই ধর্ম্মপ্রচার অপেক্ষা অনেক বেশী কাজে লাগিত। অবশ্য এই ফাঁকে আমি আমাদের দেশের শিক্ষাকে ব্যাপ্ত করিয়া ধরিবার যন্ত্র স্বরূপ কাজ করিয়াছেন বলিয়া (পাদ্রীরাই ভারতেরও পাশ্চাত্য শিক্ষার বীজ প্রথম বপন করেন এজন্য আমরা তাঁহাদের নিকট কৃতজ্ঞ) এবং দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর সময় আপনাদের দেশের কর্ম্মীবৃন্দের অক্লান্ত শ্রম ও সাহায্যের জন্য তাঁহাদিগকে ধন্যবাদ দিতেছি। এ সকল কর্ম্মীর কাছে আমাদের দেশের অধিবাসীদিগের মনুষ্যত্বের শিক্ষা লাভ করিবার এখনও প্রচুর বস্তু রহিয়াছে।

অতীতের যুগে—বিগত দেড়শত বৎসরের মধ্যেই না হয় ধরুন আমাদের দেশের শিক্ষিত ও ধনিগণের অধিকাংশেই দেশের নিঃস্ব ও অজ্ঞান জন-সাধারণে প্রতি তাঁদের কর্ত্তব্য ষোল আনা পালন করেন নাই। সে কর্ত্তব্যপালন করিলে বাহির হইতে আসিয়া সেখানে কর্ম্ম করিবার কাহারও স্থান বা সুযোগ ঘটিত না। কিন্তু দেশের প্রতি আমাদের যা কর্ত্তব্য আজ আমরা সকলেই তাহা ভাল রকম বুঝিতে পারিয়াছি। অনেক বিষয়েই আপনারাও আমরা হাত ধরাধরি করিয়া কাজ করিয়া দু'জনেরই কল্যাণ লাভ করিতে পারি। অলস ভাবে বসিয়া বর্ণ-রঙিন ভবিষ্যতের স্বপ্ন দেখিলে আর আমাদের চলিবে না—বিগত দিনের মতই গরিমাময় করিয়া ভবিষ্যৎ গড়িয়া তুলিবার জন্য আজ আমাদের কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। পশ্চিমের আপনারা স্বীকার করুন আর নাই করুন একটা অতি মহিমময় অতীত আমাদের ছিল। আমাদের রাজারা ছিলেন প্রজা পালনে করুণা, প্রেম ও ন্যায়ের প্রতি-মূর্ত্তি। আমি নিঃসঙ্কোচে বলিতে পারি যে এখানকার সকলেই আপনারা রাজা রামচন্দ্র, হরিশ্চন্দ্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতির অপূর্ব্ব উপাখ্যান জানেন। ঘর ও বাহির উভয় স্থানেই জীবনের প্রতিটী স্তরের জন্যই কর্ম্মনীতির অতি উচ্চ আদর্শ আমাদের ছিল। প্রেম কি মনোমত লাভের যে কোনো নীতিকেই যে দিন শোভন বলিয়া মনে করা হয় নাই। বিবেক তাঁহাদের ছিল—সুতীক্ষ্ণ এবং হৃদয় ও অসাড় প্রেমহীন ছিল না। নারীকে কখন জ্ঞান-চর্চ্চা বা জগতের কর্ম্মক্ষেত্র হইতে বাধা দিয়া বিরত রাখা হয় নাই।

এইবার আমি আমাদের পবিত্র সংহিতা হইতে উদ্ধৃত করিয়া প্রায় সহস্র বৎসর পূর্ব্বে মৈত্রেয়ী নাম্নী একজন নারীরত্ন যে সরল আত্মনিবেদনের বাণী উচ্চারণ করিয়াছিলেন তাহা আপনাদিগকে শুনাইব। আমাদের ব্রাহ্মসমাজে দৈনিক উপাসনায় এই প্রার্থনা করা হয় —

"অসত্য হইতে আমাদিগকে সত্যেতে লইয়া যাও, অন্ধকার হইতে আমাদিগকে জ্যোতিঃতে লইয়া যাও, মৃত্যু হইতে আমাদিগকে অমৃতেতে লইয়া যাও। হে স্বপ্রকাশ, আমাদিগের নিকট প্রকাশিত হও, দয়াময়, তোমার যে অপার করুণা তাহা দ্বারা আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।"

এই নারী পার্থিব ঐশ্বর্য্যের অসারতা প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিলেন। অনন্তের তৃষ্ণা তাঁহাকে ব্যাকুল করিয়াছিল, তাই তাঁহার স্বামী মহাযোগী যাজ্ঞবল্ক্য যেদিন সংসারের মায়া-প্রপঞ্চ কাটাইয়া সত্যের সন্ধানে বাহির হইয়া গেলেন--সেদিন তিনিও ঘরে রহিলেন না।

পুরুষের ন্যায়, মহাজ্ঞানশালিনী নারীরও সংসারত্যাগের এরূপ বহু দৃষ্টান্তই আমাদের আছে। মোটে তিনশত বৎসরের কথা -রাজপুত রাজার ঘরণী মীরাবাই তাঁহার প্রজা-স্বজন ও প্রাসাদ ত্যাগ করিয়া যোগিনী হইলেন আর আত্মাকে আপনার নিযুক্ত করিলেন— পরমার্থ ও জনকল্যাণের সাধনায়। গোটা ভারতবর্ষটায় তাঁর নাম সকলেরই কাছে পরিচিত এবং ধনী নির্ধন সমান ভাবে প্রেমে গৌরবে, মহাবিত্ত জ্ঞানে তাঁর স্মৃতির অভিনন্দন করিয়া থাকে। তাঁহার রচিত পরমার্থ সঙ্গীতাবলী ভারতের সকল ঈশ্বরপ্রেমিক ও সাধকের কাছেই সাধারণের সম্পত্তি হইয়া আছে গৃহত্যাগ মানে ইহা নয় যে সংসারের সকল সম্বন্ধ তুমি বিচ্ছিন্ন করিলে ; ছোট বাঁধনগুলা শুধু তুমি কাটিবে—আর সত্যকার তুমি সে দিন মহাবিশ্বের মধ্যে একজন হইয়া দাঁড়াইবে। এ স্বত্ব অতি গৌরবের আর অতি অল্প লোকই এ স্বত্বের দাবী করিবার অধিকারী হয়।

এই সকল উদাহরণ হইতে আপনারা বুঝিতে পারিতেছেন যে আমাদের পূবের জন্য শিক্ষার ছিল একটি ধারা ; ফল ছিল—যার অলৌকিক অপূর্ব্ব। (অবশ্য পূবের যখন শিক্ষার এ ধারা গড়িবার দিন ছিল তখন)। হাজার হাজার বৎসর আসিয়াছে গিয়াছে কিন্তু সেই পুরাণো দিনের শিক্ষা ও সভ্যতা কালের বুকের উপর যে গৌরবের রেখাপাত করিয়া গিয়াছে তাহা আর মুছিল না।

এখন শিক্ষা বলিতে লোকে বুঝে—কোনো একটা পাশ্চাত্য ভাষা পড়িতে ও লিখিতে পারার পদ্ধতি—পন্থা, (বৃটিশ সাম্রাজ্য সম্পর্কে সাধারণতঃ ইংরাজী) পশ্চিম জগতের অতীত ও বর্ত্তমান ইতিহাসের মোটামুটি জ্ঞানলাভ, (পূবের কথায় তেমন জোর দেওয়া চলে না) পাশ্চাত্য শিক্ষা, দীক্ষা, রীতি, নীতি, চালচলনের অনুকরণ করা ইত্যাদি। পশ্চিম আদর্শ খাড়া করিতেছেন আর পূবকে হয় তাহা গ্রহণ করিয়া সেই আদর্শের অনুরূপ হইয়া উঠিবার চেষ্টা করিতে হইতেছে—নয় নিজেকে হারাইয়া ফেলিতে হইতেছে—নাস্তির মধ্যে। গত দেড়শত বৎসর ধরিয়া এইরূপই চলিয়া আসিতেছে। প্রাচীন ভারতে দর্শন, বিজ্ঞান, জ্ঞান ও বস্তু উভয় তন্ত্রেরই—সাহিত্য, কলা, সঙ্গীত, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞানের চরমপ্রসার ও উন্নতিই সাধিত হইয়াছিল। কতকগুলি বিষয়ের জ্ঞান আজিকার পাশ্চাত্য জ্ঞানের অনুরূপই উন্নত ছিল—তার চেয়েও বড়। "সূর্য্য-করোজ্জল ধরণীতে কিছুই নূতন নয়"—ইহা একটা প্রচলিত কথা এবং ইহাও আমাদের বিশ্বাস যে বিগত যুগের নর ও নারী জ্ঞানীদিগের কাছে আমাদের—কিছুই অজানা ছিল না। এমন কি বিনা তারের খবর ও উড়োকলের উল্লেখও আমাদের কোনো কোনো পুরাণো বইয়ে পাওয়া যায়। আধ্যাত্মিক জ্ঞান ছিল তাঁহাদের অলৌকিক—সে জ্ঞানকে কোনো দেশের কোনো জাতির জ্ঞানই অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল চরিত্রগঠন। দৃঢ় ভিত্তির উপর স্বভাবকে দাঁড় করানো—ব্যক্তিত্বের শক্তিটাকে বাড়াইয়া বড় করিয়া তোলা—তাহাকে চাপিয়া মারা নয়। প্রাণবন্ত আদর্শ ও উদাহরণ ছিল;—প্রত্যেক শিক্ষার্থীর চক্ষুর সম্মুখে—আর তাহাদের সাধনা ছিল জীবনকে সেই আদর্শের মত করিয়া গড়িয়া তোলা। এই রকমে প্রাচীন ভারতের শিক্ষার মধ্যে ছিল জীবন—প্রাণশক্তি। সকল সময় সাক্ষর ও ব্যাকরণ মুখস্ত করার জ্ঞানের উপর সে যুগের শিক্ষা নির্ভর করে নাই—যদিও সংস্কৃত (যার শব্দগত অর্থ সংস্কার করা মানে দোষ ত্রুটি সারা) সে যুগের ভারতবর্ষের কথা ও লেখ্য ভাষা পৃথিবীর সম্পূর্ণ ভাষাগুলির মধ্যে একটী এবং বহু দেশের আর্য্য ভাষার মূল। প্রাচীন ভারতের সাক্ষর ও নিরক্ষর দুই রকমের লোকই ছিল। কিন্তু নিরক্ষরেরা সকল সময়েই যে অশিক্ষিত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে তাহা নয়; কারণ জ্ঞানীদিগের নিকটে তাহারা সর্ব্বদাই মুখে মুখে শিক্ষা করিয়াছে। ভারতের অতি ভিতরে দু'একটা পল্লীতে আজও দেখা যায় যে কৃষিজীবী পুরুষ

ও নারী গ্রামের পণ্ডিত বা ভাটের কাছে একত্র হইয়া পুরাণ পাঠ বা পৌরাণিক গল্প শুনিয়া থাকে। ইহা হইতে তাহারা শুধু উচ্চ আদর্শের জ্ঞানই লাভ করে তাহা নয়—জীবনযাত্রার তন্ত্রটা অবধি তাহাদের এইরূপে নিয়মিত হইয়া থাকে।

অজ্ঞানতার জন্য তাহারা অনেক সময়েই নিপীড়ন সহিয়া থাকে—গুরুতর ব্যাধিতে আক্রান্ত হয় কিন্তু অভ্যাস ও ধর্মের জ্ঞানে পৃথিবীর অনেক অংশেই তাহাদের সমশ্রেণী লোক-দিগের অপেক্ষা পরিচ্ছন্ন। তাহারা উপবাসী থাকিতে রাজী আছে কিন্তু দেবতার দুয়ারে আত্মনিবেদন না জানাইলে দিন তাহাদের কাটে না। পরিধানখানির প্রত্যেকটী সেলাই প্রতিদিন পরিষ্কার করিবে—ক্ষুদ্র কুঁড়েগুলির চারিপাশ ঝাড়িয়া মুছিয়া তকতকে রাখিবে—ঘটী বোগ্‌নো, থালা-বাটী পুনরায় ব্যবহার করিবার আগে অতি পরিষ্কার রকমে চিক্কণ চমকাইয়া মাজিয়া লইবে। এই যদি হয় সাধারণ শ্রেণীর লোকের কথা তাহা হইলে আমা-দের দেশের উচ্চশ্রেণীর অধিবাসীদিগের আচার রীতি তো কল্পনায়ই বেশ অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। উচ্চ বা শিক্ষিত শ্রেণীর জনগণ জীবন কালকে তাঁহাদের চারিটী পর্য্যায়ে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন। প্রথম অংশটা সবটাই আশ্রমে বা গুরুগৃহে বিদ্যা চর্চ্চায় নিয়োজিত হইত। পুরুষ ও নারীর শিক্ষার ছিল একই ধারা; নরের সঙ্গে নারীর ছিল সমানই স্থান এবং নারীর মনীষাও পুরুষের চেয়ে হীন ছিল না। বৈদিক অতীতে আমরা দেখিতে পাই নীতি-সূত্র প্রণয়ণে নারী পুরুষকে সাহায্য করিতেছেন—বহু দার্শনিক সমস্যার মীমাংসা করিতেছেন কত নব তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছেন। এই প্রসঙ্গে আমি মৈত্রেয়ী ও গার্গী নাম্নী দুইজন নারী ঋষির উল্লেখ করিতেছি। এই বিষয়ে যাঁহাদের জানিবার আগ্রহ আছে প্রাচীন ভারতের নারী সম্বন্ধে কোনো সংস্কৃত মূল বা অনুবাদ গ্রন্থ পড়িলেই সকল কথার যাথার্থ্য বুঝিতে পারিবেন। গণিত ও জ্যোতিষে নারী পুরুষের জ্ঞানকেও ম্লান করিয়া দিয়াছিল—যেমন লীলাবতী, খনা। দেশ ও সম্মান রক্ষার জন্য নারী পুরুষের সঙ্গে রণাঙ্গনে পাশাপাশি দাঁড়াইয়া যুদ্ধ করিয়াছেন। বীরের মৃত্যুকেই শ্রেয়ঃ বলিয়া বরণ করিয়া লইয়াছেন তথাপি শত্রুর হাতে আত্মসমর্পণ করেন নাই। এমন অনেক নারী ছিলেন যাঁরা যুদ্ধক্ষেত্রে বিপুল বাহিনী নিপুণ হাতে পরিচালনা করিয়া মহাসেনাপতির সুনাম ও যশঃ লাভ করিয়া গিয়াছেন দুর্গাবতী, লীলাবতী এবং অহল্যাবাই প্রভৃতি নারীর নাম রাজপুত ও মোগল

ইতিহাসে এবং বিগত শতাব্দীর প্রথমাংশের ইংরেজ পুরাবৃত্তের পাতায় উজ্জ্বল হইয়া আছে দেখা যাইবে। এমন নারীরও অভাব নাই যাঁহারা প্রিয়ের প্রয়োজনে ও প্রেমের জন্য জীবন-ব্যাপী পরীক্ষার মধ্য দিয়া বহু বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছেন, প্রমাণ—সীতা, শৈব্যা, দময়ন্তী দ্রৌপদী এবং এমনি আরো অনেকে। এমনও নারী ছিলেন যাঁহাদের কৃচ্ছ্রসাধনা মৃত্যুকেও জয় করিতে পারিয়াছিলেন যাঁহারা সতী সাবিত্রীর গল্প পড়িয়াছেন তাঁহারা সকলেই এ কথার সত্যতা বিশ্বাস করিবেন। সীতা, সাবিত্রী, অরুন্ধতী, মৈত্রেয়ী, গার্গী ও এমনি আরো কত নারী আপনাদের মহৎ হৃদয় ও সাধনার মহা দৃষ্টান্তে হাজার হাজার প্রাণের মধ্য মহাভাবের অনুপ্রাণনা আনিয়া দিয়াছিলেন এবং এমনি করিয়া ক্রমশঃ তাঁহারা ভারতীয় নারীগণের নিকট রক্তমাংসের আদর্শ হইয়াই দাঁড়াইয়াছিলেন। আজও তাঁহারা তেমনি আদর্শই আছেন, প্রাচীন ভারতীয় নারীত্ব আজও জীবন্ত হইয়া আছে। আমাদের পুরাতন ও মধ্য-যুগের সাহিত্য মহাধী নর নারীগণের মহীয়ান ও অপূর্ব্ব উপাখ্যানে ভরপুর। এই সকল সাহিত্য আমাদিগের পূর্ব্বতন মহা-চরিত্রগুলি অন্তরের মধ্যে জাগরুক রাখিবার সহায়তা করিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত, শ্রীমদ্ভাগবত, গীতা ও পুরাণ প্রভৃতি গ্রন্থ যুগ যুগ ধরিয়া অমর ও অক্ষর হইয়া রহিয়াছে।

ক্রমশঃ

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

দ্বন্দ্বে।

—:*:—

(মোর) চন্দ্র কিরণ উজল জীবন
চাঁদ আঁধিয়ার নিশি,
চাঁদ ছায়াবাজি চাঁদ মায়া আজি
আমার গো দিশি দিশি

কেমনে এ আলো　হয়ে যায় কালো
　　তবু গো উজলি রয়,
জীবনের ভুলে　　কামনায় দুলে
　　তারি মিলনেরি জয়।
স্খলিত আঁচলে　আঁখিভরা জলে
　　বিবশ চরণ জুড়ি,
যত বেদনায়　　কি যে বলে যায়
　　পথহারা সে মাধুরী।
(রহি)　যত অচেনায়　　ডাকে আয় আয়
　　নিঠুরে করুণ বাজে
প্রায়ে কাঁদায়ে　দুখে কোলে লয়ে
　　মন মোহনিয়া রাজে।

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

ঝুলন-স্মৃতি।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তন্দ্রা অবস্থা, আরামকেদারায় গা ঢালিয়া দিয়া চক্ষু বুঁজিয়া ধূম্রপান করিতেছিলাম। হঠাৎ পরিচারক আসিয়া স্মরণ করাইয়া দিল ৮টা বাজিয়া গেল। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে জলযোগ করিয়া A. D. C.র পোষাকে সজ্জিত হইয়া রাজভবনে বাগানবাড়ীর কক্ষ যাহা প্রকৃতপ্রস্তাবে বীরচন্দ্র মাণিক্যের সুখের আলয় ছিল তাহাতে উপস্থিত হইলাম, ইহাকে

ঠিক বৈঠকখানা বলা যাইতে পারে না। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহা বীরচন্দ্রের সর্ব্ববিদ্যার আগার অর্থাৎ এটা ছিল ইংরাজীতে যাহাকে বলে Studio Photography, চিত্রবিদ্যা, রাসায়নিক এবং শিল্পশিক্ষার ও আলোচনার একটি মন্দির। এ মন্দিরে যখন তিনি আসিতেন তখনই জানিতাম অদ্য মহারাজ কোন এক বিভাগের তত্ত্ববিশ্লেষণ অথবা নিজহস্তে গোপনীয় পত্রাদি লিখা এবং কখনও কখনও রাজ্যের অতি গুহ্য বিষয়ের আলোচনায় ব্যাপৃত হইবেন। কক্ষটা সম্বন্ধে আমি কিছু বলিতে গেলে পাঠকবর্গ হয় ত আমাকে অতিরঞ্জন দোষে দোষী করিতে পারেন কারণ গুরুদেবকে কোন শিষ্যই কম দেখে না। আমিও বা একদর্শী হইয়া পড়ি এজন্য বিশেষজ্ঞের মত উদ্ধৃত করিতেছি। ডাক্তার শম্ভুচরণ মুখোপাধ্যায় কলিকাতাবাসী বিজ্ঞ লোক ছিলেন তিনি ত্রিপুরারাজ্যের প্রধানমন্ত্রী মৃত দীনবন্ধু নাজির সাহেবের অধীনে মন্ত্রীপদে নিযুক্ত এবং পররাষ্ট্রবিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। বীরচন্দ্র তাঁহাকে স্বয়ং বাছনি করিয়া এপদে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। ইঁহার সহিত বীরচন্দ্র মাণিক্যের কর্ম্ম ব্যবদেশে যখন দেখা হইবার আবশ্যক হইত তখন বীরচন্দ্র মাণিক্য এই "Studio" "বৈঠকখানায়" দেখা করিতেন। তিনি তাঁহার প্রণীত "Travels to Independent Tipperah" গ্রন্থে লিখিয়াছেন:—

'I was then called up to the presence. Footing up a long broad flight of rather deep stairs, straight, after the first few steps, to upper story, I passed through a room filled with goods in glass-ware, cabinet-ware, ivory work, gold and silver plates, with musical instruments scientific instruments etc. I was next ushered into a large and airy verandahed room furnished, indeed only less crowded with furniture,......towards the centre a charming ivory chair beside an indifferent mahogony table surmounted by a costly clock under an old fashioned chandelier, here a neglected piano, there a brand new first class microsope, rich carpets and hanging heaped up in a corner a silver half drum (bayan) and a full drum (pakhawaj) mounted with ivory balls, in another, guns in boxes and guns without, swords naked and sheathed, shields and spears of sorts, paint boxes, stereo-

scopes, opera-glasses, leather bags, and carpet bags, in profusion, telescope leaning against walls or lying about on the floor, and what not besides, on a side whereof I found His Highness seated on the Indian bed of comfort and State called gadi-a roomy matress stuffed thick with cotton wool backed by an enormous round bolster and flanked by diminutive flat pillows. After the preliminery mutual greetings, as soon as I had taken by permission my seat on the rich Persian carpet specially placed for me, His Highness first enquired of my health and then mentioned the illnes in his house."

এহেন কক্ষে যিনি বসতি করিতেন তাঁহাকে "রাজর্ষি" বলুন, মহর্ষি বলুন, "ওস্তাদ" বলুন, শিল্পী বলুন, এবং তাঁহাকে রাজনৈতিক-বিশারদ বলুন, শোভা পায়!

সেবাধারী আমাকে এককক্ষে ফুট্ ফরমাইস, শিক্ষা, দীক্ষা এবং আমার Official capacity-তে সর্ব্বক্ষণ আসিতে হইত এবং কক্ষকে যথাযথ ভাবে রাখা আমার কর্ত্তব্যমধ্যে ছিল। বীরচন্দ্রকে আমার উপর সময় সময় ইহা লইয়া তাক্ত হইতে দেখা যাইত। কিন্তু এই কক্ষের মর্যাদা রক্ষা করা, যথাযথ ভাবে সাজাইয়া রাখা এবং শম্ভুবাবুর লিখিত অমূল্য, এমন কি দুষ্প্রাপ্য দ্রব্যগুলি হেফাজৎ করিয়া রাখা আমার কার্য্য ছিল অতি সামান্য দ্রব্যের জন্য কঠোর ভাষায় বলিতেন—এমন কি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। কোন এক সময়ে এ কক্ষে দারয়ানের অনুপস্থিতিতে একটী রাজসন্তান (কুমার) প্রবেশ করিয়াছিলেন এবং কক্ষে ঘুড়িয়া ফিড়িয়া দেখিয়া গিয়াছিলেন মাত্র। এই সংবাদ পাইবামাত্র তিনি আমার প্রতি বিরাগ হইয়াছিলেন এবং আমাকে কতকদিনের জন্য দরবারে যাইতে নিষেধ করিয়াছিলেন। আশুতোষ বীরচন্দ্র আমাকে ক্ষমা করিলেন এবং এমনি ভাবে বুঝাইয়া দিলেন যে আমার অপরাধ ক্ষুদ্র হইলেও তিনি ইহা যৎ সামান্য ভাবে লইতে পারেন না। সে কক্ষের সামান্য জিনিষ পত্রও তাঁহার বুকের রক্তের ন্যায় ছিল। একটী ময়ূরপুচ্ছ নির্ম্মিত পাখা লইয়া তিনি বলিয়াছিলেন তিনি ইহার দ্বারা একখানা Artestic ছায়াচিত্র লইয়াছিলেন যাহা দেখিয়া

Photography Society of Calcutta অতিশয় প্রশংসা করিয়াছিল। কাজেই তিনি এ পাখাখানাকে বহু মূল্যবান মনে করিতেন। ঘটনাধীন একজন পরিচারক জিনিষপত্র ঝাড়িবার সময় সেই পাখা হইতে দুই একখানা পালক পড়িয়াছিল, ইহার জন্য তিনি মাসাবধি আপছোস্ করিয়াছিলেন এবং বলিতেন, "চাষার হাতে শালগ্রামের মৃত্যু হইয়া থাকে।"

বাস্তবিক এককক্ষে তাঁহার ইচ্ছা ব্যতীত নিজ পরিজনেরও কাহার প্রবেশাধিকার ছিল না। এ জন্য এ গৃহের সাধারণের মধ্যে নামাকরণ হইয়াছিল "মানা-ঘর"। ইংরাজেরা যদি বনভোজন (Picnic) করিতে যায় তাহা হইলে চাকরেরা বলে "পাগলাখানায়" সাহেব গিয়াছে। ইহা যদি প্রচলিত ভাষা হইতে পারে, মানাঘর বাস্তবিকই নামাকরণ হইয়াছিল, বলিতে পারি।

যথাসময়ে Political Agentকে অভ্যর্থনা করিয়া আনিবার জন্য আমি তাঁহার বাসস্থান Guest Houseএ গিয়া উপস্থিত হইলাম। তখন সেখানে Assistant Political Agent রূপে উমাকান্ত দাস রায় বাহাদুর উপস্থিত ছিলেন। তাঁহাকে যে Political Agentসঙ্গে আনিবেন ইহা আমি বুঝিতে পারি নাই; তাঁহার সহিত আমার বচসা হইবার উপক্রম হইয়াছিল এই ঝুলন মঙ্গলগীতিসম্বন্ধে অনধিকার চর্চ্চার দরুণ। Greer সাহেব সহাস্য বদনে বলিলেন "A. D. C.গণই মণিবদের সম্মান বা খামখেয়াল রক্ষার্থে Distortion পূর্ণ সংবাদ জারী করিতে বাধ্য। Deep meditationএ থাকা কালে ঢোল ডগর বাদ্য এবং নৃত্যাদি সহযোগে সঙ্গীতও চলে! আপনার পত্র পাইয়া বুঝিয়াছিলাম মহারাজ হয়ত গভীর "যোগে" বসিয়াছেন। কিন্তু মহারাজার পত্র পাইয়া সে ভ্রম দূর হইল এবং উমাকান্ত বাবুর কথা শুনিয়া বুঝিতে পারিলাম গতরাত্রে নাচরঙ্গ রাজঅন্তঃপুরে প্রচুর পরিমাণে হইয়াছে হয়ত বা মহারাজ অদ্য দেখা দিতে পারিবেন না, এমন কথাও আমাকে জানাইতে দেওয়া নিতান্ত অসম্ভব হইবে না।"

গতরাত্রে অনিদ্রার দরুণ আমার মস্তিকে ভূতের বাসা বাঁধিয়াছিল। এক্ষণে যাহা শুনিলাম তাহা আমার মস্তিষ্ক সহ্য করিতে পারিল না।

বাহিরের কর্ম্মচারী পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রাজ অন্তঃপুরের ঘটনা Distorsion অবস্থায় শুনে এবং বিশ্বাস করে। মধ্যে মধ্যে এ দরুণ নানা উৎপাত উপস্থিত করে সভ্যাসভ্য বিচার করিতে চায়। তখন শক্তিশালী নৃপতি চাপিয়া ধরিতে বসেন তখন তাহার নাম হয় oppression, suppression and mal administration. আমি কোন উত্তর না দিয়া শম্ভু বাবুর ভাষায় বলিতেছিলাম "Oh, he is a Political Babu এই নব্য নামকরণ শুনিয়া Greer সাহেব স্তম্ভিত হইলেন এবং উমাকান্ত বাবু বেজার হইলেন। সময় নাই এক গাড়ীতে রওনা হইলাম। এই পাঁচ মাইল পথ সুপ্রসঙ্গে ও রঙ্গ বিরঙ্গে বেশ কাটিয়া গেল। রাজ-অন্তঃপুরে রাস বা ঝুলন বঙ্গদেশের ন্যায় এবং অপরাপর প্রদেশের ন্যায় খেমটাওয়ালীর বা বাইজির নৃত্যগীতের স্বেচ্ছাচারিতার প্রশ্রয় পায় না, বাড়ীর কর্ত্তা পরিজনকে লইয়া Family Divotion এর উৎসে উৎসব করিয়া থাকেন, আমি দেখিতে পাইলাম উমাকান্ত বাবু হইতে Greer সাহেব বরং অনেকটা বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু উমাকান্ত বাবু বুঝিতে নারাজ ছিলেন বরং অর্থান্ত করিয়া আত্মাভিমান প্রকাশ করিতে ছাড়িলেন না। আমরা আসিয়া রাজপ্রাসাদে উপস্থিত হইলাম—মহারাজের নিকট খবর দিলাম এবং জানাইলাম উমাকান্ত বাবু সহগামী হইয়াছেন। মহারাজ মধুর হাস্য বদনে উত্তর দিলেন "ভাল হইয়াছে। তাঁহাকেও সঙ্গে করিয়া লইয়া এস।" আমি ইহাদিগকে সঙ্গে করিয়া সেই নিভৃত কক্ষে উপস্থিত হইয়া Servitory fashionএ প্রণত হইয়া আমরা কর্ত্তব্যকার্য্য সমাধা করিলাম। নিজ কক্ষে যাইয়া বসিলাম আর ভাবিতেছিলাম অদ্যকার ঘটনা কিসে পরিণত হইবে। নবনিযুক্ত L. G. Sir Rivers Thomson Bayley একখানা Confidentialপত্রের দ্বারা মহারাজকে জানাইয়া ছিলেন "রাজ্যের বর্ত্তমান অবস্থা জানিয়া শুনিয়া তিনি যে ব্যবস্থা করিতে অনুরোধ করিতে চান তাহাই তাঁহার সুপরিচিত Greer সাহেবের যোগে গোচর করিতে অভিলাষ করেন। অতি গোপনভাবে মহারাজার শ্রুতি গোচরের জন্য "আম-দরবারে" উপস্থিত হইবেন তাঁহাকে মহারাজ Private audiance দানে কৃতার্থ করিবেন।" ইহাই আমি আমার ব্যক্তিগত ভাবে এবং উপায়ে জানিতে পারিয়াছিলাম স্বয়ং মহারাজ হইতে। ইহাই বুঝি আজ আসিয়াছে এবং উপস্থিত তাহাই আলোচিত হইতেছে। সময় হয়ত লাগিতে পারে এজন্য একখানা খবরের কাগজ লইয়া আরাম কেদারায় আরাম করিতেছিলাম।

অর্দ্ধঘণ্টা কাল মধ্যে কাজ ফতে হইয়া গিয়াছে মনে করিলাম। কারণ Pankha puller দৌড়িয়া আসিয়া আমাকে জানাইয়া গেল মহারাজার মাসপাত্র এবং পাথের কলম (Swan quill pen) লইয়া আমাকে শ্রীশ্রীযুত সাক্ষাৎ উপস্থিত হইতে হইবে। তখন আমি গেলাম। মহারাজ কলমে মসি লইয়া দস্তখত দিতে চাহিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "কেমন উমাকান্ত বাবু সব ঠিক ত?" উমাকান্ত বাবু বলিয়াছিলেন "আজ্ঞে হাঁ।" মহারাজ তাহাতে সই করিয়া দিলেন এবং মোসাবিদা করা কাগজখানা পকেটে রাখিলেন। আমার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন (হিন্দীতে) "সাহেব এই আমার সমগ্রেত, আমি বৃদ্ধ ব্যক্তি এবং প্রায় জরাগ্রস্ত। খাটনীর কাজ মহিম করুক শেষ কাজ আমি সময় মত করিব।" পার্শ্বে Studio তে Photograph হইয়া থাকে। Photography বীরচন্দ্রের একটা বাতিক বা hobby horse. আমি তখন Greer সাহেবকে বলিয়াছিলাম "Now you are at my disposal. Please follow me but you must keep quiet, when I command you, you must obey me." Greer সাহেব হাসিয়া all right বলিয়া কামরার অপর ধারে sitter স্থানে বসিয়া গেলেন। আমি তাঁহাকে Focus করিতে লাগিলাম এবং ইচ্ছা করিয়া তাঁহার মুণ্ডটাকে বিনা কারণে উৎপাত করিতে লাগিলাম। মহারাজ মৃদু মৃদু হাসিতেছেন এবং কাণ্ড দেখিয়া মনে করিতেছেন "এবার সাহেব মুস্কিল-আশানের হাতে পড়িয়াছেন।" Asst. Photographer তখন Photographer হাতে Sitterকে সমর্পণ করিল। Greer সাহেবের ছায়া ধরা হইয়া গেল—একবার নয় ছ ছ বার। বেলা তখন একটা। আবার আমাকে A. D. C. রূপে তাঁহার বাসায় আনিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া যখন মহারাজের সাক্ষাতে হাজির হইলাম। তখন মহারাজার স্নানের সময় উপস্থিত। তিনি আমাকে ঘর্ম্মাক্ত কলেবরে দেখিয়া বলিলেন (যেমন তিনি মাঝে মাঝে আদর করিয়া বলেন) "বাসায় যা, ভদ্রবেশ নে, ঠাণ্ডা হইয়া স্নান করিস্ এবং শীতল দ্রব্য ব্যবহার করিস্। নিদ্রা যাইবার জন্য চেষ্টা করিস্। জ্যৈষ্ঠ মাস—কাল রাত্রের খাটুনীর উপর আজ তোর ডবল খাটুনী হইল। যুবক—রক্তের জোর আছে বলিয়াই সহ্য করিতে পারিস্।" আমি বাসায় চলিয়া গেলাম এবং প্রায় নগ্ন অবস্থায় মেজে উপর চিৎ হইয়া পড়িলাম এবং ঠাণ্ডা হইবার জন্য চেষ্টা করিলাম

আর ভাবিতে লাগিলাম বাজীকরের চরিত্র। তাঁহার ঈষৎ হাসা বদনের কথার পিছনে অনেক গূঢ় মর্ম্ম কথা থাকে যাহা মর্ম্মহীন লোকে বুঝিতেও পারে না।

প্রগাঢ় দিবানিদ্রা হইয়াছিল। প্রায় ৬টা পর্য্যন্ত রাজবাড়ী যাইয়া দেখি "পাত্রমিত্র সভাসদ্ বসে চারিদিকে" এবং জল্পনা কল্পনা লইয়া কাণাকাণি করিতেছে ও গম্ভীর ভাবে (Like an owl dost to the moon complain) দালানের কড়িকাঠ গনিতেছে। মহারাজ তখনও অন্তঃপুরে। রাত্রি প্রায় ৮টার সময় মানা করিয়া বসিলেন জনপ্রাণীর প্রবেশ নিষেধ। কিছুকাল পরে আমার তলপ হইল। উপস্থিত হইয়া হুকুম পাইলাম অদ্যকার তোলা plate গুলি developing করিবার তাঁহার অভিপ্রায়। তাহারই জোগাড় করিয়া আমি অচিরে তাঁহাকে সংবাদ দিলাম। তিনি আলবোলা টানিতে টানিতে উপস্থিত। একখানা কেদারা টানিয়া বসিয়া গেলেন। আমি developing করিতে লাগিলাম একটু অবসর পাওয়ার মধ্যে তিনি দুই একটা সংবাদ দেন (বীজমন্ত্রের মত) যাহাতে এই বুঝিয়াছিলাম —"এবার তিনি অব্যাহতি পাইয়াছেন। Thomson সাহেবের উপদেশ (?) তিনি রক্ষা করিয়া দেখাইবেন ভুল চুক্ কাহার এবং কোথায় ?" আমি মন্ত্রমুগ্ধবৎ শুনিতে লাগিলাম। বাদপ্রতিবাদ করা এক্ষেত্রে ধর্ম্মতঃ নিষেধ। মনে করিলাম "পাকা হাতে হাল পড়িয়াছে। আমাদের বানচাল হইবেনা।" বীরচন্দ্রমাণিক্য কখনও গম্ভীরভাবে কখনও হাসা বদনে উমাকান্ত বাবুর সহিত আমার প্রেমের ঝগড়া, ঝুলন ঝগড়ার খবরাখবর জিজ্ঞাসা করেন এবং কখনও গুণ গুণ স্বরে আপন মনে মহাজন পদ গাহিতেছেন, মনে করিলাম "এ বৃদ্ধ ব্যক্তি কি রসিক পুরুষ! তিনি কি রসে না রসিক! প্রধান বাজীকরের ন্যায় উভয় হাতে সাফাই দেখাইতেছেন এবং যেন কখনও অর্দ্ধমণ লোহার গোলা লইয়া অনায়াসে বাজীকর হস্তক্ষেপ করিয়া থাকে সেই ভাবে political রঙ্গমঞ্চে তিনি রসিক বাজীকর।"

Daveloping শেষ করিয়া পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিতে প্রায় দুইঘণ্টা কাল লাগিয়াছিল। Dark-room হইতে হঠাৎ উজ্জ্বল আলোক আনিয়া আমাদের নয়ন ঝলসাইয়া দিয়াছিল। তিনি সচ্ছন্দে বসিলেন। তাহারই সম্মুখে আসনখানার উপর বসিয়া Photographer negative গুলি দেখিয়া দোষ এবং গুণের বিচার করিতে লাগিলেন। তাহার পর কাণকোঁড়া ঝুলনগীতির নথি তিনি উপস্থিত করিতে হুকুম করিলেন।

সর্ব্বনাশ! আমি তাঁহার সম্পূর্ণ আদেশ রক্ষা করিতে পারি নাই। গত রাত্রে মদিরা (?) পানে আমি আত্মহারা হইয়াছিলাম, মাত্র কয়েকটা গান ব্যতীত আর কোন গানেরই প্রুফ দেখি নাই। চন্দ্রবিন্দুর বিন্দুটীও দেখি নাই। আমি ত্রস্তব্যস্তে সে নথি হাজির করিলাম এবং যোড়হাতে প্রকাশ করিলাম গতরাত্রের সুঘটনায় কুঘটনায় আমি বিপর্য্যস্ত হইয়াছিলাম। মহারাজার আদেশ সম্পূর্ণ পালন করিতে পারি নাই। সহাস্যবদনে হাতে লইয়া তিনি লাল পেন্‌সিলে সংশোধন করিতে লাগিলেন এবং আমাকে পড়িয়া ও গাহিয়া শুনাইলেন। তখন রাত্র ১২টা বিদায় পাইলাম। Political রঙ্গমঞ্চের কোন খবরই স্মরণ রহিল না, কেবল মাত্র স্মরণ রহিল বীরচন্দ্রের কণ্ঠস্বর, মধুর মুরতি এবং ঝুলনমঙ্গলগীতের শেষ তাল।

ইতিমধ্যে পাত্রমিত্র সভাসদ কি কর্ম্ম করিয়া ফেলিলেন আমি ইচ্ছা করিয়া তাহার খোজ খবর রাখি নাই। একদিন অমৃতবাজার (July 1889) রাষ্ট্র করিয়া দিল কাশ্মীর রাজ্যে যে দুর্ঘটনা হইয়াছে বঙ্গের প্রান্ত্য রাজ্য ত্রিপুরাতে তদনুযায়ী ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। অমৃত বাজার লিখিতেছেন—

"Things came to such a pass that the Maharaja was actually held up to the public ridicule by sir River Thomson in the Calcutta Gazette treated His Highness as Deputy Magistrates under him. Mr. Greer, Political Agent of Tippera had taken His Highness the Maharaja to a flower garden for a serious conference. This information was followed by another namely that the Maharaja had been seperated from his advisers, and made to sit between two politics, one being Mr. Greer himself and the another his Assistant Babu Umakanta Das for the purpose of persuading him to make over his State to the British Government! This was followed by the still more important news that between these pressures the Maharaja had been made to sign his "Edict of Resignation for five years."

যখন পত্রে আমি ইহা পাঠ করিলাম তখন মহারাজ প্রাতঃকৃত্য সমাপন করিতেছিলেন। কাজেই আমি তখন দেখা করিতে পারি নাই। মনে করিলাম সুযোগ এবং সুবিধামত আমার বৃদ্ধ মনিবকে "বাল্য ভোগ" রূপে আমি তাঁহাকে অভিমান ভরে বেশ দুকথা শুনাইয়া দিব—বিষয় কি? এবং কেন এই লুকোচুরি কারবার? দুইটী বিভিন্ন শ্রেণীর লোক লইয়া খেলিবার প্রয়োজন কি? কেন নিজ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন না? পাঞ্জাব কেশরী রণজিৎ সিংহ বলিয়াছিলেন "English Government is safe friend but dangerous enemy" তিনি সাপ ও বানর লইয়া খেলা করিতেছেন কেন? এ কথাগুলি ওতঃপ্রোত ভাবে আমার যুবক অন্তঃকরণে উঠিতেছে ও নাবিতেছে এবং আমার মনিবের উপর অভিমানের মাত্রা বাড়াইতেছে। ইহা আমি জানিতাম প্রাদেশিক বঙ্গীয় গভর্ণমেণ্ট (Sir Rives Thomson) তাঁহার প্রতি অকারণে ও সকারণে রুষ্ট হইয়াছেন কিন্তু ইহা-দিগকে তুষ্ট করা বীরচন্দ্রের মত লোকের পক্ষে অসাধ্য কেন না তিনি বর্ত্তমান British form of Government কিছুতেই নিজ রাজ্য প্রবর্ত্তন করিবেন না একথা আমার পূর্ব্ব প্রবন্ধ "বীরচন্দ্র মাণিক্যের জেইলপ্রথা" নামক (পরিচারিকা ফাল্গুন ও চৈত্র ১৩২৬) প্রবন্ধে বলিয়াছি। আবার Greer সাহেব আসিয়া যে কর্ম্ম করিয়া গিয়াছেন তাহার খবর যাহা আমি অপরোক্ষ ভাবে বীরচন্দ্র হইতে শুনিয়াছিলাম তাহাতে বোধ করিয়াছিলাম এ বৃদ্ধ ব্যক্তি "দুর্জ্জয় মান" করিয়া বসিয়া আছেন। কিন্তু মান কাহার সঙ্গে? ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট নির্ম্মম machine রাজা, নির্ম্মমতাই তাহার "কিল" স্থানে আছে। এই দুর্জ্জয়-মানে তিনি পাঁচ বৎসরের রাজ্যভার ত্যাগ করিয়া বসিয়া আছেন। আমার মনিবের সঙ্গে আমার যে সম্বন্ধ সেই সম্বন্ধ প্রেমের সমুদ্র, অভিমান হচ্ছে প্রেমের মানরজ্জু। অদ্যাপি নিশ্চয় আমার মান-রজ্জুদ্বারা তাঁহার সততার ও প্রেমের পরীক্ষা করিব—নিশ্চয় করিব।

যথাসময়ে দরবারে বসিয়া গেলাম; দরবারের কাজ শেষ করিয়া তিনি কলা দরবারে উপস্থিত হন। প্রতিদিন তাঁহার এ-কার্য্য ছিল। এ কথা কেবল আমার নয় আমার বন্ধু স্বর্গীয় শ্রীনিবাস বন্দ্যোপাধ্যায় বি,এ, মহাশয় বীরচন্দ্র মাণিক্যের দরবারে চাকুরী করিতেন। তিনি যাহা "প্রদীপে" (চতুর্থ ভাগ আশ্বিন ও কার্ত্তিক ১৩০৮) "স্বাধীন ত্রিপুরাধিপতি

৺বীরচন্দ্র মাণিক্য বাহাদুর” নামক প্রবন্ধে ব্যক্ত করিয়াছেন (৪০৬ পৃষ্ঠায়) তাহা উদ্ধৃত করা গেল। “এই সময়ে পেস্কার জরুরী কাগজ পত্রে মহারাজার নাম স্বাক্ষর করাইয়া বিদায় হইতেন। মহারাজ হয় তখন কোন নূতন ফটো তুলিবার জন্য ষ্টুডিও গৃহে প্রবেশ করিতেন বা কোন “অয়েল পেইন্টিং” লইয়া বসিতেন। কোন বিবসনা রমণীর চিত্র অঙ্কিত করিতে বসিলে দু চারিটা বিশিষ্ট লোক ভিন্ন অন্য লোকের গৃহে প্রবেশ নিষেধ হইত, দরবারের ভাষায় বলা হইত ‘সাক্ষাৎ মালার ছবিতে” আছেন অর্থাৎ নিষিদ্ধছবি লইয়া আছেন।”

আজ সুযোগ ঘটিল ভাল। তিনি আজ পরিচারিকা মহিলাদের ফটো উঠাইবার জন্য হুকুম করিলেন। Asst Photographer রূপে আমাকে সঙ্গে থাকিতে হইবে এবং দীর্ঘকাল থাকিতে হইবে, Photogroph ও developing করিতে সময় যাইবে এবং তাঁহার সান্নিধ্যে থাকার সুবিধা প্রচুররূপে পাইব। পকেটে অমৃতবাজারখানা লইয়া গেলাম এবং যথাসময় কার্য্য সমাধা করিয়া দিতে দেড়টা বাজিয়া গেল। তখন বলিবার সুবিধা নিলাম ইহার অর্থ কি? জানিবার সুবিধা হইল। পত্রিকা লিখিত সংবাদ আমি পাঠ করিয়া শুনাইলাম এবং যোড়হাতে জিজ্ঞাসা করিতে চাহিলাম কিন্তু তিনি সহাস্যবদনে বলিয়া ফেলিলেন ‘ তুই যা বলিতে চাস্ আমি জানি। কিন্তু মনে রাখিস্ তুই যুবক্ আমি বৃদ্ধ। ছেলেরা বলে বুড়োরা পাগল কিন্তু বুড়োরা জানে যে ছেলেরা পাগল। তোকে বলিতেছি না কিন্তু বলিতেছি তাদের কথা যারা “আপনমতলবী”। গভর্ণমেণ্ট দীর্ঘকাল হইতে চায় আমার রাজ্যে একজন Defacto রাজা বা গভর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত মন্ত্রী আর আমাদের কর্ম্মচারীরা চায় তাদের “কুড়ি টাকা বজায় থাকিলে পৃথিবী ঘুরুক” কিন্তু আমি যাহা চাই তাহা তাহারা দিতে প্রস্তুত নয়। গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করে না আমি স্বেচ্ছাচারভাবে রাজত্ব করি, আর আমার সরকারী কর্ম্মচারীরা চায় না যে আমি Budget উল্লঙ্ঘন করিয়া চলি। আমি কাহারও কথা শুনিব না। বাহিরের দুই দল মাঠে মারামারা করুক, পত্রিকায় লিখুক এবং গভর্ণমেণ্ট যখন কখনও তুষ্ট হইবেন না বরং রুষ্ট হইবেন ইহা আমি জানি। কাজেই আমি দেখিলাম গভর্ণমেণ্ট সন্তুষ্ট হউক পাঁচ বৎসর কাল পুনঃ

আমি যৌবরাজ্যের সুফল আস্বাদন করি এবং এই আমরা যা করিতেছি কলাবিদ্যার অঞ্চল ধরিয়া স্বচ্ছন্দে থাকি।”

শুনিয়া অবাক্ হইলাম এই কি বুড়ার অভিমান না যুবার পাগলামী? বালকের খেলা না বৃদ্ধের মেলা? একটী রাজত্ব লইয়া খেলা মেলা করা কতদূর impolitics আমি যুবক, কার্যক্ষেত্রে নবপ্রবেশী কিন্তু পঠদ্দশায় যে Palitics পাঠ করিয়াছি (অবশ্য Native State Politics অধ্যয়ন করিয়াছি) তাহার সঙ্গে তুলনা করিয়া দেখিলাম মহারাজ মশার দুঃখে মশারীতে আগুন লাগাইতেছেন কিছুকাল সদ্য Developed platesগুলিকে স্বচ্ছ অবস্থায় দেখিয়া প্রত্যেক খানার গুণাগুণ বিচার করিতেছেন এবং সেই তাঁহার স্বভাবসুলভ হাস্য-বদন এবং মধু হইতে মধুর বাক্যে নিজে তুষ্ট হইতেছেন সঙ্গেং আমাকেও তুষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা পাইতেছেন; বীরচন্দ্র টের পাইয়াছেন। স্নানার্থে গাত্রোত্থান করিয়া আমার স্কন্ধদেশে হস্ত অর্পণ করিয়া আবার সুহাস্যবদনে বলিলেন “চিন্তা কি মহিম? কলিকাতা বাজার করিতে যা শম্ভু বাবুর সহিত দেখা করিয়া আয়।” এইমাত্র বলিয়া তিনি দ্রুতপদে চলিয়া গেলেন। আমি বুঝিতে পারিলাম এ বৃদ্ধ বাজীকর একটা বাজী মারিতে ইচ্ছা করিতেছেন। অনর্থক কলিকাতা আমার যাওয়ার কথা কিন্তু যথার্থ অর্থ ছিল আমাদিগের বন্ধু সৎপরামর্শদাতা শম্ভুবাবুর নিকট উপস্থিত বিষয়ে আলোচনা করা এবং ব্যবস্থা করা। আমার অভিমান বরফের মত গলিয়া গেল এবং গলিত বরফ খাইয়া আমি শীতল হইলাম।

“A rumour reaches us, how far true we cannot tell, that the letter of the Maharaja has given His Honour offence because of his tone. But the Maharaja has nothing to do with the “tone” of the English letter he sent; for he does not know English. What the Maharaja probably did was to give his thoughts in Bengalee for his English Secretary to convert into English and that his English Secretary not used to deal in such matters and with an imperfect knowledge of English used expressions which should not have been done.”

বিষয়টা যা হইয়াছে তাহা একণে বুঝিতে পারিলাম। মহারাজার English Secretary ছিল শ্রদ্ধেয় মৃত রাধারমণ ঘোষ বি এ। তিনি বিজ্ঞ ব্যক্তি এবং তিনি যে একজন প্রথম শ্রেণীর দার্শনিক কবি এ কথা স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর আমার নিকট বলিয়াছেন এবং প্রশংসা করিয়াছেন। সম্প্রতি তিনি মানবলীলা সংবরণ করিয়াছেন। বহুকাল তিনি রাজসংসারে ছিলেন এবং Political কার্য্যেই তাঁহার কর্ত্তব্য ছিল। তিনি যে মণিবের অনিষ্ট করিয়া নিজকে ব্যক্ত করিয়া নিম্নগামী হইবেন ইহা কখনও বিশ্বাস করা যায় না। কিন্তু এ কথা শ্রীনিবাস বাবু তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত প্রবন্ধে লিখিয়াছেন,

"ভারতের অনেক রাজা মহারাজা এইরূপ ক্ষণিক 'আয়েস্' সন্তোষের লোভে প্রাইভেট সেক্রেটারীর মুখে অন্ন আস্বাদন করিতে যাইয়া আপনাদের জীবন বিস্বাদ ও পরিণাম তিক্ত করিয়া থাকেন। মহারাজের হৃদয় দয়ার নবনীত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল; তাঁহার অনন্যসুলভ তীক্ষ্ণ বিষয়বুদ্ধি ছিল; অসাধারণ লোকচরিত্র পরিজ্ঞানশক্তি ছিল; একটী অপরিচিত লোকের সহিত প্রথম সাক্ষাৎকার সময়েই এমনভাবে তাহার আপাদমস্তক পর্য্যবেক্ষণ করিতেন যে বোধ হইত যেন রঞ্জেনের আলো অপেক্ষাও তাঁহার দৃষ্টি অধিকতর গূঢ়দর্শী ও মর্ম্মস্পর্শী; তাঁহার ক্রোধ উদ্বেলিত হইলে কর্ম্মচারীগণের হৃদয়ে খণ্ড প্রলয়ের আতঙ্ক উপস্থিত হইত, পানাশক্তি বা দ্যূতক্রীড়া প্রভৃত রাজৈশ্বর্য্যসুলভ অনেক ব্যসন হইতে তিনি মুক্ত ছিলেন, সর্ব্বোপরি তিনি অনলস অধ্যবসায়ী ও চতুরস্রশিরস্ক ছিলেন, এত গুণ সত্বেও তাঁহাকে রাজ্যশাসন ও মন্ত্রীপরিবর্ত্তন ঘটিত অনেক অখ্যাতির ভাগী হইতে হইয়াছিল; তাহার প্রধান কারণ কর্ম্মচারীদের উপরে অতিরিক্ত বিশ্বাস স্থাপন ও লোকের 'মন্ত্রির" ভয়ে অতিরিক্ত চক্ষুলজ্জ পোষণ।"

ইহাতেই পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন এই Oriental Rulersগণের স্বভাব ও প্রকৃতি। বিখ্যাত The late Mr B. M. Mala Bari লিখিয়াছেন (তাঁহার 'Native State' নামক গ্রন্থে ১৬৮ পৃষ্ঠায়)

A ruling prince is genrally an Eastern prince and nothing more. He has little education but great ideas of his own inportance which he imbibes

from his surroundings and a fearless adventurous spirit which he inherits from his fathers.”

‘সংসর্গজা দোষগুণাঃ ভবন্তি’ ইহা শাস্ত্রবাক্য এবং ‘যৎবীর্য্যঃ তৎপরাক্রমঃ’ একথা কখনও অস্বীকার করা যায় না। এজন্য বীরচন্দ্র মাণিক্যকে আমাদের মাণিক্যের কণ্ঠহার হইতে বিচ্যুত করিতে পারি না এবং উভয় দিক দেখিলে বীরচন্দ্র সাপের সঙ্গে বানর নাচাইতেছেন ইহাই আমি উপলব্ধি করিতে পারিলাম।

একদিন চাঁদানি রাত্রে তিনি বাহির হইয়া পড়িলেন এবং বাগানের চারিদিকে ঘুরিতে লাগিলেন। তাঁহার বাগান তাঁহারই মত। শুভ্র এবং সুগন্ধি পুষ্পে সজ্জিত মাঝে মাঝে সৎগন্ধযুক্ত বিলাতী পুষ্পেরও কেয়ারী করা আছে। গ্রীষ্ম স্নিগ্ধ রজনী এবং জুঁই, চামিলি, বেলা চারিদিক ছড়াইয়া পড়িয়াছে, আকাশের নক্ষত্রের ন্যায়। Overia Atuovria বিলাতী পুষ্পদ্বারা কেয়ারী করা আছে! ইহা দেখিয়াও বীরচন্দ্রের Policy-কে মনে পড়ে। তিনি Jasemine জাতীয় পুষ্পের ভয়ানক পক্ষপাতী এবং মাঝে মাঝে বিলাতী ফুলেরও আদর করিয়া থাকেন। কেয়ারী যখন বেনারী হইয়া পড়ে অর্থাৎ বর্দ্ধিত হইয়া বাড়িতে থাকে তখন তাহাকে সংযত করেন এবং কাটিয়া ছাঁটিয়া দুরস্ত রাখেন। বীরচন্দ্র তাঁহার চিরঅভ্যস্ত আলবোলা সেবক সঙ্গে করিয়া লইয়া আসিয়াছেন। আনমনে তামাকু টানিতেছেন ইতিমধ্যে আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন “তুই কলিকাতা যাবি কবে?” আমি বলিয়াছিলাম “যখন মহারাজের হুকুম।” তিনি সহাস্যে উত্তর দিলেন (একটু মুচকি হাসিয়া) “যাবি ত পূজার বাজার কর্ত্তে। শ্রাবণ মাসে কেন?” আমি চুপ করিয়া রহিলাম। তখন তিনি নিভৃতে বলিলেন “কলিকাতায় একটু আমোদ করা চাই ত? তোরা যুবক আর তবু Political বন্ধু অনেক আছে দেখা সাক্ষাৎ করা চাই। পরশু দিনই রওয়ানা হইয়া যা।” ভাবে স্পষ্ট বুঝিতে পারিলাম আমাকে যাইতে হইবে; পক্ষাপক্ষকে ফাকি দিতে যাইতে হইবে Dr. Sambhu Charan Mukherjeeর নিকট। তিনি কলিকাতায় Political রঙ্গমঞ্চে Viceroy হইতে অধীনস্থ কর্ম্মচারীবর্গকে চিনেন এবং জানেন এবং মিশেন। মাঝে মাঝে ত্রিপুরার জন্য তিনি খাটেন, যদিচ তিনি ত্রিপুরার মন্ত্রিত্ব পদ স্বেচ্ছায় পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন। কেন এবং কি কারণে একথা অপ্রাসঙ্গিক হইলেও আমাকে প্রাসঙ্গিক করিয়া

লইতে হইতেছে। Mr. Skrine (Mukherjee) জীবনী ও পত্র প্রকাশ করিয়াছেন তাহার ১৩১ পৃষ্ঠায় M. Townsend লিখিত পত্রের যে জবাব দিয়াছিলেন তাহা উদ্ধৃত করা গেল।

"You concluded with a suggestion "why do you not publish an account of your life as Minister of Tipprah"? The answer is because I might then compromise my master and the little State I served. And secondly because I might thereby close the only career open to me in the Native India. British officials try their utmost, to keep able and worthy natives out of the Native States. And any indiscretion on my part would arm them with a deadly weapon against me and the small class of aspiring natives educated in western learning who can manage States.

However, I have done the next best thing — published a small volume of "Travels through Bengal to Tipperah" giving glimpses of life in a native State, and it now awaits an adequate review from your pen."

এই পত্রের ভাব ও ভাষায় পাঠকবর্গ বেশ বুঝিবেন আসল সোণা ফেলিয়া গিল্টী জিনিষই তখনকার দিনে আদরনীয় হইত। শম্ভু বাবু রাজ্যের ইজ্জৎ রক্ষা করিতে যাইয়া যখন দেখিতে পাইলেন নিজের ইজ্জৎ পর্য্যন্ত at stake (বিপদগ্রস্ত) হইয়া পড়ে, তখন তিনি প্রাচীন ত্রিপুরা রাজ্যের সীমা ছাড়িয়া গেলেন কিন্তু অন্তর সীমার লঙ্ঘন করেন নাই বরং তাহা দৃঢ় হইতে দৃঢ়তর হইয়াছিল। "যো যস্য হৃদি নহি তস্য দূরম্" কলিকাতা বসিয়া তিনি বীরচন্দ্র মাণিক্যের Political adviser এর কাজ করিতেন। মাঝে মাঝে কৃতকার্য্য হইতেন।

আমি যথাসময়ে কলিকাতা হাজির হইলাম—যখন বিদায়ের সময় মহারাজকে বিদায় অভিবাদন করিয়াছিলাম তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিবার কালীন তিনি আমার কর্ণকুহরে একটা খবর দিয়াছিলেন "Asst Palitical Agent মহাশয় এ রাজ্যে যেরূপ অবস্থায় পড়িয়াছেন

এবং তাঁহার দক্ষিণহস্ত পঙ্গু হইয়া গিয়াছে Cram রোগের দরুণ Fool's cap অর্থাৎ গাধার টুপী কাগজে মসি লেপিয়া Deputy গিরি করিতে পারিবেন না এমত অবস্থায় ত্রিপুরা গাধায় সোয়ারী হওয়াই তাঁহার পক্ষে শোভা পাইবে একথা Govt মনে করেন। শম্ভু বাবু টের পাইতেন।

শিয়ালদহ ষ্টেশন হইতে সটান আমি Wellington Street ১নং অক্রুর দত্তের গলিতে শম্ভু বাবুর অতিথি হইলাম; তিনি তখন অসুস্থ। Dr. Mohendra Lal Sarcar তাঁহার পাশে বসিয়াছিলেন। আমাকে দেখিয়াই শম্ভুবাবু উৎফুল্ল হইলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন "কি হে Thakurling (এই আদরের নামে শম্ভু বাবু আমাকে সম্বোধন করিতেন) খবর কি? শ্রীশ্রীযুত কেমন আছেন? তোমার বাবা কেমন আছেন? তাঁহার সে প্রশান্ত মূর্ত্তি আমার স্মরণ হইতে চলিয়া যাইতে চায় না" আরও কত কি জিজ্ঞাসা করিয়া বসিলেন যেন এক নিঃশ্বাসে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ পাঠের মত। আমি তাঁহাকে সব বিষয়ে যতদূর পারি উত্তর দিলাম এবং আমার বক্তব্য তাঁহাকে বলিলাম। তখন শম্ভু বাবু একটু কষ্টের হাসি হাসিয়া গম্ভীর হইলেন এবং ডাক্তার সরকারকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি দুই একদিনের মধ্যে বের হতে পারব?" সরকার বলিলেন "বিলক্ষণ তুমি যে ন্যাকামি করিতেছ? আর তোমার হিমলাগান বাই আছে।" এই বলিয়া ডাক্তার সরকার বাহির হইয়া পড়িলেন। আমি স্নানাহার করিয়া কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর শম্ভু বাবুর শরণাগত হইলাম। "সুখবর মহিম, আমি এই মাত্র টেলীগ্রাম পাইলাম "টানসেন" (Thomson) চলিয়া যাইতেছেন। আমার পরিচিত বন্ধু Sir Stuart Bayley পুনরাগত হইতেছেন, তখন আমার সুবিধা হইবে মনে করি। তবে ছোট লাট হইয়া ইঁহারা পাখাবদল পাখীর মত হইয়া পড়ে কিন্তু Bayleyএর উপর আমি সে সন্দেহ করিতে পারি না। তোমরা এক কাজ কর। যে চিঠিখানা লিখা হইয়াছে তাহা বড় কদর্য্য ভাষায় এবং আত্মম্ভরিতাপূর্ণ। সেটা আমি দেখিয়াছি। ঐ চিঠিখানা প্রত্যাখান কর—।" ইতিমধ্যে দুর্গামোহন (স্বর্গীয় স্বনামধন্য প্রসিদ্ধ দুর্গামোহন দাস) পূজার ছুটীতে আগড়তলা যাইবেন এবং মহারাজকে আমার পক্ষ হইতে এ ক্ষেত্রে যাহা করার দরকার সে সম্বন্ধে উপদেশ দিবেন। মহারাজ ঠিক মনে করিয়াছেন। লোক চরিত্র অভিজ্ঞ, কাজেই ঠিক মর্ম্মস্থলে প্রবেশ করিয়াছেন। দুর্গামোহন দাস ব্রাহ্ম এবং উমাকান্ত দাস

আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম কাজেই উমাকান্তকে লওয়াই ঠিক মনে করি। তুমি একবার দুর্গামোহনের সঙ্গে দেখা কর।

যখন দুর্গামোহন বাবুর সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম তখন দেখি তিনি চটিয়া আগুন। আমাকে দেখা পাইবামাত্র জিজ্ঞাসা করিলেন "মহিম গাধার মত চিঠিখানা Draft করিয়াছে কে?" এই সপ্তজিহ্বাযুক্ত অগ্নিদেবকে দেখিয়াই আমার চঞ্চল জিহ্বাকে সামলাইয়া লওয়াই এক্ষেত্রে দরকার। বলিলাম "আমি জানি না।" তখন দুর্গামোহন বাবুর নিকট জানিতে পারিলাম তিনি বঙ্গের মঙ্গলঘট, কাহাকে ও পদাঘাত করিতে দিবেন না! ত্রিপুরা রাজ্যকে এবং রাজাকে অক্ষুণ্ণ রাখাই তাঁহার প্রধান কর্ত্তব্য এবং দ্রষ্টব্য। আগড়তলা যাওয়াই স্থির করিয়াছেন এবং তথায় গেলে তিনি আমাদের বাড়ীতে অতিথি হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন। পিতৃদেব ইঁহার বাল্যবন্ধু এবং এখন তিনি অন্তরঙ্গ বন্ধু। বুঝিলাম বীরচন্দ্র এবার সৎপরামর্শ পাইবেন।

সমস্ত কথা মহারাজকে সুদীর্ঘ পত্রে লিখিয়া দিলাম। কলিকাতায় এক্ষণে আমার অবস্থান করার দরকার নাই। আমি কোন কোন বন্ধুর সহিত বন্ধুর দেশ জলপাইগুড়ি যাইতে চাই এবং হয় ত দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত যাইতে পারি।

ক্রমশঃ

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

বংশীধ্বনি।

দুর্য্যোগের এই আঁধার রাতে
আকুল করা বংশী গো,
জাগায় বুকে সুখের স্বপন
সত্য শুভশংসী গো।

জাগলো নিশিগন্ধা রে
লাগলো সুধা মন্দারে
শূন্য আমার মানস-সরে
জুটলো যে রাজহংসী গো।

(২)

আন্‌লে ডেকে অতীত সুখে
বৈতরণীর ধার থেকে,
আন্‌লে ফিরে মনের মানুষ
মরণ-পুরের পার থেকে।
শীতের বাতাস তার টানে
পদ্মপরাগ ভার আনে
নিদাঘ চাঁপা উঠলো ফুটে
তুষার পুরীর চার দিকে।

(৩)

'হারা'র দেশের মলিন তারায়
হঠাৎ উজল করলে সে,
রঙমহালের ভগ্ন ভিটায়
কনকদেউল গড়লে সে।
এমন সদয় মিত্র হায়
প্রাণ দিলে আজ চিত্রটায়
শ্মশান ভূমির শূন্য কলস
সুধার ধারায় ভরলে সে।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

পথ-নির্দ্দেশ।

—:*:—

দীর্ঘ অবসাদের পর নিস্তেজ মন ও নিষ্ক্রিয় শরীর যখন সহসা এক নব শক্তির আবেশে সচেতন হইয়া উঠে তখন মানুষ যেমন তাহার চারিদিকে কেবল আনন্দহিল্লোল দেখিতে থাকে, এবং তাহারই মধ্যে নিজকে ডুবাইয়া দিয়া এতদিনের জড়ত্বের অবসান করিতে ব্যাকুল হয়, আজ তেমনই যেন ভাগলপুরের নবোদ্বুদ্ধ বাঙ্গালী ছাত্রগণও বহু দিনের ঘুমঘোর কাটাইয়া উঠিয়া একটা লক্ষ্যের সন্ধানে আত্মহারা হইয়া উঠিয়াছে। আজিকার এই উৎসব তাহাদের হৃদয়ের সেই আনন্দপ্লাবনের উদ্বেল উচ্ছ্বাস, অরুণোদয়ে আঁধার কুঞ্জে বিহগকুলের কূজন-কলরব, আশাহীন নিরানন্দ প্রাণে আশার ও আনন্দের বাণী। এই আশা ও নিরানন্দ, এই গীত ও উচ্ছ্বাস আজিকে যে নব প্রভাতের সূচনা করিতেছে, প্রার্থনা করি তাহা যেন উত্তরোত্তর উজ্জ্বলতর আলোকে প্রবাসবাসী বাঙ্গালী যুবকের জীবন মধ্যাহ্ন উদ্ভাসিত ও সার্থক করে, এবং তাহার জীবনযাত্রার দীর্ঘ পথটি গৌরব-পুষ্পে মণ্ডিত করিয়া সত্যের ও সফলতার দিকে লইয়া যায়।

আজ মনে পড়িতেছে শতবর্ষ বা তাহারও পূর্ব্বের কথা, যখন এখনকার এই প্রবাসী বাঙ্গালীর পূর্ব্ব পুরুষগণ সহস্র দুঃখকষ্ট মাথায় লইয়া স্বজনবান্ধবহীন বিদেশ বাসবরণ করিয়া লইয়াছিলেন। তখন হয়ত তাঁহারা জীবিকার জন্যই জননী বঙ্গভূমির শ্যামল অঞ্চল ছাড়িয়া বিমাতার ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়াছিলেন। কিন্তু তাহা হইলেও তাঁহাদের সমস্ত উদ্যম ও শক্তি আত্মোদর পূরণের জন্যই ব্যয়িত হইয়া যায় নাই, অর্থোপার্জ্জনই তাঁহারা জীবনের মূলমন্ত্র করিয়া লন নাই। জাতি ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে লোকহিতকর নানা কর্ম্মে তাঁহারা নিজেদের নিয়োজিত করিয়া স্বার্থের সহিত পরার্থের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের হৃদয়ে প্রেম ছিল; বিদেশকে স্বদেশের মতই ভাল বাসিয়া তাহার

---

* ভাগলপুর বাঙ্গালীছাত্রসম্মিলনী-প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে পঠিত অভিভাষণ।

উন্নতিকল্পে চেষ্টা করিতে তাঁহারা বদ্ধপরিকর ছিলেন। তাই তাঁহারা বেহার হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র উত্তর ভারতে জ্ঞান ও শিক্ষার আলোকবর্ত্তিকা বহন করিয়া লইয়া গিয়াছেন, সংবাদ পত্রাদি স্থাপন বা সম্পাদন করিয়া দেশের অভাব অভিযোগের প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, এবং সকল প্রকার সাধারণ কার্য্যে তাঁহারা অগ্রণী ছিলেন। এই ভাগলপুরের কথাই ধরা যাইতে পারে। যে বিদ্যাপীঠ আজ ত্রিশ বৎসরেরও উর্দ্ধকাল ধরিয়া ভাগলপুর বিভাগের উচ্চ শিক্ষার কেন্দ্রস্বরূপ হইয়া শত শত যুবকের জ্ঞানের পিপাসা মিটাইতেছে তাহা মুখ্যত উদারহৃদয় তেজনারায়ণ সিংহের দ্বারা স্থাপিত হইলেও তাঁহার মন্ত্রদাতা ও দক্ষিণ হস্তস্বরূপ ছিলেন একজন বাঙ্গালী—স্বর্গীয় লাড়্লীমোহন। আর একজন বাঙ্গালী মুনিসিপ্যাল চেয়ারম্যান স্বর্গীয় রাজা সাহেব শিবচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সহরে জলের কল স্থাপন করিয়া স্থানীয় স্বাস্থ্যের প্রভূত উন্নতিসাধন করিয়া গিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত বালিকাবিদ্যালয় ও হাঁসপাতালের অংশ বিশেষ তাঁহার স্মৃতি রক্ষা করিতেছে। আরও অনেক বাঙ্গালীর কীর্ত্তিচিহ্ন ধারণ করিয়া ভাগলপুর গৌরবান্বিত হইয়াছে। কিন্তু সেই অতীত যুগের প্রবাসী বাঙ্গালার কীর্ত্তি-স্মৃতি মনে কি শুধু একটা বেদনাই আনিয়া দেয় না? আর কেন আমরা বিদেশে এমন বাঙ্গালী বড় দেখি না যাঁহারা নিজেদের ধনমানসম্পদ লাভই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে না করিয়া অপরের কথাও ভাবিয়া থাকেন, যাঁহারা ক্ষুদ্র স্বার্থের গণ্ডী অতিক্রম করিয়া বৃহত্তর সমাজের বিশাল কর্ম্মক্ষেত্রে জীবনের সার্থকতার সন্ধান পান? বাঙ্গলা দেশের পাঁচ কোটি নরনারীর প্রাণ চঞ্চল করিয়া যে ভাব প্রবাহ সেখানে নিরন্তর ধাবিত হইতেছে তাহা ত আর বিদেশবাসী বাঙ্গালীর হৃদয় তটে আসিয়া তেমন প্রবল ভাবে আঘাত করে না। একটা যেন মৃত্যুর অসাড়তা আমাদের হৃদয় মন অধিকার করিয়া বসিয়া আছে। নিশ্চেষ্টতার যে জগদ্দল পাথর আমাদের বুকের উপর চাপিয়া রহিয়াছে তাহাতে আমাদের সমস্ত উদ্যম, উৎসাহ, এমন কি মনুষ্যত্ব পর্য্যন্ত নিষ্পেষিত, বিনষ্ট হইয়া যাইতেছে।

ইহার ফল আমাদের ভবিষ্যৎ আশাভরসাস্থল বালক ও যুবকগণের উপর বড় অনিষ্টকর হইয়াছে। চক্ষের সম্মুখে উদার উন্নত আদর্শের অভাব বশতঃ মন তাহাদের সঙ্কীর্ণ হইয়া যাইতেছে, হৃদয় উচ্চভাব গ্রহণে অক্ষম হইয়া উঠিতেছে। ইহার চেয়ে নৈতিক অবনতি আর

কি হইতে পারে? স্কুল কলেজে তাঁহারা শিক্ষা পাইতেছেন বটে, নানা দিকে এখনও তাঁহারা কৃতিত্ব প্রদর্শনও করিতেছেন সত্য; কিন্তু তাঁহাদের মন মহৎ সঙ্কল্পের প্রেরণা হইতে বঞ্চিত, দৃষ্টি ক্ষুদ্র ব্যক্তিগত স্বার্থের দিকেই নিবদ্ধ। সকলে সম্মিলিত হইয়া কোন একটা উদ্দেশ্যে কার্য্য করিবার প্রবৃত্তি তাঁহাদের বড় নাই, অকর্ম্মণ্যতাই যেন তাঁহদের বিশেষত্ব হইয়া উঠিতেছে। সম্মুখ দিয়া তাঁহাদের বিহারী ও মৈথিল ভ্রাতারা নবভাবের উন্মাদনায় জয়গান গাহিয়া চলিয়াছেন, সমাজসেবার ব্রত গ্রহণ করিয়া তাঁহারা বর্ষে বর্ষে দেশের শীর্ষস্থানীয় নেতৃগণের সাহায্যে আপনাদের কার্য্যপ্রণালী স্থির করিয়া লইতেছেন; কিন্তু বাঙ্গালীছাত্রগণের অসাড়তা ত তাহাতে দূর হয় নাই, কর্ম্মপ্রবাহে তাঁহাদের ঝাঁপ দিবার প্রবৃত্তির পরিচয় ত এত দিন বড় পাওয়া যায় নাই।

আজ কি সত্যসত্যই সেই শুভদিন আসিয়াছে যখন আমাদের তরুণ যুবকগণ তাঁহাদের অধঃপতনের অবস্থা তথা প্রবাসী বাঙ্গলার কূপমণ্ডুকতা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিয়া আপনাদের এবং সমাজের উন্নতিকল্পে আপ্রাণপণ চেষ্টা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইয়াছেন? সত্যই কি তাঁহাদের মানসমরুভূমে নূতনভাবের বন্যা আসিয়া তাহাকে শতকুসুমসম্ভারে সুসজ্জিত করিবার আয়োজন করিয়াছে? সত্যই কি আজ তাঁহাদের হৃদয়াবেগ রবীন্দ্রনাথের স্বপ্নোত্থিতা নির্ঝরিণীর ন্যায়—

মহা উল্লাসে ছুটিতে চায়,—
ভূধরের হিয়া টুটিতে চায়,
প্রভাত কিরণে পাগল হইয়া—
জগতমাঝারে লুটিতে চায়—!

যদি যথার্থই তাহাই হয়, যদি তাঁহারা স্বার্থ ও জড়তার পাষাণকারা ভাঙ্গিয়া চারিদিকে করুণাধারা ঢালিবার জন্য ব্যাকুল হইয়া থাকেন, যদি তাঁহারা প্রকৃত মনুষ্যত্বের সন্ধান পাইয়া থাকেন্ এবং সকল বাধাবিপত্তি তুচ্ছ করিয়া তাহারই সাধনার পথে ছুটিতে সঙ্কল্প করিয়া থাকেন তবে একবার তাঁহাদের চারিদিকে ভাল করিয়া চাহিয়া দেখিতে অনুরোধ করি, একবার দেখুন—

সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
বড়ই দরিদ্র, শূন্য, বড় ক্ষুদ্র, বড় অন্ধকার!

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্তবায়ু
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু,
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট।

আজ যদি প্রবাসী বাঙ্গালী ছাত্রদের কর্ত্তব্যের পথ এইরূপ স্থিরীকৃত হইয়া যায়, যদি তাঁহারা 'পরের কারণে স্বার্থে দিয়া বলি' জীবনমন দিতে প্রস্তুত থাকেন, তবে আর বিলম্ব নয়, 'আলস্য ত্যজি' 'কর্ম্ম-মুকুট' তাঁহারা আপনাদের শিরে তুলিয়া লউন। এখন হইতেই তাঁহাদিগকে সেবামন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া তাহার সাধনায় প্রাণপণ করিতে হইবে। যাহারা 'সবার অধম দীনের হ'তে দীন' তাহাদিগকে শিক্ষিত উন্নত করিয়া সামাজিক অবজ্ঞার গভীর পঙ্ক হইতে উত্তোলন করিতে তাঁহারা যত্নপর হউন, দুর্ভিক্ষের করাল বদন যেখানে লক্ষ লক্ষ লোক গ্রাস করিয়া গগনভেদী হাহাকারের সৃজন করিয়াছে সেখানে তাঁহাদের ভিক্ষালব্ধ অন্নমুষ্টি প্রেরণ করিয়া সেই ক্রন্দন-রোল প্রশমিত করিতে তাঁহারা চেষ্টা করুন, জলপ্লাবনে বা অন্য কোন প্রাকৃতিক উপদ্রবে যখন গ্রাম নগর উৎসন্নপ্রায় তখন তাঁহারা দেবদূতের মত গিয়া তাঁহাদের সেবাশক্তির পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করুন। পণপ্রথার যূপকাষ্ঠে বালিকা-বলি দিয়া যেখানে লোভ-রাক্ষসের তৃপ্তিসাধনের ব্যবস্থা হইতেছে তাঁহারা সেখানে গ্রীকপুরাণের পার্সিউসের ন্যায় রাক্ষস-কবলিতা বালার উদ্ধারসাধন করিয়া তেজ ও বীরত্বের পরিচয় দিন। রোগে শোকে লোকের সহায় হউন, আঁধারের মধ্যে চারিদিকে আলোকবন্যা আনয়ন করুন। এই 'এই সাধনার এ আরাধনার' বীজ যদি প্রবাসী ছাত্রগণের মনে উপ্ত হয় তাহা হইলেই অদ্যকার এই উৎসব সার্থক হইবে। ছাত্রসম্মিলনীর ইহাই যেন প্রথম ও প্রধান উদ্দেশ্য হয়।

ইহার অন্য উদ্দেশ্যও আছে। বৈদেশিক শিক্ষার প্রভাবে আমাদের হৃদয়মন যে অনেকটা বিকৃত হইয়া যাইতেছে তাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। এ শিক্ষাব্যবস্থা পাশ্চাত্য সভ্যতার অঙ্গ পাশ্চাত্য ভাবে অনুপ্রাণিত; আমাদের জাতীয়ভাব ও আদর্শ, নীতি ও ধর্ম্ম তাহাতে বড় স্থান পায় না। ফলে, "প্রবল ও বিচিত্র শক্তিশালী য়ুরোপীয় সভ্যতা অতি সহজেই আমাদের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলিতেছে, আমাদের বুদ্ধি, আমাদের হৃদয় আমাদের রুচি প্রতিদিন জলের দরে বিকাইয়া যাইতেছে।" (রবীন্দ্রনাথ,—আত্মশক্তি) রামতনু লাহিড়ীর জীবনচরিতে দেখিতে পাই, সেকলে যখন বাঙ্গালাদেশে ইংরাজি শিক্ষার

প্রয়োজন প্রমাণ করিবার জন্য বলিয়াছিলেন যে মাত্র এক শেল্‌ফ্‌ সুনির্বাচিত পাশ্চাত্য গ্রন্থ সমগ্র প্রাচ্য সাহিত্য ও দর্শন অপেক্ষা মূল্যবান, তখন তদানীন্তন ইংরাজিশিক্ষাপ্রাপ্ত হিন্দুধুরন্ধরগণ সে কথা যথার্থ বলিয়া অম্লান বদনে মানিয়া লইয়াছিলেন। সৌভাগ্যের বিষয় বাঙ্গালীর লুপ্তপ্রায় আত্মসম্মানজ্ঞান ফিরিয়া আসিতেছে, জাতীয় সভ্যতার প্রতি তাহার সেই শোচনীয় অশ্রদ্ধা অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষার প্রভাবে আমাদের মতিবুদ্ধিই যে একেবারে পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে সে খবর ত আমরা বড় রাখিনা, ভালমন্দ বিচার করিতে হইলে আমরা পশ্চিমের আদর্শের সহিত বিচার্য্য বিষয় মিলাইয়া লই, সমাজে, রাষ্ট্রে ও শিক্ষার সংস্কারের প্রয়োজন অনুভূত হইলে ঐ পশ্চিমের দিকেই তাকাইয়া থাকি,—এই ভাব-দাসত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিতে না পারিলে আমাদের জাতীয় জীবন মহিমান্বিত করিয়া তুলিতে পারিব না। পাশ্চাত্য সভ্যতা ও শিক্ষা আমাদের যে অশেষ মঙ্গল সাধন করিয়াছে তাহা অস্বীকার করিতেছি না– অস্বীকার করিলে ধর্ম্মহানি হইবে। অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার দূরে সরাইয়া দিয়া এই শিক্ষা ভারতবাসীর মন যুক্তি ও বিচারে প্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াস পাইয়াছে, সমগ্র জগতের সহিত ভারতের ভাবের আদান প্রদান সম্ভবপর করিয়া তুলিয়াছে, খণ্ড, ছিন্ন, ঐক্যহীন অসংখ্য জাতি ও সম্প্রদায়গুলিকে একসূত্রে বাঁধিয়া সাম্য, মৈত্রী ও ঐক্যের পথে লইয়া যাইতেছে। ইহা বড় কম লাভ নহে। কিন্তু তাহা হইলেও ইহার নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করিলে আমাদের সর্ব্বনাশ অনিবার্য্য। জাতীয় ভাব ও আদর্শ এই পাশ্চাত্য ভাব বন্যায় না ভাসিয়া যায় সেই দিকে আমাদের সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে।

শিক্ষার এই কুফল সাধ্যমত নিবারণ করিতে ছাত্রগণ কি কি কাজ করিতে পারেন? দেশের সাহিত্য, দর্শন, নীতি ও ধর্ম্মে গভীর আস্থা স্থাপন করিতে হইবে। আধুনিক শিক্ষা ব্যবস্থার যে অভাব বশতঃ আমরা এই শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে অসমর্থ হই তাহা স্বচেষ্টায় পূরণ করিয়া লইতে পারিলে তবেই ইহা সম্ভব হইবে একথা সর্ব্বদা স্মরণ রাখিতে হইবে। বিনয়াদি সদ্‌গুণগুলি মন হইতে যেন অন্তর্হিত হইয়া না যায়, ভগবদ্ভক্তি ও ধর্ম্মবিশ্বাসের উৎস-ধারা শুষ্ক হইয়া মন যেন নিরানন্দ মরুভূমিতে পরিণত না হয়। পশ্চিমের ভোগলালসা ভূতের মত আমাদের পাইয়া বসিয়াছে, ত্যাগের আদর্শ আমরা ভুলিয়া যাইতেছি। সেবার মন্ত্রে এই অপদেবতার হাত হইতে নিস্কৃতি লাভ করিতে হইবে। বিলাসিতা বর্জ্জন করি-

অনাড়ম্বর জীবনযাত্রার পথে সন্তোষকুসুম ফুটাইতে না পারিলে আমাদের মঙ্গল নাই। দেশ যখন ধনে ধান্যে পূর্ণ ছিল, ইহার শিল্প বাণিজ্য যখন জগতের বিস্ময় ছিল, তখনও ত আমাদের পূর্ব্বপুরুষগণ বিলাসিতাকে ঘৃণা করিতেন। আর এখন, এখন ত দারিদ্র্যের চরম সীমায় আমরা উপনীত, কোটি কোটি লোক অনশনে, অর্দ্ধাশনে দিনের পর দিন, বৎসরের পর বৎসর জীবন্মৃত অবস্থায় কাটাইয়া চলিয়াছে,—এখন এই অবস্থায় আড়ম্বর ও বিলাসিতা ঘোর মনুষ্যত্বহীনতার পরিচায়ক বলিয়া গণ্য হইবে। ধূমপান, চাপান প্রভৃতি ছোট ছোট অনিষ্টকর কিংবা অনাবশ্যক অভ্যাসের দাস হওয়াও অবাঞ্ছনীয় নহে কি ?

ছাত্র-সম্মিলনীর এই উদ্দেশ্য সাধনের সঙ্গে বাঙ্গলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতি অনুরাগ বর্দ্ধন যে বিশেষ ভাবে জড়িত হইয়া রহিয়াছে তাহা বলাই বাহুল্য। প্রবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহার একান্ত আবশ্যকতা স্বতঃই উপলব্ধ হইবে। স্বদেশের সহিত ইহাই আমাদের একমাত্র যোগসূত্র। এই ভাষার ও সাহিত্যের বন্ধনকে ছিন্ন বা ক্ষীণ হইতে দিলে চলিবে না। বৈদেশিক ভাষার সাহায্যে যে শিক্ষা লাভ করা যায় তাহার প্রকৃত মূল্য বড় বেশী নহে, এ কথা হৃদয়ঙ্গম করিয়া শিক্ষার এই অসম্পূর্ণতা বা অস্বাভাবিকতা দূরীকরণ কল্পে ছাত্রসম্মিলনী মাতৃভাষায় নানা বিষয়ের আলোচনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সেই সঙ্গে তাঁহাদিগকে ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে বাঙ্গলার বাহিরে বাঙ্গালীর স্বীয় বৈশিষ্ট্য রক্ষার একমাত্র উপায় বাঙ্গলা ভাষার চর্চ্চায় বিশেষ মনোযোগ প্রদর্শন। তাহার জন্য প্রয়োজন একটি ভাল বাঙ্গলা লাইব্রেরি। স্থানীয় শাখা পরিষদের সহিত সংসৃষ্ট একটি ছোট খাটো লাইব্রেরি আছে। কিন্তু যেখানে বাঙ্গালীর সংখ্যা অন্ততঃ পাঁচ হাজার, এবং ধনে মানে বিদ্যায় প্রতিষ্ঠায় তাঁহারা অন্য কোন সম্প্রদায় হইতে ন্যূন নহেন, সেখানে এই ক্ষুদ্র লাইব্রেরিতে কি হইবে ? ছাত্র-সম্মিলনী কি এই অভাব দূর করা তাঁহাদের কর্ত্তব্য মধ্যে গণ্য করিবেন না ?

আরও একটি কাজের ভার বেহারবাসী বাঙ্গালী ছাত্রগণ ইচ্ছা করিলে গ্রহণ করিতে পারেন। বেহার প্রদেশ প্রত্নতত্ত্বানুসন্ধানের একটি প্রধান ক্ষেত্র। বৌদ্ধ ও মুসলমান যুগের ইতিহাসের মালমসলা এত বেশী চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে যে সেই সব উপকরণের অনুসন্ধান ও সম্যক আলোচনা ছাত্রমাত্রেই অবসর বিনোদনের এক অতি প্রকৃষ্ট উপায় বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। বেহার ও বাঙ্গলা বহুকাল একত্র ছিল শুধু তাহাই নয়, প্রাচীনকালে

এই ভাগলপুর বিভাগ—যাহা তখন অঙ্গ নামে খ্যাত ছিল বঙ্গ হইতে সম্পূর্ণ অভিন্ন ছিল। আর এই সহরেরই নিকটবর্ত্তী চম্পানগর বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহে প্রসিদ্ধ। সুতরাং বেহারের ঐতিহাসিক কীর্ত্তিচিহ্ন বাঙ্গালীও তাহার নিজস্ব বলিয়া অনায়াসে মনে করিতে পারে। আর তাহাও যদি না হয় তাহাতেই বা ক্ষতি কি? ভারতের যে কোন স্থানের কীর্ত্তি ও গৌরব বাঙ্গালীরও নহে কি?

বেহারে বাঙ্গালী ছাত্রের কর্ত্তব্য অনেক। আজ যদি যথার্থই তাঁহাদের কর্ম্ম-প্রবৃত্তি জাগিয়া উঠিয়া থাকে তাহা হইলে তাঁহাদের সমস্ত বিক্ষিপ্ত শক্তি কেন্দ্রীভূত করিয়া কিরূপে কার্য্যক্ষেত্রে অগ্রসর হইতে হইবে তাহার পন্থাও তাঁহারা আবিষ্কার করিতে পারেন, এ বিশ্বাস আমাদের আছে। যাঁহারা বলেন, বেহারে বাঙ্গালী ছাত্রের মানসিক অবনতির লক্ষণ দিন দিন স্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে তাঁহাদের সহিত আমি একমত হইতে পারি না। পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙ্গালীছাত্র এখনও অনেক পরীক্ষাতে সর্ব্বোচ্চ স্থান সমূহ অধিকার করিতেছেন, যদিও তাঁহাদের সংখ্যা বোধ হয় সমগ্র ছাত্রসংখ্যার এক-ষষ্ঠাংশের বেশী নহে। গত পরীক্ষাতেই বি, এ অনার্সে দর্শন, গণিত, পদার্থ-বিজ্ঞান ও ইংরাজিতে তাঁহারা প্রথম স্থান দখল করিয়া স্বজাতির মুখোজ্জ্বল করিয়াছেন। আই, এ পরীক্ষাতেও বাঙ্গালীছাত্র সকলের শীর্ষে আপনার স্থান করিয়া লইয়াছেন, এবং আই এস্ সি তে প্রথম বিভাগ উত্তীর্ণ নয় জন ছাত্রের মধ্যে সাত জন বাঙ্গালী। * সুতরাং বাঙ্গালী ছাত্রের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে হতাশ হইবার সময় এখনও উপস্থিত হয় নাই, আর ভগবান করুন তাহা যেন কখনও না আসে। তাঁহারা যদি সরকারি চাকরির মোহ একটু ত্যাগ করিয়া স্বাধীন ভাবে জীবিকার্জ্জনে সচেষ্ট হন, তাহা হইলে এদিকে যেমন বেহারী ভ্রাতাদের সহিত তাঁহাদের মনোমালিন্যের একটা কারণ দূরীভূত হয়, অপরদিকে তেমনই আবার তাঁহারা সাধারণের কার্য্যে অধিকতর মনোনিবেশ করিবার অবসর পান। বেহারে বাঙ্গালীর চাকরির পথে নানা দিক হইতে কাঁটা পড়িতেছে বলিয়া একটা অভিযোগ এখন প্রায়ই শুনিতে পাই। এ অভিযোগ যদি সত্যই হয় তাহা হইলেও

---

* পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে পাস হইতে হইলে শতকরা ৬০ নম্বর রাখিতে হয়। লেখক

আমাদের দুঃখের কারণ কি আছে? চাকরির জন্যই হয় ত অনেক বাঙ্গালী এ সব অঞ্চলে প্রথম আসিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা যদি এখন তাঁহাদের বংশধরগণের সহজ লভ্য না হয় তাহা হইলে কি নিজেদের মন্দ ভাগ্য বলিয়া মনে করিতে হইবে? ভারত গৌরব মনীষী প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙ্গালী ছাত্রগণকে বহুবার যে কথা বলিয়াছেন আমিও আজ তাহারই পুনরাবৃত্তি করিয়া বলি—তোমরা চাকরির মোহে অন্ধ হইয়া আপনাদের প্রকৃত স্বার্থের মূলে কুঠারাঘাত করিও না। ব্যবসাবাণিজ্যের দিকে মন দাও, প্রচুর অর্থোপার্জ্জনের সঙ্গে সঙ্গে দেশেরও অনেক উপকার করিতে পারিবে।

পরিশেষে আমি বলিতে চাই এই যে, শুধু আবেগ, শুধু উদ্দীপনা নয়, আত্মস্থ ও সমাহিত শক্তিই কেবল কোন প্রতিষ্ঠানকে প্রাণময় ও ক্রমোন্নতিশীল করিয়া সিদ্ধির পথে লইয়া যাইতে সমর্থ হয়। উৎসবের উন্মাদনা বা নূতনত্বের মাদকতা যখন মন্দীভূত হইয়া আসে তখন সেই অন্তর্নিহিত প্রাণশক্তি সকলের মধ্যে তাহার গতিবেগ সংক্রামিত করিয়া দেয়, এবং অতঃপর সেই প্রতিষ্ঠানের স্থায়িত্ব ও কার্য্যকরত্ব সম্বন্ধে কাহাকেও বড় ভাবিতে হয় না, কারণ তাহাই তখন সকলকে চালিত করিয়া লইয়া যায়। আমাদের আশা আছে যে, আজ এই শারদোৎসবের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে, আচার্য্য ক্ষিতিমোহনের পৌরোহিত্যে, যাহার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল সেই ছাত্রসম্মিলনীর অভ্যন্তরে এমন শক্তি সঞ্চিত আছে যাহার দুর্ব্বার বেগ সমস্ত বাধাবিপত্তি ভাসাইয়া লইয়া গিয়া ইহাকে চির সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে। আর যদি সাধনা সত্ত্বেও আমরা সিদ্ধির পথে না পৌঁছিতে পারি অথবা যদি আশানুরূপ সফলতা লাভ আমাদের ভাগ্যে না ঘটে, তাহাতেই বা ক্ষোভ কি?

> দুর্ব্বল মোরা, কত ভুল করি, অপূর্ণ সব কাজ,
> নেহারি আপন ক্ষুদ্র ক্ষমতা আপনি যে পাই লাজ,
> তা' ব'লে যা পারি তা'ও করিব না? নিষ্ফল হ'ব ভবে?
> প্রেম-ফুল ফোটে,—ছোট হ'ল ব'লে দিব না কি তাহা সবে?

জীবনের কত পূজা অসমাপ্ত থাকিয়া যায়, কত আশা মুকুলে ঝরিয়া পড়ে, কত আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থতার তপ্ত মরুতে শুখাইয়া যায়; কিন্তু তাহা হইলেও ইহারা জীবনের পথে যে চিহ্ন রাখিয়া যায় তাহা ত সেই সর্ব্ব-নিয়ন্তার চক্ষু এড়ায় না, বিশ্বে অবিনশ্বরভাবে সকলের অজ্ঞাতসারে

তাহার কাজ চলিতে থাকে। এই জন্যই ত ঋষিকল্প কার্লাইল বলিয়াছিলেন—"Fool, knowest thou not that a thought, an action can never die?" 'তাঁহারই বীণাতারে বাজিবে তারা।' যদি এই সম্মিলনী-গঠনের ফলে একটি ছাত্রও স্বার্থের পঙ্কিলতা হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া মনুষ্যত্বের পথে ধাবিত হইতে পারেন, যদি তাঁহার হৃদয়ে মাতৃভাষার প্রতি অনুরাগ এমনই প্রগাঢ়রূপে বর্দ্ধিত হয় যে, বৈদেশিক ভাষায় আত্মীয়বন্ধুকে পত্রলেখাও আত্মসম্মানহানিকর বলিয়া তিনি মনে করেন, যদি একটি ব্যথিতেরও অশ্রু জল তিনি মুছাইতে পারেন, এবং অপরে যদি তাঁহাতে সেবাব্রতের একটা উজ্জ্বল আদর্শ দেখিতে পায়, তাহা হইলেই অদ্যকার এই উৎসব জয়যুক্ত হইবে, সফল হইবে। প্রাণভরা আশা ও আকাঙ্ক্ষা তরুণ হৃদয়ের মাধুর্য্যে ও পবিত্রতায় মণ্ডিত করিয়া আমাদের এই পূতচরিত যুবকগণ কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছেন,—তাঁহাদের সেই আশা ও আকাঙ্ক্ষা—

পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক, পূর্ণ হউক হে ভগবান্!

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

নমস্কার।

—:০:—

কৈশোরে এ কণ্ঠদেশে দিয়াছিলে যে বরণমালা

হে নগেন্দ্রবালা,—

পবিত্র সুরভিটুকু তার

ঘেরিয়া রাখিয়াছিল সর্ব্বাঙ্গ আমার

রক্ষাকবচের সম।

অহরহ মর্ম্মমূলে মম
থাকিয়া সজাগ
তোমার প্রদীপ্ত অনুরাগ
সংসারের কলহ ও কোলাহল-মাঝে
অবিক্ষুব্ধ রাখি হিয়া সাজাইলে অপরূপ সাজে ;
কত শোক, কত দুঃখ কত না দুর্দ্দিন
পুঞ্জীভূত মেঘস্তরে ছেয়ে এসে চিদাকাশ
ঝঞ্ঝাবজ্রে গরজিয়া হইল বিলীন ;
চিরস্থির নীলিমা নির্ম্মল
অন্তরালে ছিল জাগি' আলো-ঝলমল
মাঝে লয়ে অনির্ব্বাণ তব প্রেমশিখা
মধুর চন্দ্রিকা।

যে আলোক-ভাতি
কোথা দিয়া পার করি দুর্দ্দিনের রাতি
এ জীবনে আনিল প্রভাত।
অলক্ষ্যে ধরিয়া মোর হাত
ঘুরাইলে দেশে দেশে ;
ভালবেসে
শিখাইলে কত না কূজন ;
এই প্রাণ মন

একান্ত আমারি ভাবি নিয়োজিনু পরিজন-কাজে,
তুমি সঙ্গোপনে জাগি সে সবার মাঝে
আপনার ইচ্ছামত রচি' খেলাঘর
আমারে আড়ালে ধরি' সংসার করিয়া দিলে পর!

একদিন
বসন্তে নবীন
আয়ত উজ্জ্বল চোখে বিচ্ছুরিয়া জ্যোতিঃস্নিগ্ধ হাসি
কিশোর হৃদয়খানি তুলিলে উদ্ভাসি'
প্রণয়ের প্রথম আলোকে
কোন্ পুণ্যালোকে।
শ্যামাঙ্গিনী, কিশোরীর বেশে
অজ্ঞাত বিদেশ হ'তে অতর্কিতে এসে
এড়াইয়া রূপমুগ্ধ লুব্ধ বন্ধুগণে
অসঙ্কোচে কত খেলা খেলিলে এ বিদেশীর সনে।
নীতি-নিষ্ঠ সেদিনের প্রাণ
গোপন কামনা তব শুনিল হৃদয় দিয়া
পারিল না দিতে প্রতিদান;
তাই তব অভিমানী হিয়া
নির্ম্মল যৌবনখানি মসীলেপে মলিন করিয়া
অকাল-মরণ-কোলে সঁপিল তাহার
সর্ব্ব গ্লানিভার।

সেই দিন হ'তে
ভুবন ভাসায়ে চলা জীবনের স্রোতে
তরঙ্গিত আহ্বান তোমার
বারংবার
কতভাবে কতদিক দিয়া
এ হৃদয় গেল শিহরিয়া
অবশেষে
দেখা দিয়া নব দেহে শঙ্কর-হৃদয়-রমা বেশে
পরিপূর্ণ দ্বাদশ বরষ
আকাশে ভুবনে মোর বিলায়ে পরশ
তিলে তিলে মহাশক্তি করিয়া সঞ্চয়
লভিলে বিজয়।

*

ছিল অহঙ্কার
তোমার সাম্রাজ্যসীমা হইয়া এসেছি, দেবি, পার ;
ভাঙিলে সে ভুল
ক্ষোভে, রোষে, যন্ত্রণায় কাঁদায়ে আকুল ;
দেহ হ'তে দেহান্তরে অয়ি চিত্ত-সঞ্চরণ-শীলা !
ভুলিয়াছিলাম তব লীলা—
তাই
দূর হ'তে শুনাইলে—'নাই, ওরে, কোন ক্ষোভ নাই'-
নিকটে বধূর বেশে ছিলে বসি' উমা,
তারি মাঝে দেখাইলে ভূমা।

নাম ধরে ডাকিলাম তার
উত্তরে ঠেকিল হাতে প্রসারিত পা দু'খানি কার;
বিস্ময়ে দেখিনু পাশে চেয়ে
মুক্তি দিতে দু'চরণে আছ শুয়ে সাজি রুচি মেয়ে!
অকস্মাৎ চিত্ত ভেদি বাহিরিয়া এল কোন্ বাণী
অর্থ তার আজও নাহি জানি!
শুধা'ল আকাশবাণী—'বল্ দেখি কে?'
ঘুমঘোরে উত্তরিনু 'তুমি';
শুনিলাম শেষ রাতে সুখ-সুপ্তা তনয়ার মুখে
অপরূপ প্রতিধ্বনি—'আমি', 'আমি', 'আমি'।

খুলে ফেলে শিশুকন্যা-সাজ
অনাদি উষার সঙ্গে মিশাইয়া গেলি যদি আজ
আদিকবি অয়ি মহেশ্বরি!
বালার্ক-কিরণ-পাতে বিশ্ব-তমঃ বিদূরিত করি'
আয় তবে সুমধুর হাসি'—
দাঁড়া এ মানস পদ্মে অধরে ধরিয়া মাগো ভুবনমাতানো তোর বাঁশী,
সব কথা সব গান ফুরায়েছে মোর—
ভরে দে এ কণ্ঠখানি, ধ্বনি দিয়ে বাণী দিয়ে তোর।

শ্রী বিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

চিররহস্য সন্ধানে।

——:*:——

(পুনরানুবৃত্তি)

ষোড়শ পরিচ্ছেদ।

ফেরাজ ইতিমধ্যে আপন কক্ষে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত। যাহা-কিছু শুনিয়াছিল তৎসম্বন্ধে ধীর-চিন্তার অবসর পাইবে বলিয়াই সে নির্জ্জনে থাকিতে চাহিয়াছিল,—কিন্তু ঐ ঈপ্সিত বিজনতা-লাভের অব্যাহত পরেই তাহার এত ঘুম আসিতে লাগিল যে বসিয়া থাকা নিতান্তই অসম্ভব হইয়া উঠিল; শয্যার আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সে গভীর তন্দ্রাচ্ছন্ন হইল এবং প্রতিমুহূর্ত্তেই গভীর হইতে গভীরতর নিদ্রায় ডুবিয়া যাইতে লাগিল। কোথা দিয়া যে অপরাহ্ণ অতীত হইয়া গেল, কখন যে সূর্য্যদেবকে অস্তাচলশায়ী করিয়া সান্ধ্য-ছায়া আত্ম বিস্তার করিল তাহার কিছুই সে জানিতে পারিল না; অবশেষে যখন ঘনায়মান আকাশে প্রথম সান্ধ্যতারকাটী ফুটিয়া উঠিল, তখন সচকিতে জাগরিত হইয়া সে ভাবিল—'তাইতো এত দেরী!'

আপনার উপর বিরক্ত হইয়া বিমূঢ়-বিস্ময়ে সে শয্যা হইতে লাফাইয়া উঠিল,—তাহার মনে হইল, এতক্ষণ সান্ধ্যভোজনের সময় উত্তীর্ণ হইয়া গিয়াছে এবং এল র‍্যামি হয়তো তাহার প্রতীক্ষা করিতেছেন। ত্বরিত চরণে পাঠ-কক্ষে প্রবেশ করিয়া সে দেখিল, ভ্রাতা অনৈক ভদ্রলোকের সহিত কথা কহিতেছেন; সে ভদ্রলোক লর্ড মেলথর্প ছাড়া অন্য কেহই নহে। উচ্চ প্রফুল্লকণ্ঠে ইনি কথা কহিতেছিলেন এবং এল র‍্যামির চির-বিষণ্ণ প্রশান্ত-মধুর কণ্ঠস্বরের পার্শ্বে তাহা যেন আদৌই মানাইতেছিল না।

ব্যস্তসমস্তভাবে ফেরাজ প্রবেশ করিল,—তাহার শিশির-স্বচ্ছ নয়নদুটী তখনও তন্দ্রা-জড়িমা-মাখা এবং অযত্ন-বিন্যস্ত ঘনকৃষ্ণ কেশগুচ্ছ গুচ্ছে গুচ্ছে ললাটের উপর বিক্ষিপ্ত; প্রশংসমান নেত্রে মুহূর্ত্তকাল তাহার দিকে চাহিয়া থাকার পর লর্ড মেলথর্প জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে এল র‍্যামির দিকে ফিরিলেন।

"আমার কনিষ্ঠ সহোদর ফেরাজ" তৎক্ষণাৎ পরিচয় প্রদান করিয়া এল র‍্যামি ভ্রাতাকে সম্বোধন করিলেন—"ফেরাজ, ইনিই লর্ড মেলথর্প; অনেকবার এঁর কথা তুমি আমার মুখে শুনেছো।"

ফেরাজ বিনীত অভিবাদন করিল এবং লর্ড মেলথর্প সহাস্যে তাহার করগ্রহণ করিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে বলিলেন—"এই প্রিয়-দর্শন যুবকটীকে দেখে, আমার আরব্য উপন্যাসের কথা মনে পড়্‌ছে এল র‍্যামি! এ-যেন সেই ঘটনা-বিচিত্র-জীবন সুপুরুষ নায়কটী, না? যুবরাজ আমেদ, কিম্বা কোনো রাজপুত্র, কিম্বা সেই ধরণেরই কিছু,—কেমন, তাই নয়?"

এল র‍্যামি গম্ভীরভাবে একটু হাসিলেন।

"প্রাচ্য-পরিচ্ছদই তোমার এ রকম ধারণার কারণ বোধ হয়"—তিনি বলিলেন—"বাড়ীতে ফেরাজ এই পোষাকই প'রে থাকে, কারণ এদেশী পোষাকের চেয়ে এতে তা'র স্বচ্ছন্দ চলা-ফেরার পক্ষে সুবিধে হয়, আর বাস্তবিক পক্ষে দেখ্‌তে গেলে, তোমাদের পোষাক নিতান্তই বিশ্রী; ইংরাজ শ্রেষ্ঠ মানব জাতির মধ্যে অন্যতম বটে, কিন্তু তা'দের পরিচ্ছদ নির্ব্বাচনের প্রশংসা করা চলে না।"

"ঠিক বলেছো—আমাদের সব পোষাকগুলোই যেন এক ছাঁচের আর সে ছাঁচটাও ভয়ানক!"—ফেরাজকে আর একবার ভাল করিয়া দেখিবার জন্য 'লর্ড' মহাশয় এই সময় চসমাখানি চোখে আঁটিয়া লইলেন এবং ভাবিলেন—"তোফা চেহারাখানা তো!—মজ্‌লিসে একটা হুলস্থূল পড়ে যাবে নিশ্চয়—লেডি মেলথর্পের কাছে খুবই উপভোগ্য মনে হবে।" প্রকাশ্যে বলিলেন—"আস্‌ছে মঙ্গলবারে সন্ধ্যার সময় তোমার এই ভাইটীকে আমাদের ওদিকে নিয়ে গেলে ভাল হয়,—আমার স্ত্রী তা হ'লে বিশেষ সন্তুষ্ট হবেন।"

"ফেরাজ কোনোকালেই সমাজে যায় না"—এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"অবশ্য তুমি যদি পেড়াপীড়ি কর"—

"না, না, পেড়াপীড়ি কখনই আমি করিনে"—সহাস্যে মেলথর্প জানাইলেন—"পেড়াপীড়ি করবার লোক তুমি, আমি নই। তবে যদি নিয়ে যাও তা হ'লে আমি বিশেষ অনুগৃহীত হব, এই পর্য্যন্ত।"

"শুন্‌ছো ফেরাজ"—স প্রশ্ন দৃষ্টিতে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"মঙ্গলবার সন্ধ্যার সময় লর্ড মেলথর্প তোমাকে একটা অভ্যর্থনা সম্মিলনীতে নিমন্ত্রণ কর্‌ছেন। কি বল, যাবে ?"

অর্দ্ধ সন্দেহে অর্দ্ধ সহাস্যে ফেরাজ একবার মেলথর্পের ও একবার ভ্রাতার মুখের দিকে চাহিল ; পরে কহিল—"যাব।"

"বেশ, তা' হ'লে আমরা আশায় থাকবো" বলিয়া মেলথর্প উঠিলেন এবং বিদায় গ্রহণে উদ্যত হইয়া এল র‍্যামিকে বলিলেন—"হ্যাঁ ভাল কথা, লেডি মেলথর্প বিশেষ ক'রে বলে দিয়েছেন যা'তে তুমি প্রাচ্য-পোষাকে সেখানে হাজির হও।"

"তাঁর হুকুম তামিল কর্‌তে চেষ্টা কর্‌বো"—ঈষৎ ব্যঙ্গহাস্য-সহ তিনি উত্তর করিলেন ; উদ্দিষ্টা মহিলাটীর খেয়ালী-স্বভাব তিনি বিশেষ অবগত ছিলেন।

"তোমার ছোট ভাইটীও আশা করি"—

"নিশ্চয়ই !" বলিয়া পাণিপীড়ন করতঃ লর্ড মহাশয়কে তিনি বিদায় দিলেন এবং দ্বার দেখাইয়া দিবার জন্য ফেরাজকে অনুমতি করিলেন। মেলথর্প চলিয়া গেলে ফেরাজ বালকোচিত আগ্রহ ও প্রফুল্লতা-সহকারে পুনঃ প্রবেশ করিল।

"আচ্ছা, ইংলণ্ডের এই অভ্যর্থনা-সম্মিলনীটা কি রকম ?" সে জিজ্ঞাসা করিল—"আর আমাকেই বা উনি যেতে বললেন কেন ?"

"তা' আমি কেমন ক'রে বল্‌বো !" শুষ্ক ভাষায় এল র‍্যামি উত্তর দিলেন—"কিন্তু তুমি যেতে চাও কেন ?"

"জীবন যে কি রকম তা' দেখ্‌তে ইচ্ছে হয় বলে"—

" 'জীবন' দেখ্‌তে ইচ্ছে হয় !" কতকটা ঘৃণাভরে এল র‍্যামি বলিলেন—

"কি বল্‌ছো তুমি ? জীবন কি তুমি দেখ্‌তে পাওনি ?"

"না !" তৎক্ষণাৎ ফেরাজ উত্তর করিল—"নরনারী দেখ্‌তে পাই বটে, কিন্তু কি ভাবে তা'রা জীবন-যাপন করে কিম্বা কি-কাজ করে তা'র কিছুই আমি জানিনে।"

"পরস্পরের ওপর প্রভুত্ব-বিস্তার লালসা আর পরস্পরের ক্ষতি করবার চেষ্টা নিয়েই তাদের জীবন"—এল র‍্যামি বলিলেন—"কেমন ক'রে নিজেকে জাহির করা যেতে পারে

সেই চিন্তাতেই তাঁদের সকল শক্তি নিয়ন্ত্রিত ; এই তাদের জীবন-যাপন-প্রণালী, এই তাদের কর্ত্তব্য। এরকম জীবন অবশ্য ই মহৎ বা সম্মানার্হ নয়, তবে এইটেই শুধু তা'রা চায়। কর্জ্জ মেলথর্পের অভ্যর্থনা-সভায় আমার কথার উদাহরণ দেখ্‌তে পাবে ; দেখবে, হীরে মুক্তোয় মোড়া স্ত্রীলোকগুলো অলঙ্কারের অহঙ্কারে নিরাভরণাদের উপর পেখম ধরে আছে,—যাঁরা প্রকৃত ভদ্র অথচ কপালদোষে টাকার মানুষ হ'তে পারেন নি, তাঁদের ফেলে, কতো লাখপতিদের নিয়েই সকলে ব্যস্ত ; আরও দেখ্‌বে—পরের সুবিধের জন্যে কেউই নিজের কড়াক্রান্তিটী পর্য্যন্ত ছাড়্‌তে রাজী নয়। সকলের মুখেই সেই কতকগুলো একঘেয়ে পুরোণো মন্তব্য, রসিকতার ব্যভিচার, সহৃদয়তার অভাব, প্রীতির দুর্ভিক্ষ, আর অতবড় সৌখীন-সম্মিলনীর প্রত্যেক সভ্যটীর মধ্যে ই কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞানহীনতা ছাড়া অন্য বড়-কিছুই লক্ষিত হবে না। একেই যদি 'জীবন' বল্‌তে চাও তবে সে জীবন অবশ্যই দেখ্‌তে পাবে। এই সমস্ত ব্যাপার থেকে অনিষ্ট যা' সৃষ্টি হ'চ্ছে, তাও বড় অল্প নয়—কিন্তু যাক্ সে কথা, এখন খাওয়া যাগ্‌গে চল, সময় কেটে যাচ্ছে—রাত্রে আমাকে অনেক কাজ কর্‌তে হবে।"

যথোচিত ক্ষিপ্রতার সহিত ফেরাজ তাহার নিয়মিত কর্ত্তব্যে মনোনিবেশ করিল—চক্ষের নিমেষে আহার্য্য প্রস্তুত ও পরিবেশন করা হইল এবং আহারান্তে ভ্রাতৃদ্বয় ক্ষণকাল নীরবে বসিয়া রহিলেন। এল র‍্যামি এই সময় সাগ্রহ কৌতূহলের সহিত ফেরাজকে লক্ষ্য করিতে-ছিলেন, কারণ আজ তিনি জীবনে এই প্রথম অনুভব করিতেছিলেন যে যুবকের সমস্ত চিন্তার উপর তাঁহার আর যথেষ্ট প্রভুত্ব নাই। এখনও কি লিলিথের নাম তাহার মনে আছে ? ফেরাজের বৈকালিক নিদ্রাকালে এল র‍্যামি ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে লিলিথ সম্বন্ধীয় চিন্তার রেখাটী পর্য্যন্ত যেন তাহার স্মৃতি হইতে বিলুপ্ত হয়,—এক্ষণে সন্দেহের কথা এই যে, তাঁহার ঐ ইচ্ছাশক্তি কি বাস্তবিকই জয়লাভ করিতে পারিয়াছে ? তিনি, এল র‍্যামি, তাহা বলিতে পারেন না—এখনও নয়—কিন্তু জিজ্ঞাসিতে প্রশ্নটী তিনি মনোমধ্যে বারংবার আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। ঠিক এই সময় ফেরাজ নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিল এবং অঙ্গরাখার পকেট হইতে একখানি হস্তলিখিত কেতাব বাহির করিয়া এল র‍্যামির উদ্দেশে বলিল :—

"কাল রাত্রে একটা কবিতা লিখেছি, শুন্‌বে ? কেমন করে' যে ভাবটা আমার মাথায় এসেছিল তা'র কিছুই জানিনে—বোধ হয়, তখন স্বপ্ন দেখ্‌ছিলাম—"

"পড় ;" এলর‍্যামি বলিলেন—"যদি কবিতা হয় তা' হ'লে অবশ্যই তা'র মূল বোঝাতে পারা যাবে না ; কেননা, যদি তা' বোঝাতে পারতে তা' হ'লে সেটা গদ্যই হ'য়ে দাঁড়াতো।"

"লাইনগুলো যে খুব ভাল এমন কথা বলবার সাহস আমার নেই"—সন্দিগ্ধভাবে ফেরাজ বলিতে লাগিল—"তবে, আমার মধ্যে যে-বিশেষ একটী চিন্তা আছে এটা তা'রই যথাযথ প্রকাশ। বলতে পারিনে, এর জন্যে আমি তোমার কাছে ঋণী কি আমার প্রকৃতির কাছে,—মধ্যে মধ্যে আমি স্বপ্ন দেখি—কেবল প্রেম-স্বপ্নই নয়, কিন্তু যশের—সে-সব আশ্চর্য্য গৌরব-স্মৃতি আমার কাছে প্রায় স্পষ্ট, তবু বেশ আয়ত্ত করে' উঠ্‌তে পারিনে। কেমন একটা অবসাদ, কেমন একটা অসারতা যেন আমাকে পীড়া দিতে থাকে......সমস্ত ব্যাপারটা এম্‌নিই অস্পষ্ট, চকিত আর চঞ্চল! তবু, প্রেম যদি তোমার কথামত অলীক কল্পনাই হয় তা' হ'লে যশ বলে' একটা জিনিষও নিশ্চয়ই আছে ?"

"আছে"—এল্‌র‍্যামির চক্ষু উদ্দীপ্ত হইয়া পুনরায় অন্ধকার হইয়া গেল—"আছে ইহলোকের করতালিতে, কিন্তু তা'র পরিসমাপ্তি পরলোকের অবজ্ঞায়। যাক্—পড়!"

ফেরাজ প্রস্তুত হইল। "এখন এটাকে আমি 'ভাগ্য-তারকা,' ব'লেই পরিচিত করেছি"—সে জানাইল। অতঃপর তাহার সুনিয়ন্ত্রিত, সুস্পষ্ট, ও মধুস্রাবী কণ্ঠস্বর নিম্নলিখিত পংক্তিগুলির উপর দিয়া যেন সঙ্গীত তরঙ্গ ছুটাইয়া চলিল :—

"মন্থর সুমৃদুল তরঙ্গ কলতান সমুদ্র বেলাভূমি বালুকা 'পরে
সমীরণে ভাসমান নাবিকের কণ্ঠের উদাস মাধুরীভরা গান,—
পবন-স্বনন-শ্বাস সকরুণ সুমধুর স্পন্দিত হৃদিপুর যাহার স্বরে—
চিরদিন চিরদিন অজানা স্বপনলোকে উধাও ভাসিয়া চলে প্রাণ ;—
তাদেরি মিলিত ক্ষীণ ধ্বনিখানি শুনি যেন তন্দ্রাধূসর দূর অসীম নীলে
বিজন-বিরলে বসি' একা যবে আনমনে যুগল নয়ন মেলি' চাই ;
একটী উজল তারা, স্বচ্ছ মুকুতা-সম ছুলিয়া ছুলিয়া ঐ আঁধার-কূলে
নিঙাড়িয়া হিয়াখানি রজত-কিরণ-ধারা বরষিছে দেখিবারে পাই।
পাণ্ডুর নভোনীলে অকম্প অবিচল দীপ্তি-মধুর ওগো প্রেমের তারা!
ভক্তি ও অপরিসীম শান্তির গরিমায় আঁখি তব সদা ঢলঢল ?

অর্দ্ধভ্রূকুটীভরা তোমার চাহনি-তলে ক্ষুব্ধ বারিধি দোলে দু'কূল-হারা
পবন-সলিল-জ্বালা—ফেনায়িত-লহরীর লীলাভরে নিয়ত চপল ;
শীর্ষে মানিক-জ্বালা সে-ঢেউ আঁধারে লুটে, যেমতি মহান্ ভাব, হারায়ে দিশা,
কামনা-কলুষ-রাশি পরশে টুটিয়া গিয়া শতকোটী অপরূপ রূপে,
আপন জড়িমা-মাখা রহস্য-ঘোরে রচি' কুহেলি-কালিমা-ঘন মোহিনী নিশা,
আপনি জড়িত তাহে ডুবিয়া মরিতে চাহে ঘনঘোর আঁধিয়ার কূপে !"

"বারিধির কথা তোমার মনে এল কেন ?" বাধা দিয়া এবর‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।
স্বপ্ন-জড়িম-নয়নে ফেরাজ ভ্রাতার মুখপানে চাহিল। পরে বলিল :—
"তা' জানিনে।"
"যাক্—পড়ে যাও !"
ফেরাজ আরম্ভ করিল—

"দুঃখ-বারতা মম এনেছি বহন করি', ধর নভঃনিবাসিনী কিরণ-বালা !
শোন্ অয়ি কৃপাময়ি, শোন্ তব ভক্তের সকরুণ মরমের বাণী ;
বারেক চাহ এ মুখে স্নিগ্ধ নয়ন তুলি', পাঠাও একটী রেখা আশীষ-ঢালা,
আশ্বাস-ভরা-বুকে পুলকে উথলি' ভুলি জীবনের জ্বালা আর গ্লানি।
স্বরগ-মরত-মাঝে আকাশ-দোলায় বসি' দুলিছ যে জ্যোতিঃরূপা ধেয়ান-রতা,
তোমারি নয়ন-তল বিমল-আলোক-পাতে উজল জনম-কাল মোর—
তুমি জানো তুমি জানো আমার ললাট-লিপি, জানো মম শুভাশুভ যা'-কিছু কথা,
বল দেবি, বল, বল, এইবেলা শুনে লই,—ঘুচে যাক্ সংশয়-ঘোর।

"ওগো চির-জাগরিতা ! যাহার নয়ন পাতে দিকে দিকে ভেঙে পড়ে নীরদ মালা,—
কহ মোরে, কহ এই মর আবরণে ঘেরা দীন হীন জনম দুখীরে,
এই চির-চঞ্চল সংগ্রামে-হীনবল খাঁচার পাখীরে কহ, কোন্ সে জ্বালা
আঁধার জীবন 'কালে' 'ব্যাপ্তি'র মায়াজালে ধরিয়া রেখেছে তারে ঘিরে ?
অবিরাম অবিরাম আর্ত্তরোদন তা'র মুক্তি চাহিয়া ফিরে পাগল-পারা
অসীম-অতল-তলে কোথা সে তলায়ে যায়,—সাড়া তো দেয়না কেহ কৈ !

খুঁজে তো লয় নি প্রাণ এ দীন জগতখান,—সে তো জানিত না, দেবি, কেমনধারা
গৌরবে পরিপূর অপর-জগত, যেথা নাহি কিছু ভালবাসা বৈ !

*   *   *   *   *

"কি কঠোর কি দারুণ জীবন ধারণ—যদি, যাহারে জীবন বলি 'জীবন' তাহা।—
শোকে আর শ্রমে গড়া এ বরষ-কতিপয়, এই গোণা গুটিকত দিন ;—
কমল সে কাঁটাভরা, হাসি আঁখিজল-মাখা, 'আহা'র শিয়রে যেথা জাগেরে 'হা-হা !'
মানের কাঙাল ঋষি, সাধু শঠতার দাস, প্রেম—সে, লালসা-লেপে হীন !
শিল্পীর যশোভাতি—কতটুকু দাম তা'র ? মুগ্ধ গায়ক ভোর কিসের গানে ?
কবির পিপাসা-ফল মানসীর রূপাভাস বৃথাই সে কবিরে ক্ষেপায় ;
পূর্ণ কিছুই নহে, শেষেরও যে শেষ রহে ; ধূমায়িত চিতানল সে-অবসানে
—স্বপন মধুরতম—তাহারো শেষের শেষে ব্যঙ্গের হাসি হেসে যায় !"

"এ সব কথা তোমার বিশ্বাস সঙ্গত নয়"—অন্বেষু দৃষ্টিতে চাহিয়া এল র‍্যামি বলিলেন।

দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিয়া ফেরাজ বলিল—"না, তা ঠিক নয়, তবু এ-চিন্তা প্রায়ই আমার মনে জাগে।"

"এ রকম চিন্তা তোমার উপযোগীই নয়"—এল র‍্যামি বলিলেন—"ব্রহ্মাণ্ডে কিছুই 'অসম্পূর্ণ' অবস্থায় পড়ে নেই—বিশেষতঃ সৃষ্টির পরিসমাপ্তি অসম্ভব।"

"সম্ভবতঃ তা' ঠিক,—কিন্তু এত হয়তো সম্ভব হ'তে পারে যে পরিসমাপ্তি একটা আছে ; তবে সেটা আমাদের কল্পনা বা ধারণার অতীত। তুমি অবশ্যই স্বীকার করবে যে, কোনো কোনো জিনিস এমনি অসম্পূর্ণ অবস্থায় পড়ে আছে যা' বাস্তবিকই শোচনীয় ; দৃষ্টান্ত স্বরূপ শেলীর 'Fragments' কীট্‌সের 'Hyperion' বা স্কুবার্টের 'Unfinished symphony'র উল্লেখ করা যেতে পারে—"

"অসম্পূর্ণ হাঁ, এখানে বটে ;" এল র‍্যামি বলিলেন—"কিন্তু, দিন যেমন দিন বা রাত যেমন রাত, ঠিক তেমনিই নিঃসন্দিগ্ধরূপে অন্য কোনোখানে তা'রা সম্পূর্ণ হ'য়েছে। কিছুই এখানে হারায় না,—এমন কি মানব-মস্তিষ্কের লঘুতম চিন্তা-কণিকাটী পর্য্যন্তও না ; কিছুই

ধ্বংস বা বিস্মৃত হয় না,—অলস কথাটী পর্য্যন্ত না। আমরা বিস্মৃত হই, কিন্তু প্রকৃতির শক্তিবেগ চির-স্মৃতি-প্রখর। সমস্তই লিপিবদ্ধ হ’চ্ছে, সমস্তরই হিসাব থেকে যাচ্ছে—এমন বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে তাদের সংখ্যাপাত হ’য়ে চলেছে যে শেষের একচুলও ভুল হ’তে পারবে না।”

“তুমি কি বস্তুবিকই এ-রকম মনে কর? সত্য সত্যই ঐরূপ বিশ্বাস কর?”—আগ্রহ-দীপ্ত চক্ষে চাহিয়া ফেরাজ জিজ্ঞাসা করিল।

“দৃঢ়-বিশ্বাস করি”—এল র‍্যামি বলিলেন—“এ সত্য প্রকৃতির মজ্জাগত, জোর করে’ সে এ-সত্যকে সর্ব্বত্র কাজে লাগায়! কিন্তু আর তোমার কবিতার কিছু বাকী নেই নাকি?”

“আছে—” বলিয়া ফেরাজ পড়িল:—

কত ওই না যাতনায় দেহ আর আত্মায় বুঝিতেছি একযোগে আমরা দোঁহে
বুঝেছেছি চিরদিন পৃথক পথের লাগি’ বিভিন্ন-বাসনা-আকুল,—
দেহ সে মরণ-পথে আপনা সঁপিয়া সুখী গহন-তিমিরে-ঢাকা মাটীর মোহে,
আত্মা প্রসারি পাখা উর্দ্ধে উড়িতে চাহে ছাড়ি ধরা কারা-সমতুল;
দুর্ব্বার গতিবেগ উচ্চাশা সুমহান নব নব লোকে তা’র আসন ধ্রুব,
জটীল এ অবরোধ রহস্য-বাধা টুটি’ মহাতেজে ছুটে চলে তাই—
বিদ্রোহ-ধ্বজা তা’র উড়ে সে-জীবন-পার যে-জীবন মাঝে নাহি কিছুই শুভ,
মঙ্গল এতটুক্ ঘেঁষিতে পারেনা যেথা, দুঃখ-মলিন সব ঠাঁই।”

“মর্ম্ম-বাসনা মম শোনো ওগো আরাধিতা! শোনো মম জীবনের জনম-তারা!
চঞ্চল মেঘ-দলে অ’য় চির-অচপলা! চাও, এ আনন-পানে চাও;
দাও গো দাও গো মোরে আমার জনম-দাবী,—আত্ম-সাধন-বল সবার বাড়া,
এই জনতার ভিড় দু’ধারে সরায়ে দিয়া বায় তেজে ছুটিব উধাও;

করি যেন অনুভব—প্রবল কিরণ তব পলকে পলকে মোরে তুলিছে টানি'
চরম-সীমানা সেই মহা-মরমের পানে, যেথানে জাগেন ভগবান,—
জ্যোতিঃর স্বপন অয়ি! পুরাও শপথ তব, এ-অভিলষিত-বর আমারে দানি'—
করিতেই হবে, দেবি, বিজয়-মুকুট মম ধূলি-লুণ্ঠিত শিরে দান!

"ঝঞ্ঝা-মথিত মহা সাগরের উপকূলে বাতাসে-মিলায়ে-যাওয়া কুয়াশা-সম
অথবা পটের কোলে যাদু-জাল-বিরচিত আলোক-স্বপন-ছবি-প্রায়,
এই তরুলতাময় বিশালা-ধরণীখান যেন গো বিলীন হয় নয়নে মম
মেঘের প্রাসাদ সম টুটিয়া ছুটিয়া গিয়া, যায় যেন ভেসে চলে যায়!
প্রমাণিত অমরতা গৌরবে গরীয়ান আমি যে এ নশ্বর পৃথিবী 'পরি,
নীচু-সুরে-বাঁধা-ঘনে যে-গরিমা ধরে নাকো পারি তাহা বুকে বহিবারে;—
তাই সব বাণী হ'তে বিপুল-প্রকাশ-ভরা ভাষাহারা নীরবতা হৃদয়ে ধরি'
হে প্রেম-তারকা! আমি তোমারেই অনুসরি' ভাসাইনু তরী পারাবারে!"

ফেরাজ থা'মল। এল র‍্যামি, যিনি করতলে কপোল রক্ষা করিয়া নিবিষ্ট চিত্তে আবৃত্তি শুনিতেছিলেন, এক্ষণে চক্ষু তুলিয়া মিশ্র-কৌতূহল ও অনুকম্পা-ভরে ভ্রাতাকে দেখিতে লাগিলেন।

"কবিতার ছন্দটী বেশ" পরিশেষে তিনি বলিলেন—"সঙ্গীত-অংশটাও সুন্দর, কিন্তু এর মধ্যে কতকটা জবরদস্তি প্রকাশ পেয়েছে—

"প্রমাণিত অমরতা গৌরবে গরীয়ান
আমি যে এ নশ্বর পৃথিবী 'পরি—'... অর্থ কি এই 'প্রমাণিত' অমরতার? কোথায় তোমার প্রমাণ?"

"প্রমাণ আমার আধ্যাত্ম-চেতনায় আছে;" ধীরকণ্ঠে ফেরাজ উত্তর করিল—"কিন্তু তা' এই সীমাবদ্ধ মানব ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এমন সমস্ত আবেগ বা সত্য আছে যা' ভাষায় ব্যক্ত করা যায় না। ভগবানের অস্তিত্ব সত্য—কিন্তু তাঁকে বর্ণনা করা বা প্রকাশ করা আমাদের সাধ্যাতীত।"

এল র‍্যামি নীরবে শুনিলেন ; তাঁহার ভ্রূযুগল ঈষৎ কুঞ্চিত হইল।

"আজকাল তুমি বড় বেশী ভাব্‌তে আরম্ভ করেছো"—চেয়ার হইতে উঠিতে উঠিতে এল র‍্যামি বলিলেন—"আত্ম-বিশ্লেষণ ক'রো না ফেরাজ,...এ-চেষ্টা পরিণত বয়সের প্রকৃতি, কিন্তু এতে ক'রে অবিশ্বাস আর দুঃখ বাড়ে। তোমার কবিতা অবশ্যই চমৎকার, কিন্তু এর সুরটা বড় বিষণ্ণ ; এর চেয়ে তোমার সেই প্রফুল্লতা-মাখা 'নক্ষত্রের' গানই আমার ভাল লাগে। জ্ঞান সুখের জন্যে,—সুখী হওয়ার অর্থ জ্ঞানী হওয়া"—

এই সময় বহির্দ্বারে উচ্চ-আঘাত-শব্দ তাঁহার বক্তব্যে বাধা দিল। ফেরাজ তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া গেল, এবং অনতিপরেই একখানা 'টেলিগ্রাম' হস্তে ফিরিয়া আসিল। এল র‍্যামি উহার আবরণ উন্মোচন করিয়া পাঠ করিলেন,—তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়ে বিস্ফারিত এবং মুখমণ্ডল পাণ্ডুর হইয়া উঠিল।

"কাল রাত্রে তিনি এখানে আস্‌বেন ; অস্ফুট স্বরে তিনি বলিলেন—"কাল রাত্রে ! তিনি—সেই ভক্তশ্রেষ্ঠ—এখানে, কাল রাত্রে ! কেন ? আমার সঙ্গে তাঁর কি দরকার ?"

তাঁহার মুখে যেন কেমন একপ্রকার হতবুদ্ধির ভাব প্রকাশ পাইল। সপ্রশ্ন-দৃষ্টিতে চাহিয়া ফেরাজ জিজ্ঞাসা করিল :—

"কোনো কিছু দুঃসংবাদ নাকি ? কে আসছেন ?"

সামলাইয়া লইয়া, এল র‍্যামি টেলিগ্রাম-খানা ভাঁজ-করতঃ পকেটে রাখিলেন ; পরে বলিলেন—"বিশেষ কেউ নয় ; একজন গরীব পরিব্রাজক কোন একটা বিশেষ উদ্দেশ্যে বেড়িয়ে বেড়াচ্ছেন—তিনি কাল রাত্রে আমার আতিথ্য গ্রহণ করবেন।"

অবাক-বিস্ময়ে ফেরাজ দাঁড়াইয়া রহিল—অশ্রদ্ধার হাসিতে তাহার নয়ন দুটি ভরিয়া উঠিল।

"কেন আমাকে প্রতারণা কর্‌তে চাও ভাই ?" নম্রকণ্ঠে সে বলিল—"একি তোমার সম্পূর্ণতা-লাভের অন্যতম উপায় ? আমার কাছ থেকে সত্য-গোপন করায় লাভ কি ?— আমি বিশ্বাস-ঘাতক নই। যদি আমার অনুমাণ মিথ্যা না হয়, তবে এই 'গরীব পরিব্রাজকটী' সাইপীরিয়র ধর্ম্ম-সংঘের গুরুদেব ছাড়া অন্য কেহই নয় ; কোনো একটী বিশেষ নিয়ম লঙ্ঘন

করায় এ-দল থেকে তুমি বিতাড়িত হয়েছিলে। এ সব কথা আমি জানলে এমনই কি ক্ষতি হবে তোমার ?"

এল র‍্যামির বাহু মুষ্টিবদ্ধ হইল এবং চক্ষে সেই ভয়াবহ দৃষ্টি প্রতিভাত হইল যাহা ফেরাজের নিকট চিরদিনই ভীতি-কারণ ; কিন্তু তাঁহার কণ্ঠস্বরে বিন্দুমাত্রও উত্তেজনা প্রকাশ পাইল না।

"কে তোমাকে বলেছে ?" ধীরকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"যে-সময় তুমি আমাকে সাইপ্রাস দ্বীপে পাঠাও, সেই সময়ই ঐ সংঘের একজন একথা বলেছিলেন। তোমার বিপুল জ্ঞান, অসীম শক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা প্রভৃতির উল্লেখ করে', এই বলে' তিনি আক্ষেপ প্রকাশ করেছিলেন যে, একটা সামান্য ব্যাপারে তোমার গর্ব্বকে ক্ষুণ্ন করতে চাও না বলে' তুমি তাঁদের জগদ্ব্যাপী মহদনুষ্ঠানের সংস্পর্শচ্যুত হয়েছিলে। এর বেশী অন্য কিছুই তিনি বলেন নি, আমিও আর কিছু জানিনে।"

"যথেষ্ট জেনেছো ;—" শান্ত স্বরে এল র‍্যামি বলিলেন, "যদি বা আমি তাঁদের কার্য্য-প্রণালীর সংস্পর্শ-চ্যুত হয়ে থাকি তাতে আমার উপকারই হয়েছে কেন না এমন কতকগুলি বিষয়ে আমি অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পেরেছি যা তাঁদের আয়ত্বের অতীত। আর,—দুঃখিত হচ্ছি যে একেবারেই তোমার কাছে সত্য প্রকাশ করি নি,—কাল যিনি আসছেন সত্যই তিনি তাদের প্রধান নেতা। নিশ্চয়ই",—জয়গর্ব্বে ঈষৎ হাসিয়া তিনি বলিলেন—"নিশ্চয়ই তিনি এমন কোনো অভিনব জ্ঞানানুসন্ধান করছেন যা শুধু আমিই তাঁকে দিতে পারি।"

"আমার ধারণা ছিল"—ভয়ে ভয়ে ফেরাজ জানাইল—"যে তিনি একজন দৈব-ক্ষমতা-সম্পন্ন পুরুষ।"

"যদি দৈবতা থাকেন !"—ব্যঙ্গভরে এল র‍্যামি বলিলেন ; "তিনি বিশ্বাস-বাদী—বিশ্বাসই তাঁর বল, কল্পনাই তাঁর সম্বল,—এমনি কতকগুলো সহজ উপায়ে যে আশ্চর্য্য শক্তি তিনি লাভ করেছেন সে-সম্বন্ধে অবশ্য কোনো কথাই নেই ; কিন্তু আমি,—আমার বিশ্বাস নেই !—আমি চাই প্রমাণ ; আমার কাজ মানা নয়, জানা,—তা' ছাড়া আমার শক্তিও তাঁরই মত বিপুল ; যদিও বিভিন্ন উপায়ে তা' লাভ করেছি।"

ফেরাজ আর কিছু না বলিয়া পিয়ানো লইয়া বসিল এবং চাবীগুলির উপর যথারীতি অঙ্গুলি-সঞ্চালন-করতঃ তাহার সেই স্বপ্ন-সঙ্গীত হিল্লোলিত করিয়া তুলিতে লাগিল;—কোথায় কোন্ সুদূর পর্ব্বত-গাত্রে যেন নির্ঝর ঝরিয়া পড়িতেছে, তাহারই দূরাগত প্রতি-ধ্বনিই এই সুরে কম্পমান!

ক্ষণকাল এল র‍্যামি সে-সঙ্গীত শুনিলেন,—পরে ঘড়ি খুলিয়া সময় দেখিলেন—বিলম্ব হইয়া যাইতেছে।

"আচ্ছা, তুমি বাজাও ফেরাজ"—গাত্রোত্থান করিয়া তিনি বলিলেন—"আজ রাত্রে আমার আর-কিছু দরকার হবে না। এখন আমি কাজে চল্লাম।"

বাজাইতে বাজাইতে ফেরাজ সম্মতি-সূচক গ্রীবাভঙ্গী করিল। ধীরে ধীরে এল র‍্যামি দ্বার উন্মোচন করিলেন এবং বাহিরে গিয়া পুনর্ব্বার রুদ্ধ করতঃ উপরে উঠিয়া গেলেন।

নিঃসঙ্গ হইবামাত্র, ফেরাজ তাহার বাদ্যযন্ত্রের পা-দানিটার উপর চাপ দিয়া স্বর-লহরী-লীলায় কক্ষখানিকে প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিল,—পর্দ্দায় পর্দ্দায় উঠিয়া পড়িয়া, সঙ্গীতধারা যেন আর্ত্তনাদ-শব্দে তাহার কোমলাঙ্গুলি-তলে লুটাইয়া আসিল; ঠিক এই সময়ে প্রফুল্ল-কোমল স্বরে সে বলিয়া উঠিল—

"ভুলে যাব! না, কখনই না! কেউ কখনো ফুলকে ভুল্‌তে পারে? পাখীকে ভুল্‌তে পারে? চাঁদের আলো, কি মধুর গানকে ভুল্‌তে পারে? পৃথিবীটা কি এতই সুন্দর যে আমার স্মৃতি থেকে সুন্দরতম জিনিসটীকেও মুছে ফেলা যায়? নিশ্চয়ই না! হাজার হাজার জিনিস ভুল্‌তে পারি,—কিন্তু স্মৃতির ওপর যতই অত্যাচার হোক, যতই স্বপ্নলীলা চলুক, যতই বিপর্য্যস্ত হই, সে-নামটী আমি কখনই ভুলবো না—সে নাম—সেই—"

হঠাৎ সে থামিয়া গেল,—যন্ত্রণা, বিস্ময় ও সচেষ্টভাব তাহার বিমূঢ়-দৃষ্টিতলে যুগপৎ প্রকাশ পাইল,—হাতদুটো পিয়ানোর চাবীগুলোর উপর লুটাইয়া পড়িয়া একটা বিকট শব্দ সৃষ্টি করিল, এবং সন্ত্রাস-বিস্ময়ে আপনার চতুর্দ্দিকে সে ক্যাল্ ক্যাল্ করিয়া চাহিতে লাগিল।

"কি নাম! কি নাম!"—আকুল-কণ্ঠে সে বলিল—"কি-এক ফুলের নাম—কোন্-এক অপ্সরীর নাম—যত নাম এ পর্য্যন্ত শুনেছি তাদের সকলের চেয়ে মিষ্টি নাম! আঃ, এ কি

হ'ল! কেন মনে আস্‌ছে না?—হঠাৎ কি পাগল হ'য়েছি যে সেই নামটাই উচ্চারণ কর্‌তে পারছি নে? সেই—সেই……হা ভগবান! হা অদৃষ্ট! ভুলে গেছি!"

চেয়ার হইতে সবেগে উঠিয়া পড়িয়া ফেরাজ মুহূর্ত্তকাল রুদ্ধ-আক্রোশে অবাক্ হইয়া রহিল; অতঃপর, পুনরায় বসিয়া পড়িয়া, উভয়হস্তে মুখাবৃত করিল; এল রামির অদম্য ইচ্ছাশক্তির প্রাবল্য-দর্শনে তাহার সর্ব্বাঙ্গ শিহরিয়া শিহরিয়া উঠিতে লাগিল। যে-নাম স্মরণ করিয়া রাখা সে সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় মনে করিয়াছিল, সে-নাম, সেই প্রিয়তম নামটী এত সহজে সে কেমন করিয়া তাহার স্মৃতি হইতে কাড়িয়া লইল!　　ক্রমশঃ

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

অশ্রু-কণা!*

তবে কেন আর!
মুছে ফেল অশ্রু, কবি, অনিত্য ক্ষণিক হাহাকার।
কালের কুলিশাঘাতে জ্বলিয়া উঠিছে যে অনল,
সাধ্য কি নির্ব্বাণে তাহা বিসর্জ্জিয়া বিন্দু অশ্রুজল!
দহিবে এ শোক-বহ্নি বহু যুগ-যুগান্তর ধরে,
এ অভাব-অনুতাপ রয়ে যাবে অন্তরে অন্তরে।
হিত-নিষ্ঠ, হিত-ব্রত, হিতের সুপূর্ণ অবতার,
ত্রিদিবের কাম্য-নিধি, মর্ত্ত্যবাস নহে যোগ্য তাঁর!

* লেপ্টন্যাণ্ট মহারাজকুমার হিতেন্দ্রনারায়ণ মহোদয়ের স্বর্গারোহণ উপলক্ষে উৎসৃষ্ট।

পূত আত্মা পুণ্য-ধামে মহোল্লাসে করেছে গমন
হিমাচল-পাদপীঠে নর-দেহ করিয়া বর্জ্জন !

* * *

আত্মার মঙ্গল তাঁর গাও আজ গভীর মল্লারে—
অমর-চরিত্র-গাথা বিঘোষিয়া দিগন্তের পারে।
শৌর্য্য বীর্য্য ধৈর্য্য-গীতি গেয়ে যাও বান্ধব-মহলে,
দয়া দান দাক্ষিণ্যের পুণ্য-কীর্ত্তি দরিদ্রের দলে।
চিরকৌমার্য্যের গীতে মুগ্ধ কর ব্রহ্মচারিগণে,
ক্ষমার বেহাগ-কণ্ঠে কৃতজ্ঞতা দাও শত্রু-মনে।
রাজ-সৌধে স্তুতি গাও সাজাইয়া বিচিত্র সম্ভার,
দরিদ্র-কুটীরে গাও বিসর্জ্জিয়া ভক্তি-অর্ঘ্য-ধার !
নির্ভীকতা গেয়ে যাও স্ফীত-বক্ষঃ সমর-প্রান্তরে,
অব্যর্থ-সন্ধান গাও তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি মৃগয়া-কান্তারে।
ন্যায়ের কঠোর মূর্ত্তি, কর্ত্তব্যের পূর্ণ-অবতার,
গেয়ে যাও বর-কান্তি অনঙ্গ-ভঙ্গিম সুকুমার।
মন্ত্রণায় বাচস্পতি, সভ্য-ভব্য বয়োবৃদ্ধ-দলে,
বালচপলতা গাও ক্রীড়ামঞ্চে, বালক-মণ্ডলে।
স্রষ্টার অপূর্ব্ব দান একাধারে সদ্‌গুণের ডালা,
উপেক্ষিয়া মর্ত্ত্যধাম মুক্তিমার্গ করিলেন আলা !
কোটীকণ্ঠে মুক্ততানে গাও পূত-আত্মার মঙ্গল ;
এ শোকের বিনিময় নহে তুচ্ছ কণা অশ্রুজল !

শ্রীজীবনকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায়।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
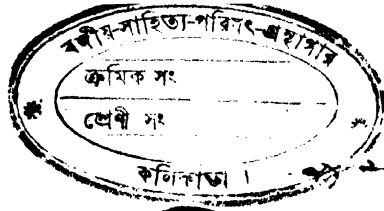
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৫ম বর্ষ। } পৌষ, ১৩২৭ সাল। { ১ম খণ্ড, ২য় সংখ্যা।

মেঘের দেশ।

এসেছি মেঘের দেশে

মেঘ রৌদ্র খেলে হেসে

লুকোচুরী খেলা,

মেঘ কাঁদে, রৌদ্র হাসে,

ইন্দ্রধনু পরকাশে

আনন্দের মেলা,

গিরিশির আলো করে
যুগল মুরতি ধরে
সুষমা ছড়ায়,
বিবিধ বরণ ছটা
নব জলধরঘটা
শৈলঅঙ্গে ভায়,
আঁখির উপর দিয়া
দামিনী ছুটিয়া গিয়া
দাঁড়ায় সমুখে,
চঞ্চল শরীর তার
ঝলসিয়া চারিধার
নৃত্য করে সুখে।
গুরু গুরু গরজন
মৃদুমন্দ বরষণ,
ভীমরুদ্ররব
নাহিক, মৃদঙ্গ তানে
জলদ গম্ভীর গানে
জাগি উঠে সব,
দ্রবিত তুষার ধার
রজতের ঝরণার
মাধুরী তরল,
শৈলেশের শ্যাম অঙ্গে
খেলা করে নানা রঙ্গে
স্নিগ্ধ শুভ্র জল।

ললিত কাকলী তার
থামে নাক একবার
মৃদুল মধুর,
সুপ্তি আসে নেত্রভরি
স্বপনের হার পরি—
পূরবীর সুর,

রাত্রি দিন ঝিল্লী গায়
দেখিতে পাই না তায়
শুধু শুনি গান,
বিহগের কাল স্বর
তাহে নিশি নিরন্তর
পূর্ণ করে প্রাণ,

তন্দ্রা আসে, ভাঙ্গি যায়
কত নিশা অনিদ্রায়
কাটি গেল ঘোরে,
পরি শাটী নীলাম্বরী
আসে নাক বিভাবরী—
আলোকের দোরে,

দীপ্তি রহে সারারাতি
নিভে না নিশীথবাতি
ছায়া ঢাকি দিয়া,
ছায়া পথে নীহারিকা
জ্বালায় তারার শিখা
গগন ছাইয়া,
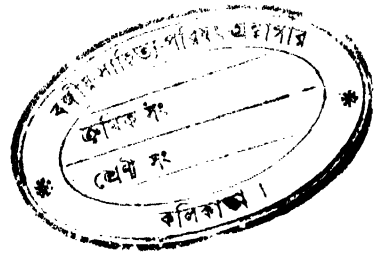
রজনীর ক্ষীণ প্রাণ
ক্ষণ মাত্রে অবসান,
দীর্ঘতর দিবা,
প্রকৃতির ছায়াবাজী
তরুলতা পত্রে সাজি
ভাসমান কিবা।

সরস ধরণীচিত
বৃক্ষ চির-কুসুমিত
বারিদের নীরে,
আসিয়া মেঘের দেশে
জলদ সায়রে ভেসে
দিন গেল ধীরে,

আবার চলিনু ফিরি
স্মৃতি যেথা আছে ঘিরি
অতীতেরে তুলি,
সেথায় আমার ঘর,
থাকি তাহে পূর্ব্বাপর
দুঃখজ্বালা ভুলি।

(ত্রিধারা) শ্রীপ্রসন্নময়ী দেবী।

প্রিয়তমা।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ।

মার্টিথ ভবনে যাত্রার জন্য শোন্ ওয়ার্থের দ্বারে দুইখানি অশ্বযান সজ্জিত হইয়া দাঁড়াইয়া ছিল। ব্যারণের বৃহৎ শকটে বিপুলকায় তেজস্বী অশ্বদ্বয় অধীর ভাবে বল্গা দংশন করিতে করিতে সবেগে চরণ তাড়নায় চঞ্চল, আর হপমার্শেলের ক্ষুদ্র বেরুচ্‌খানির শান্ত ঘোটকটি স্থির ভাবে দাঁড়াইয়া চালকের ইঙ্গিতের প্রতীক্ষা করিতেছিল।

অল্পক্ষণ পরেই,—ভৃত্যগণ বৃদ্ধ মার্শেলের আসন সিঁড়ি বহিয়া নামাইয়া আনিল। আজ তাঁহার শরীর অপেক্ষাকৃত সুস্থ ছিল, বাতের বেদনা অনেক কম; ইচ্ছা করিলে এটুকু তিনি চলিয়া আসিতে পারিতেন, কিন্তু এই স্বল্প লব্ধ শক্তিটুকু ডচেসের বাড়ীর উৎসবসভায় ব্যবহার করিবার জন্য গাড়ীর নিকট পর্য্যন্ত আসন চালাইতে আদেশ দিলেন।

সহসা অনেকগুলি লোকের পদশব্দে চমকিয়া ব্যারণের অশ্ব দুটি আরও লাফাইল! সেই শব্দে বিরক্ত ভাবে মার্শেল বলিয়া উঠিলেন, "কি ভয়ানক জন্তু!" ঠিক্ সেই সময়েই তাঁহার পাশ দিয়া কে একজন লোক ঝড়েরর মত বেগে বাহির হইয়া গেল। বিস্মিত— উত্যক্ত মার্শেল বলিলেন,—"ও কে? ও কে গেল? তোমরা উহাকে দেখিলে কি? ও সেই পাজি ডামার্ড নয়?"

সভয়ে ও বিময়ে ভৃত্য জানাইল, সেই বটে।

"কি আশ্চর্য্য! তুমি ঠিক বলিতে পার কি যে ও সেই হতভাগা ডামার্ড?"

"হাঁ প্রভু, উহাকে আমি পূর্ব্বেই চাকদের ঘরে খাইতে দেখিয়াছি।"

এমন সময় সজ্জিত বেশী ব্যারণ সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহাকে দেখিয়া কর্কশ উগ্রস্বরে হপ্‌মার্শেল বলিলেন, "রাওয়েল, তাহার স্পর্দ্ধা দেখিয়াছ? সে এই বাড়ী ঢুকিয়া আমার চাকরদের সহিত খাইয়া গেল? সে জানে না—"

বাধা দিয়া র‍্যাওয়েল্ বলিলেন "কে সে, কাহার কথা বলিতেছেন ?"

"সেই মালীটা, সেই ছোটলোক-গুণ্ডা ডামার্ড। তার দুঃসাহস্ দেখ দেখি।"

"ওঃ !" ভ্রুকুঞ্চিত করিয়া ব্যারণ বলিলেন, "সে উস্কার শাসন হইতে আমারই মাঝে কতকগুলা চিঠি আনিয়াছিল; কিন্তু সে আবার আপনার সম্মুখে আসিতে গেল কেন? নির্ব্বোধ !"

"উস্কার শাসন হইতে—তোমার চিঠি, তা সে পাইল কোথায় ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া ব্যারণ বলিলেন, "সে সেইখানেই থাকে কাকা।"

"ঐ ডামার্ড ? সেখানে থাকে ! কেন ?"

"সেখানে একটা কাজ দিয়াছি তাহাকে। গরীব,—বড় দুঃখে পড়িয়াছিল;—ক্ষমা চাহিয়া কাঁদাকাটি করিতে লাগিল—"

"তাই তুমি উহার সমস্ত দোষের কথা ভুলিয়া গেলে;— চমৎকার ব্যাপার ত !"

বিনীত ভাবে র‍্যাওয়েল্ বলিলেন, "দোষ, হাঁ! কিন্তু সে ঘটনাটায় আমাদেরও কিছু দোষ ছিল কাকা, তার প্রতি অন্যায় করা হয়,— সে সদ্বংশীয়—"

"রাখিয়া রাখিয়া দাও বংশ, পূরা ডাকাত—খুনে লোক !—ও কেন আমার বাড়ী ঢুকিল,—কার হুকুমে ?"

এবার ব্যারণও উত্তেজিত ভাবে বলিলেন, "সকল কথাই ত বলিলাম, এখনও বুঝিতেছেন না যে আমার কথামতই এখানে আসিয়াছিল।"

"বটে,—তাইত। এ বাড়ীর মালিক যে তুমিই—তাহা আমার মনে থাকেনা কেন ছাই। তা থাক্ আজি ত ঢুকিল কিন্তু ইহার পর একটা ব্যবস্থার প্রয়োজন হইয়াছে বুঝিতেছি।—"

ব্যারণ আর কথা কহিলেন না, গম্ভীর মুখে অন্য দিকে চাহিয়া রহিলেন। ভ্রাতুষ্পুত্রের এই নীরবতাও মার্শেলের সহ্য হইল না, তাঁহার প্রতি রুষ্ট দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "তা দাঁড়াইয়া কেন, তুমি আগেই যাওনা; আমার গাড়ীর পিছে পিছে যে তোমার ঐ ঘোড়া দুইটা টগ্‌বগ্‌ করিয়া লাফাইতে থাকিবে, সে আমি সহ্য করিতে পারিব না।"

"হাঁ এই যাই, লিয়েন এখনও আসিতেছে না কেন ?—কাকা, ততক্ষণে আপনি গাড়ীতে উঠুন না, আমার হয় ত একটু বিলম্ব হইতে পারে ততক্ষণে আপনি পৌছিয়া যাইবেন।"

"ও—আজ বুঝি তিনিও সঙ্গে যাইবেন তোমার ? ভাল, তবে আমি আগেই যাই।"

মার্শেলের গাড়ী চলিয়া যাইতেই লিয়েন নামিয়া আসিল। পিতৃব্যের সহিত কথান্তরে ব্যারণের মুখ অপ্রসন্ন ছিল, সহসা পত্নীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই, মেঘমুক্ত আকাশে সূর্য্য কিরণ ফুটিয়া উঠিলে ধরণীর অঙ্গে যেমন সজীব আনন্দরাগ ছড়াইয়া যায় তেমনি তাঁহার মুখখানি যেন নবীন আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। লিয়েন আজ প্রথম তাঁহার প্রদত্ত সেই বিবাহের পোষাক ও উপহৃত হীরকহার ধারণ করিয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে আরও হীরক মুক্তা ঝলমল্ করিতেছে। সুবর্ণাভ প্রচুর কেশজাল সুবিন্যস্ত হইয়া তাহার সুন্দর মুখখানিকে একটি সুকুমার ভঙ্গি দিয়াছে। শুভ্র বসন ও অলঙ্কারে আজ তাহাকে যেন নবোদিত সূর্য্যালোক সম্মুখিনী তুষার কন্যার ন্যায় অপূর্ব্ব দেখাইতেছিল। তাহার মুখ তখনও ম্লান ; ব্যারণ প্রশ্ন করিলেন, "তোমার কি কোন অসুখ করিয়াছে লিয়েন ?"

"না, কিন্তু তোমায় আমার কিছু বলিবার ছিল রাওয়েল, এখন আর সময় নাই—না ?"

সাদরে পত্নীর বাহু ধরিয়া ব্যারণ উত্তর দিলেন, "কি কথা, আসিয়া শুনিলে হইবে না কি ? আর যে সময় নাই,—ঘড়ি দেখিয়াছ ত ?"

"হাঁ, চল তবে।"

"চল, সেখানে আমাদের দোর হইবে না।"

তাঁহারা যখন মন্টিথ ভবনে আসিলেন, তাহার পূর্ব্বেই সহরের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীরা প্রায় সকলেই আসিয়া পৌছিয়াছেন। আজ সে প্রাসাদের সজ্জাও বিচিত্র। শোনা গেল গীত বাদ্যাদির পর ভোজের ব্যাপারও আছে।

প্রকাণ্ড মজলিসের একপার্শ্বে বাদক ও গায়ক সম্প্রদায় বাদ্য যন্ত্রাদি সহ উপবিষ্ট, অপর পার্শ্বে মূল্যবান আসনে, বক্ষস্থলে নক্ষত্রচিহ্নধারী অভিজাত ধনীগণ বসিয়া ছিলেন। উজ্জ্বল আলোকপূর্ণ উৎসব গৃহটির একপার্শ্বে নৃত্যশালা, অপর অংশে নৃত্যক্লান্ত তপ্তমস্তিষ্ক নর-নারীগণের বিনোদনার্থ লতাপুষ্পাচ্ছন্ন শীতল স্নিগ্ধ কুঞ্জগৃহগুলি আজ বিশেষ ভাবে সজ্জিত।

সভায় উপস্থিত সকলের, বিশেষ স্ত্রীলোকদের প্রধান আলোচনার বস্তু ছিলেন, ব্যারণ মাইনো ও তাঁহার নবীনা পত্নী। আজ কয়মাস হইতে নগরের মধ্যে এই প্রসঙ্গটিই সর্ব্ব সাধারণের অত্যন্ত উপভোগ্য ও কৌতুককর হইয়াছিল। আজও তাঁহার বিলম্ব উপলক্ষে এমন ট্রেচেনবার্গ দুহিতার কাহিনী আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। সুন্দরী কামিনীরা কল্পনার অনুমান মুখে মুখে তাহার একটী মূর্ত্তিও স্থির করিয়া বসিয়াছেন। রক্তহীন বিবর্ণ বর্ণ, মলিন মুখ ও হীনশ্রেণীর দাসীদের ন্যায় অবিন্যস্ত রক্তবর্ণ কেশ, পরিধানের পারিপাট্যহীন অল্পমূল্য কৃষ্ণবসন, ভীরু নির্ব্বোধ প্রকৃতি, পদস্থ ব্যক্তিদের নিকট বাক্যালাপে বিমূঢ় অসামর্থতা ইত্যাকার নানাবিধ ম্লানবর্ণে তাহার আকৃতি চিত্রিত হইতেছিল। এমন সময় পরিচারক ডাকিয়া বলিল, "ব্যারণ ও ব্যারণেস মাইনো!"

অভ্যর্থনাকারিণী কাউণ্ট মহিলা অগ্রসর হইয়া গেলেন ও তৎক্ষণাৎ দ্বার খুলিয়া সপত্নিক ব্যারণ সকলের সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

এই কি সেই? সভাস্থ নরনারী ব্যগ্র দৃষ্টিতে চাহিয়াছিলেন, জুলিয়েট বা আল্‌রিক কখনও এ সকল সভায় যোগ দিতেন না, নগরে যাতায়াতও অল্পই ছিল; ইতি পূর্ব্বে কেহ তাহাকে চিনিতও না। আজ সহসা এই মহিমান্বিতা রূপসীকে দেখিয়া প্রথমে কেহই বিশ্বাস করিতে পারিতেছিলেন না যে এই সেই বিশ্বনিন্দিতা ট্রেচেনবার্গ তনয়া। ক্ষণকাল সকলে মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় নির্ব্বাক ভাবে চাহিয়া থাকিলেন, কিন্তু তাহার পরই শতকণ্ঠে গুঞ্জনধ্বনি উঠিল, "ব্যারণেস্ মাইনো? কি আশ্চর্য্য—ইনিই ব্যারণেস্ মাইনো!"

প্রকাশ্য সভায় অগণ্য জনতার সম্মুখে, তেমন বিস্ময় জনক বস্তুরূপে স্ত্রীকে উপস্থিত করিয়া ব্যারণ যেন ক্ষুব্ধ হইলেন, ব্যথিত ভাবে লিয়েনের প্রতি চাহিয়া মৃদু ভাবে তাহার অঙ্গুলিতে একটু টিপ্ দিতে, লিয়েন মুখ তুলিয়া তাঁহার দিকে চাহিল। না, তাহাতে লজ্জা ক্ষোভ বা ভীরুতার কোন চিহ্ন নাই;—ব্যারণের প্রসন্ন হইল।

তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাদের ঘিরিয়া অভিযোগ আরম্ভ করিলেন যে,—"এতদিন এ রত্নকে খণির গর্ভে লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল কেন?"

ব্যারণ হাসিয়া হাসিয়া তাঁহাদের বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, কিন্তু কেহ সে কথা শুনিল না, তাঁহার অবিবেচনার জন্য চারিদিক হইতে বাক্যবর্ষণ চলিতে লাগিল। ব্যারণ

একটু বিব্রত হইয়াছিলেন, কিন্তু সেই উচ্ছ্বসিত বচনরাশির মধ্যে যে অধিকাংশই লিয়েনের সৌন্দর্য্যের প্রশংসা কল্লোল, তাহা অনুভব করিয়া পরিতৃপ্ত হইলেন।

সেই কোলাহলের মধ্যেই একপার্শ্বের দ্বারের পরদা সরাইয়া পুত্রদ্বয়কে লইয়া সসহচরী ডচেস্ সভাগৃহে প্রবেশ করিলেন। সমবেত সকলে আনন্দধ্বনি করিয়া তাঁহার অভিনন্দন করিল। আজ ডচেসেরও সজ্জার আড়ম্বরের সীমা নাই, ঐশ্বর্য্যের সে জ্বালাময় সৌন্দর্য্যে সকলের চক্ষু ঝলসিয়া গেল। লিয়েনও বিস্মিত-মোহে সে রূপ দেখিতেছিল, সহসা পাশ হইতে স্বামীর কণ্ঠে অস্ফুট স্বর শুনিয়া সে মুখ তুলিল। ব্যারণের মুখ রক্তাভ, চক্ষুর্দ্বয় হইতে জ্বালার সহিত আবেগের মুগ্ধতাও প্রকাশ পাইতেছে। তিনি মৃদুস্বরে বলিতেছেন, "সেই পোষাক—সেই ফুল—সেই সব! যেদিন সে আমার হইবে বলিয়া শপথ করে,—সেই দিনের মত—"

লিয়েন চমকিত ব্যথিত কণ্ঠে বলিয়া উঠিল, "কি—রাওয়েল, কি?"

নয়ন ফিরাইয়া পত্নীর সেই সরল মুখখানির বিষাদ চিহ্ন লক্ষ্য করিতেই ব্যারণ আত্মস্থ হইলেন, বরং আজিকার এই বিপুল আয়োজন যে তাঁহাকেই প্রলুব্ধ করিবার জন্য তাহা ভাবিয়া ঘৃণায় তাঁহার ওষ্ঠ কম্পিত হইল।

ডচেসের দৃষ্টিও সর্ব্বপ্রথমে তাঁহাদের দিকেই পড়িয়াছিল। কিন্তু বাঞ্ছিত প্রিয়জনের পার্শ্বে দণ্ডায়মানা প্রতিদ্বন্দিনীর আনন্দোজ্জ্বল বদনকান্তি দেখিবামাত্র,—তাঁহার গণ্ডস্থলের রক্তরাগ মিলাইয়া শাকবর্ণ ধারল। হস্তের মণিমুক্তাখচিত হস্তিদন্তের ক্ষুদ্র ব্যাজনীখানি মুষ্টিচ্যুত হইয়া খসিয়া পড়িতেই কুড়াইয়া দিবার জন্য নিকটের সম্ভ্রান্ত যুবকেরা ছুটিয়া গেল।

ডচেসের সে বিহ্বলতা লিয়েনও দেখিল; সে ব্যাকুলতাভরে স্বামীর বাহু চাপিয়া অধীর-কণ্ঠে ডাকিল, "রাওয়েল?" সে স্বর বেদনার সহিত আশ্রয়ভিক্ষু দীন প্রেমের করুণ প্রার্থনা ফুটিয়া,—ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; ত্রস্ত ভাবে রাওয়েল্ স্ত্রীর প্রতি চাহিতেই তাঁহারও অন্তরে সে ব্যথিত প্রণয়ের আঘাত-বেদনা বাজিল। এই বিশ্বস্ত হৃদয়া একান্ত নির্ভরপরায়ণা পতিব্রতা নারী, ইহার প্রাণে কি এতটুকু ব্যথা দেওয়া যায়? তিনি সাদরে তাহাকে আরও নিকটে টানিয়া সস্নেহ-নয়নে চাহিয়া বলিলেন, "কেন লিয়েন?" সে মুগ্ধদৃষ্টির আত্মবিস্মৃত গভীর প্রেম প্রকাশ ভঙ্গিতে লিয়েনের অন্তরের সমস্ত দ্বিধা, সমস্ত বেদনা নিমেষে মিলাইয়া

গেল, সে যেন জগতের সমস্ত কথা, স্থান কাল ভুলিয়া, নিমেষহারা নয়নে স্বামীর মুখের পানেই চাহিয়া থাকিল।

ব্যারণ সে ভাবটি প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিলেও ডচেস্ ক্রমশঃ নিকটস্থ হইতেছেন দেখিয়া অতি মৃদুস্বরে বলিলেন, "ডচেস্ আসিতেছেন, তাঁহার সহিত আলাপ কর লিয়েন।"

সমাগত সকলেই মাননীয়া রাজমহিলাকে সসম্মানে অভিবাদন করিতেছিলেন তিনিও সহাস্য বদনে তাঁহাদের প্রত্যভিবাদন করিয়া মধুর বচনে সন্তুষ্ট করিতেছিলেন। হপ্ মার্শেলের নিকট আসিয়া তাঁহাকে হস্ত প্রদান করিয়া, তিনি যে অসুস্থতা স্বত্বেও আজ তাঁহার বাটি আসিয়াছেন, সে জন্য আনন্দ প্রকাশ করিলেন। পরে ব্যারণদম্পতির সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিলেন," এই যে ব্যারণেস্ মাইনো! প্রিয় বন্ধু, তোমায় দেখিয়া আমি যে কতখানি সুখী হইলাম—তাহা আর কি বলিব। তোমার অনেক চিন্তা—অনেক কাজ, সে সব ছাড়িয়া তুমি যে আমার এ অসার উৎসবে যোগ দিতে আসিবে, তাহা আমার ধারণায় আসে নাই;—তোমায় পৃথক নিমন্ত্রণ পত্র সেই জন্যই পাঠাই নাই, ক্ষমা করিবে ত?"

জুলিয়েন একথার কি উত্তর দিবে স্থির করিতে পারিতেছে না বুঝিয়া মধুর হাসির সহিত ব্যারণই বলিলেন. "আমি ও আমার স্ত্রী কি ভিন্ন? আমার নিমন্ত্রণেই তাহার নিমন্ত্রণ হইয়া গিয়াছে; আপনি মনে কিছু করিবেন না। দেখুন না সেই হিসাবে ইঁহাকে সঙ্গে আনিতে কিছুই কুণ্ঠা বোধ করি নাই। লিয়েন শীঘ্রই অন্যত্র যাইবে, তাই আপনার সহিত সাক্ষাত করিতে আসিয়াছে।"

এই কথার সঙ্গে সঙ্গে ডচেসের কঠোর মুখভঙ্গি পলকের মধ্যে আনন্দে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল, স্খলিত কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "সত্য নাকি? প্রিয়তম লেডি, এত শীঘ্র তুমি আমাদের ছাড়িয়া যাইবে? রুডিস্ ডর্ফেই ফিরিবে বোধ হয়?"

লিয়েন স্বামীর মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু তিনি কিছু বলিতেছেন না দেখিয়া অর্দ্ধোচ্চারিত ভাবে বলিল, "হাঁ, আমি একবার—হয় ত সেখানে—যাইতে ইচ্ছা করিয়া—মনে করিয়াছিলাম"—

বাধা দিয়া হাসির সুরে ডচেস্ বলিলেন, "আরে না না, আমাদের রুগ্ন বৃদ্ধ বন্ধুকে একলা রাখিয়া এখনি যাইবে কোথায় ? ব্যারণও ত বিদেশ যাইতেছেন,—না যাইনো ?"

গম্ভীর বদনে ব্যারণ উত্তর দিলেন, "হঁা, যদিও কাকাকে একাকী রাখা উচিত নয়, তবু আমার নিজের ও লিয়োর জন্য—লিয়েন্‌কে লইয়া এখন কিছু দিন উস্কার শাসনে গিয়া থাকিব মনে করিয়াছি। অবশ্য তাহাতে কাকার বিশেষ কোন অসুবিধা হইবে না।"

আবার আঘাত! ডচেসের হাতের পাখা আবার পড়িয়া গেল। ব্যারণ তাহা তুলিয়া তাঁহার হস্তে দিলে ধৈর্য্যের সহিত গ্রহণ করিলেন কিন্তু তখন তাঁহার মুখখানি একেবারে রক্তশূন্য হইয়া গিয়াছে। অতি কষ্টে মনোভাব গোপন করিয়া—দন্তে অধর চাপিতে চাপিতে তিনি সম্মুখ হইতে চলিয়া গেলেন।

ডচেস প্রস্থান করিতে, ব্যারণের বন্ধুগণ অগ্রসর হইয়া প্রশ্ন করিলেন, "এই মাত্র যে কথা হইল তাহা কি সত্য ?" উত্তরে রাওয়েল বলিলেন, "কেন অসম্ভব কথা কি হইল ? স্ত্রীকে ছাড়িয়া আমি একাই সেখানে থাকিব, ইহাই আশ্চর্য্য নয় কি ?"

প্রীত হইয়া বন্ধু বলিলেন, "আমরা ত তাহাই জানি, তবে তুমিই উল্টা পথে চলিতেছিলে !"

হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন "এইবার আমি সোজা—তোমাদের পথেই চলিব ভাই !"

গীতবাদ্য আরম্ভ হইল, সম্মুখের ভদ্র ব্যক্তিরা আপন আপন আসন লইয়া সঙ্গীতে মনোনিবেশ করিলেন। দূরে একখানি ক্ষুদ্র টেবিলের পার্শ্বে হপ্ মার্শেল ও তাঁহার প্রিয় বন্ধু কোর্ট চ্যাপ্লিন বসিয়াছিলেন; তাঁহাদের মুখ দেখিলে স্পষ্ট বোঝা যায় যে গীতবাদ্যের প্রতি তাঁহারা মোটেই মনোযোগ দিতেছেন না, সম্মুখে আহার্য্য, তাহাতেও কাহারো আস্থা নাই। দুজনে নিবিষ্টভাবে মৃদু ভাষায় কি আলাপ করিতেছিলেন।

লিয়েনও গান শুনিতেছিল না, দূরস্থ সেই শত্রুদ্বয়ের প্রতিহিংসাপ্রখর মুখভাব দেখিয়া তাহার মন আতঙ্কে ভরিয়া গিয়াছে। পাদ্রীর জ্বলন্ত দৃষ্টি মাঝে মাঝে উন্নত হইয়া যেন তাহাকে দগ্ধ করিতে চাহিতেছিল, মার্শেলের গ্রীবাভঙ্গির লক্ষণ ক্রুর হিংসার দ্বারা চালিত, ডচেসের দৃষ্টিও তাহার স্মরণে আসিয়া বুকের মধ্যে শিহরণ জাগাইতেছিল। এতগুলি ভীষণ

শত্রুর কবল হইতে সে আপনাকে বাঁচাইতে পারিবে কি? কিন্তু তখনি তাহার বাহুতে ব্যারণের বাহুর স্পর্শ অনুভব করিয়া ব্যাকুলভাবে তাঁহার দিকে মুখ তুলিল। ব্যারণ তখন একচিত্তে গীত শুনিতেছিলেন, কিন্তু তাঁহার সেই মহিমাদৃপ্ত মুখ দেখিয়াই লিয়েনের সমস্ত ভয় দূর হইয়া গেল; সে বুঝিল—এই বলিষ্ঠ বাহুদুটির আশ্রয় পাইলে পৃথিবীতে আর তাহার কোন বিপদ্ থাকিতে পারে না। তাহার কম্পিত হস্ত স্ববলে স্বামীর হাত চাপিয়া ধরিতেই ব্যারণ ফিরিয়া বলিলেন, "কি?"—

"কিছু না—অমনি!" ব্যারণ সেই হস্তখানিকে সাদরে দুইহাতের মধ্যে চাপিয়া আবার সঙ্গীতে মন দিলেন। গায়িকার গীতশক্তি অসাধারণ, সভাস্থ সকলে মন্ত্রমুগ্ধ হইয়া শুনিতে ছিলেন।

এমন সময় একজন আসিয়া জানাইল, নৃত্য আরম্ভ হইয়াছে, ডচেস্ ব্যারণের সহিত নৃত্য করিতে ইচ্ছুক হইয়া তাঁহাকে আহ্বান করিয়াছেন।

এই অতর্কিত সংবাদে ব্যারণ চমকিয়া উঠিলেন, কিন্তু তৎক্ষণাৎ উঠিয়া বলিলেন, "তুমি খবর দাও আমি এখনি যাইতেছি।" পরে লিয়েনের কানে কানে বলিলেন, "কোন ভয় নাই লিয়েন, তবু তুমি সাবধানে থাকিয়ো—আমি শীঘ্রই ফিরিতেছি।"

প্রায় অর্দ্ধ ঘণ্টা নৃত্য চলিল। বহু লোকের নিঃশ্বাসবায়ুতপ্ত নাট্যগৃহের উষ্ণতায় ও নৃত্য-শ্রমে ডচেস শ্রান্তি বোধ করাতে রাওয়েল তাঁহাকে পার্শ্ববর্ত্তী লতাগৃহে লইয়া গেলেন। সেখানে শ্রান্তিনাশক পানীয় পান করিয়া তিনি একটু সুস্থ হইলে ব্যারণ বিদায় প্রার্থনা করিলেন।

ডচেস তখন আরামচেয়ারে মাথা রাখিয়া পড়িয়াছিলেন, এই কথায় চকিতে মাথা তুলিয়া বলিয়া উঠিলেন "উত্তম ব্যারণ মাইনো! তোমার আজিকার সমস্ত অভিনয়ই চমৎকার হইয়াছে। উত্তম, অতি উত্তম!"

ব্যারণ চমকিয়া উঠিলেন, পরে মৃদুভাবে বলিলেন "আমরা কি কোন অভিনয় করিতেছি না কি?"

"নিশ্চয়! আর সে অভিনয় অতিসুন্দর—চমৎকার!"

"বটে, কিন্তু অনুগ্রহ করিয়া যদি বলেন—নাটকখানার নাম শুনিতে পাই কি ?—নাটকের কোন্ অংশ অভিনীত হইল, আমিই বা কাহার ভূমিকা লইলাম !"

ব্যাণের হাস্যপ্লুত স্বরে আরও উত্তেজিত হইয়া দন্তে দন্তে নিষ্পীড়ন করিতে করিতে ডচেস বলিয়া উঠিলেন, "তুমি আজ সয়তানের অংশ অভিনয় করিলে, আর এটুকু নাটকের দ্বিতীয় অঙ্কে, যার প্রথম অঙ্ক সেই লিণ্ডেন উৎসবের দিন আরম্ভ করিয়াছিলে। নাটকের নাম—ওঃ তার নাম,—তার নাম প্রতিহিংসা !"

ব্যারণের মুখের হাসি এবার মিলাইয়া গেল, ডচেসের বিষাক্ত তীব্র ভৎর্সনার উত্তরে শান্ত স্বরে তিনি বলিলেন "ভুল, আপনার ভুল হইয়াছে। প্রতিহিংসা ! কোথায় তাহার এক দিন ছিল, কিন্তু এখন সে আর নাই, শুখাইয়া মরিয়া লোপ পাইয়াছে। পূর্ব্বজীবনের কোন কথাই আমায় আর ব্যথা দেয় না। এ বিশ্বাস আপনার ভ্রম লেডি, তবে যদি আমার স্ত্রীকে সঙ্গে আনায় আপনার এ অন্যায় ধারণা হইয়া থাকে, তবে জানিবেন তাহাও মিথ্যা। আমি এতদিন যে তাহাকে অনাস্থা করিয়া তাচ্ছিল্য দেখাইয়াছি, নগরের সকলে তাহাই জানে, তাই আজ এই অবসরে তাহাকে আমার প্রিয়তমা ধর্ম্মপত্নী বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত করিবার জন্যই এখানে লইয়া আসি।"

"তাই নাকি ? ঐ একগুঁয়ে অহঙ্কারী মেয়েটা, লাল চুলো ট্রেচেনবার্গ সে আজ তোমার প্রিয়তমার পদে দাঁড়াইয়াছে ? আরে ছি ছি ! মাগনো একথা উচ্চারণ করিলে কিরূপে ? একবার নিজের পানে চাহিয়া এ কথা বলিতে পার ? তোমার মত হাঁ, তোমার মত বিদ্বান বুদ্ধিমান জনপ্রিয় সুভাষী সুন্দর পুরুষের উপযুক্ত কি ঐ জুলিয়েন ট্রেচেনবার্গ ?"

"তাহাকে আমায় ব্যারণেস মাইনো নাম দিতে অনুমতি দিন লেডি, ! আর যে কোন পুরুষকে, তাহাকে আপনি যতদূর উচ্চস্থানই দিন না তাহার নিজের বিবাহিতা পত্নী যেমনই হীনা, কুৎসিতা বা যাহাই হোক তাহাকে ভালবাসা অসম্ভব, কোনরূপ বিস্ময়ের কারণ নাই ইহাতে।"

বিকৃত হাসির সহিত ডচেস বলিলেন "ভাল ভাল, শুনিয়া সুখী হইলাম। তবে সাবধানে থাকিও, বরফের পাহাড়ের সঙ্গে চিরদিন কারবার করিতে হইবে, মনে থাকে যেন।"

হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "চিরতুষারের দেশেও মানুষ বাস করে, জানেন ত ? সেই তাহাদের আপন দেশ সেখান ছাড়িয়া তাহারা আর কোথাও যাইতে চায় না !"

মর্ম্মাহতা সুন্দরী ক্রমশঃ আপনাকে অপমানিতা বোধ করিতেছিলেন। ব্যারণের শেষ কথায় তাঁহার মূর্ত্তি পাগলের ন্যায় হইয়া উঠিল। বুকের কমলালেবুর ফুলগুলা টানিয়া ছিঁড়িয়া দূরে ফেলিতে ফেলিতে তিনি কাঁপিতে লাগিলেন। ঘন নিঃশ্বাস অস্ফুট কাতরোক্তি তাঁহার নিদারুণ মনোবেদনার প্রচণ্ডতা প্রকাশ করিতেছিল।

সহৃদয় ব্যারণের তাহা সহ্য হইল না, তাঁহার নিকটে আসিয়া সুকোমল স্নেহের স্বরে বলিতে লাগিলেন, "ক্ষমা করুন, আমি আপনাকে কষ্ট দিবার জন্য কিছুই করি নাই। আমার এখন যে পথে চলা উচিত সেই দিকে অগ্রসর হওয়ায় আপনার যে এত বেশী কষ্ট হইবে তাহা ভাবি নাই। যে দিন চলিয়া গিয়াছে, তাহার কথা ভাবিয়া কষ্ট পাওয়া ভুল লেডি, অতীতকে আমি ভুলিয়াছি, আপনিও আর সেকথা ভাবিয়া কষ্ট পাইবেন না। সুখী হউন, আপনি সর্ব্বতোভাবে সুখী হউন, এই প্রার্থনা করি।"

এই বার ফণিনীর ন্যায় মাথা তুলিয়া তীব্র হাস্যের সহিত ডচেস বলিলেন, "সুখী! তুমি আমায় অসুখী দেখিলে কবে গো ? ভালবাসা, তোমার মত সামান্য ব্যারণের প্রেমের জন্য জর্ম্মাণ রাজকন্যা কখনো দুঃখিত হয় না। আমার কিসের অভাব—কিসের অসুখ !"

বলিতে বলিতে তিনি দ্বারাভিমুখে অগ্রসর হইতেই দেখিলেন, লিয়েনের নৃত্যসহচর সার ডনবার্গ জুলিয়েনকে লইয়া সেই দিকেই আসিতেছেন। তখন ব্যারণের প্রতি চাহিয়া "ঐ যে তোমার প্রিয়তমা আসিতেছেন, যাও তাহার সম্বর্দ্ধনা কর !" বলিয়া ডনবার্গকে অনুরোধ করিলেন যে এইবার তিনি জেনারেল ম্যাক্সমিলিয়ানের সহিত নৃত্য করিবেন, এই কথাটি যেন তাঁহাকে জানাইয়া দেন তিনি।

ডনবার্গ চলিয়া গেলে ডচেস লিয়েনের সম্মুখে আসিয়া বলিলেন, "যাহা হউক ক্ষমতা বটে তোমার, সাবাস মেয়ে ! কিন্তু সুন্দরি, সাবধান, অদ্ভুত জানোয়ার লইয়া খেলা সুরু করিয়াছ, ও পোষ মানিবার জাতি নহে—তাহা মনে রাখিও। আছে আছে, কখন্ যে ডানা মেলিয়া উড়িবে—তাহা বুঝিতেও পারিবে না। প্রকাণ্ড প্রজাপতি—পুষ্পে পুষ্পে মধুপায়ী অবিশ্বাসী জীব !—"

বলিতে বলিতে তিনি হাতের কমলা ফুল কয়টি করতলে মর্দ্দিত করিয়া ব্যারণ ও লিয়েনের গাত্রে ঘৃণাভরে ছুঁড়িয়া, সদম্ভে অগ্রসর হইলেন, পথিমধ্যে তাঁহার নৃত্যসহচরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার বাহু অবলম্বনে চলিয়া গেলেন।

উনত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

লিয়েন স্তম্ভিত হইয়া দাঁড়াইয়াছিল, ব্যারণও সেই ধৃষ্টা নারীর বিচিত্র দাম্ভিকতায় হতবুদ্ধি হইয়া ক্ষণকাল বাহ্যজ্ঞান হারাইয়া নির্ব্বাক ছিলেন, কিন্তু পত্নীর প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই তাহার সেই জ্যোতিঃহীন মুখ তাঁহার হৃদয়ে আঘাত দিল। তৎক্ষণাৎ তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "কি লিয়েন, ভয় পাইয়াছ?"

ভগ্নস্বরে লিয়েন বলিল, "না!" কিন্তু তাহার ভীতিব্যাকুল দৃষ্টি স্বামীর চক্ষুর উপর স্থির-ভাবে বদ্ধ হইয়া থাকিল। ব্যারণও তাহা বুঝিলেন; সাদরে তাহাকে বক্ষে লইয়া প্রীতিপূর্ণ স্বরে বলিলেন, "আমায় তোমার বিশ্বাস হয় না? বিশ্বাসের কাজ ত কিছু করিও নাই;— তবু জানিও প্রিয়তমে, তোমার এ প্রজাপতির পক্ষচ্ছেদ হইয়া গিয়াছে। এ আর উড়িবে না, কোথাও যাইবার সাধ্য নাই তার, এ তোমারি লিয়েন—একান্ত তোমারই প্রজাপতি!— আর জানিও প্রথম জীবনে তোমার সাক্ষাৎ পাইলে, সে প্রজাপতি-জীবনলাভ আমার অদৃষ্টে এ২ অসার্থকতা এত যন্ত্রণা আনিয়া দিত না।"

লিয়েনের অশ্রুধারা ব্যারণের বক্ষে ঝরিয়া যাইতেছিল, এ রোদন দুঃখের না সুখের তাহা তাহার নিজেরই জ্ঞান ছিল না। ব্যারণ আবার বলিলেন, "আমার কথা বুঝি বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না?"

স্বামীর স্বরের আর্ত্ত ভাব অনুভব করিতেই সবেগে মাথা তুলিয়া লিয়েন বলিল;—"না না তা নয়, আমি কি বলিব জানি না রাওয়েল, তোমার কাছে যে কত অপরাধই করিব আমি,— কি করিব—"

"যাহা করিবে তাহাই আমার ভাল লাগিবে প্রিয়তমে!"

"না না তুমি বুঝিতেছ না, আমি বড় হতভাগ্য, সামান্য স্ত্রীলোক মাত্র, তোমার যোগ্য…"

"ওঃ এই কথা ? বাঁচিলাম লিয়েন, এতক্ষণে আমার ভয় ঘুচিল। তুমি তবে সামান্য স্ত্রীলোক ? বাঁচাইলে আমায়, অসামান্যাদের চরণে মাথা লুটাইতে লুটাইতে আমার কপাল ভাঙ্গিয়া গিয়াছিল, এখন একটি সামান্যার স্নেহই আমার প্রয়োজন। প্রাচীন কাউন্ট বংশীয়া কন্যার প্রতিও যে আমার সাহস ছিল তা নয়, তবে আজ তুমি নিজেই যখন স্বীকার করিলে তুমি আমারি মত দোষগুণে মানুষ, তখন নিশ্চিন্ত হইতে পারি।"

লিয়েন এবার হাসিয়া ফেলিল ; বলিল, "কথায় ত তোমায় কেহ পারিবে না, তুমি চুপ কর!"

"তবে বল, এই চিরদিনের চঞ্চল—চিরকালের অপরাধীকে একটু বিশ্বাস একটু—"

স্বামীর সবল বাহুপাশ হইতে আপনাকে মুক্ত করিতে করিতে লিয়েন বলিল, "আবার পাগলামি ? ওদিকে দেখিয়াছ কি,—তোমার কাকা যে চলিয়া যাইতেছেন।" বলিয়া আঙ্গুল বাড়াইয়া হল ঘরের দিকে দেখাইল। সত্যই তখন হপ্ মার্শেল কোর্টচ্যাপ্লিনের সাহায্যে সে স্থান ত্যাগ করিতেছিলেন।

ইহার মধ্যে আরও একটি ঘটনা ছিল। কুঞ্জগৃহ হইতে বাহির হইয়া ডচেস্ যখন হল দিয়া যাইতে ছিলেন, তখন মার্শেলের নিকটস্থ হইলে তিনি তাঁহার দিকে সম্মানে বাহু প্রসারণ করিয়া দেন। ডচেস্ প্রশ্ন করেন, "শুনিলাম ব্যারণ মাইনো সস্ত্রীক ভ্রমণে যাইবেন, আমার বৃদ্ধবন্ধুও কি তাঁহাদের সঙ্গী হইবেন ?"

ব্যস্ত ভাবে মার্শেল বলিয়া উঠিলেন, "ঈশ্বর রক্ষা করুন,—আমি তাহাদের মধ্যে নাই! আমি আমার বাড়ীতেই থাকিতে চাই, বেদেদের মত ঘুরিয়া মরায় আমার আনন্দ আসেনা। তবে দেশের রাজ্ঞী,—আপনি যদি মাঝে মাঝে সেখানে পদধূলি দান করেন, তবে এ বৃদ্ধ বড় সুখী হইবে—চরিতার্থ হইবে।"

"আমি? কি করিয়া বলি যে শীঘ্র আর সে দিকে যাইব ? আপনাদের সেই ইণ্ডিয়ান হাউস্টা আমার বড় ভাল লাগিত, উহার চারিদিকের সবুজ গাছপালাগুলি, ভারি সুন্দর ছিল। সেসব নাকি নষ্ট হইয়া গিয়াছে,—আর সে দিনের সেই কাণ্ড,—নাঃ মাপ করিবেন মার্শেল, আমি আর কিছু দিন ওদিকে যাইতে পারিব না।"

অবজ্ঞা ভঙ্গিতে কথাগুলি বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই নৃত্যসহচরের সহিত ডাচেস্ চলিয়া গেলেন। চারি পাশে আরও অনেক লোক দাঁড়াইয়া ছিলেন, তাঁহারাও বিস্মিত ভাবে চাহিয়া রহিলেন। লজ্জায় ক্ষোভে বৃদ্ধের মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

এই হতবুদ্ধি অবস্থাতেই কোর্ট চ্যাপ্‌লিন তাঁহাকে লইয়া চলিয়া গিয়াছেন। ব্যারণ সভাগৃহে আসিয়া সকল কথা শুনিয়া বলিলেন, "আমাকেও তবে এখনি যাইতে হইবে।"

তাঁহাদের গাড়ী ছুটিয়া চলিতেছিল। পথের দুধারে বড় বড় গাছ, তাহার ছায়ায় ও গাম্ভীর্য্যে পথের দৃশ্য ভারাক্রান্ত বোধ হইতেছিল। থাকিয়া থাকিয়া লিয়েনের মনেও সে আঁধারের ছায়া আসিয়া পড়িতেছিল; মানুষের সুখসম্পদের চারিপাশ ঘিরিয়া বুঝি এমনি কোন কালো আঁধার লুকাইয়া আছে,—কখন কোন ছলে, ঝড়ে-ওড়া বাদলা মেঘের মত তারা সুখের আকাশ জুড়িয়া বসিবে তা কে জানে?

মুহূর্ত্ত মধ্যে ব্যারণের শকট হপ্ মার্শেলের মৃদুগতি বেরুচ্‌খানিকে ছাড়াইয়া গেল। উহার ভিতর হইতে মার্শেলের সঘৃণ বদনভঙ্গি ও চ্যাপ্‌লিনের জ্বলন্ত চক্ষু লিয়েন স্পষ্ট দেখিতে পাইল। তাহার উদ্বেগ-ব্যাকুল হৃদয়ে সে পৈশাচিক ভাব যেন একটা ভয়ের আকারেই প্রকাশ পাইয়াছিল, সে ভীতিপূর্ণ দৃষ্টিতে স্বামীর দিকে ফিরিল। কিন্তু ব্যারণ তখন তাঁহার দুর্দ্দান্ত অশ্বদ্বয় লইয়া ব্যস্ত, অতি সাবধানে তাহাদের গতি নিয়ন্ত্রিত করিয়া চলিতেছেন। তিনি পত্নীর সে ব্যাকুলতা দেখিতে পাইলেন না, কোন কথাও বলিলেন না, তবু লিয়েন সেই বলিষ্ঠ তেজস্বী পুরুষের সস্নেহ অন্তরখানি যেন আপনার নিকটে, অতি নিকটে অনুভব করিয়া আশ্বস্ত হইল। পুরুষের বলের যে এমন মহিমা, তাহার পাশে থাকিলে নারীর প্রাণ যে এতখানি আশ্রয় পায় তাহা সে পূর্ব্বে কখনও অনুমান করে নাই।

গাড়ী দ্বারে দাঁড়াইতেই দেখা গেল ফ্রেলন দাঁড়াইয়া আছে। ব্যারণ তখন ঘোড়ার রাশ কোচম্যানের হাতে দিয়া তাহাকে কি বলিতেছিলেন। ফ্রেলন লিয়েনের নিকটে আসিয়া মৃদুস্বরে বলিল, "আপনি আমায় খবর দিতে বলিয়া ছিলেন মা,—তাই আমি আসিয়াছি। সে আর নাই,—আধ ঘণ্টা পূর্ব্বে সব শেষ হইয়া গিয়াছে।"

"ওঃ"—লিয়েন চমকিয়া একটু থামিল, পরে মৃদুকণ্ঠে বলিল, "তুমি যাও,—আমি এখনি যাইতেছি।"

ফ্রোমান সরিয়া গেল, ব্যারণ আসিয়া স্ত্রীর দিকে করপ্রসারণ করিয়াছেন। তাঁহারা সিঁড়িতে উঠিবার সময় শুনিতে পাইলেন হপ্ মার্শেলের শকটও দুয়ারে লাগিল।

তাঁহারা হল ঘরে আসিয়া দাঁড়াইয়াছেন, ব্যারণ তাঁহার ভৃত্যকে ডাকিবার জন্য ঘণ্টায় হাত দিতে যাইতেই বাহিরে হপ্ মার্শেলের আসন-চক্রের শব্দ শোনা গেল, এবং পরক্ষণেই সশব্দে দ্বার খুলিয়া স্খলিত পদে বৃদ্ধ, ঘরের মধ্যে আসিয়া একখানা চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন। রাওয়েল ব্যস্তভাবে নিকটে আসিয়া বলিলেন, "এত তাড়াতাড়ি—এখানে কেন কাকা? আপনি"- -

বাধা দিয়া মার্শেল বলিলেন, "হাঁ এখানেই আসিলাম, আমি জানিতাম যে তুমি এখন এই ঘরেই থাকিবে।---"

বিস্মিত হইয়া মৃদুকণ্ঠে রাওয়েল্ বলিলেন, "আমি? আমায় ডাকিলেই হইত! সে জন্য কষ্ট করিয়া আসিলেন কেন?"

"কাজ আছে, আমার একটু দরকার আছে। তোমায় ডাকিলে ত সেই তোমার ফুরসৎ মত যাইতে,—যাক্, ব্যারণেরস, তোমার স্বামীকে কিছুক্ষণের জন্য ছুটি দিতে পারিবে কি? প্রয়োজন শেষ হইলেই অবশ্য আমি আর এক মিনিটও দাঁড়াইব না।"

বিনাবাক্যে পাশের দরজা দিয়া জুলিয়েন বাহির হইয়া গেল। ঈষৎ বিরক্তভাবে ব্যারণ বলিলেন, "কোন গোপনীয় কথা না কি?"

"গোপনীয় না হইলেও সকলের সম্মুখে সব কথা বলা চলেনা। হাঁ শোন বলি, আমি আর তোমার সহিত একত্র থাকিতে চাহিনা রাওয়েল্, আজই—এখনই অন্যত্র যাইব, তাই তোমায় বলিতে চাই যে---"

সবিস্ময়ে ব্যগ্রকণ্ঠে ব্যারণ বলিয়া উঠিলেন, "অসম্ভব! তাহা হইতে পারে না। কাকা, এখন আপনি বড় শ্রান্ত, বিশ্রাম করুন গিয়া; কাল সকালে একথা হইবে।"

পরুষ স্বরে মার্শেল বলিলেন, "না আজই একথার শেষ করা চাই, আমি আর এসকল সহ্য করিতে পারিব না।"

"কি সহ্য করিতে পারিবেন না? কাহার উপর রাগ করিয়েছেন আপনি? শুনিলাম ডচেস্ নাকি আপনাকে অপমান করিয়াছেন, তাই কি আপনার এ চিত্তবিকৃতি জন্মিয়াছে? আঃ সে একজন পর, কাকা,—"

"পর?" উচ্চ হাসির সহিত মার্শেল বলিলেন, "পর? হাঁ, তবু জানিও— তোমার মত আত্মীয়ের অপেক্ষা সে পরেরাও আমার প্রিয়।—"

ব্যারণের মুখ ম্লান হইয়া গেল, শান্ত স্বরে তিনি বলিলেন, "তবু একটি কথা,—আমি যে লিয়োর পিতা, সে কথা ভুলেন কেন?"

"হুঁ ঐখানেই একটু বাঁধন আছে বটে, তাইতো বলিতে চাই—"

"শুনুন, একটি কথা বলি কাকা,—"

"কাকা! না তুমি আর আমায় কাকা বলিও না রাওয়েল, আমি—"

ক্লিষ্ট হাসির সহিত ব্যারণ বলিলেন, "তবে না হয় শ্বশুর মহাশয় বলি? সম্বন্ধ কি মুখের কথায় শেষ হয় কাকা? কিন্তু বলুন, আপনি কি লিয়োকেও ত্যাগ করিতে পারিবেন?"

"না তাহা কেন হইবে, আমি তাহাকে সঙ্গে লইয়া যাইব সেই কথা বলিবার জন্যই আমি এখানে আসিয়াছি—বুঝিলে? সে আমার কাছেই থাকিবে।"

মুহূর্ত্তে ব্যারণের মুখভাব পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। প্রচণ্ড উত্তেজনায় তাঁহার সুন্দর বদন গভীর রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। উচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হইল, "না, তাহা অসম্ভব! ইহা হইতে পারে না!"

তেমনি উচ্চ স্বরে মার্শেল বলিলেন, "কেন হইতে পারে না?"

"আমি তাহাকে ছাড়িয়া থাকিতে পারিব না, সে আমার পুত্র।"

"আমারও দৌহিত্র, আমি তাহাকে লইয়া যাইব। সে কখনই তার মার সপত্নীর নিকট থাকিবে না।"

"সে তার বাপের কাছে থাকিবে, আপনি তাহাকে কোথাও লইয়া যাইতে পাইবেন না।"

"বটে, তোমার এতখানি স্পর্দ্ধা? সহজ কথায় কাজ হইবে না দেখিতেছি

"সহজ অসহজ যে উপায়ে ইচ্ছা তাহাই করুন, আমি তাহাকে দিব না।" বলিতে বলিতে ব্যারণ দুয়ারের দিকে অগ্রসর হইতেই ডাক দিয়া মার্শেল বলিলেন, "দাঁড়াও, বলিয়া যাও— সত্যই তাহাকে দিবে না তবে?"

ফিরিয়া ব্যারণ বলিলেন, "হুঁ সত্যই ত, নিজের সন্তান কে কবে ছাড়িয়া দেয়? কিন্তু কাকা, অনর্থক এ বিবাদ কেন? আপনিই বা আমাদের ছাড়িয়া কোথায় যাইবেন—"

"যমালয়ে! তোমাদের নিকট থাকা অপেক্ষা নরকও আমার প্রার্থনীয়। তবে লিয়ো, না তাহাকে আমি এখানে রাখিয়া যাইব না, ঐ নষ্ট বুদ্ধি ছলনাময়ী স্ত্রীলোকটা সব করিতে পারে, উহার হাতে লিয়োকে দিয়া যাইব? রাওয়েল্ প্রস্তুত হও—আমি আইনের সাহায্য লইব, প্রকাশ্য বিবাদ হইবে!"

"হউক তবে তাহাই! আপনি যদি এতখানি ইতর হইতে পারেন তবে আমিও তা পারিব না কেন? কিন্তু স্মরণ রাখিবেন, আমি উহার পিতা;—কোন আইন তাহাকে, পুত্রকে পিতার নিকট হইতে কাড়িয়া লয় না!"

সদম্ভে বৃদ্ধ বলিলেন, "আচ্ছা সে দেখা যাইবে, সকলেই জানে চিরদিনের অস্থিরমতি, এখন তোমার মাথা আরও খারাপ হইয়া গিয়াছে—তোমায় পাগ্‌লা গারদে দেওয়া উচিৎ!"

"তাই নাকি? আইনের তর্কে না পারিয়া এখন আপনি আমায় পাগল সাজাইতে চান দেখিতেছি। কিন্তু কাকা, আপনার মত চতুর লোকের উচিৎ হয় নাই যে পূর্ব্বেই তাহা আমায় জানিতে দেওয়া হইল। আমি সাবধান হইব না কি?"

দন্তে দন্ত চাপিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, "সাবধান?" সাবধান হইবার জন্যই ত বলিয়াছি। তুমি সতর্ক হও রাওয়েল্, আমি যে সহজে ছাড়িব তা মনেও স্থান দিও না?"

"আপনার যা ইচ্ছা করিতে পারেন, আমি আপনাকে বিরক্ত করিতে ইচ্ছুক ছিলাম না, কিন্তু আপনি যখন বাঁকা পথেই চলিলেন, তখন অগত্যা আমাকেও সেই মত বুঝিয়া কাজ করিতে হইবে।"

তাঁহাদের বিবাদ সহজে শেষ হইবে না বুঝিয়া লিয়েন পাশের সজ্জা-কক্ষের দ্বার খুলিয়া বাহির হইয়া বাগানে নামিয়া গেল। তখন রাত্রি হইয়া গিয়াছে, চারিদিক অন্ধকার, উদীয়মান চন্দ্র তখনও কুয়াশায় ঢাকা ছিল।

পথ চলিতে চলিতে বারবার নিয়েনের মনে হইতে ছিল, পাশ্চাতে যেন কাহার পদধ্বনি উঠিতেছে ও মিলাইতেছে। আজ তাহার মন ভাল ছিল না, সামান্য কারণেই ভয় আসিতে ছিল। উচ্চৈঃস্বরে সে ডাকিল, "এদিকে কেহ আছে কি ?"

ডামার্ড তখনও ফিরে নাই, উদ্যানরক্ষকের গৃহ হইতে সে ও নূতন উদ্যানরক্ষক দুই জনেই উত্তর দিল। নিয়েন নিশ্চিন্ত হইয়া ইণ্ডিয়ান হাউসের দিকে অগ্রসর হইল।

বালক গেব্রিয়েল্ কাঁদিতে কাঁদিতে অবসন্ন হইয়া চেয়ারের উপরই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ফ্রোলন বাহিরে দাঁড়াইয়া নিয়েনেরই প্রতীক্ষা করিতেছিল, এখন মৃতার দেহের আচ্ছাদনী বস্ত্র সরাইয়া বলিল, "আপনিই খুলিয়া নিন্ মা, আমি আর উহা স্পর্শ করি নাই।"

নিয়েন সজল নয়নে সেই বিগতপ্রাণা স্থির সুন্দরীর জ্যোতিঃহীন মূর্ত্তিখানি দেখিয়া লইল। ঝটিকা বিচ্ছিন্ন দলিত কুসুম! কোন জন্মের কত পাপে এই সুকুমার জীবনটি এমন ভাবে শেষ হইল তা কে বলিতে পারে? আরও যদি কিছু বাকি থাকে, বিচার-কর্ত্তা! করুণাময় প্রভু! তুমি তবে তাহা মার্জ্জনা কর। মানবের হস্তে ইহার নির্য্যাতনের সীমা ছিল না, তোমার দয়ার অমিয় সাগরে আজ যেন তাহার মুক্তিস্নান হয়।

"খুলিয়া লউন লেডি, এখনি হয় ত পাদরী আসিয়া পড়িবেন।"

প্রবাহিত প্রচুর অশ্রুধারা মুছিয়া নিয়েন তাহার নিকটে আসিয়া বসিল। বুকে চাপা হাতখানি সরাইয়া অতি সন্তর্পণে মৃতার কণ্ঠ হইতে পদকযুক্ত হারটি খুলিয়া আপনার গলদেশে ধারণ করিয়া পরিচ্ছদের ভিতরে ঢাকিয়া লইল।

ঘরে আলো জ্বলিতেছিল; এক পার্শ্বে জানু পাতিয়া কৃষ্ণবসনা ফ্রোলন—মৃতার শয্যায় মুখ ঢাকিয়া বসিয়াছিল, অপর পার্শ্বে নিয়েনও তেমনি ভাবে উপবেশন করিল। শান্তি—শান্তি—শান্তি! করযোড়ে সে অন্তিমের অন্তর্যামীকে স্মরণ করিতেছিল।

অনেকক্ষণ পরে উঠিয়া সে বাগান হইতে কতকগুলি ফুল তুলিয়া আনিল, সেই ফুল দিয়া মৃতা সুন্দরীর হাতে মাথায় অতি সামান্য একটু সাজা ছিল, পরে অবশিষ্ট সপল্লব বৃহৎ গোলাপটি তাহার বুকের উপর রাখিয়া—সাবধানে সেই হিম-ললাটে চুম্বন দিয়া সরিয়া আসিল।

ফ্লোরেন্স যখন মুখ তুলিয়া দেখিল তখন লিয়েন গৃহত্যাগ করিয়াছে, তাহার মৃদু পদক্ষেপ ধ্বনি কাহারও উত্যাক্ত করে নাই।

তখন আকাশের চন্দ্র উর্দ্ধে উঠিয়াছে; বনভূমি ও হ্রদের জল জ্যোৎস্নায় প্লাবিত। লিয়েন অত্যন্ত অন্যমনস্কভাবেই চলিতেছিল; যে দৃশ্য সে দেখিয়া আসিল, তাহার পর সহসা কোন ভয় ভাবনার অবকাশ এখনও আসে নাই। স্বাভাবিক নির্ভয় মনেই দ্রুত পদে সে যাইতে লাগিল, বাড়ী গিয়া স্বামীকে এই সকল সমাচার জানাইবার জন্য তাহার প্রাণ ব্যস্ত।

সেতুর সম্মুখ, এমন সময় শব্দ উঠিল, "লেডি জুলিয়েন!"

লিয়েন চমকিয়া ফিরিল, যাহার জন্য ভয়—সেই? পাদ্‌রী হিউগো ধীরে আসিয়া তাহার পার্শ্বে দাঁড়াইলেন। লিয়েনের বাক্‌স্ফূর্ত্তি হইতেছিলনা কিন্তু পাদ্‌রী স্বাভাবিক স্বরেই বলিল, "আপনি বুঝি ইণ্ডিয়ান্ হাউসে গিয়াছিলেন?"

"হাঁ।" "কিন্তু তাহার সেই হারগাছি,—সেটি আপনি লইয়া আসিলেন কেন?"

উত্তর না দিয়া লিয়েন সেতুর পথে অগ্রসর হইল, কিন্তু কোর্ট চ্যাপ্‌লিন তখনো তাহার সঙ্গে। পাদ্‌রী বলিলেন, "ভয় নাই লেডি, আমার দুটি কথা শুনিলে আপনার কোন ক্ষতি হইবে না। আমার একটি কথার উত্তর দিয়া যান্, বলুন মালাটি লইয়া আপনি কি করিবেন?"

"আমার স্বামীকে দিব।"

"আপনার স্বামী—ব্যারণ মাইনো? ও, তাঁর সঙ্গে যে আপনার ভাব হইয়াছে দেখিলাম! আচ্ছা সত্য বলুন দেখি, আজিকার আপনাদের ব্যাপারটিতে কিছু, সত্যতা ছিল না সে সকল ডচেস্‌কে ভয় দেখানো?"

"জানি না।" বলিয়া লিয়েন দ্রুত চলিয় সেতুর মাঝখানে আসিয়া পড়িল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ পাদরী তাহার নিকট আসিয়া একেবারে বাহু চাপিয়া ধরিয়া বলিল "থাম,—শোন! এত অবজ্ঞা কেন আমায়? ঐ মতিচ্ছন্ন ব্যারণটার কাছে দুটি মিষ্টি কথা শুনিয়া তোমার আর কাহাকেও দৃক্‌পাত করিবার ইচ্ছা নাই দেখিতেছি। দর্পিতা রমণি, তুমি কি ভাবিয়াছ যে আমাকে বঞ্চনা করিয়া তুমি ঐ রাওয়েল মাইনোর পাশে গিয়া দাঁড়াইয়া নিশ্চিন্ত হইবে?"

এই বার মাথা তুলিয়া লিয়েন বলিল "কেন হইব না? তিনি আমার স্বামী; আর হত-ভাগ্য পাদরী, তুমি আমায় ভয় দেখাইও না, আমি তোমায় এতটুকু ভয় করি না।"

"ভয়ের কিছু পাও নাই বলিয়া,—এই বার দেখিতে পাইবে যে—"

"যা খুসি করিয়ো, ট্রেচেনবার্গ বংশীয়রা ভয় কাহাকে বলে জানে না। আর আমার স্বামী, তুমি জান তাঁহাকে,—" কথার সঙ্গে লিয়েন চারিদিকে চাহিতেছিল, নবসংস্কৃত ইণ্ডিয়ান হাউসে অনেক দীপ জ্বলিতেছে, দূরে উদ্যানরক্ষকের জানালাতেও আলোক দেখা যায়। তাহাকে অনমনস্ক দেখিয়া পাদরী তাহার উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সবলে বক্ষবদ্ধ করিয়া বলিল, "আর না, আর না, আর তোমার সহিত বিবাদ করিতে পারি না লিয়েন, আমায় ক্ষমা কর—বাঁচাও,—"

লিয়েন চীৎকার করিয়া উঠিল, পাদরী তখনও বলিতেছিল "ঐ চঞ্চল পাগল ব্যারণ, তাহার মধ্যে তুমি কি পাইয়াছ জানি না! না না না, সে তোমার—না লিয়েন, তোমায় আমি আর কাহারও হইতে দিব না, আমি যদি বঞ্চিত হই তবে—"

"ছাড়িয়া দে পিশাচ! উঃ—" লিয়েন পাদরীর মুখের উপর মুষ্ট্যাঘাত করিল, ইণ্ডিয়ান হাউসের দিকে অস্ফুট ধ্বনিও শোনা গেল। তখন হতজ্ঞান পাদরী লিয়েনের দেহ দুই হাতে তুলিয়া সেতুনিম্নের জলরাশির মধ্যে নিক্ষেপ করিয়া বলিল "আমায় ঘুঁসি মারিবে তুমি, এতবড় স্পর্দ্ধা! যাও এই বার মনের সাধে রাওয়েল মাইনের অঙ্কশায়িনী হও গিয়া।—" দূরে দূরে কাহাদের পদশব্দ শোনা যাইতেছিল, পতন সময় লিয়েন প্রাণপণে চীৎকার করিয়াছিল, সে উদ্যানের সকলেরই কানে গিয়াছে বুঝিয়া, কোর্ট চ্যাপলিন উন্মাদের ন্যায় ছুটিয়া পলাইলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীহেমনলিনী দেবী।
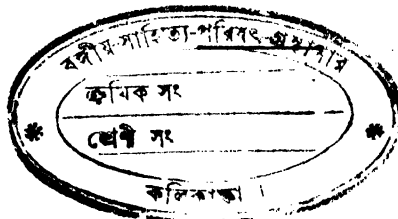
জীবনের বেলা।

জীবনের বেলা বলি-অঙ্কিত ললাটের মত আজ
দুঃখ সুখের জোয়ার ভাঁটায় কত কেটে গেছে খাঁজ!
চেয়ে দেখি আর ভাবি মনে মনে সেই কবেকার কথা,
পূর্ণিমা পরশে যেদিন জীবনে অতুলন আকুলতা!
জীবন-সিন্ধুর ঘন নীল জল উথলে উথলে উঠে
চাঁদনী পরশে দুধের জোয়ার তটে পড়েছিল লুটে!
ছিল শুধু গান আর ছিল হাসি জোছনার মত সাদা
অপার উথলা সুখের খেয়াল কোথাও ছিল না বাধা!
সুখের জোয়ারে সুধার পরশে স্বপনের মায়াপুরী
ইন্দ্রধনুর বরণে সাজিয়া আছিল দুকূল জুড়ি'!
উতরোল বায় কলরোল গীতি তরঙ্গ রঙ্গে ভরা
ছুটে এসে বুকে জড়ায়ে ধরিয়া ডুবায়ে অথির করা!
পূর্ণিমা নিশির উতলা জোয়ার থাকে না নিশীথ শেষে
আছে স্মৃতি-তীর ধ্বসে যাওয়া ঐ তটের পাঁজরদেশে
অমার আঁধারে এল যে কোটাল পাগল প্লাবন নিয়ে,
ইতিহাস তার লেখা চিরদিন তীর তিরোধান দিয়ে!
কখন যে এল, গেল যে কখন অশ্রু-সাগর-বান
সহসা কখন কি যে করে গেল হ'ল না'ক অনুমান!
আজ যেথা জাগে গুহার মতন গর্ত্তের আঁধার ব্যথা
তারি মাঝে পড়ে গুমরি মরিছে তার সে বিদায় কথা!

তট-বালুকায় যেথা শুয়ে আছে দুর্ব্বা-শিশুর দল,
সরায়ে তাদের দেখ যদি চেয়ে শুধু এক অনুপল,
আঁকাবাঁকা লেখা দেখিবে কত'না প্রেমের ছড়ান স্মৃতি,
কোথা টোল পড়া, কোথাও হাল্‌কা তুলি দিয়ে লেখা গীতি !
অসীমের তীরে সীমানা টেনেছে দু'এক নিমেষ যেথা,
চাহনিতে আর সোহাগ পরশে, সে কাহিনী লেখা সেথা !
বালুকার লেখা তবুও মোছে নি, সমাধি হয়েছে বলে'
দুর্ব্বাদলের তরুণ নবীন সবুজ বুকের তলে !
চিতার নিশানা কবরের দাগ দীপমালা দীপালীর !
প্রমোদ-তরীর ভাঙ্গা হালখানি আজো ছেয়ে আছে তীর !
শুধু আজ নাই আছড়িপিছাড়ী জোয়ারভাটার জোর
মোহানার মুখে জাগে বালি-য়াড়ি আসিতেছে ঘুমঘোর,
শান্ত স্রোতের অবাধ বহতা নাচে না ওঠে না কেঁপে,
ভাঙাচোরা পাড়ে অতীত বারতা আছে দিগন্ত ব্যেপে !

শ্রীপ্রিয়ম্বদা দেবী।

সাহিত্য ও সমাজ।

-:*:-

গত আষাঢ় মাসের পরিচারিকায় আমি 'সাহিত্য ও সমাজ' নামে—একটি প্রবন্ধ লিখেছিলাম। পরিচারিকার তরফ হতে আমার ঐ প্রবন্ধের নীচে কয়েকটা জায়গায় মন্তব্য প্রকাশ করা হয়েছিল। শ্রদ্ধাভাজন সহকারী সম্পাদক মহাশয় দয়া করে ঐ মন্তব্যগুলি আমাকে জানিয়েই তুলেছিলেন। তিনি আমাকে বলেছিলেন যে আমি আমার কথার মাঝে

মাঝে কিছু অসংযমের পরিচয় দিয়েছি। তখন তাঁকে উত্তরে আমি বলেছিলাম, আমরা তরুণের দল, বলবার উৎসাহ যতটা বেশী বিজ্ঞতা ততটা নাই। যদি কোন একটা কথা আমার সংযমহীনতার পরিচয় দিয়েই থাকে তবে তাকে ক্ষমা করে নেবেন। আমি আজ ঐ মন্তব্যগুলির সম্বন্ধে একটা কোন সদুত্তর দিতে যাচ্ছি না। একটা জিনিষ আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে—ঐ মন্তব্যের কোন জায়গায় পড়েছি মনে হয় যে শ্রীকান্তের অন্নদা দিদির চরিত্রে ভারতবর্ষের "নারীর নিজস্ব আদর্শ" মূর্ত্তিটী পরিস্ফুট হয়েছে। আজ এই প্রবন্ধে— "সাহিত্যে আদর্শ সৃষ্টি ও নারীত্বের আদর্শ" সম্বন্ধে সাধারণ কয়েকটা কথা লিখব মনে করেছি।

দুটী জিনিষ আমাদের জীবনকে বিশিষ্টতা দান করে, একটী কর্ম্ম ও আর একটী ভাব। আমাদের কারও জীবন কর্ম্মের জীবন, কারও বা জীবন ভাবময়, কারও বা কর্ম্ম ও ভাবের সমান মিলন ক্ষেত্র। যাদের জীবন কর্ম্মময়, আমি বলছি না যে তাদের জীবনে ভাব নাই। ভাবই যে সকল কর্ম্মের উৎস এতে সন্দেহ হতে পারে না, কিন্তু এটাও ঠিক বটে যে কর্ম্ম প্রধান জীবনে ভাবের লীলাতরঙ্গ ঘাত প্রতিঘাতে জীবনকে ফেনিল ও উচ্ছ্বাসময় করে না, শুধু একটা বিরাট ভাব কর্ম্মের ভিতর দিয়ে নিজের সত্তাকে পরিস্ফুট করতে প্রয়াস পায় মাত্র। আর যে জীবন ভাবময় কর্ম্ম সেখানে থাকলেও ভাবের সঙ্গে দ্রুতচরণক্ষেপে চলতে পারে না, ভাব আপনা আপনিই প্রভাতের আকাশের মত রঙীন হয়, নির্ঝরের নিয়ত প্রবহমান বক্ষের উপর শত রামধনুর মত বিচিত্র ও ক্রীড়াশীল হয়। কর্ম্ম প্রধান, ভাব প্রধান ও কর্ম্ম ভাব সমন্বয়ে গঠিত জীবনের এই তিন বিশিষ্ট ধারা স্থির থাকলেও, কর্ত্তব্য চিন্তা ও ভাব প্রকারভেদে জীবন বিচিত্র। যখন কর্ম্ম অনন্ত, ভাবও অনন্ত, তখন জীবনের ধারাও বিচিত্র এবং অসীম।

জীবন ধারা যখন নিয়ত চঞ্চল ও বিচিত্র তখন জীবনের সার্ব্বজনীন আদর্শ—যে আদর্শ অবলম্বনে সকলের জীবন গঠিত হতে পারে—এমন একটা কিছু আছে কিনা এতে সন্দেহ এসে পড়ে। সত্য যে আমরা প্রত্যেকেই জীবনের একটা আদর্শ মনে করে রেখেছি। এ আদর্শটা আমাদের ব্যক্তিগত জীবনের পক্ষে খুব সত্য হলেও সর্ব্ব সাধারণের পক্ষে সমাজের দিকে এর উপযোগিতা নাও থাকতে পারে। শিল্পীর মনে একটা সৌন্দর্য্যের আদর্শ বর্ত্তমান

থাকে। শিল্পী ও কবি নানা প্রকার চেষ্টার সাহায্যে সেই আদর্শ সৌন্দর্য্যকে রূপ দিতে প্রয়াস পান। শিল্পী, কবি ও ভাবুকের এই আদর্শ তাঁর শিক্ষা সংস্কার ও পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে। এই ব্যক্তিগত আদর্শকে আমরা Ideal বলতে পারি না এরা হচ্ছে Type.

সর্ব্বযুগের সর্ব্বকালের আদর্শ না থাকলেও এক একটা দেশের মানুষের জীবন যুগবিশেষে কোন এক ভাবের মধ্যে কিম্বা কোন এক কর্ম্মের মধ্যে সঙ্গ পেতে চায়। আমাদের ইতিহাসের যুগবিভাগের মত সাহিত্যেরও যুগবিভাগ আছে। ইতিহাসের যুগ প্রধানতঃ কর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত আর সাহিত্যের যুগ একেবারে প্রাণের উপর, ভাবের উপর নিজেকে স্থাপিত করেছে। কার্লাইল তাঁর Sartor Resartus নামে প্রসিদ্ধ গ্রন্থের এক স্থানে সমাজকে Phoenix নামে এক কাল্পনিক পাখীর সঙ্গে তুলনা করছেন। যখন বয়স এদের শরীরে জরার অবসাদ এনে দেয় তখন এই পাখীগুলি অগ্নিকুণ্ডের উপর ঝাঁপ দিয়ে পড়ে পুরাতন পালকগুলি দগ্ধ হয়ে যায়, অবশেষে পাখীটী একদিন নূতন হয়ে তরুণবেশে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়। সমাজের পরিবর্ত্তনও ঠিক এই রকম। সমাজে যখন একদিকে ধ্বংসের তাণ্ডবলীলার অভিনয় হয়, অন্যদিকে তখন এক নূতন সৃষ্টির সূচনা চল্‌তে থাকে। সমাজ-জীবনের জোয়ার ভাটার কল্লোলধ্বনি অবিরত যুগের পর যুগ ধ্বনিত হচ্ছে। তখন ভাবের উচ্ছল ঢেউগুলি আমাদের হৃদয়তট প্রান্তে আঘাত করে করে তাকে সচেতন ও সচকিত করে তোলে। নানা প্রকার প্রশ্নের আলোড়নে হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে থাকে। এই হল ধ্বংসের অভিনয়। তারপর একদিন যখন এই আলোড়ন থেমে যায়—সমাজ তখন দিঘীর জলের মত স্থির ও শান্ত হয়। এই ভাবে কখনও বা "অন্ধ জলোচ্ছ্বাস" কখনও বা "শান্তছবি", কখনও বা ঝড়ের মেঘাবৃত গগন কখনও শান্তির নীলিমা-মাখা আকাশ ধরার বুকে ক্রমান্বয়ে প্রকাশ পেতে থাকে। ঘনঘটাচ্ছন্ন স্তব্ধ সন্ধ্যার মাঝখানে যে প্রাণ অধীরতায় ব্যাকুলতায় আপনি আপনি গুমরিয়া গুমরিয়া কেঁদে উঠেছিল আবার সেই মুখ উজ্জ্বল করে নূতন শান্তির হাসি ফুটে উঠে।

সাহিত্যও যে এই জোয়ার ভাটার খেলা দেখতে পাওয়া যাবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছুই নাই, কারণ সাহিত্য যে জীবনেরই অভিব্যক্তি মাত্র। সাহিত্যকে জীবন হতে বিশ্লিষ্ট করে

দেখলে সাহিত্য "রস"এর পরিচয় পাওয়া যবে না। সাহিত্যের রস লেখকের জীবনের ব্যক্তিগত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। যে যুগ ভাঙ্গাগড়ার যুগ সে যুগ ব্যক্তিগত জীবনটাই বড় হয়ে উঠে। আমাদের প্রাণের আকাঙ্ক্ষাগুলি বর্ষার বর্ষণের উপর নবীন তৃণাঙ্কুরের মত মাথা তুলে গজিয়ে উঠে, তারাই তখন সাহিত্যের বাগান শোভিত করে থাকে। কিন্তু ভাঙ্গাগড়া শেষ হয়ে গেলে যখন জীবনে শান্তিবারির সেচন হয়, তখন ব্যক্তিগত জীবনের ছাপটা মুছে যায়, সাহিত্যে নব যুগের মনের মত একটা আদর্শের সৃষ্টি হয়, কিন্তু এ আদর্শও সর্ব্বকালের নয়।

আমরা মাঝে মাঝে ভুলে যাই যে আমাদের জীবনটা একটানা স্রোতের মত নয়, ক্ষুরধার নদীর স্রোতের মত শত গ্রন্থিময়। জীবন এক প্রকাণ্ড জটিল সমস্যা। আগের দিনে সমাজ সংগঠনের সময় সভ্যতার প্রথম পুষ্পটী যেদিন বিকশিত হয়ে উঠেছিল, সেদিন জীবন সহজ ছিল। সকলের মনের গতি একমুখী ছিল। জীবনে নানা বৈচিত্র্যের খেলা ছিল না, অনেকের জীবনই গতানুগতিকভাবে কেটে যেত। ঐ যুগে সাহিত্যে আদর্শ সৃষ্টি কঠিন ব্যাপার ছিল না, আর সমাজের দিক হতে তার একটা সার্থকতাও উপলব্ধি হত। আদর্শ সৃষ্টি বর্ত্তমান সাহিত্যের ধ্যানের বস্তু নয়। আমাদের বর্ত্তমান সাহিত্যে কর্ম্ম জগৎটাকে সঙ্কীর্ণ করে নিয়ে একটা সমস্যার সৃষ্টি করা হয়। এই সমস্যার অবলম্বনে মনস্তত্ত্বের বিশ্লেষণই সাহিত্যের এখন প্রধান কাজ চলেছে। এই পথ ধরেই আমাদের সাহিত্য রসের নির্ঝরের সন্ধান পেয়েছে। আমাদের পুরাতন আদর্শ সৃষ্টির সাহিত্যকে Tennyson এর Greinevere এর ভাষায় বলতে ইচ্ছা হয়—

> "I could not breathe in that fine air
> That pure severity of perfect light,
> I wanted warmth and colour".

অনেকে বলতে পারেন যে সকল দেশের সভ্যতারই একটা বিশিষ্টতা আছেই, সকল জাতীরই চরিত্রগত একটা বিশেষত্ব বর্ত্তমান আছে। সাহিত্যের উপর এই সাধারণ ধর্ম্মের ছাপ কিম্বা জাতীয়তার ছাপ আমাদের হৃদয় আকর্ষণ করে না, আমাদের চোখ পড়ে সাহিত্যের বিসদৃশ ধর্ম্মটার উপর, নব নব বর্ণরাগের উপর। ম্যাথু আরনল্ড তার Culture and Anarchy

নামক গ্রন্থের একস্থানে গ্রীকশিল্পের বিশেষত্ব সম্বন্ধে বলেছেন "Greek art and Greek beauty have their root in the same impulse to see things as they really are in as much as Greek art and beauty rest on fidelity to nature the best nature and on a delicate discrimination of what the best nature is". ম্যাথু আরনল্ড অতি অল্প কথার মধ্যে গ্রীকশিল্পের জাতীয়তার মূর্ত্তিটা নির্দ্দেশ করেছেন সন্দেহ নাই, যদি গ্রীকদের প্রতি চিত্রেই এই বিশেষত্বটুকু আমাদের অনুসন্ধান করে ফিরতে হয় তবে যে অপরূপ সৌন্দর্য্যের নির্ঝর প্রতি ছবির মধ্যে উৎসারিত হয়ে উঠেছে সে সৌন্দর্য্য আমাদের চোখে পড়বে না। সাহিত্য ও শিল্প সাধনা অনেকটা ব্যর্থ হয়ে যাবে। শিল্পের অভিনবত্ব, শিল্পের বিশেষত্ব হারিয়ে গিয়ে ওগুলি আমাদের কাছে প্রাণহীন হয়ে পড়বে।

জীবনের প্রসার যখন ক্রমশঃই বেড়ে চলেছে ও নানা দিক হতে নূতন নূতন সম্বন্ধের সৃষ্টি চলেছে, জীবনের সর্ব্বাঙ্গীন পরিণতি আর সকল সম্বন্ধের পূর্ণ সামঞ্জস্য সম্ভবপর নয়। এদিক হতে দেখলে সাহিত্যে আদর্শ পুরুষ কিম্বা আদর্শ নারীর সৃষ্টি বস্তুতন্ত্রহীন আর রস বর্জ্জিত হয়ে দাঁড়াবে এই আশঙ্কা হয়।

আদর্শ পুরুষ কি হতে পারে কিম্বা সাহিত্যে কোথায় তার আবির্ভাব হয়েছে কিনা এ নিয়ে আমরা ততটা মাথা ঘামাই না যতটা কিনা এই নারীত্বের আদর্শটা নিয়ে। "নারীত্বের আদর্শ," এর অর্থ কি? নারীর ভাব ও কর্ত্তব্যপুঞ্জ নিয়েই নারীত্ব গঠিত হয়েছে। নারীর জীবনটা যে যুগে নানা দিক হতে অনেক বন্ধন দ্বারা আবদ্ধ করা হয়েছিল, যে যুগে "ন স্ত্রীঃ স্বাতন্ত্র্যমর্হতি" এই বাক্য দ্বারা নারীর কর্ত্তব্যের গণ্ডী নির্দ্দিষ্ট হইয়েছিল সে যুগে একটা কোন আদর্শ থাকলেও থাকতে পারে কিন্তু এ যুগে যখন পুরুষের কর্ম্ম বহুল জীবনের মত নারীর জীবনও বিস্তৃত হয়ে পড়েছে, যখন নানা প্রকার বৈচিত্র্যের মধ্য দিয়ে নারীর জীবন পুরুষের জীবনের প্রতিযোগী হয়েছে তখন নারীর আদর্শের গঠন বোধ হয় একরূপ অসম্ভব বলতে হয়। এ যুগে নারীর জীবন কতটা বিস্তৃত হয়েছে তা বোঝাবার জন্য আমাদের সকলের শ্রদ্ধার পাত্রী শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু মহাশয়ার একটী বক্তৃতা হ'তে কতকটা স্থান উদ্ধৃত করছি ;

"I say that it is a time for us all women of India to awake whatever our race or caste or creed or rank in life, to awake and grasp the urgency of the situation. The immediate need of adequate and equal co-operation and the comradeship in guiding, moulding, sustaining and achieving there lovely and patriotic ideals that thrill the heart of every generation and in whose fulfilment lies the noblest destinyg of man."

সমাজে নারী ও পুরুষের অধিকার কি হওয়া উচিত এ সম্বন্ধে বঙ্কিম বাবুর "সাম্য" প্রবন্ধগুলিতে কি বলেছেন তাহাও উদ্ধৃত করছি ;—

"মনুষ্যে মনুষ্যে সমানাধিকার বিশিষ্ট। স্ত্রীগণ পুরুষের তুল্য অধিকারশালিনী।"

"কেহ কেহ উত্তর করিতে পারেন যে স্ত্রীপুরুষে প্রকৃতিগত বৈষম্য আছে। পুরুষ বলবান, স্ত্রী অবলা, পুরুষ সাহসী, স্ত্রী ভীরু, পুরুষ ক্লেশসহিষ্ণু, স্ত্রী কোমলা। অতএব যেখানে স্বভাব-বৈষম্য আছে, সেখানে অধিকারগত বৈষম্য থাকাও বিধেয়।"

স্বভাবগত বৈষম্য থাকিলেই যে অধিকারগত বৈষম্য থাকিবে তাহা আমরা স্বীকার করি না। ইংরাজের সঙ্গে বাঙ্গালীর প্রকৃতিগত বৈষম্য বর্ত্তমান আছে; তবে আমরা ইংরাজ ও বাঙালীর মধ্যে সামান্য অধিকার বৈষম্য দেখিয়া চীৎকার করি কেন?"

"যে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে অধিকার বৈষম্য দেখা যায় সে সকল বিষয়ে স্ত্রীপুরুষে যথার্থ প্রকৃতিগত বৈষম্য দেখা যায় না। যতটুকু দেখা যায় ততটুকু কেবল সামাজিক নিয়মের দোষে।"

"এখানে রমণী পিঞ্জরবদ্ধা বিহঙ্গিনী যে বুলি পড়াইবে সে বুলি পড়িবে, আহার দিলে খাইবে, নচেৎ উপবাস করিবে। পতি অর্থাৎ পুরুষ দেবতাস্বরূপ, দেবতাস্বরূপ কেন সকল দেবতার প্রধান দেবতা বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে।"

এ ধরণের কথা আমরা এই প্রথম শুনছিনা; অনেকে সমাজ সংস্কারক নানারূপে নানাছন্দে এ কথাগুলি আমাদের শুনিয়েছেন, কিন্তু কোন দিনইত এ আমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করতে পারে নাই। জানি না সমাজে এ উদারতাটুকু কবে আসবে যখন সে নারীর ন্যায্য অধিকার লাভের পথ উন্মুক্ত করে নারীকে যথার্থভাবে পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রের ও ভাব উদ্যানের

সংচরী ও সহকর্ম্মিণী করে তুলবে। জানি না পূজ্যপাদ বঙ্কিমচন্দ্র এ উদার সাম্যনীতির পরিপোষক হয়েও উপন্যাসে নারীজাতির এই দাসীত্বের ইঙ্গিত করেছেন কেন? দেবী-চৌধুরাণী "প্রফুল্ল" হয়ে যখন আবার সংসারে ফিরে আসলেন, সাগর তাকে জিজ্ঞাসা করলে "এখন গৃহস্থালীতে কি মন টিকবে?" প্রফুল্ল উত্তরে বলেছিল "ভাল লাগিবেই বলিয়া আসিয়াছি। এ ধর্ম্মই স্ত্রীলোকের ধর্ম্ম। রাজত্ব স্ত্রীজাতির ধর্ম্ম নয়।"

আর একদিন প্রফুল্ল ব্রজেশ্বরকে বলেছিল—

"আমি একা তোমার স্ত্রী নহি। তুমি যেমন আমার, তেমনি সাগরের, তেমনি নয়ান বৌ এর, আমি একা তোমায় ভোগ দখল করিব না। স্ত্রীলোকের পতিই দেবতা তোমাকে তারা পূজা করিতে পায় না কেন?"

বিচার আমাদিগকে যেখানে নিয়ে যায় সংস্কার অনেক সময়েই সেখানে আমাদের নিয়ে যেতে পারে না। জীবনে কিন্তু সংস্কার আমাদের অনেকের বেলাই বিচার থেকে বলবান হয়ে উঠে। তাই বোধ হয় বিচারের সাম্যবাদ উপন্যাসের প্রকৃত জীবনের উপযোগী করে গড়তে বঙ্কিমচন্দ্রের মত এত বড় মন ও পারে নাই। এ জন্যই সাম্যের বঙ্কিমচন্দ্রের আর উপন্যাসের বঙ্কিমচন্দ্রের মতবাদের এতটা পার্থক্য দেখতে পাওয়া গেল। শিল্প শিক্ষকতার আসনে আরূঢ় হয়ে নারীত্বের আদর্শ নির্ণয় করতে গিয়ে বিচারবুদ্ধির সিদ্ধান্তকে এভাবে দেবীচৌধুরাণীতে অবমাননা করেছে। অন্য কোন দিক হতে দেবীচৌধুরাণীর সার্থকতা থাকলেও এ দিক হতে যেন এই এর একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা পাথরের মত এর বক্ষে চেপে রয়েছে।

তারপর অন্নদা দিদির কথা নারীজাতির পাতিব্রত্য ধর্ম্মের মহিমাগীতি এই পূত চরিত্রে মুখরিত হয়ে উঠেছে এতে কোনই সন্দেহ নাই। এ আমাদের চিরকালের ব্যথিতা লাঞ্ছিতা স্ত্রীর বাস্তব চিত্র। এ হিসাবে বাস্তবিকই আমাদের নিজস্ব। এক অপদার্থ চরিত্রহীন স্বামীর জন্য নারী কত বড় কলঙ্ক মাথায় করে নিতে পারে এক নরহত্যাকারী স্বামীর জন্য নারী কত বড় ত্যাগকে বরণ করে নিতে পারে এ তারই চিত্র।

কিসের জন্য এতবড় সতীর কপালে এই অপরিসীম দুঃখ ভগবান লিখেছিলেন, যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী সতীর সঙ্গে কেন তিনি তার কপালে অসতীর কালো ছাপ পরিয়ে দিয়েছিলেন

এ প্রশ্নের সমাধান গ্রন্থকারই করেছেন ;—"এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সংমিণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ তাহা জানি। তাহার সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া জগতের সমস্ত নারীজাতিকে কর্ত্তব্যের ধ্রুব পথে আকর্ষণ করিতেছ।"

"তার পর আর এক দিন যখন দিদি হাতের নোয়া জলে ফেলেদিলেন, মাটী দিয়ে সিঁথের সিন্দূর তুলে ফেলে সদ্য-বিধবার সাজে কুটীরে ফিরে এলেন তখন ইন্দ্রনাথ বুঝল এই শাহজীই অন্নদা-দির স্বামী।"

ইন্দ্র সন্দিগ্ধকণ্ঠে প্রশ্ন করল "কিন্তু তুমি যে হিন্দুর মেয়ে, দিদি !"

দিদি বলিলেন "হাঁ, বামুনের মেয়ে। তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন।"

ইন্দ্র ক্ষণকাল অবাক হইয়া কহিল "জাত দিলেন কেন ? দিদি বলিলেন—"সে কথা ঠিক জানিনে ভাই—কিন্তু তিনি যখন জাত দিলেন—তখন আমারও সে সঙ্গে জাত গেল। স্ত্রী "সহধর্ম্মিণী" বই ত নয়। এ প্রসঙ্গে এখন আমার বক্তব্য বলব।

স্ত্রী যে স্বামীর সহধর্ম্মিনী এ সত্য আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু যেখানে দেখ্‌তে পাই যে স্বামীর কোন ধর্ম্মই নাই, সেখানে স্ত্রীরও নিজের ধর্ম্ম বিশ্বাস ত্যাগ করাই "সহধর্ম্মিনীর আচরণ করা হবে কিনা সে কথাটাও বিচারের বিষয়। সর্ব্বতো ভাবে স্বামীর অনুগমন করাই কি স্ত্রীজাতির "কর্ত্তব্যের ধ্রুবপথ ?" তার নিজের কি একটা মত কিম্বা বিশ্বাস থাকৃতে পারে না যে স্বতন্ত্র ভিত্তির তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠ্‌তে পারে ? প্রতি পদে পদে এই বিশ্বাস কিম্বা মতকে পদদলিত করায়—কি সার্থকতা আছে আমি জানি না। এই অবমাননার পদাঙ্ক ললাটে ধরে—দুঃখ দৈন্যের ভিতর দিয়ে এই যে নারীজাতি নিজের কর্ত্তব্য পথে অকম্পিত চরণে চলেছে তাকে আমরা কেবল উচ্চকণ্ঠে বাহবাই দিচ্ছি, কোন দিনই কি ভেবে দেখেছি যে কি করলে এই শত শত যুগের পঙ্কতিলক মুছে গিয়ে পুরুষের ও সমাজের শ্রদ্ধা ও ভক্তির পূত চন্দনে ও সিন্দুর লেখায় তাদের ললাট উজ্জ্বল হয়ে উঠ্‌বে ? স্ত্রীর এই আত্মবলিদানের মধ্যে, স্বামী দেবতার পূজার জন্য চিরকালের জন্য দুঃখকে বরণ করে নেওয়াতে সব সময়েই যে একটা প্রকাণ্ড সার্থকতা আছে একথা আমার মনে হয় না। যে

পাতিব্রত্য স্বামীর ইচ্ছার বশবর্ত্তী হয়ে পর পুরুষের কাছে নিজেকে দান করতে উদ্যত হয়েছিল, যে পতিভক্তি বৃদ্ধ স্বামীর অনুরোধ রক্ষার জন্য তাকে কাঁধে করে নরকের দ্বারে নিয়ে গিয়েছিল সে পাতিব্রত্যের কিম্বা পতিভক্তির মূল্য কি? আজ আমাদের প্রধান কর্ত্তব্য এই হবে যে ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর সামাজিক শান্তির সৌধ নির্ম্মাণ করা, আর সমাজের যে শক্তিটা নারীজাতির ব্যক্তিত্ব বিকাশের পথ সঙ্কুচিত করে ফেলেছে, যে শক্তি ব্যক্তিত্বের প্রকাশে অশান্তির আশঙ্কায় ব্যক্তিত্বকে লুপ্ত করবার জন্য চারিদিক হতে নিয়মের বেড়া তুলে ধরেছে সে শক্তির উচ্ছেদ-সাধন করা। কারণ বর্ত্তমান সমাজের অবস্থায় স্ত্রীর আত্মার বিকাশ ঘটতে পারে না, নারীজাতির ধর্ম্মজীবন নৈতিক ও সামাজিক জীবন বজ্রাহত বৃক্ষের মত আর বাড়তে পারে না।

তারপর জর্জ্জ ইলিয়টের রমলা উপন্যাসে রমলা-চরিত্র। নারীজাতির আত্মপ্রতিষ্ঠা এ চরিত্রে বিশেষ সুন্দরভাবে ফুটে উটেছে। ধাপে ধাপে স্বামী Teto যখন অবনতির সোপানে নেমে যাচ্ছিল, রমলারও স্বামীর প্রতি প্রথম প্রভাতের শিশিরের মত টল টল নির্ম্মল প্রেম শ্রদ্ধা ভক্তি ক্রমেই যেন কোথায় অন্তর্হিত হয়ে চলল।

রমলাও অনেক সহ্য করেছিল, কিন্তু ভিতরের জ্বালা ক্রমশঃই বেড়ে চলেছিল। একদিন আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্রাবের মত সে এক নিঃশ্বাসে তার অবরুদ্ধ ঘৃণা ও অবজ্ঞা প্রকাশ করে ফেলল।

"আমি সবই জেনেছি। সেই বুড়া মানুষটী তোমার কি হন সে খবরও আমি পেয়েছি। তিনি তোমার পিতৃস্বরূপ, তার কাছে তুমি এত বেশী ঋণী যে তুমি যদি তার নিজের ছেলে হতে তাহলেও এ ঋণের বোঝা তোমার এর চাইতে বাড়তি হত না। তার প্রতি তুমি যে ব্যবহার করেছ সে তুলনায় আমার বাবা বিশ্বাস করে যে কাজের ভার তোমায় দিয়ে গিয়েছিলেন সে কার্য্যে অবহেলা আর প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ বিশেষ আশ্চর্য্যের কথা নয়। * * * আমিও মানুষ, আমারও হৃদয় আছে। তোমার এই হেয় কাজগুলির জন্য আমার হৃদয়ে শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্থানে অবজ্ঞা ও ঘৃণা এসেছে। আমাদের মিলন একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা, মিথ্যাকে আশ্রয় করে বিবাহের পবিত্র বন্ধন টিকতে পারে না।"

• যে শিক্ষার বলে নারী আপনার ব্যক্তিত্বের সন্ধান পায়, সে শিক্ষা রমলার যথেষ্ট হয়েছিল, তাই অন্যায়ের ও অত্যাচারের বিরুদ্ধে তার হৃদয় বিদ্রোহ ঘোষণা করল—হোক্ না সে অন্যায়কারী ও অত্যাচারী তার স্বামী। বিবাহবন্ধনই স্ত্রীলোকের একমাত্র গতি, স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তনই স্ত্রীর কর্ত্তব্য, এ ভিন্ন অন্য গতি আর কর্ত্তব্য তার নাই এ সংস্কারের হাত থেকেও সে নিজেকে মুক্ত করেছিল। পরবর্ত্তী জীবনটা সে একটা প্রকাণ্ড কাজের মধ্যে নিজেকে সমর্পণ করল। পত্নীত্বের ভাব ঘুচে গিয়ে মাতৃত্বের অপরূপ সুষমায় তার মুখখানি উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল।

আজ আমরা সেদিনের প্রতীক্ষায় রয়েছি যে দিন নারীজাতি যথার্থ ও উপযোগী শিক্ষা পেয়ে তার ব্যক্তিত্বের শক্তি প্রাণে প্রাণে অনুভব করবে—সে দিন স্বামীর ও সেই সংসারের শুধু দাসীবৃত্তি অবলম্বন না করে সে সেবাচরণের সঙ্গে সঙ্গে পুরুষের কর্ম্মের সহযোগিনী ও প্রতিযোগিনী হয়ে উঠ্‌বে। সেবাবৃত্তি মন্দ জিনিষ নয় কিন্তু সেবকের যেখানে কোনই স্বাধীনতা নাই সেখানে সেবকত্ব—দাসত্ব ভিন্ন আর কিছুই না। শিক্ষার প্রসাদে আজ তাদের কারাগারের অর্গল উন্মুক্ত হউক, রাষ্ট্র জাতি ও দেশে আজ যে মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে চলেছি তারাও আজ সে মন্ত্র গ্রহণ করুক, "মহাসাগরের গান" তাঁদের প্রাণকে এক আকুল উন্মাদনায় ভরে দিক—তবেই তাঁদের মঙ্গল, তাতেই দেশের কল্যাণ ও শক্তি।

শ্রীঅশ্রুমান্ দাশ গুপ্ত।

দেহ ও আত্ম।

দেহটারে ভাল বাসিতে না পারো
নাহিক ক্ষতি
দেহাহিতে ভাল বাসিতেই হবে
ওগো ও সতি।

পুরাজনমের পাপ অর্জ্জিত
এই দেহখান রূপ বর্জ্জিত
মৃণালের মত তাই তার হলো
পঙ্কে গতি।
আত্মা আমার রাঙা ঢল ঢল
সরোজ সম
মধু সৌরভে গৌরবে তব
চরণ রম।
শতদলে সে যে রহিবে আঁকড়ি
কেমনে তাহারে যাবে পরিহরি ?
অনাদরে তারে কেমনে ঠেলিবে
সরস্বতী ?

শ্রীকালিদাস রায়

অভিভাষণ

—:*:—

আজ আবার বহুদিন পরে এই নারীসমিতির সমবেত নারীমণ্ডলী আমার প্রিয় ভগ্নীদিগের নিকট কিছু বলিবার জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছি। তাঁহারা আবার আজ একবার তাঁহাদের এই দীনা ভগ্নীকে স্মরণ করিয়াছেন। নারী হইয়া নারীদিগের জন্য কিছু বলিতে পাইব ; নারীর জন্য নিজের চিন্তাশক্তিকে, নিজের দৈহিক শক্তিকে নিয়োগ করিবার সুযোগ আজ আবার

* রাঁচি নারী-সমিতিতে পঠিত।

উপস্থিত হইয়াছে এজন্য এই আমার ভগ্নীরা, আমার মায়েরা সকলেই আমার কৃতজ্ঞতাভাজন! ইঁহাদের সহযোগে থাকিবার সৌভাগ্য আমার বড় বেশী হয় না, ইঁহাদের শুভকার্য্যে সোৎসাহিত করিবার সুযোগ ততোধিক অল্প তাই আজ একবার ভাবিয়া দেখিতেছি এমন কি কথা আজ বলিয়া এই সুবর্ণসুযোগকে সফল করিব—যাহা ধ্বনিমাত্র নহে, শব্দমাত্র নহে, কিন্তু আদ্য শক্তির শক্তিসম্ভূত? যাহা পরশ পাথরের মত এই প্রাণহীন নারীসমাজকে স্বর্ণরূপ দিতে পারে, মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্রের মত নব জীবনে পল্লবিত পুষ্পিত করিয়া তুলিতে পারে!

কি কথা হইতে আরম্ভ করিব তাহাই যে ভাবিয়া পাই না। শুধু আমাদের নারী কবির দুচার ছত্র মনে পড়িতেছে সমস্ত হৃদয়কে রক্তের তরঙ্গে আলোড়িত করিয়া—

"কেমনে আমোদে কাটাস্ দিবস
কেমনে ঘুমায়ে কাটাস্ নিশি
তোদের রোদন বিদারি গগন
দিক্ হতে কেন ছুটে না দিশি
রমণীর তরে কাঁদে না রমণী
লাজে অপমানে জ্বলে না হিয়া
রমণী শকতি অসুরদলনী
তোরা নিরমিত কি ধাতু দিয়া?

আবার— কেমনে আমোদে কেটে যায় দিন
সুখের স্বপনে রজনী যায়
নারীর চরম দুর্গতি নেহারি
নারীর হৃদয় টলে না তায়!"

আর কি বলিব? আমাদের যে সর্ব্বস্ব গিয়াছে, হৃদয়ের সর্ব্ববিভব হারাইয়া একেবারে নিঃস্ব সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছি। হায় রে নারীর দুর্গতি, ভারতমাতার দুরদৃষ্ট! কি ছিল আর কি হইয়াছে? জগতের চিরপূজনীয়া প্রাতঃস্মরণীয়া যে সকল ভারতনারীর বংশে আমাদের জন্ম, যাঁহাদের পবিত্র রক্তধারা আজও আমাদের ধমনীতে বহিতেছে তাঁহাদের নাম কি শাস্ত্র দেখিয়া

উদ্ধার করিতে হইবে? ভারতের যে নারী একদিন গার্গীরূপে রাজসভায় শাস্ত্রালোচনা করিয়াছেন, যে নারী লীলাবতীরূপে বড় বড় অঙ্কপ্রণালী উদ্ভাবন করিয়াছেন, যে নারী খনারূপে জ্যোতিষ বিদ্যা করায়ত্ত করিয়াছিলেন, যে নারী মৈত্রেয়ীরূপে ধনসম্পদ, সুখৈশ্বর্য্য পরিত্যাগ করিয়া অমৃতের অমৃত মন্ত্র বলিয়াছিলেন –

"যেনাহং নামৃতা স্যাম কিমহং তেন কুর্য্যাম্"

কিনা যাহাতে আমি অমৃতা না হইব, তাহা লইয়া আমি কি করিব?—যে নারী সুভদ্রারূপে যুদ্ধ-রথ চালনা করিয়াছিলেন, যে নারী গান্ধারীরূপে স্বামীর জন্য আপনার চক্ষু আবৃত করিয়া ত্যাগের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছিলেন সেই নারীর কোলেই কি আমাদেরও জন্ম নহে? আর কত নাম করিব; নাম করিয়া কি কখন আমাদের ভারতের পূর্ব্ববর্ত্তিনী নারীমণ্ডলীর গুণাবলী শেষ করিতে পারিব? আর আজ? লজ্জায় অধোবদন হইতে হয়। চক্ষের জল আর রোধ করা যায় না! এই জ্ঞানের কর্ম্মক্ষেত্র, ধর্ম্মের ধর্ম্মক্ষেত্র, ভারতের একি যুগযুগান্তরব্যাপী অজ্ঞানান্ধকার ঘনাইয়া উঠিয়াছে? আমাদের দেশের দুর্গতি আর হবে না কেন? ডাল করিয়া সেই ডালে কুঠারাঘাত করিলে ভূপতিত হইবে না কেন? আমরাই যে আমাদের মূলোচ্ছেদ করিয়াছি, আর কে আমাদের রক্ষা করিতে পারে? আমাদের দেশের সন্তানের জননীরা, আমাদের দেশের ভবিষ্যৎ-আশা ভরসার জন্মদায়িনীরা যে অজ্ঞানান্ধকারে একেবারে ডুবিয়া রহিল, সুসন্তান জন্মিবে কেমন করিয়া? লক্ষ্মী, সরস্বতীর মত কন্যা ও দেবসেনাপতি কার্ত্তিকের ও গণপতির মত পুত্র চাহিলে যে জগদ্ধাত্রীর মত মা গড়িতে হইবে!

এখন প্রশ্ন এই,—বুঝিলাম ত সব কিন্তু কার্য্যারম্ভ করি কেমন করিয়া, কোথা হইতে? যে দিকে চাহি সে দিকেই এই নারীর দুর্গতি, ভারতের বুকজোড়া এই ব্যথা দূর করি কোথা হইতে? তাই বলি বোন্ এ আর বাচবিচার করিয়া কাজ নাই, দেশপ্রদেশ ভিন্ন করিয়া, জাতিধর্ম্ম বিচার করিয়া এ কাজ আরম্ভ করিলে চলিবে না, এযে তুমিও যে আঁধারে—আমিও সে আঁধারে! তোমরা বলিবে আমরা ত বেশ আছি গৃহলক্ষ্মী পুরকামিনী হইয়া আমরা দিব্য আরামে আছি কোন দুঃখ বোধই ত আমাদের আহার নিদ্রা ত্যাগ করায় নাই; তবে

আমি বলি ভগ্নীগণ ঐ ত কুলক্ষণ, যে ক্ষত স্থানে বেদনার সাড়া নাই সুচিকিৎসক যে সেই ক্ষত স্থানকেই ভয় করেন। আমাদেরও যে হইয়াছে তাই, আমাদের যে কতদূর অধঃপতন হইয়াছে তাহা বোধ করিবার শক্তি আমাদের নাই! সে বেদনা যে দিন জাগিবে সে দিন উপায় উদ্ভাবিত হইতে বিলম্ব হইবে না। আমরা দিবা রাঁধি বাড়ি স্বামীপুত্রগণকে খাওয়াইয়া পান মুখে দিয়া পাড়া প্রতিবেশীদিগের সহিত নিন্দা গুজব করিয়া সুখে আছি, যেন জীবনের উদ্দেশ্য ঐ! এ তুচ্ছ সুখসম্ভোগস্পৃহা ও বিলাসেচ্ছা ত কোন কালে আমাদের ভারতের নরনারীকে এমন করিয়া ভূতে পাওয়ার মত পাইয়া বসে নাই তবে এমন কেন হইল?

আমরা কেন উপরে মজিলাম, ভিতর দিকে একবার চাহিয়া দেখি না? শক্তিরূপিণী জগন্মাতার অংশভূতা আমরা, শক্তির আধার এই প্রাণ যে সমাজশাসনের কুসংস্কারে নিষ্পেষণে অর্দ্ধমৃত হইয়া আছে! একবার তাহাকে মুক্তি দিয়া দেখি—একবার তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া দেখি কিনা হইতে পারে? জ্ঞান, ভক্তি কর্ম্মমার্গ, নারীত্ব দেবীত্ব সব যে এই প্রাণের মধ্যে ঘুমাইয়া আছে! জাগাও দেখি বোন্, জাগে কিনা জাগে একবার দেখ দেখি! এই যে পরিবর্ত্তনের দিনে আমাদের ভারতে নূতন নূতন ভাববন্যার ঢেউ উঠিতেছে, যুগান্তরের দিনে যুগসবন্যার তুফান বহিতেছে, অবস্থা বিপর্য্যয়ের ভাঙ্গাগড়া চলিতেছে তাহার অনুভূতি অন্তঃপুরে আসিয়া পৌঁছায় না? আমাদের দেশের কয়টা মেয়ে জানে দেশের চিন্তাধারা কার কোন দিকে বহিতেছে? যে নারী পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গ, যে নারী দেশের অর্দ্ধাঙ্গ সে নারী অপর অর্দ্ধাঙ্গের আঘাত বেদনার কথা কিছুই জানে না! প্রথমতঃ আমরা নিজেরাই জানিতে চাহি না, আমাদের সংসারই আমাদের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ঢাকিয়া রাখে, আমরা পুরুষের কামনার কামিনী বটে, কিন্তু কর্ম্মের সঙ্গিনী নহি, দ্বিতীয়তঃ পুরুষেরাই জানান আবশ্যক বিবেচনা করেন না। তাঁহারা জানেন আমাদের হৃদয় সঙ্কীর্ণ; আমাদের ধারণা অতদূর প্রসারিত নহে উপরন্তু আমরা কোনরূপ সংপরামর্শ দিতে সক্ষম নহি, কেবল কলহে তৎপর। এ সমস্ত কারণই কি দারুণ লজ্জার কথা নহে?

আমাদের অভিযোগ আমাদের দেশ নারীজাতির সম্মান করিতে জানে না। নিজের মান নিজে রাখিলে কাহার সাধ্য অসম্মান করে? আত্মরক্ষা করিবার জন্য যে বিদ্যা বুদ্ধি

মনের শক্তি কই, ধর্ম্মবিশ্বাস, ভক্তির জোর কই? তাই আজ পথে ঘাটে সর্ব্বত্র নারী অপমানিতা, লাঞ্ছিতা! শাস্ত্রকারগণ তাই শাস্ত্রের দোহাই দিয়া নিয়ম বাঁধিলেন, লৌহ অপেক্ষাও কঠিনতার শৃঙ্খলে নারীকে অন্তঃপুরে বন্দী করিলেন, তাই আজ নারী গোক লক্ষ্মী, দেশলক্ষ্মী, জগৎলক্ষ্মী না হইয়া ঘেরাটোপে অন্তঃপুর লক্ষ্মী হইয়া হইয়া বিরাজ করিতেছেন। তাই বলি যোন ভারতনারীর জীবনবীণা একবার ভাঙ্গিয়া আর একবার নূতন সুরে নূতন ছন্দে বাঁধিয়া তুলতে হইবে। মধ্যযুগের অজ্ঞানান্ধকারের পর আজ আমরা বর্ত্তমান নারীজাতি যে আলোর পথে চলিয়াছি তাহা পাশ্চাত্যের বৈদ্যুতিক আলো ভারত-বাগানের ধ্রুব জ্যোতি নহে! তাই জীবনবীণা এমন বেসুর বলিতেছে, তাই মহৎ-উদ্দেশ্যে কেবল বিরুদ্ধবাদ, তাই পরস্পরের মাঝে এত দ্বেষ, হিংসা, দলাদলি, মঙ্গল কার্য্যের নিন্দা অপবাদ ও বাধাপ্রদান করিয়া আমাদের এই পাশবিক আনন্দ! হায় রে অবনতি! আমাদের দেশের পুরুষদিগের মধ্যেও এই সকল দোষ বর্ত্তমান, তাই ত ভারত এই ক্রমোন্নতর দিনেও নিশ্চেষ্ট নিষ্ক্রিয়! কোন মহৎ কার্য্যে ভাবের আদানপ্রদান না হইলে, নূতন নূতন চিন্তাধারা আসিয়া না মিশিলে, ভাবের গতি না খেলিলে কর্ম্মের ধারায় যে আবিলতা জমিবেই জমিবে। পরস্পরের সাহচর্য্য কর্ম্মের যে শক্তি তাহা পাশ্চাত্য দেশে জ্বল্ জ্বল্ করিতেছে। এ শিক্ষা তাহাদের নিকট এখনও আমাদের শিখিবার বাকি আছে। এই একতা আমাদের মাঝে যত দিন না আসিবে আমরা কোন কার্য্য সুচারুরূপে চালাইতে পারিব না!

তাই বলিতেছিলাম এই অন্ধ দেশে যাঁহারা সত্যের আলো দেখিয়াছেন তাঁহারাই আজ একবার পথ প্রদর্শিকা হইয়া দাঁড়ান আমরা তাঁহাদের পদানুসরণ করিয়া ধন্য হই! এ মরা দেশে একবার জীবন দাও, নারী আবার জ্ঞানদায়িনী শক্তিরূপা সর্ব্বার্থসাধিকা মা হইয়া সন্তান পালন করুক্। এ আলো কিসের আলো? সুশিক্ষার আলো! তবে যে শিক্ষা বলিতে নাম স্বাক্ষর করা কিম্বা দু একখানি প্রেমলিপি লিখিতে শেখা বুঝায় অথবা মুখের আস্ফালন অন্তঃসার শূন্য জীবনক্ষেত্রকে শুখাইয়া ফেলে তাহা নহে! যে শিক্ষা নারীকে জ্ঞানে, বিদ্যায়, পরমার্থ জীবনে, সতীত্বে, তেজস্বীতায় দেবীত্বের আসনে তুলিয়া বসাইতে পারে সেই শিক্ষা দিতে হইবে। যাহা সঙ্কীর্ণতার বেড়া ভাঙ্গিয়া সার্ব্বজনীন উদারতার কথা

বলে, যাহা কুসংস্কারের কাঁটাগাছ তুলিয়া জীবনকে উর্ব্বর করে, যাহা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষের ফল গাছে অমৃতের ফল ফলায়!

ভারতগবর্ণমেণ্টের নিকট কাঁদাকাটি করিয়াও আমরা এতাবৎকাল পর্যান্ত এতগুলি বালিকা বিদ্যালয় পাই নাই যাহাতে ভারতের ঘরে ঘরে যে জড়তার অন্ধকার জমিয়া আছে তাহা দূর হইতে পারে। এই কোটী কোটী মূর্খের দেশে যে কয়টী স্কুল কলেজ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে তাহা মুষ্টিমেয়, এবং তাহাতেও আমাদের আদর্শানুযায়ী শিক্ষা দেওয়া হইতেছে না। যেরূপ সাজ সরঞ্জাম, আসবাবপত্র ও আড়ম্বরের সহিত আজকাল স্কুল কলেজ খোলা হইতেছে তাহা কোনকালেই আমাদের দেশের শিক্ষাপ্রণালী ছিল না। যে দেশের তপোবনে আদর্শ স্বভাব গঠনের জন্য ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের ব্যবস্থা ছিল সে দেশে এই অভাব দৈন্যের দিনে পাশ্চাত্যের ঐ ব্যয়সাপেক্ষ প্রণালী অনুসরণ করিলে যে কোনকালে কৃতকার্য্য হইতে পারিব না তাহা বলাই বাহুল্য। ঘরে ঘরে, বঙ্গপল্লীর অঙ্গনে অঙ্গনে, শ্যামল মাঠের কোলে, গাছের তলায়, বিদ্যালয় সৃষ্ট করিয়া দেখ এ ভারত আবার সতীতীর্থ হয় কি না। এ সকল বিদ্যালয়ে আমরা শিক্ষয়িত্রী চাই না, 'টিচার' চাইনা, দিদি, মা, সখী। যাহারা ভয়ের মূর্ত্তি দেখাইয়া সন্ত্রস্ত করিবে না, কিন্তু আনন্দময়ীর রূপে স্নেহ দিয়া, আদর দিয়া, ভালবাসা দিয়া খেলার ছলে তরুণ কোমল মনপ্রাণগুলিকে আদর্শনারীর ভাব জীবনের ছাঁচে ঢালাই করিয়া গড়িয়া লইবে। বিদ্যাশিক্ষাই যে মনের সিংহদ্বার—সে দ্বার একবার স্বর্ণকাঠি স্পর্শে খুলিতে পারিলে কত উচ্চ হইতে উচ্চতর ভাবও প্রবেশ করান কঠিন নহে। এই স্পর্শমণি প্রথম ছোঁয়ান চাইই। যাঁহারা এ শিক্ষা দিবার ভার গ্রহণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে কর্ম্মী হইয়া নামিবেন তাঁহাদের ধর্ম্মপ্রাণ সর্ব্বত্যাগী জীবনের জীবন্ত আদর্শই যে ভাববন্যা ডাকিয়া আনিবে, সকলকে জাগাইবে, পালন করিয়া তুলিবে, পবিত্র করিবে। শুধু বিদ্যালয় নহে সমবেত সঙ্ঘশক্তিও যদি এ ভার গ্রহণ করেন তবে অনেক উপকার হইতে পারে। য়োরোপ, আমেরিকা, জার্ম্মেণী, ফ্রান্স প্রভৃতি স্থানে এই সঙ্ঘশক্তি কিনা করিতেছে? অত বড় বড় রাজ্য, সৈন্যদল, নৌবাহিনী, রাষ্ট্রনীতি সবই সুশৃঙ্খলায় চালনা করিতেছে। আর আমরা ছোটখাট সভাসমিতি তাহাও চালাইতে পারি না রেষারেষি করিয়া, দ্বেষহিংসা করিয়া

প্রাণের মহৎ উদ্দেশ্যের উদ্বোধনকালেই কল্পনার স্বর্গকে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া ধূলিলীন করি। একবার সেই প্রেমে গোড়াপত্তন করিয়া কার্য্যারম্ভ করি, এস বোন, যে প্রেমে বৌদ্ধনারীগণ বড় বড় মঠ ও বিহার গঠন করিয়া আদর্শ-জীবন আঁকিয়াছিলেন। বলিতে লজ্জা হয়, হৃদয় ব্যথিত হয়, এই যে সব নারীসমিতি, মহিলাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইতেছে তাহাতেও যেন জীবনের সাড়া নাই, প্রাণের চেতনা নাই। যেন এ সকল সভাসমিতির কোন উদ্দেশ্যই নাই। সমিতি অর্থে তাহাই বুঝায়, যাহা পরস্পরের মধ্যে একটী প্রেমসূত্র বাঁধিয়া দেশের সর্ব্বপ্রকার হিতকর কার্য্যে প্রবুদ্ধ করে। আমাদের দেশে মহিলাদিগের জন্য যতগুলি সভাসমিতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে সবগুলি যদি এক যোগে এক উদ্দেশ্য আদর্শ রাখিয়া কার্য্যে ব্রতী হয় তবে ত দেশে আবার মানুষ হইয়া উঠে। একের কার্য্যে যদি অপরের সাহায্য অপরের সহানুভূতি পাওয়া যায়, একের উদ্দেশ্য যদি অপরের উদ্দেশ্য মিলিয়া যায় তবে যে সঙ্ঘ গড়িয়া উঠিবে তাহা আবার দেশকে মৃত্যুমুখ হইতে টানিয়া আনিতে সক্ষম হইবে। নারী হইয়া যদি আমরা নারীর উন্নতির পন্থা বাহির না করি, নারীর জন্য স্বার্থত্যাগ না করি তবে নারীর দুঃখ আর দূর হইবে না। এ দুঃখ দিন দিন গুরুতর হইয়া—সর্ব্বনাশের মুখে লইয়া যাইতেছে, দেশকে রসাতলে ডুবাইতেছে। ভগ্নিগণ তাই আজ তোমাদের হাতে ধরিয়া বলিতেছি "আবার তোরা মানুষ হ।"

এই সকল সভাসমিতি কিভাবে কার্য্য করিলে ভারতে আবার আদর্শ জীবনের ধারা বহিতে পারে তাহার একটী মোটামুটী তালিকা আমাদের হস্তগত হইয়াছে। যে সকল তেজস্বী, সর্ব্বত্যাগী, লোকহিতৈষী প্রাণ আমাদের হৃতসর্ব্বস্ব ধন ফিরাইয়া দিবার মানসে এই প্রণালীগুলি স্থির করিয়াছেন তাঁহাদের চরণে হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিয়া আজ আমাদের ভগ্নীগণের নিকট সেই তালিকা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিয়া প্রদর্শন করিতেছি। আমার বিনীত মিনতি, আপনারা ইহা শুনিয়া নির্লিপ্ত হইয়া থাকিবেন না, এ বিষয়টীকে ভস্মচাপা পড়িতে দিবেন না, আলোচনা করিয়া, বাদানুবাদ করিয়া, চিন্তা করিয়া, দেহমনের শক্তি প্রয়োগ করিয়া এ আগুণ জ্বালাইয়া তুলিতে যত্নবতী হউন। সমিতিগুলি নিম্নলিখিত বিভাগে বিভক্ত হওয়া উচিত :—

(১) আদর্শ জীবন গঠন

(২) ।

(৩) স্ত্রী

(৪) নারী-শিল্প

(৫) আকস্মিক সাহায্যদান

(৬) পতিতা উদ্ধার

ন—

(১) ধর্ম্মবিশ্বাস ও পরমার্থ-ভিত্তির উপরই আদর্শ ... গঠিত হয়। আমাদের সমিতির প্রত্যেক সভ্যার আপনাপন জীবন এই আদর্শে গঠন করাই জীবনের প্রধান লক্ষ্য।

ধর্ম্মকে আমরা রাখিলে ধর্ম্মই আমাদের রাখিবেন এসত্য যেন বিস্মৃত না হই। এমন ধর্ম্মজীবন গড়িতে হইবে যাহার দর্শনে, স্পর্শনে, সাহচর্য্যে নব নব জীবনে ভগবদ্ভক্তির বোধন হইবে।

ভাবপ্রচার—

(২) নারী জাতির ভাবজীবন গঠনের কথা মাসিক পত্রিকা, সুলভ মূল্য পুস্তক, অন্তঃপুর-প্রচার ও কথকতার সাহায্যে সমগ্র ভারত ছড়াইয়া দিতে হইবে। এই সকল কার্য্য সমিতির সভ্যাগণের দ্বারা সাধিত হইলেই সর্ব্বতঃ মঙ্গল।

(৩) স্ত্রীশিক্ষা—

একটী সমিতিকে কেন্দ্র সমিতি (Central Committee) করিয়া তাহারই শাখা প্রশাখা সমিতিগুলির দ্বারা ঘরে ঘরে অন্তঃপুর মধ্যে স্ত্রী শিক্ষার বিস্তার করা কর্ত্তব্য।

(৪) নারী-শিল্প—

ভারতের সর্ব্বপ্রকার প্রাচীন ও নবীন নারী-শিল্পের প্রচার। এই সমিতির সভ্যা মহিলা দিগের নিকট হইতে শিল্প শিক্ষয়িত্রী নারীগণ এই সকল শিল্প শিক্ষা করিয়া নিজে আপন আপন সংসারকে শ্রী-সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত করুন। দরিদ্রা অসহায়া নারীগণ কেন্দ্রসমিতির সাহায্যে অল্প সময়ের মধ্যে শিল্পদ্রব্য প্রস্তুত করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিতে সক্ষম হউন। কেন্দ্র-সমিতি এই সকল দ্রব্য বিক্রয়ের ভার গ্রহণ করুন।

(৫) আকস্মিক সাহায্য দান—

সমিতির ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া যে অর্থ উদ্বৃত্ত থাকিবে তাহা বিপন্না নারীগণকে আকস্মিক বিপদে আকস্মিক সাহায্য দান করিবার জন্য রক্ষিত হউক। অন্নবস্ত্রহীনা অনাথাকে অভাবোপযোগী অন্ন বস্ত্র ও পীড়িতা, আতুরা রমণীকে ঔষধ পথ্যাদি যোগাইয়া এই অর্থের সদ্ব্যয় হউক।

(৬) পতিতা উদ্ধার—

যে সকল নারী ক্ষণিক পদস্খলনের ফলে ইহ পরকাল হারাইয়া সমাজের অস্পৃশ্য হইয়াছে পাপ বাসনা ভিন্ন যাহাদের আর জীবিকা উপার্জ্জনের কোনরূপ উপায় নাই, তাহাদের ধর্ম্মপথে আনিবার চেষ্টা করা হউক। ভগবৎ প্রেম—যাহা জ্ঞানী মূর্খ, ধনী নির্ধন, সাধু পাপী সকলের উপর সমভাবে নিরন্তর বর্ষিত হইতেছে, তাহাদিগকে সেই ভগবৎ প্রেমের আশ্রয় দিয়া অনুতাপের আগুন জ্বালাইয়া সর্ব্ব পাপ পুড়াইবার চেষ্টা করা হউক। এবং তাহার সহিত কোনরূপ লোকহিতকর কার্য্যে ব্রতী রাখিয়া তাহাদের ভরণপোষণের জন্য যৎসামান্য অর্থ সাহায্য করা হউক্। এ কাজ বড় শক্ত, বড়-প্রচণ্ড মনের জোর, বড়-প্রবল সাধনা-শক্তি থাকা চাই; তবু এযে করিতেই হইবে, নহিলে যে সমাজ রসাতলে যায়। নারীর এ দুর্গতি নারীই বুঝিবে ভাল, নারীই ইচ্ছা করিলে দূর করিতে পারিবে।

যে সকল উপযুক্ত জাগা মেয়ের দ্বারা এই সকল সমিতির কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে তাঁহারাই অন্যান্য সভ্যাগণের মধ্য হইতে উপযুক্ত মেয়ের উপর উপযুক্ত কার্য্যভার অর্পণ করুন্; যিনি যে কার্য্যে অভিজ্ঞা তাঁহাকে সেই কার্য্যে ব্রতী করুন। যাঁহারা সমিতির পক্ষ হইতে স্বেচ্ছায় এ কার্য্যভার গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের নিকট সমিতি চিরকৃতজ্ঞ থাকিবেন। যাঁহাদের সে সাধ্য নাই আর্থিক সাহায্য ভিন্ন যাঁহারা কার্য্য করিতে অক্ষম, সমিতি তাঁহাদের ব্যয়ভার বহন করিবেন। কিন্তু সে সকল গৃহস্থের বাটীতে বিদ্যাশিক্ষা অথবা শিল্পশিক্ষা দিবার জন্য মহিলারা যাইবেন তাঁহাদের নিকট কপর্দ্দকও গ্রহণ না করিয়া এসকল কার্য্য করুন। এ অযাচিত উপকার পাইলে কখনই কেহ কোনরূপ আপত্তি করিবেন না। এ সকল কার্য্যের জন্য যে অর্থ আবশ্যক, সমিতির সভ্যাগণ আপনাপন সাধ্যানুরূপ মাসিক সাহায্য দান করিয়া সে ব্যয়ভার পূর্ণ করুন।

এই ত গেল মোটামুটি কথা, তার পর যদি আমরা সত্যই কার্য্যক্ষেত্রে নামি, যদি আমাদের ভাগ্যে—ভারতের ভাগ্যে সে সৌভাগ্য-রবি সত্যই উদিত হয় তখন আরো পুঙ্খানুপুঙ্খ কার্য্য-প্রণালীর তালিকা আপনা হইতেই প্রস্তুত হইয়া উঠিবে। ইংরাজিতে একটী কথা আছে—ইচ্ছা থাকিলে উপায় হইবেই। কত উৎসাহ উপযুক্ত ক্ষেত্রের অভাবে শুখাইয়া যাইতেছে, কত প্রতিভা দৈনন্দিনের তুচ্ছ কর্ম্মের তলায় চাপা পড়িয়া মরিতেছে, কত শক্তি সমাজ-শাসনে শাস্ত্র-বন্ধনে পেষিত হইতেছে তাহার কি আমরা হিসাব রাখি? এই আমাদের মধ্যেই কতজন কার্য্য করিতে পারি, অচেতনার জড়তা চূড়মার করিয়া কতবড় প্রলয় কাণ্ড বাধাইতে পারি তাহা কি আমরা নিজেরাই জানি?

ভগ্নিগণ এই যে আত্মশক্তির শক্তি আমাদের মাঝে লুকাইয়া আছে তাহাকে একবার ধর্ম্মের মন্ত্রে, জ্ঞানের মন্ত্রে, ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত করিয়া এই সংসারক্ষেত্রে বাহির হইতে দিলে সে যে এই পাপের নরকে কি পুণ্য স্বর্গ রচনা করিবে তাহাই একবার তোমরা জগৎকে দেখাও।

সেবার পরিণাম

খাঁচার ভিতর থেকেও আমায় উড়্‌তে হবে আকাশে
জান্‌তে দিলে চল্‌বে না ক' আমার ব্যথা আভাষে!
সর্ব্বনাশের দারুণ হাহাকার
অট্টহাসের দিয়ে কারাগার
মলিন মুখে হাসির মুখোস তুলে
যেতে হবে সবার কাছে, মিল্‌তে হবে সানন্দে
করতে হবে সবায় সুখী, তাদের মনের পছন্দে!

আমার বিয়োগ-বেদন-নিবিড় মরণ-মথন বালুতে
গড়্‌তে হবে প্রমোদভবন তৃষ্ণাকাতর তালুতে!
বুকের আগুন রাখ্‌তে হবে চেপে
(ওদের কি ক্ষোভ যাই বা যদি ক্ষেপে?)
আমার কালো লুকিয়ে রেখে, আমায়
জ্বাল্‌তে হবে সারানিশি দীপাবলীর আলো যে
সবার আঁধার হর্‌তে হবে, কর্‌তে হবে ভালো যে!

আমার হাসি আমার গীতি সকল ভাল নিঙারি
দিতে হবে নিঃশেষে সব, আমার যা' তা' তোমারি!
আমার দেহ বাক্য প্রাণ মন
করেছি তো তোমায় সমর্পণ!
আমার তবে র'ল কি আর বাকী?
ভাগ্যহীনের ভাঙা কপাল, রাঙা ক্ষত অগণ্য
শোকের শঙ্খে, অভাব ডঙ্কে দুর্ভাগ্যই প্রসন্ন!

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

চিররহস্য সন্ধানে।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ।

[illegible]িথের কক্ষাভ্যন্তর সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। অভ্যন্ত গৃহ কোণটীতে একাকিনী বসিয়া, জ্যারোবা দ্রুতহস্তে তাহার নির্দ্দিষ্ট বুননকার্য্য চালাইতেছে। আলোক উজ্জ্বলপ্রভ,—সুগন্ধি দারুনির্য্যাস ও গোলাপ সৌরভে কক্ষ ভরপুর,—পাছে ঘরখানির পবিত্র শান্তি

বিক্ষুব্ধ হয় এই ভয়ে বাতাসটাও যেন জোরে নিঃশ্বাস ফেলিতেছে না। পাণ্ডুর-কান্তি অথচ অনিন্দ্যসুন্দরী লিলিথ, স্বয়ং তন্দ্রাচ্ছিন্ন অবস্থায়, বহুমূল্য পালঙ্কখানির উপর, আলো-ঝলমল মখমল শয়নে শায়িতা—পার্শ্বেই দ্বিধাভিন্ন রেশমী পর্দার কোলে উন্মুক্ত বাতায়ন—আকাশ-পটের দু'একটা ক্ষীণদীপ্তি তারকা তাহার ভিতর দিয়া দেখা যাইতেছে। একটী শ্বেত প্রজাপতি, আলোকের আকর্ষণে উক্ত রন্ধ্রপথে কক্ষপ্রবেশ করিয়া, এতক্ষণ আলোকাধারের চতুষ্পার্শ্বে অনির্দ্দেশ্য ক্যাবলান্ত ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল— ক্রমে নিম্ন হইতে অধিকতর নিম্নে নামিয়া লিলিথের মাথার উজ্জ্বল কোণটিতে আশ্রয় লইয়াছে, এবং সেইখানেই স্থায়ীভাবে আস্তানা লইয়া তাহার শুভ্রোজ্জ্বল পক্ষ দু'খানি বারংবার আকুঞ্চিত ও প্রসারিত করিতেছে; কখনও বা সূক্ষ্ম শুঁয়া দুটী বিস্তারিত করিয়া আশ্রয় স্থানটার রসাস্বাদ চেষ্টাও যে না করিতেছে এমন নহে, তবে ঐ নৈশ-বিরাম-স্থানটা পরিত্যাগ করিয়া অন্য কোথাও যে নড়িবে এমন লক্ষণ তাহার ভাবে প্রকাশ পাইতেছে না। ঠিক এই সময় এল র‍্যামি নিঃশব্দে প্রবেশ করিলেন।

একেবারেই পালঙ্কপার্শ্বে অগ্রসর হইয়া, নিদ্রিতা কিশোরীর আসনখানির উপর তিনি সাগ্রহ-দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন। সে দৃষ্টিতে শুধু যে আগ্রহই ছিল এমন নহে, অনুরাগের মত অন্য কিছুও যেন ছিল—নতুবা তাঁহার হৃৎস্পন্দন সহসা দ্রুততর হইয়া উঠিল কেন—একটা অভূতপূর্ব উত্তেজনায় সর্বাঙ্গ শিহরিয়া উঠিল কেন,—আপন অনুভূতিটা বিশ্লেষণ করিবার শক্তিটুকুও লোপ পাইল কেন?

সেই অতুলনীয় পুষ্প-তনুখানির যতদূর সম্ভব সন্নিকটে ঝুঁকিয়া পড়িয়া, কতক দ্বিধা কতক আত্ম-ধিক্কার-ভরে, তিনি তাহার তরঙ্গায়িত কৃষ্ণোজ্জ্বল কেশরাশির একটী গুচ্ছ হাতে তুলিয়া লইলেন এবং এম্‌নি কৌতূহলের সহিত দেখিতে লাগিলেন যেন তাহা সৃষ্টির সদ্য-প্রকাশিত-কিছু—আশ্চর্য্য বা অস্বাভাবিক।

নির্বিরামে ব্যাঘাত ঘটায়, প্রজাপতিটা এই সময় উপাধান ত্যাগ করিল এবং অতীব উত্তেজিতভাবে তাহার মাথার উপর উড়িতে আরম্ভ করিল; পুনর্ব্বার ঐ ভীষণাকার আলোকটার সামনে সে আনন্দোল্লাসে ছুটিয়া চলিল,—এবং এল র‍্যামি বিশেষ মনোযোগের সহিত [illegible]

দেখিতে লাগিলেন। লিলিথের সুকোমল কেশগুচ্ছ তখনও তাঁহার মুষ্টিতলে বিধ্বস্ত হইয়া রহিল।

আলোকশিখায় অস্ফুটভাবে তিনি বলিলেন—"একেবারে আলোকশিখার অভ্যন্তরে—একেবারে অগ্নির গর্ভে!! ইহাই কি সমস্ত উচ্চাশার পরিণাম,—উত্তপ্ত উচ্ছ্বাস, প্রবৃত্তির উত্তেজনা, জ্ঞানের পক্ষ-বিস্তার করিয়া সেই ভাবের নিমজ্জন, তাহার মহাস্পর্দ্ধার পরিণামে মৃত্যু-লাভ? এইখানেই কি শেষ? না, পশ্চাতে আরও কিছু আছে?......সমস্যা, মহা-সমস্যার কথা! কিন্তু কে উত্তর দিবে?"

গভীর দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া তিনি পালঙ্কখানির আরও সন্নিকটে ঝুঁকিয়া পড়িলেন—এত সন্নিকট যে, লিলিথের মৃদুনিঃশ্বাস সেই পুষ্প-সুকোমল ওষ্ঠদুটীর উপর দিয়া বসন্তের বাতাসটীর মত; যেন তাঁহার গণ্ডদেশে চুম্বন করিল। বিশেষ মনোযোগের সহিত এল রামি সেই ঠোঁট দুখানি নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,—যেমন করিয়া লোকে কোনো পক্ষী বা পুষ্পের বিশেষ বিশেষ অংশ পরীক্ষা করে ঠিক তেমনি করিয়া পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। কি সুঠাম উহার বঙ্কিমভঙ্গী, কি সুন্দর ঐ প্রবালরক্ত আভাটুকু,—তদুপরি শ্বেতপুষ্প-পর্ণে প্রভাত-সূর্য্যের স্বর্ণকিরণখানির মত যে কমনীয় গোলাপ-দীপ্তিটী ঐ গণ্ডযুগলে তরঙ্গায়িত হইতেছে, ঐটীই বা কি চমৎকার! অপরদিকে, ঐ যে আকর্ণ ভ্রূযুগলের বঙ্কিম বিস্তার এবং তাহার কোলে কোলে রমণীয় ছায়ারেখা—যে ছায়া, বলিতে চাই 'আলো' আছে, আলো আছে, এই অর্দ্ধমুদ্রিত পক্ষ্মপর্ণ দুখানির অন্তরালে অপূর্ব্ব আলোক লুকানো আছে, ঐ ছায়াটী, ঐ ভ্রূরেখাটী, আর সর্ব্বোপরি ঐ সম্ভাবনাটীই বা কি মধুর! ঐ সুমসৃণ প্রশস্ত ললাট, যাহার উপর চূর্ণ কুন্তলরাশি গুচ্ছে গুচ্ছে ছড়াইয়া পড়িয়াছে, ঐ অর্দ্ধ-কুঞ্চিত কেশগুচ্ছ, যাহার উপর এই অসামান্য রূপ-প্রভা কোটীনক্ষত্র দীপ্তিতে জ্বল জ্বল করিতেছে—এ সমস্তই সুন্দর, সমস্তই অসাধারণ, প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-ভাণ্ডারের শ্রেষ্ঠতম কোমলতার রেখা ও বর্ণের আদর্শ সমাবেশ! কিন্তু কোথায় থাকিত এ সব, যদি এল রামি তাহা রক্ষা না করিতেন? মানবলোচনের অগোচরে অস্থি বা ভস্মে পরিণত হইয়া একদিন কি এ সৌন্দর্য্য চিরদিনের মত কবরের অযত্নপতিত সমাধিতলে বিলুপ্ত হইয়া যাইত না? কি

অস্বাভাবিক, কিন্তু যে উষ্ণ জীবন-প্রবাহ আজ এই দেহখানির শিরায় শিরায় সঞ্চারিত, এ জীবনী-শক্তির সম্পূর্ণ না হইলেও, আংশিক স্রষ্টা যে তিনিই, তদ্বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই। মৃতাকে তিনি জীবনের মধ্যে জীয়াইয়া রাখিয়াছেন,—আর যদি ইচ্ছা করেন, এই মুহূর্ত্তেই বলিতে পারেন "জাগো, জাগো সুন্দরি!"—তৎক্ষণাৎ সে উঠিয়া দাঁড়াইবে হাসিবে, কথা কহিবে, চলিয়া বেড়াইবে এবং এই পৃথিবীর 'দশজনের একজন' হইতে পারিবে—যদি তিনি ইচ্ছা করেন!

প্রবল ইচ্ছাবেগে এল র‍্যামির মস্তিষ্ক দপ্ দপ্ করিয়া উঠিল,; ক্ষমতার দর্পে; শক্তির সচেতন গৌরবে তাঁহার ধমনী-তলবাহী রক্তস্রোত বারংবার দ্রুত-স্পন্দিত হইতে লাগিল; মোহমুগ্ধবৎ তিনি তন্দ্রাচ্ছন্না শায়িতার পুষ্প-সুকুমার দেহখানি দিকে নিষ্পলক নয়নে চাহিয়া রহিলেন,—বুঝিতেই পারিলেন না যে জ্যারোবা ইতিমধ্যে কক্ষকোণ ছাড়িয়া আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া আছে এবং তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে তাঁহার হৃদয়ের অন্তস্তল লক্ষ্য করিতেছে।

সহসা চক্ষু তুলিবামাত্র এলর‍্যামি দেখিতে পাইলেন যে জ্যারোবার দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ,—দেখিয়াই তাঁহার ললাট ভ্রুকুটী কুঞ্চিত হইয়া আসিল। তৎক্ষণাৎ অঙ্গুলি সঙ্কেতে জ্যারোবাকে কক্ষদ্বার প্রদর্শন করিলেন; সে সঙ্কেতের অর্থ 'বাহির হইয়া যাও';—জ্যারোবা তাহা বুঝিল, কারণ এ সঙ্কেতের সম্মান রক্ষা করিতেই সে অভ্যস্ত ছিল;—তথাপি আজ সে অটলভাবেই দাঁড়াইয়া রহিল,—দৃষ্টি, এলর‍্যামির মুখের উপর নিবদ্ধ।

"বিজেতা নিশ্চয়ই পরাজিত হবে, এল র‍্যামি"—নিদ্রিতা লিলিথের প্রতি অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া ধীরকণ্ঠে সে বলিল—"অব্যক্ত শক্তিসমূহের নিপুণ নিয়ন্তা অবশ্যই হঠে আস্‌তে বাধ্য হবে! তা'র সূচনা দেখা দিয়াছে,—বীজ রোপিত হ'য়েছে—ফসলের দিনও অবিলম্বেই আস্‌ছে। স্বর্গের ইতিহাসেও দেখা যায়, যে দুর্ব্বৃত্ত দানবদল এককালে ইন্দ্রত্ব লাভের জন্যে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছিল, কিন্তু পরিণামে নির্ম্মম অন্ধকার গর্ভেই যারা নিক্ষিপ্ত হয়; আজও তারা সেই অন্ধকারেই পড়ে নেই? তেমনিই, যে স্পর্দ্ধিত আত্মা ভগবান বা প্রাকৃতিক নিয়মের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হ'য়ে উঠে তারও পতন অবশ্যম্ভাবী।"

এমন আবেগভরে ও উৎপ্রেক্ষা দিয়া দিয়া সে কথাগুলো বলিয়া গেল যে প্রত্যেক কথাটী স্বকীয় তেজে জলিয়া জলিয়া উঠিল, কিন্তু এল র‍্যামির উদাস মুখভাবে এমন কোন

লক্ষণ দেখা গেল না যাহাতে বুঝিতে পারা যায় যে কথাগুলো তাহার কাণে গিয়াছে অথবা বুদ্ধিতে পৌঁছিয়াছে। পুনর্ব্বার তিনি আদেশ-সূচক-ভঙ্গীতে পূর্ব্ব-সঙ্কেত ব্যক্ত করিলেন এবং এবার জ্যারোর তাহা মান্য করিল।

সে দৃষ্টির অন্তরাল হইবামাত্র, এল র‍্যামি উঠিলেন এবং বর্ত্তমান কক্ষ ও পার্শ্বকক্ষের পর্দ্দান্তরালবর্ত্তী সংযোগ-দ্বারটী রুদ্ধ করিয়া দিয়া পালঙ্ক-সন্নিকটে প্রত্যাবর্ত্তন করতঃ যথা-নির্দ্দিষ্ট প্রণালীতে ডাকিলেন—

"লিলিথ! লিলিথ।"

পূর্ব্ব পূর্ব্ব বারের ন্যায় এবারও তাঁহাকে উত্তরের জন্য অপেক্ষা করিতে হইল। অধীর আগ্রহে ঘড়ীর দিকে চাহিয়া মনে মনে তিনি একশত গণনা করিলেন।

"লিলিথ!"

শায়িতা, আহ্বানকর্ত্তার অভিমুখে পাশ ফিরিল এবং ঈষৎ হাসিয়া কি যেন বলিতে চাহিল,—তাহার বিম্বাধর দুখানি কাঁপিয়া উঠিল কিন্তু উচ্চারিত গুঞ্জনের কিছুই বুঝিতে পারা গেল না।

"লিলিথ! তুমি এখন কোথায়?"

এইবার, তাহার স্বর, কোমল হইলেও বেশ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল।

"এইখানেই; তোমারই কাছে—তোমার হাত আমার হাতের ওপর।"

এল র‍্যামির মাথা ঘুরিয়া গেল। সত্যই তিনি উহার বামকরতল আপন করতলে ধরিয়াছিলেন বটে, কিন্তু ইতিপূর্ব্বে কখনও কোনপ্রকার স্পর্শানুভূতির কথাই তো সে জানায় নাই!

"তা' হ'লে,—আমাকে দেখ্‌তেও পাচ্ছ বোধ হয়?" উৎকণ্ঠিত স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

বিষণ্ণ মধুর উত্তর আসিল—

"না। স্বচ্ছ বায়ুমণ্ডল আর তা'র বর্ণবৈচিত্র্য আমার চারিদিকে—অন্য কিছুই নেই।"

"একা আছ লিলিথ?"

বুক-ফাটা দীর্ঘ নিশ্বাস-শব্দে উচ্চারিত হইল—

"সর্ব্বক্ষণই আমি একা!"

অর্দ্ধ বিরক্তভাবে এল র‍্যামি একথা শুনিলেন। এই বিজনতার অনুযোগ আরও কয়েকবার সে করিয়াছে,—অথচ এ অভাব সম্বন্ধে সে চিন্তা করে এমন ইচ্ছা এল র‍্যামির ছিল না। ত্বরিত-কণ্ঠে তিনি প্রশ্ন করিলেন—

"বল, লিলিথ! তুমি কোথায় ছিলে আর কিই বা দেখ্‌লে?"

দুই মিনিটকাল সমস্ত নিস্তব্ধ; তৎপরে শায়িতার দেহ আন্দোলিত হইল।

'তুমি আমাকে নরক অন্বেষণ করতে বলেছিলে"—পরিশেষে, মৃদুভাবে সে বলিল—"আমি খুঁজেছি, কিন্তু কোনখানেই পাচ্ছি নে।"

স্বর থামিল; পরক্ষণেই আবার ঝঙ্কৃত হইল—

"একটা বড় আশ্চর্য্য কথা তুমি বলেছিলে,—কোন একটা স্থানের কথা; যেখানে শাস্তি আর যন্ত্রণা আছে, অন্ধকার আর বিভীষিকা আছে, হতাশা অবসাদ আছে;—ভগবানের সুন্দর সৃষ্টির মধ্যে কোনখানেই এরকম জায়গা নেই। দূরতম নক্ষত্রমালার স্বর্ণালোকিত সত্য-রাজ্যেও, কোন শাস্তি বা যাতনা বা অন্ধকার আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি নে। সৌন্দর্য্য, জ্যোতিঃ আর প্রেম ছাড়া অন্য কিছুই আমি খুঁজে পাই নে!"

'প্রেম' কথাটা এতই কোমলকণ্ঠে উচ্চারিত হইল যে, একখানি সুদূরাগত সঙ্গীতের মধুরতম রেশটার মত তাহা কর্ণে বাজিয়া উঠিল।

এল র‍্যামি শুনিলেন, হতবুদ্ধি হইয়া গেলেন, বুঝি বা কতকটা নিরাশও হইলেন।

"আঃ, লিলিথ, কি পাগলের মত বল্‌ছো!" উত্তেজিত কণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"যাতনা নেই? শাস্তি নেই? অন্ধকার নেই?...তা' যদি হয়, তবে এই পৃথিবীটাই নরক আর তুমি এর কিছুই জান না!"

কথাগুলি শুনিবামাত্র শয্যা-শায়ানা লিলিথ নড়িয়া উঠিল,—অতঃপর এল র‍্যামিকে বিস্ময় প্রকাশের অবকাশমাত্র না দিয়া স্বেচ্ছাক্রমে উঠিয়া বসিল। চক্ষুরুন্মীলন রাখিয়া সতেজ, সুস্পষ্ট ও পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে বলিতে লাগিল—

"যা' জানি তা' আমি তোমাকে বল্‌তে বাধ্য কিন্তু যা' সত্য নয় তা' বল্‌তে আমি অক্ষম। ভগবানের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনখানেই পাপ বা শাস্তি, কিম্বা মৃত্যু নেই। তবু যদি এসব জিনিষ থাকে, তবে তা' শুধু তোমাদের পৃথিবীতেই আছে—তা' মানুষেরই সৃষ্টি মানুষেরই কল্পনা।"

"মানুষের সৃষ্টি—মানুষের কল্পনা ?" এল র‍্যামি বলিলে—' কে এ মানুষ ?"

'ঈশ্বরের দূত." তৎক্ষণাৎ লিলিথ উত্তর করিল—"ঈশ্বরের স্বকীয় স্বাধীন ইচ্ছার সমস্ত গুণই তা'তে বর্ত্তমান। তা'র স্রষ্টার মত, সেও স্বেচ্ছা-সম্মত সৃষ্টি বা ধ্বংশ কর্‌তে পারে—ভগবান তা'তে বাধা দেন না। অতএব, মানুষ যদি অনর্থ সৃষ্টি করে, তবে সে অনর্থ মানুষ স্বয়ং ধ্বংশ না করা পর্য্যন্ত থেকে যাবে।"

এরূপ উক্তি বড়ই আশ্চর্য্য, বড়ই গভীর; এল র‍্যামি নিঃশব্দে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"যে সকল 'লোকে' আমি আজ পরিভ্রমণ করছি"—'প্রশান্ত কণ্ঠে লিলিথ বলিতে লাগিল—"এখানে বিন্দুমাত্র অনর্থ নেই। ঐ সুন্দর প্রদেশগুলিতে যারা জীবন-স্রষ্টা, তা'রা শুধু পবিত্রতাই খুঁজতে চায়। তা' ছাড়া যন্ত্রণা বা পাপ কেনই বা থাক্‌বে ? আমি বুঝ্‌তে পারি নে।"

"না"—তিক্তকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"বুঝতে পার না, কারণ নিজে তুমি খুবই সুখী ; 'সুখ' কোনোকালেই ত্রুটী দেখ্‌তে পায় না। পৃথিবী থেকে অনেকখানি দূরে চলে গিয়ে পৃথিবীর কথা তুমি ভুলে গিয়েছো ! যে-বন্ধন আজও তোমাকে এ-গ্রহের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছে তা' অতি সূক্ষ্ম, কাজেই বেদনার স্পর্শ আর অনুভূতই হচ্ছে না। আমার অনুভূতি যদি তোমার মধ্যে সঞ্চারিত করা যেত !......কারণ, ভগবান বড় নিষ্ঠুর লিলিথ, করুণাময় নন ; ভগবান—একমাত্র ভগবানেরই ওপর—জগতের যত দুঃখ যন্ত্রণার বোঝা নির্ভর কর্চ্ছে ; এ-চিরন্তন দুঃখের না আছে কারণ, না আছে নিবৃত্তির উপায়।"

লিলিথ পুনরায় পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়িল ; তাহার ওষ্ঠপ্রান্ত হাস্যোজ্জ্বল। 'হায় রে অন্ধ-নয়ন !" অস্ফুট স্বরে সে বলিল—'এত নিস্তেজ, এত ক্ষীণদৃষ্টি যে আলোকটুকু পর্য্যন্ত সহ্য করতে অক্ষম !"

তাহার কণ্ঠস্বরে এম্‌নি একটা কাতরতা প্রকাশ পাইল, যে, ঐ স্নিগ্ধ রাতেই এল র‍্যামি চমকিয়া উঠিলেন,—বুকের ভিতরটা যেন ধক্ করিয়া কোথায় ঘা মারিল এবং পরক্ষণেই নিস্পন্দ হইয়া আসিল !

"আমার জন্যে তোমার দুঃখ হয় ?" কম্পিত-স্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস-শব্দ শ্রুত হইল। "তোমার জন্যে দুঃখ হয়" "নিজের জন্যেও হয়।"

নিরুদ্ধশ্বাসে এল র‍্যামি বলিয়া উঠিলেন—"কেন ?"

"কারণ তাহাকে আমি দেখ্‌তে পাইনে,—কারণ, আমাকে তুমি দেখ্‌তে পাও না। যদি তোমাকে দেখ্‌তে পেতাম,—যদি আমার স্বরূপ তুমি দেখ্‌তে পেতে, তা' হ'লে সমস্তই জান্‌তে পার্‌তে, সমস্তই বুঝ্‌তে পার্‌তে।"

"তোমাকে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি, লিলিথ ! তোমার হাত আমি ধরে রয়েছি।"

"না,—আমার আসল হাত নয় ; তা'র ছায়া মাত্র।"

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই, এল র‍্যামি তাঁহার করতল-ধৃত চম্পকাঙ্গুলিগুলির পানে চাহিলেন ; এই পুষ্প-কোমল স্পর্শ-সুখদ হস্তখানি কি না 'ছায়া' ! তবে কায়া কৈ, বস্তু কোথায় ?

"এ সমস্তই মিলিয়ে যাবে"—লিলিথ বলিতে লাগিল—'ছায়া' মাত্রেই যেমন মিলিয়ে যায় ঠিক তেম্‌নিই মিলিয়ে যাবে, কিন্তু 'আমি' থাক্‌বো—এখানে নয়, এখানে নয়—অন্যত্র কবে তুমি আমাকে ছেড়ে দেবে ?"

"কোথায় যেতে চাও ?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"আমার বন্ধুদের কাছে"—সাগ্রহ-দ্রুতকণ্ঠে সে উত্তর করিল—"তা'রা প্রায়ই আমাকে ডাকে—আমি শুন্‌তে পাই, 'লিথিথ ! লিলিথ !' বলে' তা'দের স্বর যেন সঙ্গীতে বেজে ওঠে,—কখনও বা,তাদের আহ্বান-সঙ্কেতও দেখ্‌তে পাই, কিন্তু আমি যেতে পারি নে। বড় নিষ্ঠুর, বড় নিষ্ঠুর !—কারণ তা'রা আমাকে ভালবাসে আর তুমি বাস না,—কেন তবে প্রেমহীন হ'য়েও আমাকে এমন করে' বেঁধে' রাখ্‌তে চাও ?"

এল র‍্যামি কাঁপিয়া উঠিলেন,—সেই অনিন্দ্যসুন্দর মুখখানির প্রতি অপলক-নয়নে চাহিয়া ক্ষণকাল ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন ; অলোক-সামান্য সৌন্দর্য্য সত্ত্বেও, তাঁহার মনে

হইতে লাগিল, সে-মুখ যেন সেই সিংহ-কটি রাক্ষসীর, যাহার লোলুপতা কেবল নর-শোনিতে, এবং যে, সমস্যা-পূরণ-ভার প্রদান করিয়া 'থিবস্'-নগর প্রায় জনশূন্য করিয়াছিল।

"প্রেমই কি তোমার আকাঙ্ক্ষিত, লিলিথ?" ধীরভাবে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা' ছাড়া, তোমার ঐ 'প্রেম-চিন্তা' বা 'প্রেম-স্বপ্ন'র সার্থকতা কি?"

" 'প্রেম' স্বপ্ন নয়;" লিলিথ উত্তর করিল—"প্রেমই সত্য, প্রেমই জীবন। আজও আমি সম্পূর্ণ জীবন্ত নই—'প্রেম' আর 'প্রতীক্ষা'র মাঝখানে দুলে বেড়াচ্ছি।"

এল র‍্যামি দীর্ঘ-নিঃশ্বাস-সহ জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা' হ'লে তুমিও দুঃখী, লিলিথ?"

"না; দুঃখের অবকাশেই নেই। আমার নির্জ্জন প্রতীক্ষার মধ্যেও আলোর আনন্দ রয়েছে—বিশেষতঃ ভগবৎ-সৌন্দর্য্যের গৌরব সর্ব্বব্যাপী।"

এল র‍্যামি শূন্যদৃষ্টিতে শায়িতার দিকে চাহিয়া রহিলেন,—মুখভাবে তাঁহার নিদারুণ হতাশা।

"দূরে, বহুদূরে ইহার ভ্রমণ-সীমানা;" হতাশচিত্তে তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"কি উপায়ে এই সমস্ত সংস্কারাচ্ছন্ন অস্পষ্ট উক্তির বিরুদ্ধে তর্ক করা যায়! তা'র আনন্দ আমি বুঝি না, আমার বেদনাও সে বোঝে না। অবশ্যই স্বর্গীয় ভাষা মর-জীবের কর্ণে অবোধ্য। কিন্তু দেখি;—লিলিথ!" আদেশ-সূচক স্বরে তিনি পুনরায় তাহাকে আহ্বান করিলেন। "এমনভাবে তুমি ঈশ্বরের কথা কও যেন তিনি তোমার পরিচিত। কিন্তু আমি—আমি তাঁকে জানি নে—আমি তাঁকে প্রমাণ করতে পারি নি; যদি তোমার ক্ষমতা থাকে, তবে তাঁর আকার প্রকার কি রকম তা' বর্ণনা কর।"

লিলিথ নীরব। এল র‍্যামি তীক্ষ্ণ-দৃষ্টিতে তাহার প্রশান্ত মুখভাব নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন,—স্বর্গীয় হাস্য-জ্যোতিঃতে সে মুখ সমুজ্জ্বল।

"নিরুত্তর!" বিরক্তিভরে তিনি বলিলেন। "বস্তুতঃ উত্তরই বা কি থাকবে! একটা প্রকাণ্ড অন্ধশক্তি যা' অকারণে সৃষ্টি করে বা নিষ্প্রয়োজনে ধ্বংস করে, তা'র আবার আকার প্রকার কি রকম হবে!"

শেষোক্ত কথাগুলি তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হইবামাত্র, লিলিথ একটু নড়িয়া উঠিল, এবং তাহার হস্তদ্বয় যেন আবেগাতিশয্যে উৰ্দ্ধোৎক্ষিপ্ত হইয়া ধীরে ধীরে মস্তকপার্শ্বে এলাইয়া পড়িল।

"সঙ্গীতের প্রচলিত সপ্তস্বরে আরও সপ্ততিকোটী স্বর যোগ কর"—সে বলিল—"আর, ঐ সমস্ত স্বরকে মধুরতম ঐক্যতানে ঝঙ্কৃত কল্পনা কর,—বুঝ্‌তে পারবে যে ভগবানের স্বর সঙ্গীতের ক্ষীণতম প্রতিধ্বনি কি প্রকার! যত-কিছু উজ্জ্বল বর্ণাভাষ, যত কিছু সুন্দরতম আকৃতির রেখাভঙ্গী থাকতে পারে, তা'তে চিরন্তন যৌবন গরিমা, চিরন্তন মহত্ত্ব, চিরন্তন আনন্দ, চিরন্তন শক্তি যোগ কর, তবুও কি গানে, কি ভাষায়, ভগবানের সৌন্দর্য্য প্রকাশ করা যাবে না! তাঁর দৃষ্টি থেকে আলোক তরঙ্গিত হ'চ্চে—আবির্ভাব থেকে মহা-সঙ্গীত উৎসারিত হ'চ্চে,—ব্যাপ্তি-পথে গমনাগমন থেকে কোটী কোটী জগত উদ্ভুত হচ্চে,—ব্যাপ্তি ইঙ্গিতমাত্রেই তারায় ফুলে আকাশ ছেয়ে যাচ্ছে। কি সুন্দর ঐ নীহারিকা-পথে তাঁর গতিলীলা!—"

সহসা থামিয়া গিয়া, যেন বা আনন্দাতিশয্যে সে একটী সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস টানিয়া লইল,—কিন্তু এল র‍্যামির মুখমণ্ডল অবসাদের অন্ধকারে ছাইয়া আসিল।

"বিশেষ কিছু শেখাতে পার্চ্ছ না লিলিথ"—সখেদ-বিরক্তিভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"তুমি যা' দেখ্‌ছো, কিম্বা 'দেখ্‌ছি' বলে' মনে করছো, কেবল সেই কথাটাই বল্‌ছো,—এ বিষয়ের সত্যতা সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস উদ্রেক করতে পারছো না।"

লিলিথের মুখখানি পাণ্ডুর হইয়া আসিল—ওষ্ঠপ্রান্ত হইতে হাস্যজ্যোতিঃ অন্তর্হিত হইল এবং সর্ব্বাঙ্গের হিল্লোলিত সৌন্দর্য্যটী যেন সহসা জমাট ও কঠিন হইয়া উঠিল।

"প্রেমই বিশ্বাস উদ্রেক করে;" সে বলিল—"যেখানে আমরা ভালবাসি নে, সেখানে সন্দেহ করি। সন্দেহ অনর্থ সৃষ্টি করে, আর ঐ অনর্থ ঈশ্বরকে জানে না।"

"ব্যর্থ আমার জীবন! সম্পূর্ণ বিষাদ!" তিক্তকণ্ঠে এল র‍্যামি চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"অৰ্দ্ধমুক্ত আত্মাও যদি সেই কতকগুলো বাঁধাবুলি আর পুরোণো সংস্কার বাক্যই আবৃত্তি করতে থাকে, তা' হলে সমস্তই আমার পক্ষে পণ্ডশ্রম। কিন্তু না, এমন করে'

যে সে আমাকে নিরাশ করবে, তা' কিছুতেই হবে না ;"—লিলিথের দেহখানির দিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়া তাহার শিথিল হস্তদ্বয় সজোরে আকর্ষণকরতঃ আপন মুষ্টিমধ্যে তিনি গ্রহণ করিলেন, পরে পালঙ্কখানার ধারের কাছে আরও সরিয়া আসিয়া এমনি অগ্নিবর্ষী দৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া রহিলেন যেন তাঁহার ঐ নিষ্ঠুর নয়নাগ্নি-শিখা আজ কিশোরীটির অন্তস্তম মর্ম্মস্তর পর্য্যন্ত বিঁধিয়া বাহির করিতে উদ্যত !

"লিলিথ !" প্রভুত্ব-প্রকাশক স্বরে তিনি বলিলেন—"সোজা কথা কও, যা'তে তোমার বক্তব্য বুঝ্‌তে পারি। তুমি বল্‌ছো নরক কোথাও নেই ?"

দৃঢ়কণ্ঠে উত্তর আসিল—"না, নেই"।

"অন্যায় কি তা' হ'লে শাস্তির হাত এড়িয়ে যাবে ?"

"শাস্তির আগুন, 'অন্যায়' আপনিই জ্বেলে নেয়। অন্যায় আপনিই আপনাকে ধ্বংশ করে। এইটেই নিয়ম।"

"খাসা !—তারপর, বলে যাও ! কেন,—এসব তো জানা কথা—কিসের জন্য সততা সৎ বলেই দুঃখভোগ করে ?"

"কথনো তা' করে না ; করা অসম্ভব।"

"অসম্ভব ?"—তীব্রকণ্ঠে এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"অসম্ভব"—দৃঢ় কোমল কণ্ঠে পুনরুক্ত হইল। "মনে হয় বটে যে সততা উৎপীড়িত হইবে, কিন্তু তা হয় না ; মনে হয় বটে যে পাপজয়ী হচ্চে, কিন্তু তা হয় না ; মনে হয় বটে যে পাপজয়ী হ'চ্চে কিন্তু তা ভুল ভুল।"

"এবং ঈশ্বর আছেন ?"

"ঈশ্বর আছেন।"

"আর স্বর্গ ?"

"কোন স্বর্গ ?" লিলিথ বলিল—"স্বর্গ তো লক্ষ লক্ষ।"

এল র‍্যামি থামিলেন,—ক্ষণকাল কি ভাবিলেন—পরে বলিলেন—

"ঈশ্বরের স্বর্গ।"

"তুমি বলতে চাও, ঈশ্বরের জগত;" প্রশান্ত কণ্ঠে লিলিথ জানাইল—"না সে কেন্দ্রে তুমি আমাকে পৌঁছতে দিচ্ছ না। তা' আমি দেখতে পাচ্ছি অনুভব করছি যে তা' অনেক দূরে রয়েছে—কিন্তু তোমার ইচ্ছা বল আমাকে বন্দী করে' রেখেছে—যেতে দিচ্ছে না।"

"আচ্ছা, যদিই, ধর, আমি যেতে দেই, তা' হলে কি কর্ব্বে তুমি? আবার আমার কাছে ফিরে আসবে কি?"

"কখনো না! পরিপূর্ণ গৌরবের মধ্যে একবার যা'রা প্রবেশ করতে পারে, অসম্পূর্ণ আলোকে আর তা'রা ফিরে আসে না।"

এল র‍্যামি থামিলেন,—আরও কয়েকটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার আয়োজন করিতে লাগিলেন, কিন্তু লিলিথের নিম্নোদ্ধৃত বাক্যগুলি একেবারেই তাঁহাকে চকিত করিয়া দিল—

"কে একজন আমার নাম ধরে ডাকছিল,'—সে বলিল—"সে ডাক এমনি কোমল, এমনি স্নেহময়, যেন আমার নামটী তার বড়ই আদরের। তার আহ্বান শুনতে পেয়েছিলাম কিন্তু উত্তর দিতে পারি নি; কিন্তু শুনতে পেয়েছিলাম—বুঝেছিলাম যে, সে আমাকে বড়ই ভালবাসে। ভালবাসার চিন্তাটী পর্য্যন্ত মধুর—শুষ্কজগৎও তাইতে সৌন্দর্য্যময় হয়ে ওঠে!"

এল র‍্যামির বুকের ভিতরটা যেন হঠাৎ ধক্ করিয়া উঠিল,—ফেরাজের স্বর তা হলে ভজ্রাবেরেও সে শুনতে পেয়েছে! সে স্বর মনে করেও রেখেছে!—আরোও গুরুতর—যে, তা এই সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম মুক্ত আত্মাটীর কাছে প্রেমানুভূতির মত একটা অস্পষ্ট আবেশ ও বহন করে এনেছে। আত্মা বলিলাম বটে, কিন্তু এসম্বন্ধে এল র‍্যামির মন যে বেশ নিঃসংশয় ছিল তাহা নহে। কারণ, 'আত্মা' বলিয়া কোন কিছুর অস্তিত্ব সম্বন্ধে, প্রমাণাভাবে, তাঁহার দৃঢ় প্রত্যয় ছিল না। সমস্ত বৃত্তিই, এমন কি অতীন্দ্রিয় প্রকৃতির বিশুদ্ধতম আবেগ-স্পন্দনটুকু পর্য্যন্ত, তাঁহার নিকট মস্তিষ্কের ক্রিয়া মাত্র বিবেচিত হইত। তবে বৈজ্ঞানিক হিসাবে এটুকু জানিতেন যে, বহিঃপ্রকৃতিতেই হোক্ বা অন্তপ্রকৃতিতেই হোক্, একটা কিছু, অবশ্যই কোথাও আছে, যাহা হইতে মস্তিষ্ক ভাবের প্রেরণা সঞ্চয় করে,—নতুবা, ভাবের মত অস্পষ্ট-কিছুও অবশ্য আর 'শূন্য' হইতে উদ্ভূত হইতে পারে না।

বিশেষতঃ, এই এক লিলিথ সম্বন্ধীয় পরীক্ষার মধ্যেই প্রচুর বিস্ময়ের কারণ ছিল; কেননা, যতদিন হতে ঐ যন্ত্রকে তিনি জীবনাবদ্ধ করিয়াছেন, তত দিন হইতে বিশেষ সতর্কতার সহিত তিনি লক্ষ্য রাখিয়াছেন, যাহাতে তাঁহার নিজের কোনরূপ চিন্তা বা ধারণার ছাপ তার উপর না পড়ে। অথচ ভগবান সম্বন্ধে অথবা বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে এযাবৎ সে যাহা কিছু বলিয়াছে, সে সমস্তই তাঁহার নিজ যুক্তি বা চিন্তা প্রণালীর একেবারেই বিরুদ্ধবাদ! তবেই প্রশ্ন দাঁড়াইতেছে—কোথা হইতে কি উপায়ে এ জ্ঞান তাহার মধ্যে আসে? যখন তাহার মৃত্যু হয় (প্রকৃতির নিয়মানুসারে) সে সময় লিলিথ একজন অজ্ঞ অর্দ্ধ অসভ্য আরব শিশুমাত্রই ছিল, এবং যে কয়বৎসর পুনর্জ্জীবিত অবস্থায় (বৈজ্ঞানিক নিয়মানুসারে) তন্দ্রামগ্ন রহিয়াছে, এ কয় বৎসরের মধ্যে বাহ্য প্রকৃতির দিক হইতে কোনপ্রকার ধারণাই সে পায় নাই, অধিকন্তু এক বাল্য-স্মৃতি ব্যতীত অন্যকোনোরূপ অন্তর্জাগতিক ধারণাও তাহার মধ্যে থাকিবার কথা নয়। অথচ,—অলোকসামান্য সৌন্দর্য্য তাহার সর্ব্বাঙ্গে ফুটিয়া উঠিয়াছে, এবং এমন সমস্ত কথাবার্ত্তা সে কহিতেছে যাহা মরজীবের ধারণাতীত। এই যে রহস্য, এই যে তাহার শারীরিক ও মানসিক বিকাশ—ইহার উত্তর কি? ইহার অন্তর্নিহিত বিস্ময়, সমস্যা ও রহস্য এল র‍্যামির সমগ্র চিত্তখানাকে আকুল করিয়া তুলিত। কিন্তু আজ এ কি বিপদ ঘটিল! ভালবাসার কথা সে উত্থাপন করিল—তাহার আকাঙ্ক্ষিত স্বর্গীয় বা ব্যক্তি সম্পর্কশূন্য ভালবাসা নয়,—কিন্তু সেই ভালবাসা, যাহা তাহার বর্ত্তমান অস্তিত্বের উপর একটা অস্পষ্ট সুখানুভূতির সাড়া আনিয়াছে। এমন স্বর কোনো স্বর তাহার কর্ণে বাজিয়াছে যাহা এই আত্মিক তন্দ্রার মধ্যে প্রবেশলাভ করিবার সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত,—যতই একথা এল র‍্যামির মনে হইতে লাগিল, ততই একটা রুদ্ধ আক্রোশ তাঁহার চিত্তকে যেন পীড়া দিতে লাগিল! জ্যারোবার বিশ্বাস-ঘাতকতা ও ফেরাজের অপরাধকে যথাসম্ভব লঘু ও উপেক্ষযোগ্য ভাবিয়া বারংবার তিনি মনকে বুঝাইতে চাহিতেছিলেন বটে—কিন্তু তথাপি কেমন একটা অপূর্ব্ব চাঞ্চল্য কিছুতেই যেন তাঁহাকে সহজ হইতে দিল না। এক্ষণে কি করা যাইতে পারে? ঐ যে আকাঙ্ক্ষা-মদির কথগুলি—"ভালবাসার চিন্তাটা পর্য্যন্ত মধুর, শুষ্ক জগতও তাতে সৌন্দর্য্যময় হয়ে ওঠে"—এ কথার কি দেওয়া যায়?

অসন্তোষ-স্নিগ্ধ-চিত্তে বারংবার তিনি বিষয়টাকে মনোমধ্যে আন্দোলিত করিতে লাগিলেন। তিনি, একমাত্র তিনিই লিলিথের প্রভু,—তিনি আজ্ঞা করিবেন এবং সে তাহা পালন করিবে,—কিন্তু এ-সম্বন্ধ কি চিরদিন থাকিবে? অন্যথার সম্ভাবনাটাই যেন তাঁহার রক্ত হিম করিয়া দিল,—আচ্ছা, এতকালের এত প্রকার হিসাবনিকাশের পর আজ যদি সে হঠাৎ পলায়ন করে —উঃ! এল র‍্যামি শিহরিয়া উঠিলেন।

সে-রাত্রির মত আর কোনো প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবেন না স্থির করিয়া, ধীরে ধীরে তিনি লিলিথের মৃণাল-বাহু দু'খানি মুষ্টি-মুক্ত করিয়া দিলেন।

"যাও লিলিথ!" স্নেহার্দ্র-স্বরে তিনি বলিলেন—"বাস্তবিকই এ জগত শুষ্ক—আর বেশীক্ষণ তোমাকে এ-অন্ধকারে ধরে রাখ্‌তে চাই নে—যাও, বিশ্রাম করগে।"

"বিশ্রাম?" দীর্ঘনিঃশ্বাসসহ লিলিথ বলিল—"কোথায়?"

এল র‍্যামি তাহার মুখের কাছে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং অনুরাগভরে তাহার অলুলায়িত কেশগুচ্ছে অঙ্গুলি চালনা করিতে করিতে কোমলতর কণ্ঠে বলিলেন—"যেখানে তোমার খুসী!"

'না তা আমি পারি নে!" বিষণ্ণ-কণ্ঠে সে বলিল—"নিজের অভিরুচি আমার কিছুই নেই,—প্রভুর ইচ্ছা পালনেই আমার আনন্দ।"

এল র‍্যামির বুকের ভিতর যেন ডমরু বাজিয়া উঠিল।

"'আমার' ইচ্ছা" লিলিথ অপেক্ষা যেন আপনাকেই বিশেষরূপে সম্ভাষণ করিয়া তিনি বলিলেন—"কি উল্লাস! কি বিস্ময়!—'আমার' ইচ্ছা!"

লিলিথ শুনিল,—একটা অপূর্ব্ব গৌরব-দীপ্তিতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—এবং ওষ্ঠ দু'খানির রন্ধ্রপথে বীণাবিনিন্দিত মধুর-স্বর ভাসিয়া আসিল—

"তোমার ইচ্ছা!—হ্যাঁ, তোমার ইচ্ছা,—আর, আর ভগবানের ইচ্ছাও বটে!"

এল র‍্যামি চকিত, বিস্মিত, নির্ব্বাক! এরূপ উত্তর তাঁহার একেবারেই আশাতীত! মনে হইল যে জিজ্ঞাসা করেন—এ কথার অর্থ কি? কিন্তু কিশোরীর মুখমণ্ডলে চাহিতেই

এম্‌নি একটী পাণ্ডুর প্রশান্ত দীপ্তি তাঁহার চোখে পড়িল যাহাতে তিনি বুঝিলেন যে উহা নীরব থাকিবার ইঙ্গিত।

"ফিলিপ!" অস্ফুট-স্বরে তিনি ডাকিলেন।

কোন উত্তর নাই। নত-নয়নে ঐ মুখখানির প্রতি চাহিয়া এল র‍্যামি দাঁড়াইয়া রহিলেন; গভীর সানুরাগ-উদ্বেগের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি বশতঃ তাঁহার স্বভাব-গম্ভীর মুখখানিকে অধিকতর গাম্ভীর্য্যময় দেখাইতে লাগিল।

"ভগবানের ইচ্ছা!" ঘৃণাভরে তিনি বলিলেন—"ভগবানের ইচ্ছা তো বহুপূর্ব্বে মরুপ্রান্তরে তা'র অস্তিত্ব পর্য্যন্ত লুপ্ত করে দিয়েছিল,—তবে, তা'র সম্বন্ধে ভগবান আজ এমন কি কর্‌বেন যা' আমি আগেই করিনি?"

এল র‍্যামির এই আত্মম্ভরিতা যে নিতান্তই অসঙ্গত এমন মনে হইল না; অথচ তিনি ভাল রকমই জানিতেন যে, সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে, ব্রহ্মাণ্ডের অণুকণাটীর পর্য্যন্ত সম্পূর্ণ নির্ব্বাণ-লাভ অসম্ভব দাঁড়াইয়া যায়। বিশেষতঃ, একটী মানবাত্মার উপর এভাবে প্রভুত্ব-বিস্তার করিবার অধিকার তাঁহার ভাগ্যে কেন যে লাভ হইয়াছে তাহার অন্তর্নিহিত কারণ রহস্য বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার প্রবৃত্তিটুকুও এল র‍্যামির ছিল না,—বিজ্ঞান জগতে তাঁহার স্বকীয় আবিষ্কার গৌরবকেই তিনি এ-সমস্তের মূল-কারণ মনে করিতেন; নিজের অধ্যবসায় ও অক্লান্ত নৈপুণ্য—জীবনব্যাপী অধ্যয়ন ও অনুশীলন ফলে প্রাকৃতিক শক্তিসমূহ-সম্বন্ধে প্রগাঢ় জ্ঞান-লাভ, ইহাকেই তিনি আত্মশক্তির মূলাধার বলিয়া বুঝিতে চাহিতেন। সম্পূর্ণ রূপে না হইলেও, প্রায়ই তিনি ভুলিয়া থাকিতেন যে সকল প্রকার স্বাভাবিক শক্তির পশ্চাতে 'একটা কিছু' আছে যাহা সমস্তই জানে, সমস্তই দেখে, সমস্তই পরিচালনা বা শাসন করিয়া থাকে—সে 'কিছু' এমন কিছু, যাহার বিরুদ্ধে মহাশক্তিধর মানবও প্রবল ঝড়ের মুখে তুচ্ছতম তৃণখণ্ডটীর মত চক্ষের নিমেষেই নিরুদ্দিষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

প্রকৃতপক্ষে, বিজ্ঞান-জগত যে পরিমাণে ভগবানের বিরুদ্ধ ধর্ম্মী, সে পরিমাণে তাঁহার উদ্দেশ্য সহায় নহে। এইজন্যই, তাহার উজ্জ্বলতম আবিষ্ক্রিয়াও লক্ষ্য-ভেদে অক্ষম মহা-মনীষা প্রায়শঃই অসরল ও শ্রদ্ধাহীন হইয়া থাকে—তাহার কারণ এই যে শিক্ষ

অত্যাধিক্য অহঙ্কারের পরিপোষক, এবং অহঙ্কারের সহিত বিশ্বাস বা শ্রদ্ধা চিরদিনই সঙ্গতি লেশ শূন্য। সম্পূর্ণ বিজ্ঞান এবং পরিপূর্ণ আত্মবোধ যদি সম্মিলিত হয় তবেই আমাদের চরম প্রার্থনায় মিলিতে পারে, অর্থাৎ বিশুদ্ধ ও যুক্তি-নিষ্ঠ মানব-ধর্ম্ম গড়িয়া উঠা সম্ভব হয়। কিন্তু এল র‍্যামির চরিত্রগত প্রধান বিশেষত্বই ঐ অহঙ্কার,—ইহাতে তিনি কোনো ক্ষতি দেখিতে পাইতেন না।

অসামান্য জ্ঞানের অধিকারী হওয়ায়, এবং শারীরিক ও মানসিক প্রতিভা-বলে, আ ন ধারণা-সম্মত অনিষ্ট সমূহ নিরাকরণের ক্ষমতা থাকায়, তিনি বুঝিতে পারিতেন না—কিজন্য, দমন করিবার সমর্থ-সত্বেও, তাঁহাকে প্রাকৃতিক বা আত্মিক শৃঙ্খলা সমূহের বশ্যতা স্বীকার করিতে হইবে!

উক্ত প্রকার যুক্তি তর্কে এ ক্ষেত্রে ও আপনার মনকে সচ্ছন্দ করিয়া তুলিয়া, এল র‍্যামি আর একবার শায়িতার প্রতি মনোনিবেশ করিলেন,—এবং তাহার নড়ীর গতি বা দেহের উত্তাপ-মাত্রা প্রভৃতি যথাবিহিত পরীক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন যে বর্ত্তমানক্ষেত্রে 'আরাক' নিষেক না করিলেও চলিবে তখন কক্ষত্যাগে উদ্যত হইলেন।

কক্ষ-বিনিষ্ক্রান্ত হইয়া তিনি মখমল-পর্দ্দাখানি টানিয়া দিলেন—ফলে, পূর্ব্ববর্ণিত শ্বেত প্রজাপতিটী, যে নৈশ-বিশ্রাম-স্থান অন্বেষণের জন্য স্বর্ণাভ আলোকাধারটার পানে উড়িয়া গিয়াছিল, এক্ষণে শাখা-বিচ্যুত শুষ্কপত্রটীর ন্যায়, মৃত্যু-কুঞ্চিত অবস্থায় লিলিথের পালঙ্ক-প্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

ভারতীয় নারীর ভবিষ্যৎ

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

ভারতবর্ষে যে শুধু জ্ঞানী গুণী নরনারীর দৌলতেই ধনী ছিল তা নয় সমৃদ্ধিও ছিল তাহার অতুলন। প্রকৃতপক্ষে ইহার রূপকথার কথার মত ঐশ্বর্য্য এক সময় ছিল দুনিয়ার গল্প করিবার বস্তু। যুগের পর যুগ এই ঐশ্বর্য্যই তাহাকে আকর্ষণের কেন্দ্র রূপে গড়িয়া ছিলেন। বিদেশের বহু স্থান হইতে বহু বিদেশীয় ভ্রমণকারী আসিয়াছিলেন, এদেশ পরিভ্রমণে পরিশেষে অনেকেই তাঁহাদের এ দেশকে ভাল বলিয়া ফেলিয়াছিলেন কারণ ইহার মোহন রূপের ফাঁদ কাটাইবার কারোই কোনদিন যো ছিল না, এমনি করিয়া বৈদেশিক তারা ভারতীয় হইয়া উঠিয়াছিলেন। ভারতে ইদানিং আপনারা দেখিতেছেন অনেক জাতি, অনেক গোত্র, জ্ঞান চর্চ্চা ও সভ্যতার নানান স্তর ও পর্য্যায়, পাশাপাশি ভারতের বক্ষে আছে সকলেরই জন্য স্থান যেমন বিধাতার জগতে আছে নিখিলেরই আশ্রয়। "বাঁচ এবং বাঁচাও" এই ছিল ভারতের নীতি বাণী এবং এই জন্যই ভারত মৃত্যুকে এড়াইয়া গিয়াছে। ইজিপ্ট রোম এবং অন্যান্য আরো প্রাচীন রাজ্যের গৌরব আছে অতীত দিনের সঙ্গে জড়াইয়া মরিয়া শুধু দু একটা স্মৃতি স্তূপ যা তাদের ২।১ জনের জীবনের কাহিনী বলিবার জন্য দাঁড়াইয়া আছে। কিন্তু ভারতের অতীত গ্রন্থিবদ্ধ হইয়াছে বর্ত্তমানের সহিত। বহু ভাঙ্গা-গড়ার মধ্য দিয়া সে চলিয়া আসিয়াছে কিন্তু প্রত্যেটা পরিবর্ত্তনই তাকে বড় করিয়াছে এই গৌরবে তার খাটো করিতে পারে নাই। এই হাজার হাজার বৎসর ধরিয়া আপনার আঙিনায় সে "সুজন্মা"র সুশস্যই সংগ্রহ করিয়া জমাইয়া তুলিয়াছে এবং যদি তার অতিতেরই মত গরিমা ভবিষ্যতেরও স্বপ্ন সে দেখিতে চায় তাহা হইলেও অন্যায় বা অশোভন কিছু হইবে না।

ভারতবর্ষে আজ হইতে পারে নিঃসম্বল কিন্তু সত্য করিয়াই সে নিঃস্ব নয়। তার ভুল জ্ঞান ও বাস্তব ঐশ্বর্য্য আজও একেবারে নিঃশেষ হয় নাই। এখনো সে রবীন্দ্রনাথের জন্ম

দিতে পারে—জীবিত কবি ও সুধীদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠতম। তার গোপালকৃষ্ণ গোখেলে ছিলেন সুচতুর রাজনৈতিক ছোটবড় নির্বিশেষে সকল ভারতবাসীর প্রীতির পাত্র মুকুটহীন ভারত ভূপতি। যদি তিনি নিজের স্বাস্থ্যকে এতটুকুও বাঁচাইয়া চলিতেন, যদি মাতৃভূমির কল্যাণের জন্য এমন অক্লান্ত শ্রম না করিতেন—তাহা হইলে হয় ত আজও আমরা তাঁহাকে আমাদিগের মধ্যে পাইতাম, ভারতকে এই বহু কৃচ্ছ্রতা দ্বন্দ্বসংঘাতের মধ্য দিয়া তিনি পথ দেখাইয়া লইয়া যাইতে পারিতেন। তারপর আমাদের আছেন সার জগদীশচন্দ্র বসু বিংশ শতাব্দীর মনীষী ঋষি বৈজ্ঞানিক, আর আছেন আমাদের লর্ড সিংহ সমস্ত ভারতবর্ষের গর্বের ধন এবং মাননীয় সভাপতি এবং উপস্থিত হিন্দু, মুসলমান, পার্শী এবং ভারেতর অন্যান্য সম্প্রদায়ের সভ্য যাঁহারা জন্মভূমির জ্ঞানের জন্য সাধ্যানুসারে আত্মনিয়োগ করিতেছেন তাঁহারা যদি বলিতে অনুমোদন করেন—তবে বলিব যে এ পুরুষে ভারতের এ বংশের তিনি অবতংস। তারপর আমাদের নারীও আছেন—যাঁহার পুরাণের প্রাচীন কথাকে সত্য বলিয়া প্রমাণ করিয়া দিতেছেন। তীক্ষ্ণ-ধীসম্পন্না নারী আছেন—সাহিত্যকলার চতুর-শিল্পী নারী আছেন, বিশ্বপ্রেমের প্রতিমূর্ত্তি নারী আছেন, বিপুল সাম্রাজ্যের রশ্মি ধারণের ক্ষমতাশালিনী নারী আছেন—পণ্ডিতা রমাবাই সরোজিনী নাইডু, কামিনী সেন, স্বর্ণকুমারী ঘোষালের মত নারী আছেন, ভূপালের মাননীয়া বেগমসাহেবার মত নারী আছেন এবং বাঙ্গলার স্বর্গীয়া মহারাণী স্বর্ণময়ীর ন্যায়ও নারী ছিলেন। যদি সময় থাকত তবে আমি এমনই আরো অনেক নাম করিতে পারিতাম। আমি যেখানকার মেয়ে সেই এক বাঙ্গলা দেশেই এমন ধী-শালিনী মহিলা আছেন যে পশ্চিমের যে কোনো সভ্য দেশের পক্ষে তেমন মেয়ে গৌরব করিবার। আমাদের মহিলা ঔপন্যাসিক আছেন, পণ্ডিতা, সম্পাদিকা, কবি, উপাধিধারিণী, শুশ্রূষাকারিণী, শিক্ষয়িত্রী সকলের শেষে মহিলা জমিদারও আছেন—যাহাদের জমিদারীর বিলি-ব্যবস্থা খবরদারী তদারকের মুন্সিয়ানা অধিকাংশ পুরুষ জমিদারের চেয়ে অনেক ভাল। একজন কি দুইজন উকীলও হইয়াছেন—কিন্তু আদালত তাঁহাদিগকে ব্যবসায়ের অধিকার দেয় নাই যদিও আমার মতে ইহা অতিশয় অন্যায়। বিশেষতঃ ভারতবর্ষে যেখানে উচ্চ

বংশীয় হিন্দু ও মুসলমান মহিলারা পর্দা মানিয়াই চলিতেছেন—এবং যদি কখনো মোকদ্দমা করিবার প্রয়োজন হয় তাঁহাদিগের পক্ষসমর্থন তেমন ভাল করিয়া হইতে পারে না।

বিশ্বের সকল দেশের নারীরাই আপনাদিগকে বিসর্জ্জন করিয়াছে—পুরুষের জন্য—আত্মদান করিয়াছে। পুরুষেরা এই ত্যাগের উপরে দাবী করিয়াছেন অধিকার। প্রায়ই তাঁরা যে। হয়তো খেলার পুতুল—কখনও ভাবিয়াছেন সংসারের কর্ম্মে নারী তাঁহাদের কর্ম্মের যন্ত্র। আমাকে দুঃখের সহিত এ কথা বলিতে হইতেছে কিন্তু কেউ কি ইহা অস্বীকার করিতে পারেন?

কিন্তু পূর্ব্বে আমি জ্যোতিষ ও গণিতের কথায় দুই জন মহিলার নামোল্লেখ করিয়াছি। তাঁহাদের একজন খনা। খনার বচন ভারতের অনেক স্থানেই প্রচলিত আছে। তিনি শ্বশুরকে বাঁচাইবার জন্য আপনার জিহ্বা বরণ করিয়া লইয়াছিলেন। শ্বশুর তাঁহার ছিলেন একজন খ্যাতনামা জ্যোতিষী মহারাজা বিক্রমাদিত্যের নব রত্নের এক রত্ন বিক্রমাদিত্য যখন খনার প্রতিভার কথা শুনিয়া তাঁহাকে আপনার সভার দশম রত্ন রূপে নিয়োগ করিবার জন্য খনাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিলেন শ্বশুর তখন পুত্রবধূর প্রতিভায় হীন গৌরব হইবার ভয়ে তাঁহার জিহ্বা কাটাইয়া দেন। তাঁর শ্বশুর বরাহ মিশ্রও এক সময়ে কঠিন প্রশ্ন সমাধানের জন্য তাঁহার কাছে ঋণী ছিলেন। এ প্রশ্ন স্বয়ং মহারাজা দিয়াছিলেন সমাধানের জন্য। বরাহমিশ্র পুত্রবধূর জিহ্বা কাটিয়া সে গৌরবের পুরস্কার করিলেন। ভারত নারীর আত্মত্যাগের এতো অতি সামান্য দৃষ্টান্ত। একশত বৎসরেরও কম হইল ভারতের অনেক স্থানেই সতীদাহ প্রথা প্রচলিত ছিল একথা কে না জানেন। ইহা অবশ্য পুরাকালের প্রথা নয়; এবং অতিশয় বর্ব্বরতার পরিচায়ক একটা ব্যাপার তবু ইহা নারীর আত্মবিসর্জ্জনের দৃষ্টান্তই দেখাইতেছে। স্ত্রীলোক বিশেষতঃ বিগত কয়েক শতাব্দী হইতে পৃথিবীর সকল দেশেই আমার মনে হয় অস্বাভাবিক ভাবে পুরুষের সুখ সুবিধার জন্যই জীবনধারণ করিতেছে। অবশ্য গুলজারও তাহাদিগকে লইয়া হয় নিঃসন্দেহ বিশেষতঃ যদি অপাঙ্গে তাদের বাঁকা ভঙ্গী থাকার সৌভাগ্য থাকে কিন্তু তাহা এই যে তাহাদের মানসিক ঋদ্ধি বৃদ্ধিও জ্ঞানোন্নতির পক্ষে পরিমাণহারা ক্ষতি তাঁহার পূরণ করিয়া দিতে পারে না।

বর্ত্তমান যুগের একজন চীনা মহিলা তাঁহার দেশবাসিনী নারীদিগকে উপদেশ দিয়াছিলেন যে তাঁহারা বেশ গন্ধে প্রসাধনে মোহিনী সাজিয়া মনোহরণের ছদ্মবেশ পরিত্যাগ করেন। বিশ্বাস করেন যেন প্রত্যেকেই তার ভগবানের দেওয়া নিজের রূপ আছে। আমরা সকল জাতির নারীই উপরের উপদেশ হইতে যথেষ্ট শিক্ষালাভ করিতে পারি। আমাদের এখন হইতে স্বাভাবিক জীবন যাপন করিতে হইবে বাছিয়া খুঁজিয়া লইতে হইবে আমাদের কর্ম্ম এবং খাঁটখাঁট তাহার সাধনার নির্দ্দেশ করিয়া লইতে হইবে মুক্তির পথ। ভারতে শিক্ষিতা মহিলাদিগের সুযোগ ও কর্ম্ম ক্ষেত্র প্রতিদিনই বৃহৎ হইতে বৃহত্তর হইয়া উঠিতেছে। ভারতে এখনও মহিলা আছেন যাঁহারা প্রাচীন যুগের মত আজিকার দিনেও রাজনীতির চর্চ্চা করিয়া থাকেন। জ্ঞানের তৃষ্ণা অনেক নারীতেই কঠোর গণ্ডী ভাঙ্গিয়া ফেলার বল আনিয়া দিয়াছে। এদিকে জ্ঞানের দীপার দিক দিয়া চলিয়াছি বলিয়াই বস্তুতন্ত্রের দিকটাও একেবারে নাস্তি হইয়া যায় নাই।

ভারতের খনির মণি হীরার এখনও নিঃশেষ হয় নাই, ভূমি এখনও প্রচুর শস্য প্রসব করে প্রায়ই দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয় বটে কিন্তু আমি বলি তাহার কারণ বেশীই হউক আর কমই হউক দেখিয়া শুনিয়া করিবার ক্রটী। ভারতের তাঁতীরা আজও তাহাদের নিপুণ করে সৌখীন রং-এর বাহার দেওয়া মিহিনমুনার শাড়ী কাপড় বুনিতেছে, কিন্তু বলিতে দুঃখ হয় যে তাহারা যথোচিত উৎসাহ পায় না তবু ম্যানচেষ্টার ও বার্ম্মিংহামের তন্তুবায় দিগের ভারতীয় শিল্পের অনুকরণের সকল চেষ্টাই তারা ব্যর্থ করিয়াছে। ভারতীয় শিল্পিরা এখনও এমন শিল্প গড়িতেছেন যে বৈদেশিক ভ্রমণকারী ও অপহৃদিস মণি সন্ধানীরা বাহির হইতে আসিতেছেন অতি ব্যগ্র আগ্রহে সেই শিল্প বিত্ত সংগ্রহের সন্ধানে।

ভারত, বীরত্ব ও সাহসের গৌরবেও হীন নহে। বীরের যোগ্য বংশধরের মতই ভারতের যোধ সম্প্রদায় অতি বড় কৃতীত্বই দেখাইয়াছে, আর সে বীর্য্যবত্তার তাদের পুনঃ পুনঃ প্রমাণ হইয়াছে বর্ত্তমান মহাযুদ্ধে।

এমন মোহন বিত্তশালিনী ভারতকে নিঃস্ব বলা চলে না। ভারতের হতাশ হইবার কারণ নাই।

মনু উপদেশ দিয়াছেন যে—পুত্রের ন্যায় কন্যারাও সমানই যত্নে পালিতা ও শিক্ষা প্রাপ্ত হইবে। শিক্ষিত সুগী পাত্রের সহিত কন্যার বিবাহ দিবে। তিনি আরও বলিয়াছেন যেখানে নারীর সম্মান আছে সেইখানেই আছে শ্রী ও অমৃত আর সেইখানেই বাস করেন শ্রী-নিবাস স্বয়ং। আদিম কালের মানব, নারীকে শুধু শ্রদ্ধা ও সম্মান করিয়াছেন নয় সর্ব্বদাই তাঁহার পরামর্শ সহায়তা গ্রহণ করিয়াছেন এবং চলিবার পথেও তাঁহাদেরই নির্দ্দেশ মানিয়া লইয়াছেন। পুরুষের সঙ্গে নারী ছিল সম চিন্তাশীল সহকর্ম্মিণী।

এখনও ভারতবর্ষের অনেক সংসারেই পারিবারিক ব্যাপারে নারীর নিদেশকে অধিক মর্য্যাদা দেওয়া হইয়া থাকে। পুরুষ অন্নের সংস্থান করিবেন আর সে অন্ন বিতরণের ভার নারীর। নারীই সংসারের কর্ত্রী। সাধারণতঃ মা, ঠাকুমা, খুড়ীমা পিসিমা সর্ব্বময় ক্ষমতা লইয়া সংসার পালন করিয়া থাকেন আর সেই পালনের ক্ষমতা তাঁহাদের প্রেম ও আত্মোৎসর্গের উপাদানে তৈরি। গরিষ্ঠের এই মহৎকর্ম্ম পুত্র কন্যার চরিত্র গঠনের উপকরণ যোগায়।

শত শত শতাব্দীর সভ্যতা, নীতিশিক্ষা এবং "মহতো মহীয়ান" আদর্শ আমাদের নারীদিগের শিরা-ধমনীতে রক্ত প্রবাহ সঞ্চালিত করিতেছে। সেই জন্য বর্ত্তমানের সকল যোগ্যতা লইয়া বর্ত্তমান বংশধরদিগের জন্য কল্যাণ কর্ম্মের অনুষ্ঠান তারা করিতে পারিবে এবং দীপালি-জ্বালা একটা মনোময় ভবিষ্যতের দিকে তাহারা অগ্রসর হইবে। ঘরের মধ্যে শুধু তাহারা একচ্ছত্রা রাণী হইয়া রাজ্যশাসন করিবেন তাহারা ভবিষ্যতে তাহারা বাহির হইতে সেই অতীতের দিনে যেমন যাইত—কর্ম্মক্ষেত্রে পুরুষের সঙ্গে যোগ দিবার জন্য। গণ্ডী বাধা উঠিয়া গিয়াছে অবগুণ্ঠন খসিয়া পড়িয়াছে। অবাধ আলোক ও প্রভাত বায়ু তাহাদের মুখে চোখে পুলকের সঙ্গে আনিয়া দিয়াছে—মাতৃভূমির আহ্বান, নীল আকাশের ডাক তাদের কাণে পশিয়াছে পৃথিবীর সকল হইতে আজ তারা পৃথক নয়।

এমন একটা সময় আসিতেছে যখন প্রত্যেক জাতিই আদায় করিয়া লইবে তার পাওনা। আমার যেন মনে হয় সে পাওনা আদায়ের চেয়েও আরো কিছু বেশী সংঘটিত হইতে চলিয়াছে। একটা যেন নূতন আলোক বিশ্বের বুকে নব-প্রভাত লইয়া আসিতেছে—এই বিশ্বব্যাপী সমরে ক্ষত-বেদনা ও তীব্রতা, আজের এই দেশ-দেশের অশান্তি, অভিযোগ এ সকলের বক্ষ দীর্ণ করিয়া আসিতেছে একটা নূতন সত্যযুগ দ্রুত ত্বরিত। ভগবান নিষ্ঠুর

নন। মানব তার অজ্ঞানতায় মরণের বরণে ধ্বংসের ভেট যোগাইতেছে কিন্তু ভগবান তাঁর ভাগ্যবতী জ্ঞানে চিরদিনই অমৃতের স্পর্শ দিয়া বাঁচাইতেছেন নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতেছেন। অনেক জাতিই ইত্যবসরেই দেখিতে আরম্ভ করিয়াছেন--কি ব্যস্ত বেগেই না বিধাতার হাতের কাজ চলিয়াছে কেমন তড়িৎ-টানে তাঁর দেশগুলিকে পূর্ব্ব, পশ্চিম, উত্তর, দক্ষিণ তিনি টানিতেছেন এক সঙ্গে মিলাইয়া ধরিবার জন্য। মনে হয় যেন এই সব দেশের যা কিছু শোভন শুভ তাহাদিগকে তা দিতে হইবে বিধাতার ইঙ্গিতে আর তাহারই উপর হইতে যে যুগ আসিতেছে আর প্রতিষ্ঠান। আবার নারীর অমৃতময়ী সেবা ও জ্ঞান নিতান্ত করিয়া প্রয়োজন হইবে সকল ক্ষতের উপর প্রলেপ দিতে, নূতন জীবন ও শক্তিকে পূর্ণ করিয়া তুলিবার জন্য মনুষ্যত্বের মহত্ব আনিয়া দিতে। মনে হয় যেন এতদিন ধরিয়া সব দেশই চলিয়াছিল আপনার পথে নিজের প্রয়োজন প্রত্যেকেই চলিয়াছিল আপনার গতি মুখে অন্যকে এড়াইয়া ছাড়িয়া—ফলে একজনের কর্ম্ম সাধিত হইতেছিল আর একজনের প্রতিপক্ষে বিরোধ ঘটাইয়া।

আমাদের কেহই (পূর্ব্ব ও পশ্চিমের) অবশ্য অকৃতজ্ঞ হইব না। আমরা কেহই অস্বীকার করিব না যে বিগত দিনে আমরা পরস্পরের নিকট অনেক বিষয়েই ঋণী ছিলাম। আমাদের উচিত নয় যে একজন আর একজনের উপর বড় হইয়া উঠিবার জন্য চেষ্টা করি কারণ করে পূব করেই বা পশ্চিম, দুইই সেই নিরাকার, অক্ষয় অনন্ত রাজা ভগবানের এবং তিনি তাহাদের—আমাদের সকলের। যখন আমরা তাঁর সৃষ্ট জীব তাঁর রাজ্য ভাগ করিতে বসি তখন তাঁকেই আমরা অস্বীকার করি তাঁর পবিত্র আইন ভাঙিয়া চলি। যখন আমরা অপরের কর্ম্ম ধারার মধ্যে ত্রুটি ধরি, তাহাদের ধর্ম্মের মধ্যে দোষ দেখি, সমব্যথায় হৃদয় ভাঙিয়া যায় না; সহানুভূতি ক্ষমা শুভ-ইচ্ছা জাগাইতে পারি না আমাদেরই একশ্রেণীর অন্যান্য জীবের প্রতি তখন আমরা অখণ্ড বিধাতাকেই খণ্ড করিয়া সেই খণ্ডগুলির মধ্যে রচনা করিয়া তুলি এক একটা প্রাচীর।

কিন্তু একটা সময় আসিতেছে যখন সকলেই ন্যায্য স্বত্বের দাবী করিয়া আপন অংশ আদায় করিয়া লইবে, যখন নর ও নারী কালো-সাদা, পীত-হরিৎ—সকলকে দেওয়া হইবে

সমান অধিকার সমান সুযোগ —যখন সকল বৃত্তির বাঁধ-বাঁধন যাইবে ভাঙিয়া ছিঁড়িয়া, যখন ভগবান আপনার অস্বীকার আর ক্ষমা করিয়া বলি বন না—আপনাকে আর একবার জগতের সম্মুখে প্রকাশ করিবেন যেমন অতীতে অনেকবার করিয়াছেন —জগতকে জানাইবার জন্য যে তাঁহার নীতি বিধান সকলের উপরে বড় এবং তাঁরই বিচার সকল বিচারের শেষ।

পূর্ব তাঁহারই নিকট হইতে পাইয়াছিল মানবজাতির উপরে অধিনায়কত্ব আবার ইহাও তাঁহারই ইচ্ছা যে পশ্চিমও সে নেতৃত্বের একটু সুযোগ পাইয়াছে। কিন্তু মনে হয় ভবিষ্যতে জাতির উপরে নেতৃত্বের ভার লইবেন ভগবান স্বয়ং এবং তাঁহার বিশ্বের সবগুলি দেশকে সমান করিয়া আনিবেন একই সমতলের উপর। আমাদের প্রত্যেককেই কিছু কিছু স্বার্থত্যাগ করিতে হইবে; প্রত্যেকে প্রত্যেকের সহিত মিলিব জীবন যাত্রার অর্দ্ধপথে। এমন কি শিক্ষা বড় করিতে হইবে নব সংস্কার। ভবিষ্যৎকালের উপর পূবের ছাপটা পড়িবে যে আয়তনে পশ্চিমের দাগটাও ফুটিয়া উঠিবে সেই মাত্রায়। পশ্চিম ইউরোপের বাহিরের অন্য সভ্যতার আর অস্বীকার করিয়া চলিতে পারিবে না।

অতি পুরাতন আদিম ছিল ভারতীয় নারীর পক্ষে সোণার যুগ। এ বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই। তখন তাহারা ছিল স্বাধীন—এবং আপনাদের কর্ম্মে মুক্তির পথ করিয়া লইবার ছিল তাহাদের যথেষ্ট সুযোগ। সংসারটা আরম্ভ হইল মধ্যযুগে। তখন মানবী হইল মানবের সাধারণ সম্পত্তি নারীত্বটা নারী আপনার হারাইয়া বসিল। তবুও মাঝে মাঝে দু'একজন বহুধা-বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়াও এমন ব্যক্তিত্বের প্রতিষ্ঠা করিতে পারিয়াছিল যে সেই মসীময় মধ্যযুগেও পুরুষকে সেটা অনুভব করিতে হইয়াছিল (বেশ গাঢ় রকম)

৫০ বৎসর আগে আমাদের অবস্থা যা ছিল তুলনায় তার চেয়ে আজের অবস্থা অনেক উন্নত, তবু নারীকে অল্পাধিক পরিমাণে আজও পুরুষের অনুকম্পার উপর নির্ভর করিতে হয়। যা হোক তবু আমাদের প্রবোধ আছে যে আমরাই পৃথিবীর একমাত্র নারী নই যাঁরা পুরুষ কর্ত্তৃক নির্য্যাতিত ও অস্বীকৃত হইয়া আসিতেছি। আমাদের কর্ম্মের নিদেশনায় প্রয়োজন পুরুষের ইঙ্গিত যেন আমাদের চেয়ে নারীর মানস-বৃত্তি পুরুষেরই অধিক এবং তাঁহারা যেন সবজান্তা—আমাদের পক্ষে কি শুভ আর কি-ই বা অশুভ। আমরা কিন্তু তাঁহাদের কর্ত্তব্যের

নির্দ্দেশ করিয়া দিতে যাই না কারণ আমরা জানি যে তাঁহাদের পক্ষে যাহা শুভ অশুভ তা তাঁহাদের জানা উচিত। তথাপি আমরা প্রস্তুত আছি—তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিতে সাহায্য করিতে কেন না আমরা জানি যে পুরুষের জীবন সাফল্যের সঙ্গে আমাদের সুখ প্রসাদ ওতঃপ্রোত ভাবে জড়িত। আমরা চাই সহানুভূতি আমাদের অন্তরাত্মাকে শোভন ও সম্পূর্ণ করিয়া গড়িবার শক্তি। অতীতের উপর আমরা পাইয়াছি—একটা দৃঢ় প্রতিষ্ঠান—ইহার উপরেই আমরা বর্ত্তমানকে গড়িয়া তুলিতে পারি—ইহা করিতে আমাদিগকে বাধা জন্মাইবারও কিছু নাই। নর ও নারী নিয়তই পরস্পরকে সাহায্য করিতে পারে—চলার মাঝখানে বাধা শিলা রূপে দুরতিক্রম্য না ইহার, পরস্পর পরস্পরের সাথী হইতে পারি। আমর একথা শুনিয়া পুরুষরা দুঃখিত হইতে পারেন। তাঁহারা বলিতেছেন—আমরা হইয়া উঠিতেছি সাফ্রেজেট আমরা হইয়া উঠিতেছি সাহেবী। কিন্তু তাঁহারা ভুলিয়া যাইতেছেন যে আমরা চাহিতেছি শুধু আমাদের জন্ম অধিকার, আমরা চলিতে চাহিতেছি অতীতের আমাদের নারী-নেতাগণের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া। পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চ্চাকেও আমরা তাচ্ছিল্য করি না কারণ আমরা জানি তাহার ভিতর আছে প্রচুর কল্যাণ এবং এই চর্চ্চায় মোহিত হইয়া উঠিলে হৃদয় আমাদের গৌরবান্বিত হইতে পারে। আমরা বিশ্বাস করি সকল জ্ঞানানুশীলন, উচ্চ চিন্তার ফল গোটা বিশ্বের সম্পত্তি এবং উন্নতি প্রয়াসী কোনো জাতিই ইহার যে কোনো একটাকেও অবহেলা করিতে পারিল না কারণ তাহা হইলে এ অবহেলা তাঁহাদের আপন উন্নতির গতিকেই পর্য্যাহত করিয়া দিবে। পূর্ব্বকালে পূর্ণ যৌবন সঞ্চারের আগে কন্যার বিবাহ হইত না। অনেক সময়েই তাঁহারা আপন মনোমত বরের বরণ করিতেন এবং সংস্কার ও শিক্ষায় তাঁহার সর্ব্বাংশেই স্বামীর সমতুল্য ছিলেন। ভারতের কোনো কোনো সমাজে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধ হইয়াছে—যেমন ব্রাহ্ম ও আর্য্য সমাজ কিন্তু নারীর শিক্ষার একটা কিছু ধারা এখনও বিধিবদ্ধ হয় নাই। কেহ কেহ বলেন—স্বামীর সহচরী হইবার উপযুক্ত শিক্ষা দিলেই নারীর পক্ষে যথেষ্ট হইল। কি মহা করুণার কথা। কেহ কেহ বলেন ভারতীয় নারীর পক্ষে কোনোরূপ কার্য্যকরী বিদ্যালাভের প্রয়োজন নাই এবং যাঁহারা এরূপ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন—সমাজে সে সকল নারী বরং নিন্দনীয়ই। তাঁহারা বলেন এই শিক্ষা নারীর গৃহিণীপনা ঘরকন্নার কাজে বাধা জন্মায়, আমার মনে হয় ইহা নিতান্ত নির্ব্বোধেরই

উক্তি। আমার কাছে আপন ঘরের কোনো কর্ম্মই হীন নয় পরিবারে সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য আত্মনিয়োগ করার মধ্যে নীচতা নাই এবং অধিকাংশ নারীই তা মনেও করেন না। আমাদের দেশের বেশীর ভাগ নারীর পক্ষেই এমন কি বড় ঘরের ঘরণী পদবীর গরবিণী যাঁরা তাঁদের পক্ষেও এই ই নিয়ম। অবশ্য দু'একজনের সম্বন্ধে এ নিয়মের ব্যতিক্রমও ঘটিয়াছে—কিন্তু ব্যতিক্রমের উপর জাতির বিচার করা সঙ্গত নয়।

অনেকে আবার বলিতেছেন:—নারীরা আমাদের দেশে আত্মীয়পরিজন কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হন না এরূপ ঘটনা অতি কদাচিৎ ঘটিয়া থাকে সুতরাং অর্থকরী বিদ্যার দুয়ার নারীর সম্মুখে খুলিয়া ধরিবার প্রয়োজন কিছু নাই কিন্তু উদরের সংস্থানই ত ব্যবসায় শিক্ষার একমাত্র উদ্দেশ্য নয়। চিকিৎসক, ধাত্রী, শিক্ষয়িত্রীও আইনজ্ঞা হওয়ার মানে আপনার দেশ ও স্বদেশবাসী জন-গণের কল্যাণ-কাজে সহায়তা করা। এ শিক্ষা জীবনকে দেয়—একটা উদার দৃষ্টি। অবশ্য প্রত্যেক নারীকেই বাহিরে গিয়া তাহার জীবিকা অর্জ্জন করিয়া আনিতে হইবে না কিন্তু শিক্ষা থাকিলে ঘরের গণ্ডীর এ পারেও—তাঁহাদের দ্বারা হইতে পারে। তাঁহারা দেশ ও দশের কথা ভাবিতে—বাহিরের মুক্ত বিশ্বের স্পন্দন অনুভব করিতে পারেন। বিশ্বাস আসে যে তাঁহারাও এই মহা বিশ্বেরই জন এবং এর চেয়েও বড় কথা হইল। এই যে শিক্ষা প্রথমতঃ শিক্ষার জন্যই হওয়া উচিত অন্য কথা তার পরের। শিক্ষার মানে আমি এই বুঝি যে আপনাকে মহৎ করিয়া তোলা—মনে ও স্বভাবে দুই দিক দিয়াই।

গত ৮০ বৎসরের মধ্যে নারীর পক্ষে লড়িবার জন্য অনেক নেতাকেই আমরা পাইয়াছিলাম—যেমন মনীষী পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, রাজা রামমোহন রায়, ব্রহ্মানন্দ কেশব চন্দ্র সেন এবং এইরূপ আরও অনেকে। আত্মোন্নতির কৃচ্ছ্র পথকে প্রশস্ত করিয়া ধরার জন্য এ যুগের ভারতীয় নারী আমাদের সেই সকল মহাত্মার গৌরবময় স্মৃতির উদ্দেশ্যে কৃতজ্ঞতার অভিনন্দন জানান অবশ্য করিয়া কর্ত্তব্য। কিন্তু আমাকে দুঃখের সহিত বলিতে হইতেছে যে পুরুষদিগের সহিত একই ক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া তাঁহাদিগের সঙ্গী ও সহকর্ম্মী রূপে কাজ করিবার উপযুক্ত হইতে আমাদের এখনও বহু শিখিবার ও করিবার আছে। দেশের কাজে দাঁড়াইবার পক্ষে তাঁহাদের নিজেদের জন্যই এখনও যথেষ্ট সবল হয় নাই;—কিন্তু কর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছে।—সূত্রপাতেই আমরা আনন্দ করিব কর্ম্মের অংশ গ্রহণের দাবী

জানাইব। দেশের জন্য তার নারীও অনুভব করে—পুরুষের মতই সুগভীর বেদনায়—মাতৃভূমির সেবায়, তাঁর জন্য প্রাণধারণে তাঁরই জন্য জীবন উৎসর্গ করাই তারও আকাঙ্ক্ষা। আমাদের দেশের অতি সামান্য সংখ্যক ২১৪ জন পুরুষ ভোটের অধিকার পাইয়াছেন। কয়েকজন শিক্ষিতা মহিলাও দেশনেত্রী দু'চারজন নারীর সাহায্যে কর্ত্তৃপক্ষের দরবারে নিবেদন জানাইয়াছেন যে নারীকেও ভোটের অধিকার দেওয়া হউক অন্ততঃ যাঁরা এ অধিকার লাভের যোগ্য—তাঁহাদিগকে যেন বঞ্চিত করা না হয়। কিন্তু নিবেদন আমাদের ব্যর্থ হইয়াছে। তাই বলিয়া আমরা নিরাশ হইব না—আমরা প্রাণপণ প্রয়াস করিব নারীর কর্ম্মফল ভবিতব্যকে আকার দিয়া তুলিতে মর্য্যাদা এবং আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে সে ভবিতব্যও মর্য্যাদায় গৌরবে অতীতের দিনের তুলনায় কোনো অংশেই হীন ম্লান হইবে না। আপনাদের নারীদলের মধ্যে আমাদের পক্ষসমর্থনের কয়েকজন মহিমময়ী মহিলা আছেন। তাঁহারা আমাদিগকে টানিতেছেন আমরাও নারী বলিয়া নয় তাঁহারা ও আমরা শতাব্দীর শতাব্দী ধরিয়া সমানই দুঃখভাগিনী হইয়া আছি বলিয়া।

তাঁহাদের কল্যাণকামনায় আমরা গৌরব করিতেছি এবং আমাদের জাতিয়া জীবন-গঠনের সম্মুখ-পথে অগ্রসর হইয়া চলিবার জন্য তাঁহাদের সাহায্য সর্ব্বান্তঃকরণে গ্রহণ করিতেছি। কোনো জাতিই সম্পূর্ণ সভ্য অভিধান লাভ করিতে পারিনা যে পর্য্যন্ত না সকলগুলি অঙ্গই তার পরিণত পুষ্ট হইয়া উঠিবার যথেষ্ট অবসর ও উপাদান পায়। নারীর অর্দ্ধাঙ্গ সমাজের চাই ঠিক পুরুষের অর্দ্ধাঙ্গেরই ন্যায়ই দৃঢ় সবল হওয়া, বুঝি তার চেয়েও বেশী কারণ জাতির মাতৃত্বের যে মহা গৌরব তা যে নারীরই নিতান্ত। "যে হাতে শিশুর সেবা হয় সেই হাতেই পৃথিবীর শাসন ভার"—এবং সত্যকার ঐ হস্তেই জাতির জীবন সঞ্চার হয় অথবা মৃত্যু লইয়া আসে রাজ্যের গঠন হয় অথবা সাম্রাজ্য ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। শিশুর হৃদয়ে যে প্রাথমিক শিক্ষার বীজ অঙ্কুরিত হয় শিশুর অজ্ঞাতে তাহাই তাহার অন্তর প্রদেশে দৃঢ়মূল সঞ্চার করিয়া পরবর্ত্তী জীবন ও বংশে সুফল ধারণ করে।

আমরা যদি আমাদের বড় ভালবাসার দেশের কাজ করিতে চাই তবে সন্তানসন্ততির উপযুক্ত মা হইতে হইবে। এবং এই যোগ্যতা লাভ করিতে হইলে আমাদিগকে দিতে হইবে প্রচুর সুযোগ আমাদের চাই পুরুষের সাহায্য ও সহানুভূতি আরো চাই এই দেশের নর-নারীর

সহায়, কারণ তাঁরা ও আমরা একই সাম্রাজ্যের প্রজা। আমরা পরস্পরকে টানিয়া লইবার জন্য একজন আর একজনকে হাত বাড়াইয়া দিব—যদি আমরা চাই এদেশ, ওদেশ দুই দেশেরেই ঋদ্ধি সম্বল।

কিপলিং এর এই ভ্রমাত্মক ছত্র কয়টী আমাদের ভুলিয়া যাইতে হইবে ঃ—

"পূব সে রহিবে পূব প্রতীচী পশ্চিম
কথনো হবেনা এই যুগল মিলন
দাঁড়াইয়া যতদিন আকাশ পৃথিবী
ঘিরে আছে বিধাতার বিচার আসন।

কিন্তু পশ্চিম যখন খৃষ্ট-ধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ছিল তখন কি সে পূবকে বরণ করে নাই। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তার পরেও পুনঃ পুনঃ মিলিয়ে দাঁড়াইয়াছে। এখন তারা পরস্পর পরস্পরের অংশ প্রত্যংশ। তারা একজন আর একজনের প্রাণের সাড়া আপনার অন্তরে ফুটাইয়া ধরিয়াছে। আমরা শুধু বাহিরের মিছা কথার উপর পার্থক্যের ত্রুটির আরোপ করি যেমন বর্ণ, রীতি পদ্ধতি ইত্যাদি। আজ আসুন এসব আমরা ভুলিয়া গিয়া অন্তরের অন্তরতম প্রদেশে প্রবেশ লাভ করি। মূল বনিয়াদ স্বরূপ সেখানে আমরা সন্ধান পাইব একই মনুষ্যত্বের। আমার পরম দরদী বন্ধুদের কয়েকজন ইংরেজ মহিলা। যখন পরস্পরের কাছে আমরা আপন আপন অন্তরের দ্বার মুক্ত করিয়া দিই কোনো বিচার বিতর্কই তখন আমাদিগের মধ্যে পার্থক্যের জাঙ্গাল রচনা করিয়া দাঁড়ায় না। আমরা পরস্পরের সত্যকার গৌরব ও মর্য্যাদা ছাড়া আর কিছুরই বিচার করি না কারণ আমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ থাকে পরস্পরের আত্মার পরস্পরের জ্ঞানদ্যোতনার প্রতি। যদি আমরা আমাদের স্বজাতীয় জীবের আত্মার, গৌরবের খবর লইতে পারি তবে বৃথা ব্যথা, সন্দেহ, প্রভৃতি ক্রমশঃ পৃথিবী হইতে অন্তর্হিত হইবে। প্রত্যেকে প্রত্যেককে মনে করিবেন ভ্রাতা ও ভগিনী; অনন্তের নির্দেশ পালন করিবার জন্য একই জীবনের পথে যাত্রী কেবল একজন বিকাশের ক্রমে একটু বেশীদূর এগাইয়া গিয়াছে আর একজনকে সাধনার অনেক স্তর অতিক্রম করিয়া এখনও যাইতে হইবে। কিন্তু গন্তব্যের সীমান্ত সকলেরই এক।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

প্রাণের প্রবাহ।

আলোর দেশের বারতা বহিয়া
আকুল পবন ছুটিয়া আসে,
গোপন প্রেমের মধুর পরশে
কাননে কোমল কুসুম হাসে।
গগণের কোলে তারকার আলো,
সাগরের কোলে ঊর্ম্মি রাশি,
সহসা সরল বন্ধন টুটি
উচ্ছল-প্রেমে আসে গো ভাসি।
কে জানিত ওগো কোকিল-কূজনে
এত সঙ্গীত লুকিয়ে আছে,
ফাগুনীর ঘায়ে নীরব-তন্ত্রী
পঞ্চমে পুনঃ পুলকে বাজে।
তেমনি সহসা মানব হিয়ায়
ভাবের প্রবাহ আসে গো ছুটে,
অজানা আলোর পরশ লভিয়া
হৃদয়-কমল অমনি ফুটে।
ভাবের জোয়ারে ভেসে যায় প্রাণ,
সে কি কল্লোল চিত্ত মাঝে,
সঙ্গীত শত বন্ধন টুটি
অন্তরে যেন আপনি বাজে।
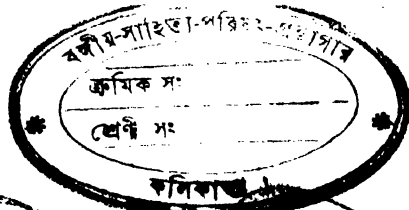
শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।"

৫ম বর্ষ। } মাঘ, ১৩২৭ সাল। ১ম খণ্ড, ৩য় সংখ্যা।

শেষভিক্ষা।

বেজে উঠে ওই জীবন-বীণায়
শেষ বিদায়ের গান ;
সকল গানের প্রভু আজি মোর
লও গো শেষের দান।

ক্ষ্যাপার মতন সারা নিশিদিন
বেসুরেই শুধু বাজাইনু বীণ্,—
তোমার আলোক-সভায় কেমনে
বাজাব এ বীণাখান!

বীণায় আমার দাও নবস্থর—
সঙ্গীতে হৃদি কর ভরপুর,
শতদল হয়ে তব পাশে যেন
ভেসে উঠে মোর গান।

শ্রীশ্রীপতিপ্রসন্ন ঘোষ।

প্রিয়তমা।

—:*:—

(পূর্ব্ব প্রকাশিতে পর)

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

"খুন—খুন, কে খুন করিল ত্যাথ!" দূর হইতে আর একটা চীৎকার উঠিয়াছিল। লিয়েন ততক্ষণে জলে পড়িয়া সাঁতার দিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু ভারি পোষাক বিশেষ তাহার রৌপ্যতার-খচিত পাড়ের জন্য সে যথারীতি হস্তপদ সঞ্চালন করিতে না পারায় শীঘ্র শীঘ্র ডুবিতেছিল।

দূরে চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল ইণ্ডিয়ান হাউসের নবনিযুক্তা দাসী; চন্দ্রালোকে সেতুর দৃশ্য সে দেখিয়াছিল। কে কাহাকে জলে ফেলিয়া দিল—দেখিয়া সে চীৎকার করে। সে শব্দে উদ্যানের সকলেই ছুটিয়াছিল। আলো লইয়া ফ্রোলেন সর্ব্বাগ্রে ও পশ্চাতে উদ্যানরক্ষকেরা সেখানে আসিয়া পড়িল। লিয়েনের দেহ এক একবার ভাসিয়া উঠিতেছিল, জন রোদন-কাতর স্বরে বলিয়া উঠিল, "মা,—আমার ননা যে! একি সর্ব্বনাশ হইল!"

ততক্ষণে ডামার্ড গায়ের কোট ছিঁড়িয়া খুলিয়া জলে লাফাইয়া পড়িয়াছে। অল্প ক্ষণেই ব্যারণেসের দেহ তীরে উঠাইয়া ডামার্ড দূরে দাঁড়াইল। লিয়েন অচৈতন্য হইয়াছিল।

সকলের শুশ্রূষায় খানিক পরেই তাহার জ্ঞান ফিরিল। একটু সুস্থ হইয়াই সে বলিল—একথা লইয়া তাহারা যেন গোল না করে। প্রশ্ন করিয়া বুঝিল পদরীকে তাহারা চিনিতে পারিয়াছে। ক্রোলনের একান্ত বাধা সত্ত্বে লিয়েন আর সেখানে থাকিতে চাহিল না, "বড় প্রয়োজন আছে" বলিয়া তখনি প্রাসাদে চলিয়া গেল।

উদ্যানের কলরব শোন্‌ওয়ার্থের দাসদাসীরাও শুনিয়াছিল; কোথায় কি হইল--পরস্পরকে প্রশ্ন করিতে করিতে তাহারা বাহির হইবার উপক্রম করিতেছে, এমন সময় জলদেবীর ন্যায় সিক্ত কেশে আর্দ্র বসনে প্রভু পত্নীকে উপস্থিত হইতে দেখিয়া সকলে আশ্চর্য্য হইয়া কোলাহল করিয়া উঠিল। মৃদু হাসিয়া সকলকে আশ্বস্ত ও গোল্ করিতে নিষেধ করিয়া লিয়েন উপরের উঠিয়া আপনার ঘরে আসিল।

হানা তাহার সঙ্গেই আসিয়াছিল, পোষাক বদলাইয়া সে তাহার গায়ে একটি পশমী জামা দিয়া চুল শুখাইতে লাগিল। লিয়েন বলিল, "ব্যারণ কোথায় হানা ?"

মুচ্‌কি হাসিয়া হানা বলিল, "তাঁহারা সেই ঘরেই আছেন।" লিয়েন বুঝিল এখনও তাঁহাদের বিবাদ মিটে নাই। একটু ভাবিয়া সে দাঁড়াইতেই হানা বলিল, "কোথায় মা—বসুন, চুলটা ভাল করিয়া শুখাইয়া দিই, এত রাত্রিতে ঠাণ্ডা জলে ভিজিয়া আপনার অসুখ হইবে যে।"

"না কিছু হইবে না, তুমি বসো—আমি এখনি আসিতেছি।" বলিয়া লিয়েন একখানি কালো শালে সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া হলঘরের দিকে চলিয়া গেল।

খুড়া ভাইপোর বচসা তখন ধীরে ধীরে থামিয়া আসিতেছে, বৃদ্ধের মুখে কুটিল ক্রোধের মূর্ত্তি জাজ্বল্যমান, ব্যারণের আকৃতি যেন বিরক্তি ও অবসাদে ক্লান্ত। লিয়েনকে দেখিয়া তিনি সোৎসাহে বলিলেন, "লিয়ো কোথায় গেল—জান ?"

সে ঘুমাইতেছে, "বলিয়াই হফ্‌মার্শেলের প্রতি চাহিয়া বলিল, শেষ হইয়াছে, রোটাস্ লিলি আর নাই।"

সোৎসুক স্বরে বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন,—"তাই নাকি! এতক্ষণে একজন প্রজাবৃদ্ধি হইল সয়তানের! প্রেতিনী মরিয়া নরকের শোভা বাড়াইল।"

"না, সে স্বর্গের শোভা, এতক্ষণে সে ন্যায় বিচারকের পদতলে বসিয়া তাহার গলার কালো দাগগুলার জন্য বিচার প্রার্থনা করিতেছে ?"

লিয়েনের কথায় সচমকে মার্শেল বলিলেন, "গলার কালো দাগ ? তার মানে ?"

"তার মানে আপনি ভালই জানেন, ডাক্তার তাকে পক্ষাঘাতের লক্ষণ বলিলেও সর্ব্বজ্ঞ ভগবান সে বাঁকা আঙ্গুলের চিহ্ন চিনিতে ভুল করিবেন না।"

বৃদ্ধ সবেগে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া আবার বসিয়া পড়িলেন, "ওঃ ওঃ—মরিবার পূর্ব্বে তবে সে জিভ্‌ নাড়িতে পারিয়াছে বুঝি ?"

"না না, জীবনে আর সে বাক্‌শক্তি ফিরিয়া পায় নাই, জন্মের মতই তাহাকে নষ্ট করা হইয়াছিল। কিন্তু পাপ. ও মহাপাতক কি গোপন থাকে কখনো ?"

আশস্ত হইয়া বক্রহাসির সহিত বৃদ্ধ বলিলেন, "তবে তুমি কি বকিতেছ ? পাগল হইলে না কি ?"

লিয়েনের আকৃতিতে দারুণ উত্তেজনার সহিত অবসাদের ভাবও স্পষ্ট দেখা গেল ; তাহার চোখের পাতা ভার, দেহ যেন ভাঙ্গিয়া পড়িতেছে। তবু সে জোর করিয়া বলিল, "পাগল ? হাঁ, সেই রেড্‌ রুমের দ্বারের নিকটের অমানুষিক ঘটনা ভাবিলে মানুষ পাগল হইয়া যায় বটে। স্মরণ করুন, আফ্রিকার দিনে আপনার সে কৃতকর্ম্ম স্মরণ করুন,— আর যদি—"

"রাওয়েল—রাওয়েল, তোমার স্ত্রী নিশ্চয় পাগল হইয়া গিয়াছে ! যাও উহাকে বিছানায় লইয়া যাও, ঘুমাইলে সুস্থ হইতে পারে।"—

রাওয়েলও আশ্চর্য্য ভাবে চাহিয়া ছিলেন, তিনি এতখানি জানিতেন না তাই জুলিয়েনের কথার অর্থবোধ করেন নাই, সে অত্যধিক উত্তেজনার কারণও সহসা অনুমান করিতে না পারিয়া নিকটে আসিয়া বলিলেন "লিয়েন, তোমার চুল ভিজিল কিসে, এত রাত্রিতে স্নান করিয়াছ না কি ?"

"না, সে সব পরে জানিবে, এখন আমার দুটি কথা বলিতে দাও রাওয়েল !—"

"বলিবে তোমার মাথা আর মুণ্ড ! রাওয়েল, দেখিতেছ কি, মেয়েটির মাথা যে একেবারে খারাপ হইয়া গিয়াছে দেখিতেছ না, এখনি নাচের পোষাকে ছিল আবার কখন গিয়া

মাথায় জল ঢালিয়াছে,—গায়ে একটা মড়া-ঢাকার মত কাপড় জড়াইয়া ভূত সাজিয়াছে, তারপর এখানে আসিয়া ঐ আবল্ তাবল্ কথা। যাও উহাকে ধরিয়া নিয়া ঘরে যাও, যত্ন কর।”

নিকটে আসিয়া ব্যারণ বলিলেন, “হাঁ লিয়েন, ঘরে চল, তুমি সুস্থ নও।”

তাঁহার হাত সরাইয়া লিয়েন বলিল, “খুব সুস্থ আছি, কোন ভাবনা নাই তোমাদের। বৈকালে তোমায় বলি নাই রাওয়েল? আমার কতকগুলি কথা বলিবার ছিল, তুমি তখন বলিয়াছিলে যে আসিয়া শুনিবে। যাহা হউক ইনিও উপস্থিত আছেন,—শোন তোমরা। আমি সেই মৃতা নারীর কথা বলিব, যে আর তোমাদের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ রাখে না।” ইহার পর সে প্রথম দিন হইতে সমস্ত কথা বলিয়া গেল। ফ্রোলন যেমন ভাবে সমস্ত ঘটনা দেখিয়া শুনিয়া বুঝিতে পারে, তাহার মুখের কথা দিয়া সে তেমনি ভাবে বুঝাইয়া দিল।

শুনিতে শুনিতে হপ্‌মার্শের চীৎকার করিয়া বলিলেন, “ফ্রোলনটাও আমায় বিষম ফাঁকি দিয়াছে! উঃ আমি যে তাহাকে চিরদিন বিশ্বাসী বলিয়া জানিতাম!—নিমকহারাম—পাজি! এত মিথ্যাকথা বানাইয়া রাখিয়াছে তা ত জানিতাম না।”

“সে মিথ্যা বলে নাই—”

লিয়েনের কথায় বাধা দিয়া মার্শেল বলিলেন, “যত মিথ্যা বলিতেছি আমি,—কেমন? একটা দাসী, যে একটু ভয় পাইলে বা সামান্য অর্থের মুখ দেখিলে—এক মুখে পঞ্চাশ কথা ঘুরাইতে পারে;—তারি মুখের আজগুবি এক গল্প শুনিয়া লোকে আমায় ঐ সব অসম্ভব কাণ্ডের নায়ক স্থির করিয়া লইবে; ইহা তোমার পাগ্‌লামির খেয়ালী বুদ্ধিতে আসিলেও আর কেহ সে কথা বিশ্বাস করিবে না, তা জান?”

“তার কথা না বিশ্বাস করুক, কিন্তু এই পত্রখানা—পড় রাওয়েল, এ চিঠি তোমারই।” বলিয়া লিয়েন গলার চেন হইতে পদকটি খুলিয়া স্বামীর হাতে দিল। “ও আবার কি?” বলিয়া ব্যারণ তাড়াতাড়ি ছুরির ফলা দিয়া পদকটির ডালা খুলিয়া পত্রখানি বাহির করিলেন।

“ওকি—কার চিঠি, দেখি।” বলিয়া মার্শেল হাত বাড়াইয়া সম্মুখে আসিতে ব্যারণ হাত সরাইয়া বলিলেন, “আমার চিঠি—ছোট কাকার লেখা, আমি পড়িয়া আপনাকে দিব, থামুন।”

"গিলবার্টের লেখা? না না মিথ্যা কথা, ও চিঠি জাল—"

লিয়েন বলিল, "ভাল করিয়া দ্যাখ রাওয়েল, উপরে শিল আছে।"

পত্রখানি ভাঁজ করা ছিল কিন্তু উপরের মোহর ভাঙ্গে নাই। রাওয়েল্ দেখিয়াই বলিলেন, "তাই ত, এ যে সেই আঙ্গটির শিল কাটা, ঐ যেটা আপনার আঙ্গুলে এখনও আছে,—দশই সেপ্টেম্বর দিনটিকে স্মরণ রাখিতে বলিয়া তিনি যাহা আপনাকে দিয়াছিলেন।"—

মধ্য পথে বাধা দিয়া সগর্ব্বে মার্শেল বলিলেন, "হাঁ এখন পর্য্যন্ত আমি গোপনও এ আঙ্গটির সম্মান অক্ষুন্ন রাখিয়াছি। আমাদের ভাই—প্রত্যেকেই প্রত্যেকে এমন স্নেহের চক্ষে দেখিত। একটা দাসী ও ঐ ষড়যন্ত্রী মেয়েটার কথায় ভ্রাতৃত্বে আঘাত পড়িবে না, কেহ বিশ্বাস করিবে না!"

রাওয়েল্ পত্র ছিঁড়িয়া চমকিয়া বলিলেন, "একি—এও যে সেই দশই সেপ্টেম্বরেই লেখা,—কি আশ্চর্য্য!"

"সত্য নাকি? পড়, চিঠিখানা পড় ত।" বৃদ্ধের মুখেও ঔৎসুক্য দেখা দিয়াছে। ব্যারণ পরিষ্কার কণ্ঠে পাঠ করিতে লাগিলেন।—

"আজ দশই সেপ্টেম্বর,—আমার স্নেহভাজন ভ্রাতুষ্পুত্র রাওয়েল মাইনোকে এই পত্র লেখা হইল। মনে রাখিও আজ সেপ্টেম্বরের দশ দিবস, আমি এই দিনের স্মৃতি উপযুক্ত স্থানে রাখিব, যাহাতে এই পত্রের সত্যতার কোন সন্দেহ থাকিবে না।"

পিতৃব্য ও ভ্রাতুষ্পুত্রের মুখ হইতে এক সঙ্গে বিস্ময় ধ্বনি বাহির হইয়া গেল। লিয়েনের চক্ষুও বিস্ফারিত—নাসারন্ধ্র কম্পিত হইতেছিল। ক্ষণ পরে রাওয়েল্ আবার পড়িলেন।—

"যাহাকে আমি এতদিন স্নেহপরায়ন বিশ্বাসী ও ধর্ম্মশীল বলিয়া জানিতাম, আজ জানিয়াছি যে আমার সেই ভ্রাতা এডেলবার্ট মাইনো,—মহা পাপিষ্ঠ, সে চিরকাল ধরিয়া আমায় প্রতারিত করিয়া আসিয়াছে। এই আমার আসন্নমৃত্যুর সময়ও তাহার নিষ্ঠুর ছলনায় আমি মুগ্ধ ছিলাম, সেই জন্য যাহা মনোকষ্ট পাইয়াছি সে কথা বলিতে আর প্রবৃত্তি হইতেছে না।"

চীৎকার স্বরে মার্শেল বলিলেন, "কী!"—

সে কথার উত্তর না দিয়া ব্যারণ বলিতে লাগিলেন, "রাওয়েল, আজ তুমি আমাদের বংশের উচ্চ চূড়ায় বসিয়াছ নিশ্চয়; ব্যারণ জন্ মাইনো প্রিয়তম ভ্রাতুষ্পুত্র আমার! মৃত্যু আসিয়া

যখন আমার সম্মুখে স্থির পদে দাঁড়াইয়াছে, এ জীবন তাহার শেষ পরিণামের জন্য প্রস্তুত, সেই সময় তোমার এ পত্রখানি লেখা হইল। ইহা আমার একান্ত ইচ্ছার অন্তিম অনুরোধ, আশা করি তুমি তাহা রক্ষা করিবে। কারণ, যদি আমার ভাগ্য সর্ব্বত্র একই ভাবে প্রবঞ্চিত না হইয়া থাকে,—তবে আমি বিশ্বাস করি যে আমার বালক রাওয়েল্ যতই চপল ও কৌতুক-প্রিয় হোক, তারুণ্যের পরিণতি ঘটিলে তাহার স্বাভাবিক সত্যপ্রিয় ন্যায়নিষ্ঠ বুদ্ধি ধর্ম্মপথ হইতে বিচ্যুত হইবে না।"

"তোমাকেই আমি ভার দিয়া যাই পুত্র, পরে এই কার্য্য—তুমিই করিয়ো।—"

"ইণ্ডিয়ান লিলিকে তুমি জান, সে নর্ত্তকী নহে, বেনারসের উচ্চ বংশোদ্ভবা কুমারী; আমার জন্যই সে এখানে আসে। তাহাকে আমি যথারীতি বিবাহ করি; এই সঙ্গে সে বিবাহের সার্টিফিকেট দিলাম। ইহার গর্ভজাত সন্তান আমারই পুত্র। আমার যে পুত্র জন্মিয়াছে, ইহারা তাহা আমায় এতদিন জানিতেও দেয় নাই, চিকিৎসক ভৃত্য—সকলকেই উৎকোচে বশীভূত করিয়া, আমার দারুণ ভ্রান্তির মধ্যে—মৃত্যুমুখে ঠেলিয়া দিতেছিল, আমি অশেষ কষ্ট পাইয়াছি। ঐ মহাপাতকী এডেল্‌বার্ট আমার স্ত্রীর রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহার নিকট পাপ প্রস্তাব করিয়া প্রত্যাখ্যাত হয়, সেই আক্রোশে আমার নিকট তাহাকে বিশ্বাসঘাতিনী বলিয়া প্রমাণিত করে।"

রুদ্ধ ক্রোধে বৃদ্ধের ললাটের শিরা ফুলিয়া উঠিয়াছে, তিনি সর্প গর্জ্জনের ন্যায় উচ্চারণ করিলেন, "বটে, এতদূর!"

জ্বলন্তদৃষ্টি তুলিয়া ব্যারণ পিতৃব্যের প্রতি চাহিয়া আবার পাঠারম্ভ করিলেন। "আমি পূর্ব্বে যাহা উইল করিয়াছি, তাহা আমার স্বেচ্ছাকৃত। আর তাহার পরিবর্ত্তন করিতে চাহিনা, তবে একটি কথা আমার ত্যক্ত সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ;—যদি বাঁচিয়া থাকে তবে আমার পুত্র পাইবে, অন্যান্য সর্ত্ত পূর্ব্বরূপ থাকিল। আর বয়োঃপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত সেই বালক তোমারই তত্ত্বাবধারণে থাকিবে; রাওয়েল্ তুমি তাহার শিক্ষার জন্য যত্ন লইও। আমি জানি, লিলি আমার অভাবে বেশিদিন বাঁচিবে না, তবু যতদিন থাকে—হতভাগিনীর যেন কষ্ট না হয়—ইহাও তোমারি ভার।"

"আর এই পরিচারিকা লন; ইহার অন্তঃকরণ অতি উচ্চ, প্রভুর হিতাকাঙ্ক্ষিণী ও বিশ্বাসী—তুমি স্বচ্ছন্দে ইহার প্রত্যেক কথা বিশ্বাস করিতে পার। হাঁ আবার বলি,—আজ ২শচ সেপ্টেম্বর যে অঙ্গুরিতে ইহার উপরে ও ভিতরে শিল মোহর দিলাম আজই আমি তাহা সেই ভণ্ড ভ্রাতাকে স্মৃতি চিহ্ন বলিয়া দিয়া যাইব। তাহার কাছে তুমি ইহার প্রমাণ পাইবে, এ পত্র যে জাল নয় তাহা বুঝিতে আর কাহারও বিলম্ব হইবে না। আমার শেষ আশীর্ব্বাদ, ভগবান তোমায় সুখী করুন ও তুমি যেন ধর্ম্মপথ ভ্রষ্ট না হও।

গিলবর্ট মাইনো"

পত্রখানি পাঠ শেষ হইলে, ব্যারণ তাহা মোড়কে পুরিয়া পকেটে রাখিয়া বলিলেন "এ চিঠিখানি ত উইল, আজই ইহা উকিলের নিকট পাঠাইতে হইবে।"

বৃদ্ধ কি চিন্তা করিতেছিলেন, তাঁহার মুখ ভস্মবৎ বিবর্ণ। সহসা কি ভাবিয়া বলিয়া উঠিলেন, "সে কি? না তাহা হইতে পারে না, এমন পত্র আমার কাছেও আছে, তারপর কোর্ট চ্যাপ্লিনের সাক্ষ্য,—সেও অল্প মূল্য নয়;—"

সক্রোধে রাওয়েল বলিলেন, "কোর্ট চ্যাপলিন! না তাহার কথা বিশ্বাসযোগ্য নয়।"

"তোমার যত বিশ্বাস স্ত্রীর কথায়—কেমন? ও কি—লেডি, তোমার অমন চেহারা কেন? রাওয়েল দ্যাখ ওদিকে দ্যাখ।"

সত্যই লিয়েনের সর্ব্বাঙ্গ থর থর করিয়া কাঁপিতেছে, মুখ ও চক্ষু গভীর রক্তবর্ণ।

রাওয়েল বলিলেন, "কি লিয়েন, কি হইয়াছে তোমার?"

বৃদ্ধ বলিলেন,—"হইবে আবার কি, মিথ্যা কথা বলিয়া এখন ভয় পাইয়াছে। ভিতরে কোথাও গলদ্ আছে নিশ্চয়ই; দেখিতেছ না—উহার সে তেজ সে কথা সব যেন নিভিয়া গিয়াছে।—কিন্তু—না না রাওয়েল্, ওকি? ধর ধর—তোমার স্ত্রী পড়িয়া গেল!"

ব্যারণ ছুটিয়া আসিতে আসিতে জুলিয়েনের অচৈতন্য দেহ কার্পেটের উপর লুটাইয়া পড়িল। তিনি আসিয়া গায়ে হাত দিতেই বুঝিলেন, তাহার প্রবল জ্বর,—সর্ব্বাঙ্গ আগুনের মত পুড়িয়া যাইতেছে।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ।

তিন সপ্তাহকাল লিয়েন শয্যাগত, জ্বর ও প্রবল বিকার। ডাক্তার ত জীবনের আশা ত্যাগই করিয়াছিলেন, এখন ক্রমশঃ সে আশঙ্কা দূর হইয়া আসিয়াছে। আর ব্যারণ? এ কয়দিন যে তাঁহার পক্ষে কি ভাবে গিয়াছে—ভুক্তভোগী ভিন্ন অন্যে তাহা বুঝিবে না। তাঁহার জীবনে এই প্রথম অরুণোদয়, উষার কোলেই তাহা অস্তোন্মুখ হইতেছে,—এ চিন্তায় তিনি উন্মাদ প্রায় হইয়াছিলেন। ডাক্তার পর্য্যন্ত তাঁহার অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত।

একমাস কাটিলে লিয়েন অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়া, প্রথম জ্ঞান লাভের পর চক্ষু মেলিয়া চারিদিকে চাহিয়া ডাকিল, "রাওয়েল্?"

তখনি একখানি মুখ তাহার স্নেহসজল চক্ষু মেলিয়া লিয়েনের সম্মুখে ঝুঁকিয়া পড়িল, "কেন ভাই?" রুগ্না চমকিয়া উঠিল, "দিদি,—তুমি?"

সে মুখ আল্‌রিকের। ভগিনীর বিস্ময় ভাব বুঝিয়া তিনি বলিলেন, "হাঁ দিদি আমি, তোমার অসুখের সময় ব্যারণ আমায় খবর দিয়াছিলেন, সেই হইতেই ত আছি—তুমি এতদিন আমায় চিনিতে পার নাই।"

"আমার কি খুব বেশী অসুখ হইয়া ছিল দিদি?"

"ছিল, কিন্তু এখন তুমি ভাল আছ, কোন ভয় নাই আর?"

"কতদিন এমন আছি?"

"এই কয়দিন হইবে,—কিন্তু লিয়েন আর না, বেশী কথা কহিও না, তুমি বড় দুর্ব্বল?"

"আচ্ছা, কিন্তু লিয়ো— সে কো'থায় আছে?"

"ঐ যে পাশের ঘরে, তোমার কাছে আসিবার জন্য সে যে কী করিয়াছিল,—ব্যারণ নিষেধ করায় ঐ দ্বার পর্য্যন্ত আসে। আর দিন রাত্রিতে কত খানা চিঠি যে লিখিতেছে,—বলে মা ভাল হইয়া পড়িবেন?"

"তাহাকে একবার আন না দিদি?"

"ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করি—তারপর। তুমি কিছু খাইবে লিয়েন?"

"খাইব, কিন্তু ব্যারণ কখন আসিবেন?"

"এইমাত্র গেলেন তিনি, তোমার জন্য ভাবিয়া তাঁহার শরীরও ভাল নাই।"

নিশ্বাস ফেলিয়া লিয়েন একটু থামিল। আল্‌রিক উঠিয়া শীতল ফলের রস আনিয়া লিয়েনের মুখে ধরিলেন। প্রভাতের আলোক আসিয়া ঘরের দেয়ালে পড়িয়াছিল, বাহিরের উজ্জ্বল রৌদ্রতাপে বায়ু সুখস্পর্শ। পথ্যের পর লিয়েন বলিল, "গেব্রিয়েল এখন কোথায় থাকে জান?"

"সে এখানেই আছে লিয়েন, লিয়োর মাষ্টারের কাছে পড়িতে সুরু করিয়াছে।"

"সে মায়ের জন্ত কাঁদে দিদি?"

ম্লাণ হাসিয়া আল্‌রিক উত্তর দিলেন "সে ভাবনা এখন নয়, গেব্রিয়েলের কোন কষ্ট নাই এইটুকু মাত্র জানিয়া রাখ; ব্যারণ তাহাকে বড় ভালবাসেন দেখিতেছি।"

"ভালবাসেন—তিনি তাহাকে ভালবাসেন?"

"নিশ্চয় বাসেন; তুমি তাহার জন্য নিশ্চিন্ত হও—লিয়েন, কিন্তু আর কোন কথা নয়,—ডাক্তার তোমায় বেশী কথা বলিতে বারণ করিয়াছেন।" লিয়েনের রক্তবর্ণ ওষ্ঠপ্রান্তে মৃদু হাসির রেখা ফুটিয়াছিল, সে নিশ্চিন্ততার নিঃশ্বাস ফেলিয়া পাশ ফিরিয়া শয়ন করিল ও অল্প ক্ষণের মধ্যে নিদ্রাভিভূত হইল।

ভগ্নী ও স্বামীর যত্ন ও শুশ্রূষায় শীঘ্র শীঘ্র সে স্বাস্থ্যলাভ করিতে লাগিল। সেদিন লিয়েনকে আহার দিয়া আল্‌রিক বাহিরে গিয়াছেন, ব্যারণ তাহার মাথার কাছে বসিয়াছিলেন। লিয়েন হাতখানি বাড়াইয়া ডাকিল "রাওয়েল!"

সাদরে তাহার হাত ধরিয়া ব্যারণ বলিলেন "এই যে আমি, লিয়েন।" বলিয়াই তাহার পার্শ্বে আসিয়া বসিলেন। লিয়েন হাসিল, তাহার উত্তরে তিনিও হাসিয়া বলিলেন "কেন হাসি কিসের?"

"দ্যাখ রাওয়েল—"

পত্নীর মুখে অপরূপ আনন্দের উজ্জ্বলতা ও গণ্ডস্থলে নবীন স্বাস্থ্যের রক্তিমা ব্যারণের দৃষ্টিকে তৃপ্ত করিয়া দিল; সস্নেহে তাহাকে চুম্বন করিয়া বলিলেন "কি কথা বলিতেছিলে বল না!"

"বেশী কিছু না, আমি ভাবিতেছিলাম এই যে, আর কিছু দিন পূর্ব্বে আমার এমন অসুখ হইলে—আমি নিশ্চয় বাঁচিতে চহিতাম না।"

ব্যারণের মুখজ্যোতি হ্রাস হইল, লিয়েন তাহা দেখিল। বলিল, "আর এখন ?"

মৃদুকণ্ঠে ব্যারণ বলিলেন, "আর এখন কি ?"

স্বামীর দৃষ্টির সহিত দৃষ্টি মিলাইয়া লিয়েন বলিল, "এ বাঁচায় কত সুখ রাওয়েল! এত ভালবাসার মধ্যে আমার এই পুনর্জ্জন্ম, ইহা ছাড়িয়া আমি যে স্বর্গেও যাইতে চাই না, এ জীবন এ আরোগ্য কত সুখের!"—লিয়েনের নয়ন কোণে অশ্রুবিন্দু ঝল মল করিতেছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে রাওয়েলের মুখ আরক্ত জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া চক্ষুর্দ্বয় বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া গেল। কাতর কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "তোমায় ফিরিয়া না পাইলে আমি বাঁচতাম না লিয়েন্।"

স্বামীর প্রসারিত বাহুর উপর মাথা দিয়া লিয়েন কতক্ষণ নীরব ছিল। ব্যারণ তাহার রুক্ষ চুলের মধ্যে মৃদুভাবে অঙ্গুলি চালনা করিতেছিলেন। সহসা চমকিয়া লিয়েন বলিল, "ও কি—ও কী রাওয়েল? না না তিনি আমার উপর বড় বিরক্ত—বারণ কর—বারণ কর!"

ব্যারণ বুঝিলেন এখনও তাহার মস্তিষ্ক স্থির হয় নাই, ভয়ে রক্তস্থালী অত্যন্ত চঞ্চল, কপালে ঘর্ম্ম দেখা দিয়াছে। আরও নিকটে আসিয়া সহাস্যে বলিলেন,—"যদি তিনি আসেনই—তাহাতেই বা তোমার ভয় কি লিয়েন? কিন্তু না, ও শব্দটা কাকার চেয়ারের শব্দ নয়, ব্যাপারটা কি দেখিবে?" বলিয়া পাশের ঘরের পরদা সরাইয়া ধরিলেন। সেখানে লিয়ো একটা রামছাগলের পৃষ্ঠে সওয়ার হইয়াছে ও গেব্রিয়েল তাহাকে ধরিয়া ঘরময় চালাইয়া লইয়া বেড়াইতেছে।

লিয়েন সে দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে অধীর হইয়া বলিল, "ডাক রাওয়েল, ডাক উহাদের!"

"লিয়ো, এস তোমার মা ডাকিতেছেন;—গেব্রিয়েল তুমিও"—

ঘরখানিকে কলহাস্যে উতরোল করিয়া খানিকক্ষণ শিশুর খেলা চলিল, লিয়েন লক্ষ্য করিল চিরদিনের ভীরু গেব্রিয়েলের ভাবভঙ্গিতে আর সে জড়িত ভাব নাই, ব্যারণের সহিত সে সভক্তি অথচ সহজ স্বরেই কথা বলিতেছে।

তাহারা চলিয়া গেলে লিয়েন বলিল, "হপ্‌মার্শেল কি এদিকে আসেন না ?"

"না, তিনি ত এখানে নাই।"

"কোথায় আছেন তবে ?"

"পরে সকলি জানিবে, এখন আর সে সকল বিরক্তিকর কথা ভাবিয়া তোমার কাজ নাই; তবে গেব্রিয়েলের ব্যাপার মিটিয়া গিয়াছে—এইটুকু জানিয়া রাখ।"

এই সময় আল্‌রিকের পদশব্দ পাইয়া ব্যারণ উঠিলেন। আল্‌রিক ঘরে আসিয়া বলিলেন, "ব্যারণ মাইনো, চলিলেন যে ?"

"একটু দরকার আছে দিদি, আপনি বসুন।" হাসিতে হাসিতে এই কথা বলিয়া রাওয়েল গৃহত্যাগ করিলেন। লিয়েন এক দৃষ্টিতে তাঁহার দিকেই দেখিতেছিল, তিনি অদৃশ হইলে মৃদু নিশ্বাস ফেলিয়া মুখ ফিরাইল। আল্‌রিক হাসিয়া বলিলেন,—'ইঁহাকেই আমরা কত অন্যায় অপরাধে অপরাধী ভাবিয়াছি লিয়েন? ম্যাগ্‌নস্ পর্য্যন্ত তোমার কথা বলিতে স্ত্রীলোকের মত কাঁদিয়া অধীর হইত। এখন আমার ইচ্ছা করে তাকে ডাকিয়া ব্যারণের সঙ্গে আলাপ করিয়া দেখাই যে কি সহৃদয় উচ্চান্তঃকরণ ভগিনীপতি তাহার। তোমার বড় সৌভাগ্য বোন, ইহার মত স্বামী সকলের ভাগ্যে ঘটে না।"

আনন্দে আতিশয্যে লিয়েনের চক্ষু বুঁজিয়া আসিয়াছে, অস্পষ্ট স্বরে সে বলিল, "ম্যাগ্‌নস্ একবার এখানে আসিবে না কি ? কতদিন তাহাকে দেখি নাই।

আল্‌রিক বলিলেন, তোমরাই যে রুডিসডর্ফে যাইবে, ব্যারণ বলিয়াছেন "তুমি আর একটু সুস্থ হইলে কিছুদিন সেখানে থাকিবেন। কতক জিনিষপত্র পাঠাইয়া দিয়াছেন এখনই।"

মুক্ত দ্বারপথে দেখা গেল একঝুড়ি ফুল লইয়া ফ্রোলন সেই দিকে আসিতেছে, আল্‌রিক্ বলিলেন, "তোমার গৃহকর্ত্রী ঐ ফ্রোলন, ইহার মত প্রভুভক্ত সেবাপরায়ণা দাসী আমি দেখি নাই। তোমার রোগের সময় সে যে কি ঐকান্তিক যত্নই করিয়াছে!"

"প্রথম হইতেই সে আমায় ভালবাসিত দিদি।"

"হাঁ, তাহার নিকট অনেক গল্পই শুনিয়াছি।"

"শুনিয়াছ ?" বলিয়া লিয়েন হাসিল।

ফ্রোলন আসিয়া নানা আকারে সজ্জিত পুষ্পগুচ্ছগুলি লিয়নের শয্যা পার্শ্বে সাজাইতে সাজাইতে বলিল, "এ সেই ফুল মা, যা হপ্‌মার্শেল লিয়োকেও ছুঁইতে দিতেন না।"

একগুচ্ছ সুগন্ধফুল নাকের কাছে ধরিয়া লিয়েন জিজ্ঞাসা করিল, "ভাল কথা লন্, হপমার্শেল কোথায় গেলেন—কেন গেলেন, বলিতে পার?"

"হাঁ, সেই রাত্রিতেই ত; তাঁদের দুইজনের বিবাদের পর ব্যারণ তোমায় লইয়া ঘরে চলিয়া গেলেন, আর বৃদ্ধ প্রভু—উঃ সে কী রাগ মা! খোঁড়াইয়া খোঁড়াইয়া চীৎকার শব্দে চাকরদের ডাকিতে ডাকিতে তিনি বাহিরে আসিলেন। চাকর দাসীরা সব সেইখানে দাঁড়াইয়া তাঁহার কাণ্ড দেখিতেছিল, আমিও ছিলাম। তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া লুকাইয়া পলাইলাম, কারণ আমার উপরই তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশি রাগ বোধ হইল। কাছে পাইলে তিনি আমায় টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া কাটিতেন তখন তারপর বাহিরে আসিয়া তাদেরকে সেভাবে দেখিয়া গালি দিতে দিতে হুকুম দিলেন যে শীঘ্র কোর্ট চ্যাপ্‌লিনকে ডাকিয়া আন। চাকরেরা হতভম্ব হইয়া কোন উত্তর দিতেছে না দেখিয়া আরও রাগ করিতে লাগিলেন, তখন তাঁহার প্রধান ভৃত্য উইলি বলিল, চ্যাপলিন এখানে নাই। তাহার সঙ্গেই সে পাদরীর কাণ্ড আপনাকে জলে ফেলিয়া দেওয়ার কথা বলিয়া জানাইল তখন হইতে আর তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইতেছে না। একথা শুনিয়া মার্শেল মুখ ভার করিয়া নিজের ঘরে চলিয়া গেলেন। সে রাত্রিটা তিনি ঘুমান নাই, উপরের ঘরে তাহার পায়ের শব্দ—জিনিষ পত্র গুছানোর খুট্ খাট্ শোনা গিয়াছিল। ভোরেই আস্তাবলে খবর দিয়া গাড়ী সাজাইয়া তিনি চলিয়া গিয়াছিলেন, শুধু উইলি তাঁহার সঙ্গে গিয়াছে।"

লিয়েন খানিকটা শুব্ধ থাকিয়া বলিল, "আর পাদরীরও খবর কি?"

লন বলিল, "তাঁর খবর ত ঠিক জানিনা লেডি, তারপর আর আসেন নাই এখানে।"

আল্‌রিক বলিলেন, "ব্যারণের নিকট শুনিয়াছি আমি, তিনি এখান হইতে পলাইয়া ডচেসের আশ্রয় লইয়া ছিলেন। জানত তুমি ডিউক অব মণ্টিগ স্বয়ং প্রোটেষ্টাণ্ট ছিলেন, এখন ডচেস্ ক্যাথলিক হইবার ইচ্ছায় তাঁহাকে নিজেদের পুরোহিত নিযুক্ত করায়,—তাঁর প্রজারা রাগিয়া উঠে ইহার সহিত ঐ পাদরী একজন প্রোটেষ্টাণ্ট লেডিকে হত্যার চেষ্টা

করিয়াছিল,—এ জনরব চারিদিকে রাষ্ট্র হইলে তাহারা বিদ্রোহ করিয়া ডচেসের প্রাসাদ আক্রমণ করে। সে গোলোযোগটা সহজেই মিটিয়া যায় বটে, কিন্তু তার পরই অসুস্থতার ভানে ডচেস্ অন্যত্র চলিয়া গিয়াছেন, চ্যাপ্লিনেরও কোন খবর নাই।"—

এই সময় ব্যারণ আবার সেই কক্ষে প্রবেশ করিয়া বলিলেন, "কি গল্প হইতেছে ?"

ফ্রোলন তাড়াতাড়ি উঠিয়া তাঁহাকে নমস্কার করিয়া দূরে দাঁড়াইল। আল্‌রিক হাসিয়া বলিলেন, "আপনারই গল্প হইতেছিল মাঝ হইতে ফ্রোলন হপ্ মার্শেলের কথা বলিতে লাগিল ।"

একটু বিষণ্ণ হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "আজ তাঁহার পত্র পাইয়াছি, তিনি তাঁহার প্রাপ্য সম্পত্তির এক তৃতীয়াংশ দাবি করিয়াছেন।"

"তুমি তাহাতে আপত্তি করিবেনা ত ?" লিয়েন বলিল।

"না নিশ্চয় না ! আমি এখনি তাঁহার সমস্ত জিনিষ পাঠাইয়া আসিলাম।"

ব্যারণ দূরে বসিতে উদ্যত দেখিয়া আলরিক উঠিয়া বলিলেন, "আপনি এইখানে বসুন, আমি একবার বাহিরে যাইব।"

ফ্রোলন ও আলরিক চলিয়া গেলে লিয়েন উঠিয়া বসিল। এখন সে দুই চারি পা চলিতে পারিত। ব্যারণ তাহার নিকটে আসিয়া বলিলেন, "এখন একটু একটু বেড়াইতে পারিলে শীঘ্র শীঘ্র মাথাটি সুস্থ হয়।"

হাসিয়া লিয়েন বলিল, "এইত দিব্য সুস্থ হইয়াছি।"

"হাঁ তাহা পরমেশ্বরের দয়ায়, আমরা ত হাল্ ছাড়িয়া বসিয়াছিলাম।"

"তাই বুঝি ? তোমরা হাল্ ছাড়িলে ত এতটা করিল কে ? সব শুনিয়াছি গো, এই সামান্য স্ত্রীলোকটার জন্য তোমার দুর্ভোগের কথা সব শুনিয়াছি। কেন—কেন এত দিতেছ আমায় ? এত সুখ যে আমি সহ্য করিতে পারিতেছি না !"

সত্যই লিয়েনের মুখে উদ্বেগ চিহ্ন দেখা দিয়াছে। রাওয়েল তাহাকে ধরিয়া বলিলেন, "পাগল হইলে না কি ? নিজের স্ত্রীর জন্য মানুষে যাহা করে, আমি তাহার চেয়ে কি বেশি করিলাম লিয়েন ?"

স্বামীর বক্ষে মাথা রাখিয়া লিয়েন ক্ষণকাল নীরব ছিল তার পর মুখ তুলিয়া বলিল,—"বল,—কোন দিন আমার উপর রাগ করিবে না ?"

হাসিয়া ব্যারণ বলিলেন, "বিনাদোষে ?"

"না—দোষ করিলেও,—আমি কত দোষ করিব হয়ত !"

"ও: তাই বল। সত্য সত্য লিয়েন তুমি আমায় এখন পর্য্যন্ত বিশ্বাস করিতে পারনা, না ?"

"না তা নয়, তবে মনে হয়—আমি যদি তোমার যোগ্য হইতাম,"—

"থাম আর বলিতে হইবে না। এ চিরদিনের অব্যবস্থিত চিত্ত দুর্ভাগাকে বিশ্বাস করা কাহারও পক্ষে সহজ নয় তা জানি। কিন্তু মনে রাখিও তুমি, তোমায় যে আমি কেন ভাল বাসিয়াছি সে কথা এক একবার স্মরণ করিও। রূপের মোহে—প্রজাপতির মতই সত্য,—নারীজাতীর পিছনে ঘুরিয়া ঘুরিয়া আমি ক্লান্ত—অবসন্ন হইয়াছিলাম। তাহাকে কি প্রেম নাম দেওয়া যায় লিয়েন ? দাও, কিন্তু তবে ইহার নাম কি বল ?"

"রাওয়েল্, ক্ষমা কর"—

"কিসের ক্ষমা প্রিয়তমে ? সুরা, সুরার উত্তপ্ত নেশায় আমি জ্বলিয়া মরিয়াছি,—তাই এ জীবন জুড়ানো অমৃতকে আজি এমন প্রাণ দিয়া অনুভব করিতেছি। তাহাদেরও একদিন প্রিয়া বলিয়া ভাবিয়াছি, কিন্তু আজ যাহাকে ভাবিতেছি,—সে আমার জগতের সর্ব্বাপেক্ষা—বুঝি প্রাণাপেক্ষা প্রার্থনীয়া, বরণীয়া, সে আমার সকল প্রিয়র শ্রেয়তমা, সে যে আমার প্রিয়তমা লিয়েন্ !" ব্যারণের স্বর থামিয়া গেল, লিয়েন সর্ব্বাঙ্গে তাঁহার স্পর্শের প্রবল আবেগ অনুভব করিতেছিল। পুলকে তাহারও দেহ শিথিল—অবশ হইয়া গেল। প্রিয়তমের প্রেম-স্পর্শ, আজ সত্যই লিয়েন দেহমনে স্বামীর প্রিয়তমা !

সমাপ্ত।

শ্রীহেমনলিনী দেবী।

বিশ্রাম।

—ঃ*ঃ—

ঘুমাও তুমি ঘুমাও সখি
আজ্‌কে তুমি শ্রান্ত,
কোল ভরা আজ দোল দিয়ে সই
দোল-যামিনী অন্ত।

কোজাগরের খেল্‌তে কড়ি
জাগ্‌লে তুমি রাত্রি ধরি,
তন্দ্রা-অলস হস্ত তোমার
দান ফেলিছ ভ্রান্ত।

(২)

অলস তোমার নয়ন সখি
অবশ তোমার অঙ্গ,
সাঙ্গ তোমার সাধের খেলা
কুঞ্জ হলো ভঙ্গ !

আকাশ ভেঙ্গে ঘুম নামিছে
দোল-সাগরের ঢেউ থামিছে,
ক্ষুদ্র বুকের ধুক ধুকানি
আজ্‌কে অবসান তো।

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক।

অন্নদা দিদি ভারতীয় নারীর আদর্শ কি না ?

বিগত জ্যৈষ্ঠ মাসের 'পরিচারিকা'য় আমার পরম স্নেহভাজন শ্রীমান অংশুমান দাশ গুপ্ত এম, এ, বিএল, ভায়া তাঁহার 'সাহিত্য ও সমাজ' শীর্ষক সুলিখিত প্রবন্ধে স্ত্রীজাতির ব্যক্তিত্বের অস্তিত্ববোধে ও স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যেই যে নারীত্বের আদর্শ প্রতিপন্ন করিতে গিয়া লিখিয়াছিলেন, "সূর্য্যমুখীর মত স্বামীর ইচ্ছার মধ্যে নিজের ইচ্ছাকে বিলিয়ে দেওয়া আর আজকাল আমাদের নারীর আদর্শ নয়। দাম্পত্য সম্বন্ধের মধ্যে তাদের স্থান কোথায় তারা আজ শিক্ষার গুণে বুঝে ফেলেছে।' উদাহরণে উল্লেখ করিয়াছিলেন 'ঘরে বাইরের' নিখিলেশ ও বিমলার দাম্পত্য সম্বন্ধ। সেই সঙ্গে দেশের পুরাতন পন্থীদের প্রতি কটাক্ষ করিয়া বলিয়াছিলেন "বিমলার জয়ে আজ নারীজাতির গৌরব আরও উজ্জ্বল শিখায় জ্বলে উঠেছে। নারীজাতির এই জয়জয়কার ঘোষিত হয়ে থাক্‌লেও এই বইখানাকে আমাদের অন্তঃপুরে প্রবেশদান করতে এ দেশের নীতিজ্ঞদের অনেক আপত্তি উঠে থাকে। কি ভয়ানক ক্ষোভের বিষয়! তারপর শরৎ চট্টোপাধ্যায়ের 'চরিত্রহীন'। চরিত্রহীনের নামের গুণেই বাংলার যুবকের অপাঠ্য নির্দ্দিষ্ট হয়ে উঠেছে।' আমরা তাঁহার মূল যুক্তিকে শিরোধার্য্য করিলেও তাঁহার উক্তিকে নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিতে না পারিয়া, নিজের বিশ্বাসমত নিম্নলিখিত মন্তব্য, প্রবন্ধের পাদটিপ্পনীতে লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম :—"সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বইখানাকে অন্তঃপুরে প্রবেশদান করতে ভয়ের কারণ আছে বা নাই একবারে অমন নিঃসন্দেহভাবে বলা কঠিন। জিনিষ ভাল হলেই তা যে-সে হস্তে নির্ব্বিচারে দেওয়া চলে না। শাণিত অস্ত্র যোদ্ধার হস্তেই উপযুক্ত,—বালকের পক্ষে জীবন-হন্তারক! অধিকারীর কথাটা আমার অনেক সময়ে ভুলে যাই; একদিন বাঙ্গালায় মেয়েদের নভেল পড়াই দোষের ছিল, আজ তা অন্য আকার ধরেছে, তবুও আজও বঙ্কিমের স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্যের চিত্র যে-মন ঠিক ধর্‌তে পারে নাই, সেই মনে অত বড় সমস্যার সমাধান করে প্রকৃত লক্ষ্যে উপনীত হবার মত অবস্থা আসে নাই। আসবে—সাড়া পড়েছে,—শিক্ষার মধ্য দিয়া, শিক্ষিত স্বামীর সাহায্যে, সখ্যে এ সকল জটীল তত্ত্ব একদিন পূর্ণ-সমাধান প্রাপ্ত হবে, সত্য প্রকাশিত হয়ে

সার্থক হবে—'ঘরে বাইরে'। বিলাতী ভাবে নয়,—ভারতের রক্তে ভারতের ভাবে সেটা পাবে সাফল্য। সে চিত্র ঠিক নিখিলেশ বিমলার সম্বন্ধের মধ্য দিয়া নয় শরচ্চন্দ্র 'শ্রীকান্তে' দিদি'তে যে আদর্শের ইঙ্গিত করেছেন—ভারতের নারীর সেই নিজস্ব আদর্শ—সর্ব্বকালের সেই গৌরীর চিত্র ভারতে একদিন উজ্জ্বল হয়ে উঠ্বেই।'

আমার এ মন্তব্যকে উদ্দেশ্য করিয়া শ্রীমান তাঁহার 'সাহিত্য ও সমাজ' নামক পৌষের পরিচারিকায় প্রকাশিত, দ্বিতীয় প্রবন্ধে লিখিয়াছেন, "আমি আজ এই মন্তব্যগুলির সম্বন্ধে কোন সদুত্তর দিতে যাচ্ছি না। একটা জিনিষ আমাকে বড়ই ভাবিয়ে তুলেছে.—ঐ মন্তব্যের কোন জায়গায় পড়েছি মনে হয় যে শ্রীকান্তের অন্নদা দিদির চরিত্রে ভারতবর্ষের নারীর নিজস্ব আদর্শ মূর্ত্তিটী পরিস্ফুট হয়েছে। নারীজাতির পাতিব্রত ধর্ম্মের মহিমা গীতি অন্নদাদিদির এই পূত চরিত্রে মুখরিত হয়ে উঠেছে এতে কোন সন্দেহ নাই। আমাদের চিরকালের ব্যথিতা লাঞ্ছিতা স্ত্রীর বাস্তব চিত্র। এ হিসাবে বাস্তবিকই আমাদের নিজস্ব। * * * স্ত্রী যে স্বামীর সহধর্ম্মিণী এ সত্য আমি অস্বীকার করছি না। কিন্তু যেখানে দেখ্তে পাই যে স্বামীর কোন ধর্ম্ম নাই, সেখানে স্ত্রীরও নিজের ধর্ম্মবিশ্বাস ত্যাগ করাই 'সহধর্ম্মিণীর' আচরণ করা হবে কি না সে কথাই বিচারের বিষয়। সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুগমন করাই স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্যের ধ্রুবপথ? তার নিজের কি একটা মত কিম্বা বিশ্বাস থাক্তে পারে না যে স্বতন্ত্র ভিত্তিতে তার ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠ্তে পারে?" তাঁহার এই উক্তির সহিত আমার 'আদর্শের' একটুকুও বিরোধ নাই। তাঁহাতে ও আমাতে বিষম বিরোধ এই 'ব্যক্তিত্ব', স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য ও সহধর্ম্মিণীত্বের ধারণা লইয়া। তাঁহার মতবাদকে যদি বুঝিয়া থাকি, তাহাতে আমার মনে হয়, তিনি ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য অর্থে বুঝিয়াছেন—স্ত্রীর আপনার বিশ্বাস ও মতকে পূর্ণত্ব দান করিয়া স্বীয়ভাবে, অন্যের মতের সাহায্য বা অনুবর্ত্তীতার মুখাপেক্ষী না হইয়া আপনার প্রবৃত্তিতে (প্রকৃতিতে কিনা যথাস্থানে দেখিব) আপনি ফুটিয়া উঠা, তাঁহার সহধর্ম্মিণীত্ব অর্থে স্বামীর হুবহু ছন্দানুবর্ত্তিনী হওয়া—সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুগমন করা। আমার সংস্কারবদ্ধ মনে, উক্ত স্ত্রীধর্ম্মের মর্ম্ম কিন্তু প্রকাশ পাইয়াছে ভিন্ন আকারে, তাই আমাকে সরল বিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া, স্বামী নিখিলেশ হইতে মতবাদে স্বাধীনা, নিজের মত ও বিশ্বাসের প্রাণপ্রতিষ্ঠায় একান্ত অনুরাগিণী, স্ব-ভাবে অনন্যকর্ম্মী,

নবমন্দিরের স্বাতন্ত্র্যের মূর্ত্তিমতী দেবী বিমলাকে নারীত্বের নিখুঁৎ আদর্শ না বলিয়া নরহন্তা শাহজীর স্ত্রী, সে যে শাহজীর স্ত্রী সে কথা,—তাহাদের প্রকৃত অকাট্য সম্বন্ধ জনসাধারণে প্রকাশ করিতেও অক্ষমা—ব্রাহ্মণকুলে জন্মিয়াও সেদেনী যে, সেই অন্নদাদিদিকে নতশিরে স্বীকার করিয়া লইয়াছি ভারতের ভাবে সতী শিরোমণি—গৌরীপীঠে বসিবার উপযুক্ত দেবী সে! অন্যের চক্ষে দিদি 'বাথিতা লাঞ্ছিতা ব্যক্তিত্ববর্জ্জিতা' রমণীর প্রকৃষ্ট উদাহরণ বা যাই হ'ন,—আমার চক্ষে এই মহিমময়ী রমণীর বিরাট ব্যক্তিত্ব, সতীত্বের তেজ, উদারতা, উচ্চতা, প্রশস্ততা, গভীরতা, সর্ব্বোপরি তাঁহার অবিচলিত ধর্ম্মভাব, স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহঃ গায়ত্রী মন্ত্রের স্বাভাবিক সাধনক্ষম তাঁহার মন,—যে নারীত্বের আদর্শ প্রকটিত করিয়াছে, তাহাতে বলিতে বাধ্য হইয়াছি—দিদি ভারতের আদর্শ, জগতের আদর্শ, অতীতের আদর্শ, বর্ত্তমানের ভবিষ্যতের সর্ব্বকালের! আমার এ উচ্ছ্বাসের অত্যুক্তি নয়, অনুভূতি কিন্তু বিরাটকে কল্পনায় আঁটিবার শক্তি কোথা, কল্পনাকে অক্ষম দীনভাষা কি করিয়া আকার দিবে! ভাবকে হয় ত আমি ভাষায় ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইব না; আপনাকে প্রকাশ করিয়া ঠকিয়াছি, উক্তির উপর যখন যুক্তির অস্ত্র পতিত হইয়াছে, তখন তাহার সহনশীলতার পরখ করিতে আমি বাধ্য,—তাই আজ প্রতিবাদের হিসাবে নহে, পরীক্ষকের নিকট প্রকাশের বেদনা লইয়া পরীক্ষা দিতে বাধ্য হইতেছি, নতুবা সূক্ষ্মদর্শী শরৎবাবুর মনজাকে লইয়া কষ্টিপাথরের ব্যবহারে আমার প্রবৃত্তি আদৌ ছিল না।

পরীক্ষার্থীর উত্তর অনেকটা পরের বুলি; নিজে কিছু বলিবার পূর্ব্বে সুধীজনের মতবাদ উদ্ধৃত করিয়া বুঝিতে চেষ্টা করি নারীর বিশেষত্ব, নারীত্ব কোথায়, পুরুষ ও নারী যখন একই কর্ম্মক্ষেত্রে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, অন্ততঃ নারীদের সাফল্য, পূর্ণ বিকাশ পুরুষের সমকর্ম্মী হইয়া বা তুল্য অধিকার লাভে বিবেচিত হইয়াছে—তখন পুরুষ ও নারী প্রকৃতির স্বাভাবিক ধর্ম্মের একটা বুঝাপড়া হওয়া দরকার। আমার সৌভাগ্য বর্ত্তমান বর্ষের পৌষের 'প্রবাসীতে' প্রকাশিত শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশয়ের 'পুরুষ ও নারী' নামক গবেষণাপূর্ণ প্রবন্ধে এ সম্বন্ধে আমার প্রাণের অনেক কথাই মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে। নলিনীবাবু যথার্থই বলিয়াছেন, 'নারীও মানুষ, পুরুষও মানুষ, প্রথমে গোড়ার এই ঐক্য। উভয়কে সমান ভাবে এই সত্য বুঝিতে হৃদয়ঙ্গম করিতে সুবিধা, সুযোগ, স্বাধীনতা দিতে হইবে। কিন্তু

তারপর দেখিতে হইবে উভয়ের পার্থক্য,—একই মানুষ হইলেও বিভিন্ন আধারের জন্য মানুষ-ধর্ম্ম দুই জনের মধ্য দিয়া ফুটিয়া উঠিতেছে কি রকমে। পুরুষের শিক্ষাসাধনা আর নারীর শিক্ষাসাধনার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য মনুষ্যত্বকে উদ্বোধন করা চরিতার্থ করা, কিন্তু তাই বলিয়া উভয়ের পন্থা পদ্ধতি ভঙ্গীরীতি সবই যে একরকম তাহা নয়। জগতের এক্য যেমন সত্য, জগতের বৈচিত্রও তেমনি সত্য।* * * মানুষের আছে দুইটি ভাগ—এক জ্ঞান আর এক শক্তি, মানুষ চাহে জানিতে ও করিতে। জ্ঞানের প্রকাশ মনবুদ্ধিতে, শক্তির প্রকাশ প্রাণে। পুরুষ জ্ঞান, আর নারী শক্তি। পুরুষের সহজ স্বাভাবিক প্রতিষ্ঠা অথবা ভারকেন্দ্র মস্তিষ্কে, নারীর প্রাণে! * * * নারীর কাজ, তাহার সহজ ধর্ম্ম হইতেছে 'হওয়া।' নারী যে জিনিষ স্পর্শ করে, সে জিনিষকে সে আপনার সাথে মিলাইয়া মিশাইয়া লইতে চায়,—তাহার মধ্যে আপনাকে সে নিঃশেষ ঢালিয়া হারাইয়া ফেলিতে চায়,—তাহাকে আপনার মধ্যে গ্রাস করিতে, অঙ্গের অঙ্গীভূত করিয়া লইতে চায়। পুরুষ কিন্তু জিনিষের সাথে ঐ রকম ভাবে মিলিয়া মিশিয়া যাইতে,—জিনিষটি 'হইয়া' যাইতে পারে না। নারীর সত্তা সহজ সরল অখণ্ড একমুখী। নারী কেন্দ্রমুখী শক্তি আর পুরুষ কেন্দ্র-বিমুখী শক্তি। প্রাণের অনুভব শক্তির সূক্ষ্মতা ও তীক্ষ্ণতা নারী প্রকৃতিরই একটা বিশেষ ধর্ম্ম।" জ্ঞান-উপাসক পুরুষ অপেক্ষা প্রাণময়ী নারী অধিকতর ভাবপ্রবণ—প্রতিপদে সে বিচারের বালাই রাখে না; সে যেটাকে সত্য বলিয়া মানিয়াছে সে সেটাকেই ধরিয়া থাকিতে ভালবাসে,—বিচার বুদ্ধি সে যদি কখনও প্রয়োগ করে তাহা স্বীকৃত সত্যের পক্ষে- তাহার প্রাণের নিগূঢ় অনুভূতি,—কেন্দ্রাভিমুখী শক্তি,—আপনার আদর্শ কেন্দ্র ত্যাগ করিয়া বহির্মুখী হইতে, বাহিরের কোলাহলে যোগ দিতে, বহিঃপ্রকৃতির তুলনায় অন্তরপ্রকৃতিকে বিচার করিতে নিতান্ত নারাজ! নারী প্রকৃতি প্রার্থনা করে এক,—একনিষ্ঠত্ব,—একাগ্রতা,---তাই সে তাহার লক্ষ্য—অনুভূত সত্য—আদর্শ, পুরুষের মত বিচার বুদ্ধিতে পরিবর্ত্তন করিতে চায় না! এই জন্য সংস্কারের প্রসার তাহার হৃদয়ে যেরূপ অটুট, অনুভূতির প্রাখর্য্যও তদ্রূপ তীক্ষ্ণ, সে ভাবকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করে যত সহজে,—তাহা পরিবর্ত্তন করিতে হইলে উপস্থিত হয় তাহার তেমনি জীবনমরণ সমস্যা। সে নিজের ভাব লইয়া মরিবে, অসাধ্য সাধন করিবে তথাপি টুটিবে না—নোয়াইবে না—অঘটনঘটনপটীয়সী সে, প্রবল প্রবাহিনী

শত সহস্র বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া গিরি পৃথি ভাঙ্গিয়া চুড়িয়া, কূলকে অকূলে ভাসাইয়া সে লক্ষ্য স্থানে পৌঁছিবেই ! ভাল মন্দের, কার্য্য অকার্য্যের বিচার নাই তখন তাহার জীবনে,—শক্তি নিজ হৃদয় শক্তির প্রাবল্যে, প্রাণের আবেগে ছুটিয়াছে আর ছুটিতেছে,—সাধ্য কি পুরুষের সে শক্তির সম্মুখে প্রবলতর শক্তি প্রয়োগ করে,—কি প্রাণে কি দেহে অবলা নারী তখন পুরুষ অপেক্ষা অনন্ত গুণে প্রবলা ! লেডি ম্যাক্‌বেথের নরহত্যায় একান্ত আগ্রহ, পতীপরায়ণা কৈকেয়ীর পতিহত্যা, পান্নার সন্তান বলি, সাবিত্রীর সল্পায়ু পতিগ্রহণ, অন্নদা দিদির নরহন্তা স্বামীর জন্য কুলত্যাগ, শ্রীরাধিকার কলঙ্ক চন্দন, এমন কি আত্ম-সুখ-উন্মত্তা অভয়ার বর্ষায় অভিসার—বহু নারীর অঘটন ঘটনে এই নারী প্রকৃতি পরিস্ফুট ! নারীর বিশেষত্ব তাহা হইলেই এই প্রাণ-ধর্ম্মে, সাফল্য যদি তাহাকে লাভ করিতে হয় তাহা হইলে এই প্রাণ ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায়, কর্ম্মক্ষেত্রও তাহার সেইটী যাহাতে প্রাণ ধর্ম্মের বিকাশ,—প্রাণ ধর্ম্মের পরিপুষ্টির জন্য তাহার জ্ঞানের চর্চ্চা—শুদ্ধ বুদ্ধি লাভের জন্য—পুরুষের শিক্ষা পদ্ধতি হইতে সুতরাং নারীর শিক্ষা পদ্ধতি ভিন্ন ! উভয়ের কর্ম্মক্ষেত্রে বহু সামঞ্জস্য থাকিতে পারে অনেক বিষয়ে, সাহচর্য্যের আবশ্যকতাও আছে বহু বিষয়ে, কিন্তু উভয়ের লক্ষ্য এক হইতে পারে না কিছুতেই,—স্ত্রীপুরুষের সহকর্ম্মিনী হ'ন শ্লাঘার বিষয়, মঙ্গলের কথা কিন্তু কর্ম্ম তাঁহাদের ঠিক এক হওয়া অসম্ভব,—স্ত্রী এই হিসাবে স্বামীর সহধর্ম্মিণী কিন্তু ছন্দানুবর্ত্তিনী সর্ব্বতোভাবে স্বামীর অনুগামিনী কিছুতেই নহেন—স্ত্রীপুরুষের প্রকৃতিগত স্বাতন্ত্র্য মুছিয়া ফেলিতে পারে না কিছুতেই ; অন্নদা দিদি স্বামীর সহধর্ম্মিণী, প্রফুল্লও, সূর্য্যমুখী, গোড়ায় সুচরিতা, এমন কি (নিরুপমা দেবীর দিদির) সুরমা দিদি, যিনি স্বামীকে প্রথমে আমল দিতেই চান নাই তিনিও—যে সকল নারী নারীধর্ম্মের উপমাস্থল—তাঁহারা সকলেই স্বামীর সহধর্ম্মিণী,—ছন্দানুবর্ত্তিনী তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় অল্পই। আমরা উভয় শব্দকে এক কল্পনা করিয়া গোলে পড়িয়াছি ! ধাঁধা লাগিবার যথেষ্ট কারণ আছে—বিরাট সহধর্ম্মিণীত্বের একটা স্পষ্ট দিক—বাহ্যিক আবরণে ব্যক্ত ঐ সহানুবর্ত্তীতায়,—ফলের খোসাটী যেমন তাহার অন্তরের আঁটিটাকে ঢাকিয়া রাখে—তাহার সত্তাকে—মাতৃত্বকে আবৃত করিয়া রক্ষা করে, জীবকে আকৃষ্ট করিয়া তাহার বংশ বৃদ্ধির সহায় হয়, সহানুবর্ত্তীতাও তেমনি রক্ষা করে সহধর্ম্মিণীত্বকে ;—পুরুষকে আকৃষ্ট করিয়া সাফল্যের পথে অগ্রসর করিয়া

দেয়। খোসা ও আঁটী যেমন এক নয়—খোসাকে বাদ দিয়াও পরিণত আঁটীর সাফল্য যেমন অসম্ভব নয়, সহানুবর্ত্তীতা ও সহধর্ম্মিণীত্বের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। আর একটি পদার্থের অস্তিত্ব রহিয়াছে খোসা ও আঁটীর মধ্যে,—সেট ফলের ক্ষীর। প্রকৃতপক্ষে সেইটী হইতেছে লোলুপের আকর্ষণ—তাহার স্বাদে যদি আকৃষ্ট জীব মুগ্ধ হয়—কাজ হাঁসিল হইয়া যায় যথাযথভাবে। ক্ষীরই মনুষ্য হৃদয়ে প্রেম—তাহার স্বভাবই হইতেছে ত্যাগ—আপনাকে বিলাইয়া দিয়া স্বার্থক করিয়া তুলে সে ধর্ম্মকে—অন্তরতম বিশেষ বস্তুটিকে,—সত্তাকে। প্রেমাস্পদ যদি প্রেমে মুগ্ধ আত্মহারা হইয়া যান সে ক্ষেত্রে কোন গোলই থাকে না,—আর 'আকৃষ্ট' হয় যদি খোসার মালেক—ক্ষীর ও মর্ম্মে তাহার হয় অনুনুকুক্তি তাহা হইলেই যত ঝঞ্ঝাট!—খোসা সে ক্ষেত্রে ব্যর্থ, ক্ষীর মাধুর্য্যহীন, আঁটীর সাফল্য সমস্যা হয় জটীল কিন্তু ক্ষীর ও আঁটী একেবারে নিরর্থক হয় না; অমন প্রতিকূল অবস্থাতেও ক্ষীর সার; আঁটী মাটীতে মাধ্যাকর্ষণ বলে স্থিতি লাভ করিয়া আপন ধর্ম্মকে অক্ষুণ্ণ রাখিতে প্রয়াস পায়। ইন্দ্রিয়রূপ সহানুবর্ত্তীতার সে প্রতিকূল ক্ষেত্রে কার্য্য করিবার সুযোগ অতি কম; পক্ষান্তরে সহধর্ম্মিণীত্বের কর্ম্মপ্রয়াস বহু পরিমাণে বৃদ্ধি পাইতে বাধ্য হয়,—প্রতিকূল ক্ষেত্রকে আনুকূল্যের দিকে টানিয়া লইতে। আর একটি অতি প্রচলিত উদাহরণ লইয়া এই প্রকৃতিগত অতীন্দ্রিয় ভাবটিকে বুঝিতে চেষ্টা করি। কাব্য কথায় দেখি নারীর উপমা লতা,—পুরুষ বৃক্ষ তাহার আশ্রয়। লতা সত্যই বৃক্ষের আশ্রয় প্রার্থনা করে, তাহাকে অবলম্বন করিয়া উর্দ্ধে উঠিতে থাকে—সময়ে বৃক্ষের মস্তকদেশ পর্য্যন্ত সমাচ্ছন্ন হইয়া পড়ে লতা ও পুষ্পে—কিন্তু তাই বলিয়া বৃক্ষ ও লতা এক হইয়া যায় না; লতা নিজ ধর্ম্ম পরিত্যাগ করে না—তাহার সর্ব্বদাই চেষ্টা উপযুক্ত আলোকউত্তাপ সংগ্রহ করিয়া নিজ সত্তাকে রক্ষা করা। নারীর প্রাণপণ চেষ্টাও তাই। অবলম্বন তাহার একটা চাইই,—প্রকৃতি প্রার্থনা করে পুরুষকে। অন্তরে, ভাবে, অভাবে, সংসারে, বাহিরে, কর্ম্মক্ষেত্রে সাধারণের কার্য্যে বা রাজনৈতিক ব্যাপারে সে ক্ষেত্রেই হউক না কেন—এক স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের সাফল্যের আশা নাই,—নারী নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে ফুটিয়া উঠিতে সমর্থা—(সাধারণ নারী সম্বন্ধে অন্য কথা হইলেও) তাহা একেবারে অস্বীকার করিবার উপায় নাই কিন্তু পুরুষকে বাদ দিয়া নারী প্রকৃতির প্রতিষ্ঠা, সাফল্য অসম্ভব ব্যাপার! গুরুতর রাজনৈতিক ব্যাপারে

নারী প্রতিভা এক অংশ উজ্জ্বল করিতে সমর্থ হইতে পারে কিন্তু আধেয় ভাবে, আধার হইতে হইবে তাহার পুরুষ--জ্ঞানমূর্ত্তি। স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের মূল প্রাণে,--জ্ঞানের রাজ্যে সে জোড় পাইবে কি করিয়া। অদ্বিতীয়া বিদুষী সে হইতে পারে,—নারী বলিয়াই ত সে মস্তিষ্কহীনা নয় কিন্তু জ্ঞানের আলোক যতই সে লাভ করুক না কেন,—মস্তিষ্ক হইতে সে জ্ঞানে পুষ্ট হইবে অধিকতর তার প্রাণবৃত্তি। সে কখনই প্রার্থনা করিবে না যুদ্ধ দ্বন্দ্ব বিবাদ কলহ,—কূট রাজনীতি, চাণক্যনীতি,—শিক্ষা তাহার প্রাণে জাগাইয়া দিবে শান্তির তৃষ্ণা, সাম্য মৈত্রী প্রেমের গৌরব,—অশিক্ষিতা যেখানে সংস্কারবদ্ধ, চলিতে ফিরেছে অন্ধ—শিক্ষিতা সেখানে উদার—সমপ্রাণতায় গরিয়সী—প্রাণ সত্তার অনুভূতি তার অতি সূক্ষ্ম,—নারীত্বের বিকাশে তার প্রাণশক্তির মহিমায় সকলেই মুগ্ধ বিশেষতঃ স্নেহের প্রেমের কাঙ্গাল পুরুষ। সেও সকলকে বিশেষতঃ পুরুষকে আকৃষ্ট করিয়া কৃতার্থা—নানা সম্বন্ধ সূত্রে নিজকে বিলাইয়া দিয়া পরকে নিজ করিয়া সে সফল, ধন্য তাহার নারীজন্ম! সার্থক তাহার নারীত্ব!

জীবনে সম্বন্ধ, উপসম্বন্ধ যোগাযোগ অনন্ত। সংসারে তন্মধ্যে প্রধান রক্তসম্বন্ধ, সেটা স্বাভাবিক—তাহা অপেক্ষাও বড় আছে আর একটী, দাম্পত্য সম্বন্ধ—পরকে রক্তসম্বন্ধী অপেক্ষায় আপন করিবার বৃত্তি! প্রাণের স্বাভাবিক ধর্ম্ম সেটা। প্রাণের স্পন্দন যেখানে এই প্রবৃত্তিই সেখানে—পশুপক্ষীতে নরনারীতে জীবজগতে ইহার প্রসার। নিম্নস্তরে প্রাণের প্রেরণায় মিলন ইন্দ্রিয়ে,—ক্ষণিক; স্তর যত উচ্চ, প্রাণের অনুভূতি যত প্রখর, সূক্ষ্ম, মিলন-স্পৃহা তত প্রগাঢ়—স্থায়ীত্বের চেষ্টা তত বেশী, মিলনকে অন্তরে বাহিরে জাগ্রত রাখিবার ইচ্ছা ততই বলবতী সুতরাং এই বৃত্তির মনুষ্যোচিত বিকাশ যেখানে—মিলনসঙ্গী প্রেমাস্পদ সেখানে এক,—মিলন অবিচ্ছেদ, রাগ, অনুরাগ, সঙ্গ, সম্ভাষণ স্মৃতিমাধুর্য্য—পুলক, আনন্দ,—প্রেম—নানাচ্ছলে—নানাভাবে—প্রাণে মনে মিলিয়া মিশিয়া—সে সম্বন্ধকে করিয়া তুলে নিত্য—চিদানন্দের কৃপায় তাহা চির—সর্ব্বকার্য্যের মধ্যে তাহার প্রবাহ, প্রেমাস্পদের উপস্থিতে অনুপস্থিতে, সুব্যবহারে কুব্যবহারে—একমুখী, একাগ্র ঐকান্তিক। এ কূলহীন অকূলে যে একবার নিমজ্জিত হইয়াছে তাহার আর নিজের স্থিতি অস্তিত্ব কোথায়? প্রেমাস্পদের জন্য সে পাগল আত্মহারা! পরের অস্তিত্বে যাহার অস্তিত্ব, পরের সুখে যার সুখ, পরের দেওয়া দুঃখ যার প্রেমাস্পদের দান, সুখ; প্রেমাস্পদের কর্ম্ম যেন

তাহার ধর্ম্ম, প্রেমাস্পদ বলিয়া যাহাকে সে গ্রহণ করিয়াছে সে পুরুষ যাহাই হ'ক তাহার সহধর্ম্মিণী সে। স্থূল চক্ষে প্রেমাস্পদের দোষগুণ তাহাকে সুখদুঃখ দান করে সত্য কিন্তু অন্তরে সে প্রেমাস্পদের কার্য্য সমালোচনায় পরাঙ্মুখ ; প্রেম পরশপাথর তাহার প্রেমাস্পদের সকলই তাহার চক্ষে স্বর্ণে পরিণত করিয়া দিয়াছে। ভাব তাহাকে এমন একটী অতিন্দ্রিয় বস্তু প্রেমাস্পদের মধ্যে দিয়া সন্ধান দিয়াছে যাহা ছাড়াইয়া গিয়াছে প্রেমাস্পদকে—সেইটীই প্রেমের লক্ষ্য—সতীত্বের গৌরব—নারীর প্রাণের আদর্শ! 'ভাঙ্গাগড়ায় যুগেও' সেটী শাশ্বত—কেননা সেটী প্রাণের ধর্ম্ম—তাহা যুগধর্ম্মের বাহিরে—সমাজের বাহিরে—সীমাবদ্ধ নহে তাহা কোন জাতিতে, কোন দেশবিশেষে—সর্ব্বদেশের সর্ব্বকালের নিত্য বস্তু সেটী! আধারভেদে, দেশকালভেদে তাহার প্রকাশ রূপ বিভিন্ন সত্য কিন্তু মূলগতভাবে (spiritএ) তাহার আদর্শ হ্রাসবৃদ্ধির অতীত। সত্যযুগে সতীতে, ত্রেতায় সীতাতে দ্বাপরে গান্ধারীতে (পরকীয়াভাবে শ্রীরাধাতে) সাবিত্রীতে কলিযুগে বেহুলাতে, পদ্মিনীতে, উপন্যাসের নায়িকা মৃণালিনীতে, ভ্রমরে, প্রফুল্লে, অন্নদাদিদিতে, মৃণালে, ইউরোপের ডোরায়, আরবের সখিনাতে সেই একই নারীত্ব আদর্শের বিভিন্নরূপ—মূলসত্তায় সকলেই এক। সূর্য্যরশ্মির যেমন নানাবর্ণের কাচের মধ্যে দিয়া বিভিন্ন বর্ণে প্রকাশ পায়, কেহ একটু স্বচ্ছ কেহ একটু ঘোরাল এও তেমনি আধারভেদে একই রশ্মির রূপের বিভিন্ন প্রকাশ। অন্নদাদিদি প্রাণের এই আদর্শ লইয়া, অত কষ্টে, অমন দৈন্যের মধ্যে, শ্মশানে, নিত্য দৈহিক নির্য্যাতন সহ্য করিয়াও নরহন্তারক, গাঁজাল শাহজীর সঙ্গকে প্রেয় প্রেয় বলিয়া আলিঙ্গন করিলেন, সাবিত্রী, সাখিনা, বৈধব্য অতি নিকট বুঝিয়াও হৃদয় দেবতাকে মাল্যদান করিতে বিন্দুমাত্র দ্বিধা করিলেন না—আর (টেনিসনের) ডোরা, উইলমকে তাহার প্রতি প্রেমহীন জানিয়াও প্রাণমন সমর্পণ করিল উইলমে,—(তাহার পরিণীতা স্ত্রী মেরী স্বামীর একটি সন্তান বক্ষে ধরিয়াও আবার দ্বিতীয় স্বামী গ্রহণ করিল কিন্তু) ডোরা রহিল চিরকুমারী। কেন ? তার প্রেম ত উইলমের কেবল দেহমন অবলম্বন করিয়া নয়—উইলমের প্রেম বা তাচ্ছিল্যে ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত নয়—ডোরার প্রেম তাহার প্রাণে, তাহার আদর্শে, সত্যে—স্বামী রূপেরও অতি উচ্চে সে যে একটী অতীন্দ্রিয় শাশ্বত অবিনশ্বর বস্তু সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছে তাহার শক্তিতে, মাধুর্য্যে, 'হওয়ার' আনন্দে—সে সকল পার্থিব দুঃখ কষ্ট কালাকালের

অতীত—অন্য পুরুষ লাভের পথ তাহার পক্ষে সামাজিক হিসাবে চির উন্মুক্ত থাকিলেও একাগ্রমনা ডোবার আদর্শে উইলম্ ব্যতীত অন্যকে গ্রহণ তাহার পাপের—সে কুমারী হইয়াও উইলমের বিবাহিতা সহধর্ম্মিণী, তাহাতেই অনন্যমনা, সর্ব্বত্যাগের সতী ! অন্নদা দিদির পক্ষেও এ কথা প্রযুজ্য !

গল্পে গল্পে মুক্তা নাই, মণিযুক্ত সর্প অপেক্ষা সংসারে বিষধরের সংখ্যাই অধিক। রোগ বুঝিয়া ঔষধের ব্যবস্থা;—সমাজ তাহা করুন আমার তাহাতে বিন্দুমাত্র আপত্তি করিবার কিছু নাই, আমার বর্ত্তমান কৈফিয়তের অন্তর্ভুক্ত তাহা নহেও, তবে চিকিৎসক যিনি, তাঁহার প্রতি এ ক্ষুদ্র রোগীগণের সবিনয় অনুরোধ তিনি যেন অসুখ বিশেষ লক্ষণের চিকিৎসা করিতে গিয়া বিস্মৃত না হন মূল জীবনীশক্তিকে হৃদপিণ্ডের স্বাস্থ্যের ব্যবস্থাকে, রোগীর অস্তিত্ব লক্ষণকে কারণ এটা ধ্রুব সত্য প্রাণ শক্তির বিলোপের সহিত সকল শক্তির বিলোপ। প্রাণ-প্রকৃতির আদর্শ-স্বাস্থ্য রক্ষা করার প্রয়াস চিকিৎসার মূলে, যদিও সাধারণের পক্ষে, আবহাওয়ার দোষে সে স্বাস্থ্য সকলের পক্ষে লাভ করা সম্ভব নয় কিন্তু আদর্শ সেই হেতুবাদে খাটো হইতে পারে না ! আবহাওয়ার অনুকূল যেটা সেই ব্যবস্থার সন্ধান করুন সমাজের চিকিৎসক, বিলাতী মিত্র সুরাসক্ত রোগের ব্যবস্থা ভারতে কেন, ভারতের দুধবটী বিলাতে অচল।

যে দেশের শিক্ষায় শিক্ষিত হইতেছি আমরা, যে দেশের জ্ঞানে আমাদের বর্ত্তমান জ্ঞান, তুলনা বিবেচনার ধারা সে দেশের জীবনপ্রবাহ আর এদেশের মানসিক গতি এক নহে, পরস্পর আলাদা বিভিন্ন। উভয়ের মধ্যে আমরা সাদৃশ্য যেটা লক্ষ্য করি সেটা আমাদের বিদেশী শিক্ষার গুণে। হৃদয় দিয়া দেখিলে আমরা দেখিতে পাইতাম দেশদ্বয়ের প্রকৃতির মধ্যে কত পার্থক্য ! ভাবজগতে নারীত্বে পূর্ব্ব কথিত মূল আদর্শ, হৃদয়-বৃত্তি সর্ব্বদেশে অভিন্ন হইলেও সতীত্বের নারীত্ব সামাজিক আদর্শের সাধারণ ধারণা দেশে দেশে ভিন্ন। অন্য দেশের নারী স্বামীতে প্রার্থনা করে, সর্ব্ববিষয়ে সাহায্য, সহানুভূতি, শ্রদ্ধা, ভালবাসা, স্বামী-স্ত্রীর মিলিত-জীবনে হইবে সংসারিক ব্যাপারের সম্পূর্ণ অনুকূল, বিলাতী mate বলিতে যাহা বুঝায় স্বামী হইবেন পুরাদস্তুর তাহাই ! এ হিসাবে, শ্রীমান অশ্রুমান ভায়া, সূর্য্যমুখীর নিজের ইচ্ছাকে স্বামীর ইচ্ছার মধ্যে বিলাইয়া দেওয়াই, কুন্দের মত আপন মত ও বিশ্বাসের প্রতিষ্ঠা

জন্য স্বামী ত্যাগ না করায় যে দোষের বলিয়া মনে করিয়াছেন তাহা অন্যায় নহে। এভাব যেখানে সেখানে রমলা সত্যই খুব স্বাভাবিক ভাবে, স্বামীর ব্যবহারে ব্যথিতা হইয়া বলিয়াছেন—"তোমার এই হেয় কাজগুলির জন্য আমার হৃদয়ের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার স্থানে অবজ্ঞা ও ঘৃণা এসেছে। আমাদের মিলন একটা প্রকাণ্ড মিথ্যা—মিথ্যাকে আশ্রয় করে বিবাহের পবিত্র বন্ধন টিকিতে পারে না।" সুতরাং তুমি ত্যজ্য—আমি তোমার সহিত বিবাহব্যবচ্ছেদ করিতে বাধ্য। এই চক্ষে বিচার করিতে গিয়াই শ্রীমান, বঙ্কিমচন্দ্রের অমন নিখুঁৎ সতী প্রফুল্লকে রাণীগিরি তুচ্ছ করিয়া স্বামী গৃহে কড়াই মাজিতে দেখিয়া দাসীত্বের কল্পনা করিয়া ব্যক্তিত্বের বিনাশ কল্পনায় শিহরিয়া উঠিয়া লিখিয়াছেন—'বঙ্কিমচন্দ্র শিল্প শিক্ষকতার আসনে অধিরূঢ় হয়ে নারীত্বের আদর্শ নির্ণয় করতে গিয়ে বিচার বুদ্ধির সিদ্ধান্তকে এ ভাবে দেবী চৌধুরাণীতে অবমাননা করেছে। অন্য কোন দিক হতে দেবী চৌধুরাণীর সার্থকতা থাকলেও এদিক হতে বেশ এই এর একটা প্রকাণ্ড ব্যর্থতা পাথরের মত এর বক্ষে চেপে রয়েছে।' শ্রীমানের মত ধীমান ভারতীয় নারী প্রকৃতির যথার্থ রূপ দেখিতে যদি একটু চেষ্টা করিতেন—তাহা হইলে বঙ্কিমচন্দ্রের খুঁৎ ধরিবার পূর্ব্বে তাঁহার চক্ষে পড়িত তাঁহার উক্তির খুঁৎ। তাঁহাকে বলিতে হইত—রমলা, অভয়ার ন্যায় যতই স্বাতন্ত্র্যপ্রিয় তেজস্বিনী Forward হউন তাঁহার উক্তি ভারত রমণীর প্রাণের উক্তি নয়। তিনি নিশ্চয়ই প্রফুল্লকে লক্ষ্য করিয়াছেন—তাহার নির্লিপ্ত ভাব, কার্য্যসৌকর্য্যে সে চরম বিলাসবিভবে নিমজ্জিতা—আবার পর মুহূর্ত্তের ভিক্ষারিণী গড়া থানপরা সন্ন্যাসিনী-প্রায় কিন্তু সেই সঙ্গে জানি না কেন—তাঁহার চক্ষে পড়ে নাই কেন প্রফুল্লের প্রাণের আর একটী পূর্ণ লিপ্তভাব, প্রফুল্লর প্রাণের আর একটি মূর্ত্তি—মনোমন্দিরে তার ব্রজেশ্বর, তার স্বামী চিরবিরাজিত—প্রফুল্লের বাহ্যমূর্ত্তির পরিবর্ত্তন আছে কিন্তু তার অন্তরের ধ্যানের এদিক ওদিক সে এক পলের জন্যও করিতে পারে নাই। দিবা নিশা যখন জগন্নাথকে তাহার নাথ বলিয়া স্বীকার করিয়া সুখী হইতে উপদেশ দিতেছে, জগৎপতি নারীর প্রকৃত পতি বলিয়া ব্যাখ্যা করিতেছে—প্রফুল্ল তাহার সায় দেয় নাই কখনই—সে জানে তাহার পতি দেবতা যেমনই হ'ন যেখানেই থাকুন সে ব্রজেশ্বর! স্বামীর কল্যাণের জন্য একটি একাদশীতেও সে মৎস্য ব্যবহার করিতে বিস্মৃত হয় নাই। ব্রজেশ্বর তাহার জীবন মনের আশ্রয়

দেবত্ব,—ব্রজেশ্বরের সংসার প্রফুল্লর আপনার সংসার—ও ডাকাতের রাণীগিরি তাহার নয়,—যথার্থ রাজা রাণীত্ব! ব্রজেশ্বরের সংসারে কর্তৃত্ব লাভই তাহার রাণীগিরি, দাসীত্ব নহে, আপনার সংসারে প্রিয়জনের জন্য নিজের কাজ,—নারীর কাজ, জেলার ম্যাজিষ্ট্রারী অপেক্ষা সংসারের কর্তৃত্বপণা কি কম? রাজ্য চালনা হইতে কম জটিল নহে!

হিন্দুর সকল বিষয়েই আধ্যাত্মিকতা, ভক্তিবাদ, সকল কার্য্যেই ধর্ম্মের দোহাই, সকল বস্তুতেই ধর্ম্ম সম্বন্ধ, দেবত্বের আরোপ এ দেশের যেন প্রকৃতি। এই জন্যই হিন্দু বিদেশীর চক্ষে, ভিন্ন সম্প্রদায়ীর বিচারে—এমন কি ইংরাজীতে পাকা তাহার ঘরের ছেলের দৃষ্টিতেও পৌত্তলিক; সাধনাহীন সাধক এ দেশে প্রচুর সুতরাং প্রকৃত সাধক, আদর্শ ভক্তের নিকট দেবতার পাষাণমূর্ত্তি কি যাহিরের মন কল্পনা করিতেও অক্ষম! সীমাবদ্ধ পুতুল সে আবার দেবমূর্ত্তি,—জড়ের আবার ক্ষমতা কোথা! ভক্ত যেন ঐ পুতুলটীর দুইখানি ক্ষুদ্র জড় হস্তটীকেই পরিত্রাণের উপায় স্থির করিয়া তাহাই আঁকড়িয়া ভ্রমান্ধ, মোহে অজ্ঞানতার মধ্যে প্রাণপাত করিতেছে—কি ব্যর্থ তাহার জীবন! ভক্তপ্রাণ ঐ সসীম মূর্ত্তিতে অসীমের সন্ধান লাভ করিতে পারে—তাহাকে বিশ্বদেব বলিয়া প্রাণে মনে বিশ্বাস করিতে সমর্থ, সে সাধনা যাহার না আছে সে হৃদয়ঙ্গম করিবে তাহা কি করিয়া। কাজেই হিন্দু পৌত্তলিক! সুচরিতা ভারতনারী,—বুদ্ধিমতী সুচরিতাই কিন্তু ব্রহ্মবালিকা, তাহার শিক্ষা দীক্ষা হিন্দু হইতে ভিন্ন! সে গোরাকে প্রশ্ন করিয়াছিল—"আপনি কি ঠাকুরকে ভক্তি করেন!" গোরা উত্তর দিল—"হাঁ, ভক্তি করি বৈ কি!" সুচরিতা মনে মনে কি চিন্তা করিতে করিতে গোরার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। গোরা কহিল "আমার কথা ঠিক মত বোঝা তোমার পক্ষে খুব কঠিন সে আমি জানি। কেন না সম্প্রদায়ের ভিতরে মানুষ হয়ে এ-সব জিনিষের প্রতি সহজ দৃষ্টিপাত করবার শক্তি তোমাদের চলে গেছে। তুমি যখন তোমার মাসির ঘরে ঠাকুরকে দেখ, তুমি কেবল পাথরকেই দেখ, আমি তোমার মাসির ভক্তিপূর্ণ করুণ হৃদয়কেই দেখি। তুমি কি মনে কর ঐ হৃদয়ের দেবতা পাথরের দেবতা!"

সুচরিতা কহিল "ভক্তি কি করলেই হয়? কাকে ভক্তি করচি কিছুই বিচার করতে হবে না!"

গোরা কহিল "অর্থাৎ তুমি মনে করছ একটা সীমাবদ্ধ পদার্থকে ঈশ্বর বলে পূজা করা ভ্রম। কিন্তু কেবল দেশ কালের দিক থেকেই কি সীমা নির্ণয় করতে হবে! মনে কর, ঈশ্বরের সম্বন্ধে কোন একটি শাস্ত্রের বাক্য স্মরণ করলে তোমার খুব ভক্তি হয়; সেই বাক্যটি যে পাতায় লেখা আছে সেই পাতাটা মেপে, তার অক্ষর কয়টা গুণেই কি তুমি সেই বাক্যের মহত্ত্ব স্থির করবে? ভাবের অসীমতা বিস্তৃতির অসীমতার চেয়ে ঢের বড় জিনিষ! চন্দ্রসূর্য্যতারকাখচিত অনন্ত আকাশের চেয়ে ঐ এতটুকু ঠাকুরটি যে তোমার মাসির কাছে যথার্থ অসীম। পরিমাণ গত অসীমকে তুমি অসীম বল, সেই জন্যেই চোখ বুজে তোমাকে অসীমের কথা ভাবতে হয়। কিন্তু হৃদয়ের অসীমকে চোখ মেলে এতটুকু পদার্থের মধ্যেও পাওয়া যায়। তাই যদি না পাওয়া যেত তবে তোমার মাসির যখন সংসারের সমস্ত সুখ নষ্ট হয়ে গেল তখন তিনি ঐ ঠাকুরটিকে এমন করে আঁকড়ে ধরতে পারতেন কি? হৃদয়ের অত বড় শূন্যতা কি খেলাচ্ছলে এক টুকরো পাথর দিয়ে ভরানো যায়? ভাবের অসীমতা না হলে মানুষের হৃদয়ের ফাঁকা ভরে না।"

যে হিসাবে হিন্দু-ভক্ত পৌত্তলিক, পাথরের মূর্ত্তি তাহার সর্ব্বনিয়ন্তা প্রাণের দেবতা, সেই ভাবেই হিন্দু নারীর পতি দেবতা—ইহপরকালের কাণ্ডারী। স্বামী কেবল তাহার সংসারিক জীবনযাত্রার Mate সঙ্গী নহেন—স্বামী তাহারই ধর্ম্ম। এই ভাবই ভারতের সতীত্বের আদর্শ। শরৎবাবু অতি সোজা কথায় যখন ব্রাহ্মদুহিতা, আধুনিক শিক্ষার অনুপ্রাণিতা, স্ত্রীস্বাতন্ত্র্য, স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যের অন্যরূপে আস্থাবতী অতলা, মৃণালের বৈধব্য দুঃখে যথার্থই দুঃখিতা হইয়া পত্যন্তর গ্রহণে তাহার বৈধব্য দুঃখ দূর করিতে ব্যস্ত হইয়াছিল, তখন অনাড়ম্বর আদর্শ সতী চরিত্র মৃণালের মুখ দিয়া বলাইয়াছেন,—"তুমি ত আমার সকল কথা বুঝতে পারবে না ভাই! বিয়ে জিনিষটি তোমাদের কাছে শুধু একটা সামাজিক বিধান। তাই তার সম্বন্ধে ভাল মন্দ বিচার-চলে,—তার মতামত যুক্তি তর্কে বদলায়। কিন্তু আমাদের কাছে এ ধর্ম্ম। স্বামীকে আমরা ছেলেবেলা থেকে এই রূপেতেই গ্রহণ করে আসি। এ বস্তুটি যে ভাই বিচার বিতর্কের বাহিরে! বিস্মিতা অতলা প্রশ্ন করিয়াছিল, বেশ, তাও যদি হয়, ধর্ম্ম কি মানুষের বদলায় না ঠাকুর ঝি? মৃণাল কহিয়াছিল, ধর্ম্মের মত মত বদলায় কিন্তু আসল জিনিষটি কই আর বদলায় ভাই সেজ দি? তাই লড়াই ঝগড়ার মধ্যেও সেই

মূল জিনিষটি আজও সকল জাতিরই এক হয়ে রয়েছে। স্বামীর দোষ গুণের আমরাও বিচার করি তাঁর সম্বন্ধে মতামত আমাদেরও বদ্‌লায়,—আমরাও ত ভাই মানুষ। কিন্তু স্বামী জিনিষটি আমাদের কাছে ধর্ম্ম, তাই তিনি নিত্য। জীবনেও নিত্য, মৃত্যুতেও নিত্য! তাঁকে আমরা বদ্‌লাতে পারি নে।

অচলা ক্ষণকাল স্থির থাকিয়া কহিয়াছিল—এই যদি সত্যি, তবে এত অনাচার আছে কেন?

মৃণাল বলিয়াছিল ওটা থাক্‌বে বলেই আছে। ধর্ম্ম যখন থাকবে না তখন ওটাও থাক্‌বে না। বেড়াল কুকুরের ত ভাই অনাচার নেই।

অচলা হঠাৎ কথা খুঁজিয়া না পাইয়া কয়েক মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া বলিয়াছিল,—এই যদি তোমাদের সমাজের শিক্ষা, তবে শিক্ষা যাঁরা দেন, তাঁদের এত সন্দেহ এত সাবধান হওয়া কিসের জন্য? এত পর্দ্দা, এত বাঁধাবাঁধি সমস্ত দুনিয়া থেকে আড়াল করে লুকিয়ে রাখ্‌বার এত প্রাণপণ চেষ্টা কেন? এই জোর-করা সতীত্বের দাম বুঝ্‌তুম পরীক্ষার অবকাশ থাক্‌লে!

তাহার উত্তাপ দেখিয়া মৃণাল মুচকিয়া হাসিয়া কহিয়াছিল, এ বিধি ব্যবস্থা যাঁরা করে গেছেন উত্তর জিজ্ঞাসা করগে ভাই তাঁদের। আমরা শুধু বাপ মায়ের কাছে যা শিখেচি, তাই কেবল পালন করে আস্‌চি। কিন্তু একটা কথা তোমাকে জোর করে বল্‌তে পারি সেজদি, স্বামীকে ধর্ম্মের ব্যাপার পরকালের ব্যাপার বলে যে যথার্থই নিতে পেরেচে তার পায়ের বেড়ি বেঁধেই দাও আর কেটেই দাও, তার সতীত্ব আপনা আপনি যাচাই হয়ে গেছে! এই বলিয়া একটুখানি থামিয়া ধীরে ধীরে বলিয়াছিল, আমার স্বামীকে ত তুমি দেখেচ? তিনি বুড়ো মানুষ ছিলেন, সংসারে তিনি দরিদ্র, রূপ গুণও তাঁর সাধারণ পাঁচজনের বেশী ছিল না; কিন্তু তিনিই আমার ইহকাল, তিনিই আমার পরকাল! এই বলিয়া সে চোখ বুজিয়া পলকের জন্য বোধ করি বা তাঁহাকেই অন্তরের মধ্যে দেখিয়া লইল, তারপরে চাহিয়া একটুখানি ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল "উপমাটা হয়ত ঠিক হবে না, সেজদি কিন্তু এটা মিথ্যা নয় যে বাপ তাঁর কাণা-খোঁড়া ছেলেটির উপরেই সমস্ত স্নেহ ঢেলে দেন। অপরের সুন্দর

স্বরূপ ছেলে মুহূর্ত্তের তরে হয় ত তাঁর মনে একটা ক্ষোভের সৃষ্টি করে, কিন্তু পিতৃধর্ম্ম তাতে লেশমাত্রও ক্ষুন্ন হয় না। যাবার সময় তাঁর সর্ব্বস্ব তিনি কোথায় রেখে যান এতো তুমি জানো? কিন্তু নিজের পিতৃত্বের প্রতি সংশয় দিয়ে কথনো তাঁর পিতৃধর্ম্ম ভেঙ্গে যায়, তথন সেই স্নেহের বাষ্পও কোথাও খুঁজে মেলে না। কিন্তু আমাদের শিক্ষা সংস্কার ও চিন্তার ধারা আলাদা, তাই আমার এই উপমাটা ও কথাগুলো তুমি হয় ত ঠিক বুঝতে পারবে না, কিন্তু এ কথা আমার তুমি ভুলেও অবিশ্বাস কোরো না, যে, স্বামীকে যে-স্ত্রী ধর্ম্ম বলে অন্তরের মধ্যে ভাবতে শেখেনি, তার পায়ের শৃঙ্খল চিরদিন বদ্ধই থাক, আর মুক্তই থাক, এবং নিজের সতীত্বের জাহাজটাকে সে যতবড় বৃহৎ কল্পনা করুক, পরীক্ষায় চোরাবালিতে ধরা পড়লে তা'কে ডুবতেই হবে। সে পর্দ্দার ভিতরেও ডুবেছে, বাহিরেও ডুবে।"

কথাগুলিতে ভারতীয় নারী-প্রকৃতির আদর্শটি এমন সুন্দর স্পষ্ট ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে যে ইহার উপর আর মন্তব্যের আবশ্যক করে না। মৃণালের আদর্শ ধর্ম্ম যেটা অন্নদা দিদিরও তাহাই, এই সত্যকে ভারতীয় সতী অন্তরে, জীবনে আঁকড়াইয়া ধরিয়া, তাহাকেই লক্ষ্য করিয়া সর্ব্ব অবস্থাতে লক্ষ্যের দিকে অলক্ষ্যে অগ্রসর হইতেছেন। নারীর প্রাণ-শক্তি এ সমাজে বর্দ্ধিত হইয়া, এ সত্য উপলব্ধি করিয়া বরমাল্য যাহাকে অর্পণ করিয়াছেন তাহাকেই জীবনমরণের স্বামী বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, বিবাহের মন্ত্রোচ্চারণের সঙ্গে সঙ্গে। বিবাহের মন্ত্র, রমলার চর্চ্চের মিলন-মন্ত্রের ন্যায় নিরর্থক নহে, বস্তুতঃ তাহার ক্রিয়া, শক্তি হিন্দুনারী হৃদয়ে অসীম। নিরুপমা দেবীর 'দিদি'তে, অনুরূপা দেবীর 'মন্ত্র-শক্তি'তে এ শক্তির প্রবল বল আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। অন্নদা দিদি ত তাদের অনেক উচ্চে। সুরমা ও বাণীকে বরং ঘাতপ্রতিঘাতে ক্ষত বিক্ষত হইয়া এ সত্যকে আবিষ্কার করিতে হইয়াছিল কিন্তু মৃণাল ও অন্নদা দিদির মনে এ ধর্ম্মের একটা জাগ্রত মূর্ত্তি বিবাহের পূর্ব্বেই এমন ভাবে প্রকটিত ছিল যাহার জন্য বিবাহমন্ত্রোচ্চারিত হইবা মাত্রই ইহারা স্বামীকে গ্রহণ করিয়াছিলেন ধর্ম্মরূপে। মৃণালের অবস্থা বরং এ সত্যকে বাস্তবে হৃদয়ঙ্গম করিবার সুযোগ ছিল, বৃদ্ধ স্বামী তাহাকে ভালবাসাই দিয়াছেন, দিদির অদৃষ্ট ছিল বিপরীত। ভালবাসা বলিয়া বস্তু তাঁহার স্বামীর হৃদয়ে ছিল না কণামাত্রও। তাঁহার স্বামী দেবতাটীর গুণ অশেষ! এমন কুকর্ম্ম জগতে নাই যাহাতে তাঁহাকে স্নেহাই দেওয়া চলে, তথাপি অন্নদা দিদি কি করিয়া, কতবড় আকর্ষণে যে তাহাকে

ধর্ম্মের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন, বাস্তবিকই তাহা পুরুষ আমরা কল্পনায় আনিতে পারি না, তাহা সহজ ভাবে গ্রহণ করিতে পারে যদি কেহ সে ভারতের নারী। জনৈকা পাঠিকার নিকট আমাদের এ দৈন্য ব্যক্ত করিলে তিনি অতি সহজ ভাবেই বলিয়াছিলেন "বাঃ এটায় এমন অসাধ্য সাধন আপনারা কল্পনা করছেন কেন বুঝিনে—স্বামী মনের মত না হলেই কি ত্যাগ করে আর একটি খুঁজতে হবে, তা হলে ভেবে দেখুন প্রায় ষোল আনার স্বামী মশায়দের কি দশা, মেয়েদেরও তাতে দুর্দ্দশার অন্ত নেই; মনের মানুষ খুঁজে খুঁজে ফিরবে কত কাল, ধরবে কত ছাড়বে কত! সে জীবন যদি সুখের হয়, দুঃখ আবার আছে কোথা! সেটা পারেন পুরুষে, মেয়ে করবে তাই ছি!"

তাঁর চোখে মুখে গ্রীবাভঙ্গীতে এমন একটা ভাব তখন ফুটিয়া উঠিয়াছিল তা দেখিয়া না ভাবিয়া পারি নাই, মৃণাল কি তবে ভারত নারীর ঘটে ঘটে!

শিক্ষা, সংস্কার বা যে জন্যেই হউক, ভারতীয় নারীর এই একনিষ্ঠতা, উচ্ছ্বাসসংঘাতে আমাদের, বিদেশীয় ভাবাপন্ন মনে সময়ে বিজলীর ন্যায় প্রকাশ পাইলেও তাহাতে আস্থা স্থাপন করিতে পারি না। বিদেশীয় শিক্ষা আমাদিগকে জ্ঞানের পথে অগ্রসর করিয়াছে অনেকখানি, বিচার-বুদ্ধির প্রাখর্য্যও দান করিয়াছে যথেষ্ট। সংস্কারকে আমরা ঘৃণা করি, সংস্কারের মূলে যে প্রাণের একটি শাশ্বত সত্য নিহিত আছে, যেটিকে অবলম্বন করিয়া সংস্কার দানা বাঁধিয়া উঠিয়াছে, তাহা আমাদের চক্ষে পড়ে না। জ্ঞান নিখিল জগতের, সংস্কার দেশের, দেশের প্রকৃতিকে অবলম্বন করিয়া তাহা ফুটিয়া উঠে,—তাহাতে কালে নানা আবিল্য কলঙ্ক অনুলেপিত হইয়া তাহাকে মসী মলিন করিয়া ফেলে ঠিক—কিন্তু সত্য শাশ্বত মূল ধর্ম্ম থাকে অবিকৃত,—সেটীকে অস্বীকার করিবার উপায় নাই,—করিলে দেশের মঙ্গল নাই, কারণ যাহার যেটী প্রাণ শক্তি, ধর্ম্ম, তাহাকে বিভিন্ন মূর্ত্তি দান করিবার প্রয়াস অর্থে বিরোধের সৃষ্টিই। ইহার উদাহরণ একপক্ষে অন্নদা দিদি, অন্যপক্ষে বিমলা। একপক্ষে রাজলক্ষ্মী, অপর পক্ষে অভয়া। অন্নদা দিদির মনে প্রাণের আদর্শ স্বামী ধর্ম্ম,—তাঁহার রক্ত মাংসে জ্ঞান বুদ্ধিতে এ সত্যানুভূতি নিত্য প্রাকৃতিগত,—তাই তিনি এই ধর্ম্মের প্রতিষ্ঠায় সর্ব্ব অবস্থায় সর্ব্ব প্রকার দৈহিক দুঃখ কষ্টকে শ্রেয় বলিয়া স্বইচ্ছায় প্রশান্তচিত্তে গ্রহণ করিতে সমর্থা। স্বামী শিক্ষিত হইয়াও নরপশু—তাঁহার স্মৃতিকে তিনি সাত সাতটী বৎসর হৃদয়মন্দিরে

সদা জাগ্রত রাখিয়া ধ্যানমগ্না,—তাহার প্রতীক্ষার উৎকণ্ঠিতা—সেই স্বামী দেখা দিল হেম সাধুদের মূর্ত্তিতে,—অন্যের চক্ষে তাহার কদর্য্য মূর্ত্তি ঢাকিয়া ফেলিয়াছিল তাহার পূর্ব্বরূপ—সতীর চক্ষুকে কিছুতেই প্রতারিত করিতে পারিল না, তিনি চিনিলেন তাঁহার ধর্ম্ম আশ্রয় ভস্মাচ্ছাদিত স্বামীকে! যে স্বামী দিদির দিদিকে হত্যা করিয়া, নিরুদ্দেশ হইয়া স্বামী হইয়া যে অপমানের আগুন স্ত্রীর বুকের মধ্যে জ্বালাইয়া দিয়া গিয়াছে। যে জ্বালায় দিদি আজীবন পুড়িয়াছেন, সেই স্বামীর আশ্রয় লাভের জন্য অরণা দিদি, আত্মীয়, রক্ত সম্বন্ধীয় আপনার জনের মায়া কাটাইয়া এক গভীর রাত্রে খিড়কীর দ্বার দিয়া গৃহত্যাগ করিলেন। 'সবাই শুনিল, সবাই জানিল অরণা কুলত্যাগ করিয়া গিয়াছে।' এ কুলত্যাগ যে কতবড় ত্যাগ, কতখানি আত্মবলী দিয়া আত্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা, স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের কিরূপ অতি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত—তাহা কল্পনা করিতে পারি না! শ্রীরাধিকার কুলত্যাগ অপেক্ষাও যেন আরও উর্দ্ধে,—শ্রীরাধিকার ত শ্রীকৃষ্ণের কুলশীলবিবসা মধুর মুরলীর তান ছিল, আহ্বান ছিল, প্রেমলীলা ছিল—দিদির, এক ধর্ম্মানুরাগ ব্যতীত,—স্ত্রীলোকের সর্ব্বাপেক্ষা বড় কলঙ্ক কুলত্যাগ—তাহাতে স্বইচ্ছায় ঝাঁপাইয়া পড়িবার মত ছিল কি! তাঁহার শেষ আশাটুকুও ছিল না; স্ত্রীলোকের সকল কলঙ্কের শেষ হইয়া যায় যদি সে একদিন প্রমাণ করিতে পারে যে তার কুলত্যাগ স্বামীর জন্যই—স্বামী লাভ করিতেই সে সে কর্ম্ম করিয়াছে. জগত তখন তাঁহার একনিষ্ঠতায় মুগ্ধ হইয়া বলে ধন্যা নারী! দিদির যে সে সুযোগও ছিল না,—স্বামী তাঁর নরহত্যাকারী,—তাহার প্রকৃত পরিচয় প্রকাশ পাইলেই সর্ব্বনাশ! দিদি হৃদয়ের উচ্ছৃঙ্খল আবেগে, পূর্ব্বাপর বেশ ধীরভাবে সমস্ত আলোচনা না করিয়া যে কুলত্যাগ গৃহত্যাগ করেন নাই তাহা বলাবাহুল্য; শাহজীর ব্যবহারেও যে তাঁহাকে আকৃষ্ট করে নাই তাহাও নিশ্চিত, সে তাঁহাকে প্রার্থনা করিয়াও ও-দেশে দেখা দিয়াছিল না,—সকল সুখ দুখের উপরে যে আকর্ষণ তাঁহার সেই আদর্শ অক্ষুণ্ণ রাখিবার অনুরাগই তাঁহাকে গৃহত্যাগী করিয়াছিল; এ অনুরাগের সহিত দেহের সম্বন্ধ নাই বলিলেই হয়! মৃণাল প্রদত্ত সন্তান বাৎসল্যের উদাহরণ যেমন নিত্য আকর্ষণ, রক্তের টান, দিদির দাম্পত্য সম্বন্ধও তেমনি রক্তের টানের চেয়েও আর একটা প্রবলতর অকাট্য আকর্ষণ! সে আকর্ষণে স্বামীর ভাল মন্দ, সু কু স্ত্রীর নিতান্ত আপনার,—নিজের স্বভাবের হীন অংশ কখনও প্রতিভাত হইয়া উঠিলেও যেমন তাহাকে দেহমন চ্যুত করা সম্ভব

নয়,—কেবল অনুতপ্ত হৃদয়ে তাহার সংশোধন চেষ্টা হইতে পারে মাত্র, স্বামীর স্বভাবও সহধর্ম্মিণীর পক্ষে তদ্রূপ ; স্বভাবের জন্য স্বামীকে ত্যাগ হিন্দুনারীর পক্ষে অসম্ভব ব্যাপার,—তাঁহার নিরাকরণের চেষ্টা কেবল সতীর হাতে,—ফলাফল সমস্তই ভগবানে। দিদি যে সে চেষ্টা করেন নাই তাহা বলিবার উপায় নাই। দিদি স্বামীকে সহ্য করিয়াছেন প্রশ্রয় দেন নাই কখনই। স্বামীর কুকার্য্যকে তিনি কখনই অনুমোদন করেন নাই, তিনি আত্মকথা নিজ মুখে ব্যক্ত করিয়াছেন অন্নই, সে ব্যক্তি তিনি নন। ইন্দ্রনাথের মুখে আমরা শুনিয়াছি—"আমি নিজেই ত কত দিতে পারি, কিন্তু দিদি যে কিছুতেই নিতে চান না।" শাহজী ইন্দ্রকে সাপের মন্ত্র শিখাইবার প্রলোভনে মোহ রচনা করিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে অর্থ আদায় করিত, দিদি, স্বামীর সে প্রকার অসদুপায়ে অর্থ সংগ্রহের বাধাই হইয়াছিলেন—তাহাতে সহধর্ম্মিণীত্ব করিয়া সহায় হন নাই কখনই—তাঁহার ব্যক্তিত্বের আদর্শ যে অনেক উপরে। তিনি ইন্দ্রকে নানা প্রকারে সাবধানই করিয়াছেন বিধিমতে। সমস্ত কথা প্রকাশ করিয়া বলিবার তাঁহার পথ ছিল না—কিন্তু একদিন বুঝিলেন শাহজীর মিথ্যা আচরণ অন্যের জীবনকে বিপন্ন করিতে পারে—এ সত্য অনুভূত হইবামাত্র সকল বাধাবিঘ্ন তাঁহার সত্যের নিকট টুটিয়া গেল,—স্বামীর মান হইতে সত্যের মান তাঁহার হৃদয়ে বড় হইয়া দেখা দিল—সহধর্ম্মিণীত্ব স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তীতাকে স্পষ্ট পৃথক করিয়া, ব্যক্তিত্ব বিকশিত হইয়া, বুদ্ধিমতী কেবল মাত্র স্বামীর পার্থিব বিপদকে দূরে রাখিয়া, সাপুড়ে মন্ত্রের নগ্ন মূর্ত্তি নিরেট সত্যকে প্রকাশ করিলেন। "আচ্ছা, দিদি, ঘর বন্ধন, দেহ বন্ধন, ধূলো পড়া এ সব জান ত ? আর যদি নাই জানবে, ত অমন সাপটাকে ধরে দিলে কি করে ?" ইন্দ্রের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিলেন "ইন্দ্র, তোর দিদির এ সব কাণা কড়ির বিদ্যেও নেই, সে যদি তোরা বিশ্বাস করিস্ ভাই, তা' হলে আজ তোদের কাছে আমি সমস্ত ভেঙ্গে ব'লে আমার বুকখানা হাল্‌কা ক'রে ফেল্‌ব। বল্‌, তোরা আমার সব কথা আজ বিশ্বাস করবি ?" শ্রীকান্ত তাঁহার সত্য মূর্ত্তি লক্ষ্য করিয়াছিল,—সে সর্ব্বাগ্রে জোর দিয়া বলিয়া উঠিল "আমি তোমার সব কথা বিশ্বাস করব দিদি ? সব যা বল্‌বে সমস্ত। একটি কথাও অবিশ্বাস করব না।" দিদির প্রাণে সহানুভূতির মাধুর্য্য ঢালিয়া দিল,—সেটা যে তিনি জীবনে লাভ করেন নাই,—দ্বিধা আর থাকে কি ! তিনি শ্রীকান্তের প্রতি চাহিয়া একটু হাসিয়া বলিলেন "বিশ্বাস করবে বই কি ভাই ! * * * তা ছাড়া, আমি ত

কখনও মিথ্যা কথা কইনে ভাই।" বলিয়া তিনি আর একবার তাহার প্রতি চাহিয়া ম্লান ভাবে একটুখানি হাসিলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত নীরব থাকিয়া, দিদি হঠাৎ বলিয়া উঠিলেন, ইন্দ্রনাথ "মনে করেছিলুম আজই আমার সমস্ত কথা তোমাদের জানিয়ে দেব। কিন্তু ভেবে দেখ্‌চি, এখনও সে সময় আসেনি। আমার এই কথাটুকু আজ শুধু বিশ্বাস কোরো ভাই আমাদের আগাগোড়া সমস্তই ফাঁকি। আর তুমি-মিথ্যে আশা নিয়ে শাহজীর পিছনে পিছনে ঘুরে বেড়িয়ো না—আমরা মন্ত্র-তন্ত্র কিছুই জানিনে, মড়াও বাঁচাতে পারিনে; কড়ি চেলে সাপ ধ'রে আ'নতেও পারিনে। আর কেউ পারে কিনা জানিনে, কিন্তু আমাদের কোন ক্ষমতা নেই।" ইন্দ্র মুগ্ধ হইয়া কহিল, "যদি পার না, তবে সাপ ধরলে কি ক'রে ?" দিদি বলিলেন, "ওটা শুধু হাতের কৌশল ইন্দ্র, কোন মন্ত্রের জোরে নয়, সাপের মন্ত্র আমরা জানিনে।" ইন্দ্র বলিল "যদি জান না, তবে দুজনে জুচ্চুরি ক'রে, ঠকিয়ে আমার কাছ থেকে এত টাকা নিয়েচ কেন ?" ইন্দ্র দোষ দিল দুজনকে—ফলে দিদি এ দুজনের বাহিরে,—স্বামী স্ত্রীর সাধারণতঃ এক মতলব এই বিশ্বাসেই ইন্দ্রের এই উক্তি,—কিন্তু পরে ইন্দ্রই কথা প্রসঙ্গে আসল কথাটা প্রকাশ করিয়াছে—"যেদিন থেকে দিদি বল্লে 'ইন্দ্রনাথ, তোমার রোজগারের টাকা হ'লে নিতাম, কিন্তু এ নিয়ে আমাদের ইহকাল পরকাল মাটি কর্‌ব না,' সেইদিন হ'তে ঐ সয়তান ব্যাটা (শাহজী) দিদিকে কত মার মেরেচে, তার হিসেব-নিকেশ নেই। তবু দিদি ওকে কাট কুড়িয়ে ঘুঁটে বেচে, খাওয়াচ্ছে, গাঁজার পয়সা দিচ্ছে—তবু কিছুতে ওর হয় না।" যে জন্য এরূপ নির্ম্মম ভাবে নিপীড়িত হইয়া অত কষ্টে অন্নদা দিদির স্বামীসেবা—সেই জন্যই অন্নদা দিদি তৎক্ষণাৎ ইন্দ্রের অভিযোগের যথার্থ জবাব দিতে পারিলেন না; বোধ করি বা নিজেকে একটুখানি সাম্‌লাইয়া লইতে লাগিলেন। এ সামলান কিসের জন্য—তার আভাস অন্নদা দিদির চিঠিতে আছে—তিনি লিখিয়াছেন আমার কথা শুধু আমারই কথা নয় ভাই, সে আমার স্বামীর কথা। আবার তাও ভাল কথা নয়। তাই যখনই বলিতে চাহিয়াছি তখনই মনে হইয়াছে, স্ত্রী হইয়া নিজের মুখে স্বামীর নিন্দা গ্লানি করিয়া পাপের বোঝা আর ভারাক্রান্ত করিব না।"

দিদির মুখখানি একেবারে যেন মড়ার মত শাদা হইয়া গেল। সভয়ে, সসঙ্কোচে বলিলেন "আমরা যে সাপুড়ে, ভাই,—ঠকানোই যে আমাদের ব্যবসা"—সতীর কি আত্মত্যাগ,—দৈন্য—বিমল চন্দ্রে শশাঙ্ক রেখা।

যার জন্য এত সেই স্বামী দেবতা--দেবতারও অধিক কেন না কাঠের ঠাকুরের ত সাধ্য নাই হস্তও চর্ম্মের কঠোর সম্বন্ধটার পরিচয় দেয়,—স্ত্রী আদত মন্ত্র রহস্য প্রকাশ করিয়া দেওয়ায় গুণবান স্বামী লাঠির আঘাতে, তাঁহাকে অচৈতন্য করিয়া ছাড়িল--শেষই হয় ত করিয়া ফেলিত—যদি ইন্দ্র মধ্যে আসিয়া না পড়িত। এমন অত্যাচারের পরও যখন দিদি চেতনা ফিরিয়া পাই-লেন, তাঁহার মুখ দিয়া একটিও অভিযোগের উক্তি নিকাশিত হইল না ; তিনি ইন্দ্রনাথের হস্তের সুদৃঢ় বন্ধন হইতে শাহজীকে মুক্ত করিয়া দিয়া বলিলেন "যাও, শোওগে।" ইন্দ্রকে কাছে ডাকিয়া, তাহার ডান হাতটা নিজের মাথার উপর টানিয়া লইয়া বলিলেন "ইন্দ্র, এই আমার হাত দিয়ে আজ শপথ কর্ ভাই, আর কখনো এ বাড়ীতে আসিস্‌নে। আমাদের যা হবার হোক, আর আমাদের কোন সংবাদ রাখিস্‌নে।" ইন্দ্র প্রথমটা অবাক্ হইয়া রহিল। যে দিদি তাহাকে এত ভালবাসে সে কি করিয়া এ কথা বলিতে পারে ! কিন্তু পরক্ষণেই আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিয়া বলিল "তা বটে ! আমাকে খুন করতে গিয়েছিল, সেটা কিছু না। আর আমি যে ওকে বেঁধে রেখেচি, তাতেই তোমার এত রাগ ! এমন না হ'লে কলিকাল বলেচে কেন ? কিন্তু কি নেমকহারাম তোমরা দুজন। আয় শ্রীকান্ত আর না।" নিজ ভাবে বিভোর, ক্রোধে উন্মত্ত ইন্দ্রের আশাহত প্রাণ বুঝিবে কি—বক্ষের কতখানি রক্ত জমাট বরফে পরিণত করিয়া কি উদ্দেশ্যে দিদি আজ প্রাণের দুলাল—তাঁর স্নেহের একমাত্র পাত্র ভাইটীকে সমস্ত প্রাণ শক্তি একত্র করিয়া দূরে সড়াইয়া দিতে উদ্যত হইয়াছেন ! দিদি চুপ করিয়া রহিলেন—একটি অভিযোগেরও প্রতিবাদ করিলেন না ! সতী পাষাণ প্রতিমা বাক্য স্ফুরণ হইবে কি প্রকারে !

সতীর পূর্ণ বিকাশ শাহজীর সেই শেষ দিনে। (মন্ত্র বুজরুকি যে মিথ্যা তাহা হাতে হাতে প্রমাণ করিয়া) শাহজীর সর্প দংশনে মৃত্যু হইয়াছে ! সতী বসিয়া আছেন মৃত স্বামীর মাথাটি তাঁহার ক্রোড়ে করিয়া ! নির্ব্বাত নিষ্কম্প প্রদীপটীর মত ! ইন্দ্র ও শ্রীকান্তকে স্বামীর মৃত্যু কাহিনী সংক্ষেপে বলিয়া তিনি হাত দিয়া অত্যন্ত সন্তর্পণে শাহজীর মুখাবরণ উন্মোচিত করিয়া গভীর স্নেহে তাহার সুনীল ওষ্ঠাধরে ওষ্ঠ স্পর্শ করিয়া বলিলেন, "যাক্, ভালই হ'ল ইন্দ্রনাথ! ভগবানকে আমি এতটুকু দোষ দিইনে।" সে কণ্ঠ স্বরে যে কি মর্ম্মান্তিক বেদনা, কি প্রার্থনা, কি সুনিবিড় অভিমান প্রকাশ পাইল, তাহা যে শুনিয়াছে তাহার সাধ্য নাই যে জীবনে বিস্মৃত হয়। কিন্তু কিসের জন্য এই অভিমান ? প্রার্থনাই বা কাহার জন্য ?"

তার পরে তিন জনে ধরাধরি করিয়া শাহজীর মৃত দেহটা সমাহিত করিল। গঙ্গার ঠিক উপরেই কাঁকরের একটুখানি পাড় ভাঙ্গিয়া ঠিক যেন কাহারও শেষশয্যা বিছাইবার জন্যই এই স্থানটুকু প্রস্তুত হইয়াছিল। ১০।১৫ হাত নীচেই জাহ্নবী মায়ের প্রবাহ—মাথার উপরে বন্যলতায় আচ্ছাদন। প্রিয় বস্তুকে সযত্নে লুকাইয়া রাখিবার স্থান বটে। বড় ভারাক্রান্ত হৃদয়ে তিন জন পাশাপাশি বসিয়া, আর একজন তাহাদের কোলের কাছে মৃত্তিকা তলে চির নিদ্রায় অভিভূত! কাল যে ছিল আজ সে নাই!

হঠাৎ দিদি সেই গোরের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বিদীর্ণ কণ্ঠে কাঁদিয়া উঠিলেন, "মা গঙ্গা, আমাকেও পায়ে স্থান দাও মা! আমার যে আর কোথাও জায়গা নেই।" তাঁহার এই প্রার্থনা, এই নিবেদন কিরূপ মর্ম্মান্তিক সত্য,—আশ্রয়হীনার সর্ব্বাপেক্ষা তীব্র বেদনা! কঠোর কর্ত্তব্যের বাঁধনে এতক্ষণ যে প্রাণকে তিনি বাঁধিয়া রাখিয়াছিলেন—এ মুহূর্ত্তে তার ছুটী মিলিয়াছে—আর কি বাধা মানে! বিগ্রহের বিসর্জ্জন—অভিশপ্তের ইহজগতের যন্ত্রণার অবসান—সব দুঃখের শান্তি—হিন্দু হইয়া চিতার আগুন জ্বলিল না চিতায় জ্বলিল সতীর প্রাণে; এ ক্রন্দনের তুলনা কোথা?

যে এই আদর্শ নারীর পতিব্রতা সতীর সংস্পর্শে আসিয়াছে সেই ধন্য! শ্রীকান্তের জীবনে তাই তিনি রক্ষা-কবচ! জীবনের প্রতি পরীক্ষায় শ্রীকান্ত তাঁহাকে স্মরণ করিতে বাধ্য হইয়াছে,—শ্রীকান্তের সতীত্বগর্ব্ব দিদির মহিমায়! শ্রীকান্ত সত্যই বলিয়াছে "তারপর অনেক জায়গায় ঘুরিয়াছি; কিন্তু এই দুটো পোড়া চোখে আর কখনও তাঁহার দেখা পাই নাই, না পাই কিন্তু অন্তরের মধ্যে সেই প্রসন্ন হাসি মুখখানি চিরদিন তেমনই দেখিতে পাই। তাঁহার দুঃখের কথা, তাঁহার চরিত্রের কথা স্মরণ করিয়া যখনই মাথা নোয়াইয়া প্রণাম করি, তখনই এই একটা কথা আমার মনে হয়, ভগবান! তোমার কি বিচার! আমাদের এই সতী-সাবিত্রীর দেশে স্বামীর জন্য সহধর্ম্মিণীকে অপরিসীম দুঃখ দিয়া সতীর মাহাত্ম্য তুমি উজ্জ্বল হইতে উজ্জ্বলতর করিয়া সংসারকে দেখাইয়াছ জানি। তাঁদের সমস্ত দুঃখ-দৈন্যকে চিরস্মরণীয় কীর্ত্তিতে রূপান্তরিত করিয়া জগতের সমস্ত নারী জাতিকে কর্ত্তব্যের ধ্রুবপথে আকর্ষণ করিতেছে—তোমার সে ইচ্ছাও বুঝিতে পারি, কিন্তু আমার এমন দিদির ভাগ্যে এত

বিড়ম্বনা নির্দ্দেশ করিয়া দিলে কেন? কিসের জন্য এত বড় সতীর কপালে অসতীর এমন গভীর কালো ছাপ মারিয়া চিরদিনের জন্য তাঁকে তুমি সংসারে নির্ব্বাসিত করিয়া দিলে? কি না তুমি তাঁর নিলে? তাঁর জাতি নিলে, ধর্ম্ম নিলে,—সমাজ, সংসার, সম্ভ্রম সমস্তই নিলে। দুঃখ যত দিয়াছ, আমি ত আজো তাহার সাক্ষী রহিয়াছি। এতেও দুঃখ করি না, জগদীশ্বর! কিন্তু যাঁর আসন সীতা, সাবিত্রী, সতীর সঙ্গেই, তাঁকে তাঁর বাপ, মা, আত্মীয়-স্বজন, শত্রু, মিত্র জানিয়া রাখিল কি বলিয়া? কুলটা বলিয়া!"

সীতার সতীত্বের পুরস্কার অগ্নিপরীক্ষায়, নির্ব্বাসনে, দ্বিতীয় বার অগ্নি পরীক্ষার প্রস্তাবে পাতাল প্রবেশে! সতীর শেষ পিতৃ অনাদরে অগ্নিতে ঝাঁপ দিয়া আত্মহত্যায়, গান্ধারীর পুরস্কার আত্মীয় অন্তরঙ্গের মহাশ্মশানে! পাবক ভস্মে পরিণত করিয়াই পবিত্র করে, সংসারে পড়িয়া থাকে ছাই তথাপি সর্ব্ব বিধ্বংসী অগ্নি—পাবক।

বড় ক্ষোভেই শ্রীকান্ত বলিয়াছে "হায় রে, কোথায় তাঁহার এই আত্মীয়! সে দেশ যেখানে যত দূরেই হোক, এ দেশের বাহিরে হইলেও, হয় ত এক দিন গিয়া হাজির হইয়া বলিয়া আসিতাম—এই তোমাদের অন্নদা! এই তাঁর অক্ষয় কাহিনী! তোমাদের যে মেয়েটিকে কুলত্যাগিনী বলিয়া জানিয়া রাখিয়াছ, সকাল বেলায় একবার তাঁর নামটাই লইও—অনেক দুষ্কৃতির হাত এড়াইতে পারিবে।'

'তবে, আমি একটা সত্য বস্তু লাভ করিয়াছি। নারীর কলঙ্ক আমি সহজে প্রত্যয় করিতে পারি না। আমার দিদিকে মনে পড়ে। যদি তাঁর ভাগ্যেও এত বড় দুর্নাম ঘটিতে পারে, তখন সংসারে পারে না কি? এক আমি, আর সেই সমস্ত কালের সমস্ত পাপ-পুণ্যের সাক্ষী তিনি ছাড়া, জগতে আর কেহ কি আছে, যে অন্নদাকে একটুখানি স্নেহের সঙ্গেও স্মরণ করিবে! তাই ভাবি, না জানিয়া নারীর কলঙ্কে অবিশ্বাস করিয়া সংসারে বরঞ্চ ঠকাও ভাল, কিন্তু বিশ্বাস করিয়া পাপের ভাগী হওয়ায় লাভ নাই।" পথে ঘাটে পাপের মূর্ত্তি দেখিয়া শ্রীকান্তের মনে হইয়াছে "এ সকল তাহাদের শুধু বাহ্য আবরণ; যখন খুসি-ফেলিয়া দিয়া ঠিক তাঁর মতই সতীর আসনের উপর অনায়াসে গিয়া বসিতে পারে। বন্ধুরা বলেন, ইহা আমার

একটা অতি জঘন্য শোচনীয় ভ্রম মাত্র। আমি তাহারও প্রতিবাদ করি না। শুধু বলি, ইহা আমার যুক্তি নয়—আমার সংস্কার।"

হউক সংস্কার এ সংস্কারের তুলনা নাই; ইহার মূল সত্তা অনুভব করিবার শক্তি যে জাতির জাগ্রত হইবে সে জাতি হইবে ধন্য, যে শিক্ষায় নারীর এই বিরাট সত্তা জীবনে মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে সেই শিক্ষাই শিক্ষা—যে আদর্শে নর নারীকে দিদির পদপ্রান্তে পৌঁছাইয়া দিবে সেই আদর্শই আদর্শ।—দিদিকে অক্ষয় করিয়া হিন্দুর নয়নে তাঁহাকেই প্রতিভাত করিয়া তোল বিধাতা!

দিদি স্বামীর ঋণ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করিয়া নিঃসম্বল অবস্থায় কেবল আপনার ব্যক্তিত্ব ধর্ম্ম সম্বল করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইলেন। সেই শ্মশানে বিসর্জ্জন দিয়া গেলেন এ পারের সমস্তই। শাহজীকে, প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর দুইটী স্নেহের-পাতা ভাইকে, শ্রীকান্তের স্মৃতিচিহ্ন ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত, হউক তাহা স্নেহের দান তবু সে যে অর্থ, স্বার্থ, সর্ব্বস্বার্থ-বর্জ্জিতা সতী তাহা যে গ্রহণ করিতে পারেন না। এ টাকাকটি শ্রীকান্তের দেওয়া সেই টাকা কটিই; অত কষ্টেও স্নেহচিহ্ন ব্যয়িত হইয়াছিল না—তাঁর বক্ষের পঞ্জর সমান তাহা—তাহার প্রত্যার্পণে কি ব্যথা তাঁহার বক্ষে বজ্রসম বাজিয়াছিল! দিদি পত্রে শ্রীকান্তকে লিখিয়া গেলেন "মনে দুঃখ করিও না ভাই। টাকা কয়টি ফিরাইয়া দিলাম বটে. কিন্তু তোমার ওই কচি বুকটুকু আমি বুকে পুরিয়া লইয়া গেলাম। মনে করিও, তোমাদের দিদি যেখানেই থাকুক ভালই থাকিবে, তাহাকে কিছুতেই আর ব্যাথা দিতে পারবে না।"

অতি সত্য কথা! যাহার আদর্শ স্থির যে প্রকারেই হউক সত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়া যে জীবনে জাগ্রত করিয়াছে তাহার নিকট ঘর বাইর, পর্দ্দা, প্রান্তর,—ঐশ্বর্য্য, দৈন্য সমস্তই এক। মৃণাল গৃহে, অন্নদা দিদি সহায়সম্বলহীন অপরিচিত, অজানা বহুপ্রকৃতির নরনারীর সম্মিলিত বাইরে, সর্ব্ব অবস্থায় সতী, তাহাদের তেজে তাহাদের সতীত্ব সর্ব্বজয়ী সে-নারীত্বর অপমান করে এমন সাধ্য অতিবড় সয়তানেরও নাই, শক্তিরশক্তি সর্ব্ব শক্তির উপরে, অন্নদা দিদির সতীত্বের আদর্শ কত বড়! তাঁহার সব দিক কল্পনায় আনিতেও ভয় হয়,—স্তম্ভিত হৃদয় নত হইয়া আসে, মনে হয়—কলিতে মূর্ত্তিমতী সতীর আদর্শ দিদি তুমি।

(খ)

প্রশ্ন উঠিবে—অন্নদাদিদি আদর্শ সতী সত্য, ভাবে তিনি মহিয়সী সর্ব্বজয়ী, কিন্তু কার্য্যে ত তিনি নরহত্যাকরীর সেবিকা, তাঁহার ভাবে তাঁহার অন্য পথ অবলম্বনের উপায় ছিল না কিন্তু কেহ যদি 'ঘরে-বাইরে'র বিমলার ন্যায় নিজের মত ও বিশ্বাসকে স্বামী হইতে স্বতন্ত্র করিয়া দেশের কার্য্য, পরোপকারে জীবন সমর্পন করে, সে তাহা হইলে অন্নদা দিদি অপেক্ষা ছোট কিসে? হাতে কলমে দশের মঙ্গলের আশা যাহাতে, দিদির একনিষ্ঠতা,—স্বামী-সেবা হইতে সে আদর্শে হীন কিসে? এ প্রশ্নের উত্তর শরচ্চন্দ্রের কথায় মৃণালের উক্তিতে দেওয়া হইয়াছে—দ্বিরুক্তি অনাবশ্যক। প্রতিভার বিরাট মূর্ত্তি সূক্ষ্মদর্শী রবীন্দ্রনাথও ইহার উত্তর দিয়াছেন তাঁহার ঐ 'ঘরে-বাইরে'—বিমলা চরিত্রে। স্ত্রীস্বাতন্ত্র্যের বর্ত্তমানের যেটী আদর্শ তাহা ইউরোপের রমলায়, ভারতের বিমলায় প্রকাশ! একটু আলোচনা করিয়া দেখা যা'ক বিমলায় তাহার সার্থকতা কতটুকু। বিমলা নিখিলেশের 'মন্ত্র পড়া' বিবাহিতা স্ত্রী। আর আর দশজন হিন্দুর মেয়ে স্বামীকে যে ভাবে গ্রহণ করে বিমলাও নিখিলেশকে সমাজের সেই বাঁধা ভাবেই গ্রহণ করিয়াছিল, (এ বাঁধাবাঁধির ভালমন্দ বিচার এ আলোচনার বাহিরে,) নিজের একটা স্বাতন্ত্র্যতা সে তখন অনুভব করে নাই,—আদর্শ সতী অন্নদা দিদির প্রাণ সে পায় নাই—সাধারণের ন্যায় বিমলাও স্বামীর দেহমনকে অবলম্বন করিয়া স্বামীর ভালবাসা লাভে সুখী হইতে চাহিয়াছিল; বাঙ্গলার মেয়েরা জানে স্বামীকে ভালবাসিতে হয়, তাঁহাকে ভক্তি করিতে হয়, তাঁহার সহিত ভালবাসার বিবাদ করিতে হয়, মান অভিমানে তাঁহাকে আপন করিতে হয়, সাজসজ্জা সবই স্বামীর জন্য, স্বামী তার একমাত্র অবলম্বনীয়, স্বামীর জন্য তাহার সমস্তই! প্রথম জীবনে বিমলারও ছিল তাহাই। স্বামীর সুখে ছিল তার সুখ, তাঁর মতে ছিল তার মত—মেমের কাছে লেখাপড়া শিখাইতে তাঁর ইচ্ছা তাহাতেই রাজি, মেজজা একটু যেন হিংসা করিতেন, স্বামী বলিতেন এটাকে মনে তুলোনা, বিমলার মনে যাহাই থাক তাঁর সে ইচ্ছা সে মান্য করিয়াই চলিয়াছে, স্বামীর আহার কালে নিজে কাছে বসিয়া থাকিয়া সে সুখী হইত, তার লেখা চিঠিগুলি চন্দনকাঠের বাক্সে যত্নে তুলিয়া রাখিত, যেন কৃপণের ধন, তাঁর ফটোকে পুষ্প মাল্যে সাজাইয়া কতই না আনন্দ পাইত, স্বামী তাহা লইয়া কৌতুক করিতেন, বলিতেন, 'আমা অপেক্ষা তোমার কাছে আমার ছবি বড়'

তাহা বিমলাকে লজ্জিত করিত না আনন্দই দিত! তিনি যে রংয়ের সাড়ী ভালবাসেন তাহাই ছিল বিমলার প্রিয় পরিধেয়, যে খোঁপা ছিল নিখিলেশের প্রিয় তাহাই শোভা পাইত বিমলার মাথায়, এক কথায় বিমলা তখন নিখিলেশের।

নিখিলেশ কিন্তু বিমলাকে সে চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তিনি পুরুষ,—তাঁহার কল্পনা নানামুখী, সেই সঙ্গে প্রাণটা ছিল করুণায় পূর্ণ, প্রেমে ভরপুর—নারীর মতই প্রেম তাঁর প্রাণে; প্রেমের যেটা প্রকৃতি—প্রেমাস্পদের জন্য সর্ব্বত্যাগ, দিদির মতই প্রগার ভাবে ছিল নিখিলেশে,—প্রেমাস্পদের ভাল মন্দকে সহ্য করিবার ক্ষমতা—তাহার মঙ্গলের জন্য একাগ্র আকাঙ্ক্ষা। দিদি যেমন বিবাহের মন্ত্রের সহিত মান্য করিয়া লইয়াছিলেন স্বামী ধর্ম্ম,—নিখিলেশও বিবাহের মন্ত্রের সহিত স্ত্রী, বাড়ীর অন্যান্য বৌয়ের তুলনায় সৌন্দর্য্যে খাটো হইলেও, তাহাকেই গ্রহণ করিয়াছিলেন—ধর্ম্মপত্নীরূপে,—নিখিলেশ স্ত্রীতে একনিষ্ঠ! নিখিলেশের চক্ষে বিবাহ ব্যাপারটা ধর্ম্মের, প্রেমের, নিখিলেশ দাম্পত্য প্রেমের আদর্শ—সাধারণ হইতে অনেক উচ্চে—প্রেমবৃত্তি তাঁহার হৃদয়ে স্বাভাবিক,—স্বভাবের উপরে নিয়মের বাঁধ,—মৃণালের ন্যায় তিনিও সমাজের রাখ রাখ ঢাক ঢাক ভাবের ব্যবস্থা অনুমোদন করিতে চাহেন নাই স্বভাবেই,—তাঁহার প্রাণ প্রার্থনা করিত অবাধ প্রেম, সর্ব্বগ্রাসী ভালবাসা সত্তা যাহার হইবে সকল অবস্থায় অটুট—ঘরে বাইরে; সুখ দুঃখে, বাৎসল্যের মত, ভাতৃত্বের মত, দাম্পত্য সম্বন্ধও স্বাভাবিক হইবে, নিত্য, স্থায়ী! ঘরের বাঁধন,—বাঙ্গলায় প্রচলিত সংস্কার তাই তাঁহার হৃদয়ে বড় ব্যথা দিল—তিনি স্পষ্টই অনুভব করিলেন 'স্ত্রী পুরুষের পরস্পরের প্রতি সমান অধিকার,—সুতরাং তাদের সমান প্রেমের সম্বন্ধ।' তিনি বলিলেন "আমি চাই, বাইরের মধ্যে তুমি আমাকে পাও আমি তোমাকে পাই। ঐখানে আমাদের দেনা পাওনা বাকি আছে।",

সাধারণ বাঙ্গালী মেয়ের মতই বিমলা উত্তর দিল "কেন, ঘরের মধ্যে পাওয়ায় কমতি হ'ল কোথায়?" তাহার সাধারণ মন কি করিয়া বুঝিবে সর্ব্বগ্রাসী প্রেম কি! সর্ব্ববাধাহীন কুলনাশা প্রেম চায় কি? সেটা যে সংসারের, সমাজের সংস্কারের বাহিরে! তুমি আছ আর আমি আছি—আমি নাই তুমি আছ ভাব সংসারের সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়াও শ্মশানেও যাহাকে

প্রেমিক বা প্রেমিকা সুখী—সে চায় অন্তরে বাহিরে বিশ্বে প্রেমের পরীক্ষা! স্বামী বলিলেন 'এখানে আমাকে দিয়ে তোমার সমস্ত মুড়ে রাখা হয়েচে—তুমি যে কাকে চাও জান না, যাকে পেয়েচ তাও জান না।" সত্যই বিমলা তা' জানে না—জানিতে ইচ্ছাও করে না,—এ সব কথা তাহার একেবারেই ভাল লাগ্‌ত না,—বিমলা সাধারণ স্ত্রীলোক—সমালোচক তাঁহাতে যত স্বাতন্ত্র্যত কল্পনা করুন—বিমলা স্বাতন্ত্র্যহীনা,—নিখিলেশ ঠিকই বিমলার সম্বন্ধে বলিয়াছেন 'উৎকটের উপরে ওর অন্তরের ভালবাসা'—নীকন্তে অন্যের যেমন স্বর্ণ সুখের জন্য একটা তীব্র আকাঙ্ক্ষা,—বিমলারও তেমনি উৎকটের উপর একটা তীব্র টান—এক হিসাবে এ প্রবৃত্তিতে তাহারা অপর দশ জন হইতে স্বতন্ত্র,—কিন্তু নারীত্বের স্বাতন্ত্র্যের বিকাশ তাহাদের মধ্যে কমই! নিখিলেশের বিরাট আদর্শ-প্রেমকে কল্পনায় আঁটিয়া উঠিবার শক্তি বিমলার ছিল না! তাই বাধাবিঘ্নহীন যে পর্য্যন্ত—সেই পর্য্যন্ত স্বামীতে সে একনিষ্ঠ,—পরীক্ষার কালে তাহার নিষ্ঠা সন্দীপে, আশ্রয় তাহার সন্দীপ,—সন্দীপ-মেঘ নিখিলেশ-প্রেম-সূর্য্যকে তাই বিমলার হৃদয় আকাশে এতটা সময় আচ্ছাদিত করিয়া রাখিতে পারিয়াছিল—নিখিলেশ সূর্য্য না হইলে পরিণাম কি দাঁড়াইত কে জানে!

দিন ত বেশ কাটিতেছিল সহসা একটা ঝড় উঠিয়া 'উৎকট' বাতাস সমস্ত তালপাড় করিয়া ফেলিল। 'সেটা বাংলা দেশে স্বদেশীর যুগ'—সেদিন বিমলার দৃষ্টি এবং চিত্ত, আশা এবং ইচ্ছা উন্মত্ত নবযুগের আবীরে লাল হয়ে উঠেছিল। এতদিন সে যে জগৎটাকে একান্ত বলে জেনেছিল এবং জীবনের ধর্ম্মকর্ম্ম আকাঙ্ক্ষা ও সাধনা যে সীমাটুকুর মধ্যে বেশ গুছিয়ে সাজিয়ে সুন্দর করে' তোলবার কাজে প্রতিদিন লেগেছিল সে দিনও তার বেড়া ভাঙেনি বটে কিন্তু সেই বেড়ার উপরে দাঁড়িয়ে হঠাৎ যে একটি দূর-দিগন্তের ডাক শুনল স্পষ্ট তার মানে বুঝ্‌তে পারল না কিন্তু মন উতলা হয়ে গেল। সেদিন সন্দীপ জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিতে লাগলেন,—শ্রোতার হৃদয় দুলে দুলে ফুলে ফুলে উঠে কূল ছাপিয়ে ভেসে যাবার জো হ'ল তখন তাঁর সে এক আশ্চর্য্য মূর্ত্তি" বিমলা দেখ্‌ল। 'বক্তৃতার প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক কথায় যেন ঝড়ের দমকা হাওয়া। ইহার উপর আবার, বাছা বাছা কথায় সন্দীপের আহ্বান,—উদ্দাম উপদেশ নিংকে দেশভক্তির সহিত জড়াইয়া বিমলাকে ভিক্ষা',—সন্দীপ জানিত—'মেয়েরা আপনার ভিতর থেকে জানে এই দুর্গম ইচ্ছাই হচ্চে জগতের

প্রাণ''—সন্দীপ বিমলাকে বুঝাইল—সকল শক্তির মূলে রমণীর শক্তি দেশের কাজ সফল হইবে সেই শক্তির বলে। সন্দীপ বিমলাকে চিঠিতে লিখিল—'বিশেষ প্রয়োজন। দেশের কাজ।' 'রইল বিমলার শেলাই পড়ে। তাড়াতাড়ি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে সে চুল ঠিক করে নিল,—জ্যাকেট বদল করল; সে জানে সন্দীপের চোখে সেই জ্যাকেটটির সঙ্গে তাহার একটি বিশেষ পরিচয় জড়িত আছে। একবার মুহূর্ত্ত কালের জন্যে সে ভেবেছিল ফিরে চলে যাই—এমন সময়ে একটা দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে মুখ তুলে সন্দীপ বিমলাকে দেখে যেন চমকে উঠ্‌লেন। বল্লেন এই যে আপনি এসেছেন! কথাটার মধ্যে, কথার সুরে, তাঁর দুই চোখে চাপা ভর্ৎসনা। দুদিন বিমলা দেখা দেয় নাই---'সন্দীপের এই অভিমান যে বিমলার অপমান সে বিমলা জানে কিন্তু রাগ করবার শক্তি নাই।' বিমলার হাত পা কাঁপছিল। সে শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে সন্দীপকে বল্লে "আপনি দেশের কি কাজ আছে বলে' আমাকে ডেকেচেন, তাই আমি ঘরের কাজ ফেলে এসেচি।"

সন্দীপ একটু হেসে বল্লেন "আমি ত সেই কথাই আপনাকে বল্‌ছিলুম। আমি যে পুজার জন্যেই এসেচি, তা জানেন? আপনার মধ্যে আমি আমার শক্তিকেই প্রত্যক্ষ দেখ্‌তে পাই সে কথা কি আপনাকে বলিনি! আপনি সেদিন সেই যে একখানি সাড়ি পরেছিলেন লাল মাটির মত তার রং আর তার চওড়া পাড় একটি রক্তের ধারার মত রাঙা, সেই সাড়ির আঁচল সে কি আমি কোনো দিন ভুল্‌তে পারবো? এই সব জিনিষই ত জীবনকে সতেজ, মৃত্যুকে রমণীয় করে' তোলে (!) বল্‌তে বল্‌তে সন্দীপের দুই চোখ জলে' উঠ্‌ল। চোখে সে ক্ষুধার আগুন কি পূজার সে, বিমলা বুঝ্‌তে পারল না।' এমনি করে' সন্দীপ কথায় দেশের স্তবের সঙ্গে যখন বিমলার স্তব মিশিয়ে দিল তখন সঙ্কোচের বাঁধন আর টেঁকে কি! তখন বিমলার রক্তের মধ্যে নাচন ধরেচে।' সেই নাচনে বিমলার সব ভাসিয়া গেল, স্বামী পড়িলেন অন্তরালে,—সন্দীপের 'দীপক রাগিণীর' তালে তালে নাচিতে গিয়া বিমলার ব্যক্তিত্ব আর রহিল কোথা!' 'মেয়ে মানুষ যে পদ্মবনের পঙ্কজ তার তলাকার পঙ্ক ঘুলিয়ে উঠ্‌ল,'—সেই ঘোলা জলে ডুবিয়া বিমলা হারাইয়া ফেলিল—ঘরের আদর্শ, বাঙ্গলার আদর্শ, মনের লক্ষ্যহীন দৌড়াদৌড়িকেই মনে হইল তার জীবনের কাজ—সে প্রকৃত স্বদেশী ভাবে স্বদেশকে না চিনিয়া—'সন্দীপের স্বদেশী সংহার,—গরীবের

একমাত্র বিলাতী জীর্ণচীর ভস্মসাৎ করাকেই ধরিয়া লইল মাতৃপূজা! স্বামীতে 'একনিষ্ঠতা এক ব্রত।' তাহার আর রহিল কোথায়? বাকসর্ব্বস্ব, অর্থলোলুপ, বিলাসী সন্দীপের দোষই বিমলার চক্ষে তখন অশেষ গুণ,—সন্দীপের অর্থের দাবী—দেশের নামে ডাকাতির প্রবৃত্তির পরিতৃপ্তির জন্য বিমলা বৃদ্ধ খাজাঞ্চীকে খুন করিয়া অর্থ সংগ্রহেও ঈঙ্গিত করিতে দ্বিধা করিল না—এমনি মোহপাশ! সন্দীপ, বিমলার সে ভাবকে আখ্যা দিয়াছিল 'এই ত হিপ্নটিজম!'

'যে স্বামীর কোন ধর্ম্ম নাই'—তার স্ত্রীর উশৃঙ্খলতা বনাম স্বাতন্ত্র্যের বিধি নির্দ্দেশ পরের কথা, বিমলার অমন স্বামী! সর্ব্বগুণান্বিত--তার একি কাণ্ড, কত বড় মোহ, খাঁটি ত্যজিয়া নকলের জন্য কি বিকট আগ্রহ। স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য, স্বাধীনতা দান করিতে যে স্বামীর প্রাণের আগ্রহ স্বদেশীয় প্রকৃত ভাব যে স্বামীতে, তাঁহাকে বুঝিতে চেষ্টা না করিয়াই সে হুজুকের নেশায় 'স্বভাব-মাতাল' সন্দীপের উদ্দাম উশৃঙ্খলতাকে মান্য করিয়া লইল জীবনের ব্রত বলিয়া; তাহার সমস্ত বিসর্জ্জন দিয়া মত্ত হইল স্বদেশীয় নামে তাণ্ডব নৃত্যে, পরপুরুষের অঙ্গুলী হেলনে উঠিতে বসিতে! স্বামী হইতে এ স্বাতন্ত্র্যের পরিণাম কি? কতদূর অন্ধ হইতে পারে যে স্ত্রী, স্বামীর প্রতি, গৃহের প্রতি, পরিজনের প্রতি, তাহার অপরিচিত বাহিরের ব্যাপারেও, শিক্ষিতা বিমলা তাহার উদাহরণ। নিজে ত ফিরিয়া দেখেই নাই, যখন মেজ জা তাহার চক্ষে অঙ্গুলী দিয়া দেখাইয়া দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, "না ছোট রাক্ষুসী, একবার কি তাকিয়ে দেখ্‌তেও নেই, ওর (নিখিলেশের) মুখের ছিরি কি রকম হয়ে গেচে।" বিমলার তা কানে পৌছায় নাই। সন্দীপের দ্বারা এতদূর হিপ্নটাইস্ড হইয়াছিল সে! স্ত্রী স্বাতন্ত্র্যের নামে সন্দীপের মক্ষিরাণী কিরূপ মোহে আত্মহারা হইয়াছিল, সে ভাবটা এত স্পষ্ট যে 'ঘরে বাইরে'র প্রত্যেকটি চরিত্রের উক্তি হইতে গ্রন্থকারের নিজের কথা উদ্ধৃত করিয়া প্রমাণ করা মোটেই কষ্টসাধ্য নয়। অন্নদা দিদি যে আদর্শ অবলম্বনে "ধর্ম্মহীন" স্বামীকে অবলম্বন করিয়া স্বধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন, বিমলার সেটার অনুভূতি যদি থাকিত তাহা হইলে স্বামী নিখিলেশকে অবলম্বন করিয়া স্বার্থক হইত তাহার স্বদেশীব্রত; গৃহেও অক্ষুণ্ণ থাকিত শান্তি; স্বামীর পাশে তাঁহার সহকর্ম্মিনী হইয়া যদি সে বাহিরে আসিয়াও দাঁড়াইত তাহা হইত কিরূপ শোভন, কাজ হইত কত বেশী! না হইবে কেন, সেইটাই যে স্ত্রীর স্বাতন্ত্র্য, নারীর প্রাণপঙ্ক

ধর্ম্ম, জীবনে সফল হইবার পন্থা! স্বামীর ছন্দানুবর্ত্তিনী না হইয়াও যদি সে স্বামীকে বুঝিয়া, তঁহাকে বুঝাইয়া তাহার সহিত দ্বন্দ্বকলহ, মান অভিমান করিয়া সে নিজের মত ও বিশ্বাসকে প্রাণ দিতে চাহিত, যদি তাহাতে জয়ী হইত বা পরাজিত হইত, তাহাতেও ছিল তাহার কত গৌরব! স্ত্রী-স্বাতন্ত্র্য বলিতে আমাদের মনে জাগে এই ভাবটি, সেইটিই ভারতের, সেইটিই আমরা আদর্শ হিসাবে মনে প্রাণে প্রার্থনা করি।

সমালোচক বিমলার জয় দেখিয়াছেন যেট আমাদের মনে হয়, সেটাই তার পরাজয়—উশৃঙ্খলতায় উদ্দাম-নৃত্য-ক্লান্তিতে, ছুটিয়া ছুটিয়া লক্ষ্যে পৌঁছাইতে না পারিয়া হতাশপ্রাণে অনুতপ্ত হৃদয়ে সে যখন শান্তিময় গৃহের পানে ফিরিয়া তাকাইতে বাধ্য হইয়াছিল—বিমলা মক্ষিরাণী ফিরিয়াছিল না তখন! সন্দীপের রাজাছাড়া দাবী—স্বদেশ সেবার নামে জুলুম ক্রমে মক্ষিরাণীর মানস চক্ষে ফুটাইয়া তুলিয়াছিল,—সন্দীপের আসল মূর্ত্তি। সন্দীপকে বিমলা এতদূর 'নাই' দিয়া বসিয়াছিল যে সে সন্দীপের উপযুক্ত প্রাপ্য তিরস্কার তাহাও তাহাকে দিতে পারিল না—সেখানেও তার পরাজয়। স্তাবক সন্দীপ যে দিন মক্ষিরাণীর নিকট "আশাহত হয়ে একেবারে গর্জ্জে উঠল—তুমি! তুমি আমাকে অপমান করবে! তোমার কি না আমার কাছে ধরা পড়েচে বলত তোমার যে—"

তখনকার বিমলার উক্তি—"ওর মুখ দিয়ে আর কথা বেড়ল না। সন্দীপ যে মন্ত্র ব্যবসায়ী, মন্ত্র যে-মুহূর্ত্তে খাটে না সে মুহূর্ত্তেই ওর আর জোর নেই—রাজা থেকে একেবারে রাখাল হয়ে যায়! দুর্ব্বল! দুর্ব্বল! ও যতই রূঢ় কর্কশ কথা বলতে লাগল ততই আনন্দে আমার বুক ভরে উঠল। (একি নাগপাশ হ'তে মুক্তির আনন্দ নয়?) আমাকে বাঁধবার নাগপাশ ওর ফুরিয়ে গেছে আমি মুক্তি পেয়েচি। বাঁচা গেচে, বাঁচা গেচে। অপমান কর আমাকে অপমান কর, এইটেই তোমার সত্য, আমাকে স্তব করো না, সেই-টেই মিথ্যা!"

সমালোচক এই মুক্তিকেই কি নারীত্বের সাফল্য বলিতে চান? সেই ভবি ভুললি এত কেন জ্বালালি' এটা এক্ষেত্রে অরসিকের টিপ্পনী!

প্রেম যাহার সহায়, স্বামী যার স্বামীত্বের গৌরবে নিয়ত প্রভান্বিত—মাঘের কুজ্ঝটিকা তাহার হৃদয় পটে আর কতক্ষণ? মিষ্ট আস্বাদনে জিহ্বা আড়ষ্ট হইয়া অম্লের আকাঙ্ক্ষা,—সে

আকাঙ্ক্ষার মূল্য কি ? মিষ্টে প্রীতিরুক্তি, বিমলা যাঁর তাঁরই ! শ্রীকান্ত সত্যই বলিয়াছে, বিমলা ত শুদ্ধা বুদ্ধিমতী, "যে পতিতা সেও ইচ্ছা করিলেই অনায়াসে যখন তখন বসিতে পারে সতীর গৌরবময় আসনে,—বিমলার প্রাণ তখন প্রার্থনা করিল সেই স্বামীপদ।" বিমলা তাহাই করিল। 'ইচ্ছা ছিল আজ রাতে আমার স্বামীর পায়ের ধুলো নেব। শোবার ঘরে গিয়ে দেখি তিনি অকাতরে ঘুমচ্ছেন। আজ সমস্ত দিন তাঁর অনেক ঘুরোঘুরি অনেক ভাবনা গিয়েচে। (দু'দিন আগে বিমলার এ চিন্তা ছিল না) খুব সাবধানে মশারি একটুখানি খুলে তাঁর পায়ের কাছে আস্তে আস্তে মাথা রাখলুম। চুলের স্পর্শ লাগতেই ঘুমের ঘোরে তিনি তাঁর পা দিয়ে আমার মাথাটা একটু ঠেলে দিলেন।'

"পশ্চিমের বারান্দায় গিয়ে বসলুম ! হৃদয়ের দিকে তাকালে দেখতে পাই যা ছিল তা সবই আছে কেবল নড়ে' চড়ে গিয়েচে। যা সাজানো ছিল আজ তা এলোমেলো—যা কণ্ঠের হারে গাঁথা ছিল তা আজ ধুলোয় ! সেই জন্যই বুক ফেটে যাচ্ছে।'

"মাটির উপর উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদতে লাগলুম—একটা কোনো-দয়া কোথাও থেকে চাই, একটা কোনো-আশ্রয় একটু ক্ষমার আভাস, একটা এমন আশ্বাস যে, সব চুকে যেতেও পারে। মনে মনে বল্লুম, আমি দিন রাত ধর্না দিয়ে পড়ে' থাকব প্রভু—আমি খাব না, আমি জল স্পর্শ করব না, যতক্ষণ না তোমার আশীর্বাদ এসে পৌঁছয় "

স্বামীর জন্য নারীর এ কাতরতা কিরূপ হৃদয়স্পর্শী —এ পরাজয় হলেও স্বামীর নিকট পরাজয় ইহাতেও নারী কতদূর গৌরবান্বিতা !

'এমন সময় পায়ের শব্দ শুনলুম। আমার বুকের ভিতরটা দুলে উঠল। কে বলে দেবতা দেখা দেন না ! আমি মুখ তুলে চাইলুম না, পাছে আমার দৃষ্টি তিনি সইতে না পারেন ! এস, এস এস,—তোমার পা আমার মাথায় এসে ঠেকুক্, আমার এই বুকের কাঁপনের উপরে এসে দাঁড়াও, প্রভু, আমি এই মুহূর্ত্তেই মরি !'

কোথায় ছাই স্বাতন্ত্র্য ; এযে মিলিয়া মিশিয়া পায়ে পড়িয়া স্বামীকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিয়া গলিয়া মিশিয়া যাইবার ভাব—নারীর নারীত্ব !

"আমার শিয়রের কাছে এসে বস্‌লেন। কে? আমার স্বামী! তা'র পরে আমার শিরার বাঁধন যেন ছিঁড়ে ফেলে আমার বুকের বেদনা কান্নার জোয়ারে ভেসে পড়ল! বুকের মধ্যে তাঁর পা চেপে ধর্‌লুম—ঐ পায়ের চিহ্ন চিরজীবনের মত ঐখানে আঁকা হয়ে যায় নাকি?"

"তিনি আস্তে আস্তে আমার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগ্‌লেন। আশীর্ব্বাদ পেয়েচি।"

আর না—এ চিত্রের পরেও আর বলা চলে না ইউরোপের রমলা ও বাঙ্গলার বিমলা এক—বরং বলি অন্নদা দিদির ক্ষুদ্র সংস্করণ বিমলা তুমি,—আগুনে পুড়িয়া তুমি আজ কাঁচা সোণা, যে আশীর্ব্বাদ আজ লাভ করিয়াছ তাহাতে বোন দিদি হইতে আর কতক্ষণ! তুমিই বা আজ ছোট কিসে! তোমাদের পদধূলি লইবারও অনুপযুক্ত আমরা,—দেবী মহিমা কীর্ত্তনে পুণ্য থাকে যদি—বারান্তরে বুঝিতে চেষ্টা করিব—অন্নদা দিদি, রাজলক্ষ্মী, অভয়া ইত্যাদিতে পার্থক্য কোথা—অন্নদা দিদি কেন নারীশিরোমণি!

শ্রীজানকীবল্লভ বিশ্বাস।

দুঃখ-সাধনা।

-ঃ*ঃ-

তুমি কত ব্যথা আর সওয়াবে গো মোর
এ প্রাণে
পাতা ঘর মোর ভেঙ্গে দেবে কত
তুফানে?

আর কতদিন সুখের খেয়ালে হাস'বে
আর কতদিন অশ্রু সাগরে ভাসাবে
আরো কতদিন দুঃখের ভয়ে শাসাবে
আমায় কে জানে ?
কত ব্যথা আর সওয়াবে গো মোর
এ প্রাণে ?
সময় কি আজো হয় নি নীরব
রহিতে ?
দুঃখ সুখের তরঙ্গাঘাত
সহিতে ?
ভক্তি কি আজো শেখেনি কঠোর সাধনা
হৃদয় কি আজো বহিতে শেখেনি বেদনা ?
তবে　ফাটাও ফাটাও ফাটাও এ বুক চেতনা
কঠিন-পাষাণে।
কত ব্যথা আর সওয়াবে গো মোর
এ প্রাণে ?

চিররহস্য সন্ধানে।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্ব-পরিচ্ছেদে বর্ণিত ঘটনার পর দিবস। সমস্ত দিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি হইতেছে,—বাতাস কনকনে,—মধ্যে মধ্যে প্রবল ঝড় বহিতেছে। এল র‍্যামি আজ আর কোথাও বাহির হন নাই,—বাড়ী বসিয়া লিখিতেছেন, পড়িতেছেন, এবং প্রাপ্ত পত্র সমূহের মধ্যে প্রয়োজনীয় কয়েকখানির উত্তর প্রদান করিতেছেন। এই সকল পত্র-লেখকের অধিকাংশই তাঁহার সম্পূর্ণ অপরিচিত, তথাপি তাহারা এল র‍্যামির কোনো একখানি গ্রন্থ পাঠে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া, গ্রন্থকর্ত্তাকে ঐ সকল পত্র লিখিয়াছে। সাহিত্যের হাটে গ্রন্থখানি বিশিষ্ট মৌলিকতা লইয়া আবির্ভূত,—সমালোচকেরা ইহার বিরুদ্ধে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছেন, কারণ এ-যাবৎ যাহা লিখিত হইয়াছে বা সমালোচক-মহোদয়দিগের বুদ্ধির সহিত পরিচিত হইয়া উঠিয়াছে, এ-গ্রন্থে সেরূপ কোনো কথা দেখা যায় নাই। বর্ত্তমান গ্রন্থের পৃষ্ঠাগুলির ভিতর দিয়া এই তথ্যটী বিশেষভাবে প্রমাণ করা হইয়াছে যে, তুচ্ছ ও সঙ্কীর্ণ-জীবন হইলেও, মানুষ অতিমানুষিক শক্তি-সম্পন্ন এবং ঈশ্বরেরই ন্যায় সদ্‌গুণালঙ্কৃত; সাধারণ আধ্যাত্মবাদ-দলের পক্ষে এ-কথা অবশ্যই বিশেষ সান্ত্বনা-প্রদ ও সুখস্বপ্নময়, অগত্যা তাহারা এল র‍্যামিকে খুবই একজন আশ্চর্য্য মানুষ মনে করিয়াছে, এবং আপনাদিগকে ততোধিক আশ্চর্য্য ভাবিতেও ছাড়ে নাই। প্রকৃত মহৎ-চিত্তই কেবল মহত্ত্বকে বিনম্র হৃদয়ে বরণ করিতে সক্ষম, অথচ এই মহৎ-চিত্তের মহা দুর্ভিক্ষ প্রায় সর্ব্বত্রই। এল র‍্যামির ঐ পত্র-লেখকবর্গের মধ্যে অধিকাংশই সেই নিম্ন জাতীয় বুদ্ধিজীবী, যাহারা নির্ব্বিচারে প্রত্যেক নবাবিষ্কৃত সত্যকে এমন ভাবে গ্রহণ করে যেন সেগুলি বিশেষ ভাবে তাহাদেরই জন্য উদ্দিষ্ট, সমস্ত জগতের জন্য নয়;—যেন তাহারাই জগত ব্যাপারের মধ্যে একমাত্র বিশিষ্ট ও উচ্চ জাতীয় জীব, সুতরাং প্রকৃত জ্ঞানের অদ্বিতীয় বোদ্ধা। "সকলের নিকট না হইলেও," একজন লিখিয়াছেন, "আপনার গ্রন্থ আমার নিকট আদরণীয় মনে হইয়াছে, কেন না 'নির্ব্বোধ জনসাধারণের' ন্যায় আমি বস্তুর আধ্যাত্ম-অংশ-অনুধাবনে

অক্ষম নই!" কথাটা এম্‌নি মুরুব্বিয়ানা-ধরণের যাহাতে বুঝায়—ঐ 'নির্ব্বোধ জনসাধারণ' যেন তাঁহারই মত 'আধ্যাত্ম-লোকের' অন্তর্ভূত নয়!

"আপনার গ্রন্থ পাঠে খুসী হইয়াছি"—আর একজন জানাইয়াছেন—"কারণ আমি একজন কবি, এবং এই নিম্ন লক্ষ্য ও নিম্নতর-বাসনাময় জগতখানাকে আন্তরিক ঘৃণা করিয়া থাকি!"

আপনাকে কবি কল্পনা করিয়া, একই নিশ্বাসে 'জগতকে ঘৃণা করি' বলিয়া প্রচার করা,—যে-জগত তাহাকে জননীর স্নেহে পালন করিয়া আসিতেছে এবং সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি যোগাইতেছে,—যে কতখানি বেয়াদপী, তাহা এই সকল আত্মসর্ব্বস্ব অহঙ্কারীরা একবার ভাবিতেও চায় না;—হতভাগা! এই জাতীয় চিঠিগুলির উপর চোখ বুলাইতে বুলাইতে এল র‍্যামির মুখভাব বিরক্তিপূর্ণ হইয়া উঠিতে লাগিল; তিনি সেগুলোকে এক পাশে ঠেলিয়া রাখিলেন,—কখনও যে উত্তর দিবেন এমন সম্ভাবনা আর রহিল না। জনসাধারণের মধ্যে অধিকাংশ লোকেরই এইরূপ পরিপূর্ণ অজ্ঞতা সম্বন্ধে যতই তিনি চিন্তা করিতে লাগিলেন ততই উত্তরোত্তর হতাশ হইতে লাগিলেন।

জননী প্রকৃতদেবীর শিক্ষা সমূহ এতই সহজ ও সরল যে, সে সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া কিরূপে যে আমরা সমস্যা-জটিল বক্র পথে চলিবার জন্য ব্যস্ত হই, তাহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্য। দৃষ্টান্ত স্বরূপ ধরা যাক্, প্রকৃতি আমাদিগকে বলেন—"বৎসগণ সত্য অতি সরল,—সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়া আমি তাহার প্রকাশে সহায়তা করিতে বাধ্য। মিথ্যা কুটীল ও আয়াস-সাধ্য—আমি তাহার গতি নিয়ন্ত্রিত করিতে অক্ষম—মিথ্যাই মিথ্যার পরিচালক,—ইহার পথ জটিলতা ও ধাঁধায় পূর্ণ; হে আমার অবোধ সন্তানগণ! কি জন্য তবে তোমরা সত্যকে পাশ কাটাইয়া ঐ মিথ্যা-বরণেই বদ্ধ পরিকর? যে ভাবেই তোমরা কার্য্য কর না কেন, সত্যের প্রকাশ অবশ্যম্ভাবী—কোনো বিরুদ্ধ স্রোতেই ইহার বজ্র কণ্ঠ রুদ্ধ করিতে পারিবে না।" ইহাই প্রকৃতির বাণী;—কিন্তু তাহাতে আমরা কান দেই না,—আমরা চাই ভ্রান্তির তন্দ্রায় নিমগ্ন হইয়া চিরন্তন ন্যায়-বিচারকে ফাঁকি দিতে। সে বিচার কিন্তু কখনও প্রতারিত হয় না,—এমন কি অস্পষ্টও হয় না,—ভাসমান মেঘের আড়ালে চন্দ্রিকাধারার মত ক্ষণিক আবৃত হয় মাত্র।

"সর্ব্বপ্রকার ক্ষতিকে পাশ কাটাইয়া চলা কতই না সহজ," পত্রোত্তর-প্রদান-কার্য্য সমাধা করিয়া দু'তিনখানা ভারী ভারী গ্রন্থ কোলের কাছে আকর্ষণ করতঃ এল র‍্যামি আপন মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন—"সুস্থ শরীরে, স্বচ্ছন্দ চিত্তে, শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণার হাত এড়াইয়া, নীরোগ জীবন যাপন করিতে পারা কতই না অনায়াস-সাধ্য,—কেবল যদি আমরা একটীমাত্র নিয়ম অভ্যাস করিতে থাকি ; সে নিয়মটী আত্মত্যাগ। ঐ একমাত্র নিয়মের মধ্যেই সমস্ত নিহিত,—লিলিথ যে বারংবার জানায়, আমরা নিজে সৃষ্টি না করা পর্য্যন্ত পাপ বা অন্যায় অস্তিত্ব-শূন্য, এ কথা সত্য হওয়াই সম্ভব। অন্ততঃ পৃথিবীর অর্দ্ধেক দুঃখ ইচ্ছা করিলেই আমরা এড়াইয়া চলিতে পারি। ঋণের কথা ধর,—এই যে মহাবিরক্তি-কর দুঃখ, ইহার কারণ আমাদের অমিতব্যায়িতা ব্যতীত অন্য কিছুই নয়,—তবে কি জন্য এই ক্ষমতার অতিরিক্ত ব্যয় করা ? কেন ? লোক-দেখানো ? নীচ আড়ম্বর ? বিলাস ? আলস্য ? এই সমস্ত ব্যাপারের বিরুদ্ধেই ভগবানের চিরন্তন নিষেধ জাগ্রত রহিয়াছে। তারপর শারীরিক যন্ত্রণা বা পীড়ার কথা ধর,—এখানেও আত্মদোষই দেখা যায়,—আহারে অসংযম, কামলিপ্সা, দুর্ব্বল বা পীড়াদুষ্ট নরনারীর পরস্পর পরিণয়,—এই সমস্তই অসংখ্য দুঃখের উৎস-কেন্দ্র ; কারণগুলি পরিত্যাগ কর, দুঃখ হইতেও পরিত্রাণ পাইবে। প্রকৃতির শৃঙ্খলা সমূহ এত পরিস্কার ও সহজ হওয়া সত্ত্বেও প্রত্যহই আমরা প্রকৃত পথ ছাড়িয়া নূতন নূতন দুঃখ সৃজন করিতে ছুটিয়াছি !"...

অন্যমনস্কভাবে তিনি গ্রন্থের পাতা উল্টাইতে লাগিলেন,—পাঠে তাঁহার মন বসিতেছিল না, চিত্ত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িতেছিল। সহসা ফেরাজের কথা তাঁহার মনে পড়িল,—সমস্ত দিনের মধ্যে তাহার সহিত একেবারেই আজ বাক্যালাপ হয় নাই। সেবার দিক হইতে তাঁহাকে কোনোরূপ অভাব-বোধ করিতে হয় নাই, কারণ প্রত্যেক তুচ্ছতম কার্য্যটীতেও ফেরাজ তাহার ভ্রাতার ইচ্ছা-পালনে ক্ষিপ্রতা ও অনুরাগই দেখাইয়া আসিতেছে ; তথাপি, অধুনা এমন একটা বাধ্যবাধকতার ভাব এতদুভয়ের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে যাহা পূর্ব্বে ছিল না। ফেরাজের ব্যবহারে আজকাল একটী বিষণ্ণ অথচ সতেজ ভঙ্গী প্রকাশ পায়,—এম্নি একটা ভাব, যেন সে কোনো শৃঙ্খলিত গর্ব্বী রাজপুত্র, কারারুদ্ধ, অবস্থায় কেবলমাত্র শৃঙ্খলা ও কর্ত্তব্যের দিক দিয়াই নির্দ্দিষ্ট কার্য্যগুলি যথাযথরূপে করিয়া চলিয়াছে। এক্ষণে বিস্ময়ের

কথা এই যে, এল র‍্যামি আপনাকে কোমল বৃত্তি সমূহের বিরুদ্ধে পাষাণ কঠোর মনে করিলেও, ফেরাজের মধ্যে সেই আগেকার মত একাগ্র বিশ্বাস বা স্নেহময় ব্যবহারের অভাবকে আজ অভাব বলিয়াই অনুভব করিতে লাগিলেন।

"সমস্তই পরিবর্তিত হয়" বিষণ্ণচিত্তে এল র‍্যামি ভাবিতে লাগিলেন—"অবশ্য পরিবর্তনই নিয়ম; বিশেষতঃ যে বালক আজও মানুষ হইয়া উঠে নাই অথচ যৌবন-সীমায় পদার্পণ করিতেছে মাত্র, তাহার মনোভাবের মত চঞ্চল আর কিছুই নয়। ফেরাজ-সম্বন্ধে আমার ক্ষমতা শেষ সীমায় আসিয়া পৌঁছিয়াছে,—আমি জানি, তাহার সম্বন্ধে কতটুকু করিতে পারি বা কতটুকু পারি না—এ যেন অনেকটা সেই "এই পর্য্যন্ত তোমার গতি, আর নয়" ধরণের। বেশ, সে তাহার গন্তব্য-পথ নিজেই বাছিয়া বাহির করুক,—কেবল, আমার পথে যেন সে দাঁড়াইবার কল্পনা না করে, অথবা আমার কার্য্যে যেন বাধা দিতে না আসে! তুমি জান অন্তর্যামী, এমন কোনো কার্য্য নাই যাহা আমি করিতে চাহিব না, যদি—"

এল র‍্যামি থামিয়া গেলেন, কুণ্ঠিত হইয়া পড়িলেন; আবেগের আতিশয্যে তাহার মুখমণ্ডল রক্তবেগ-তরঙ্গিত হইয়া উঠিল, হস্তদ্বয় স্বভাবতঃই মুষ্টিবদ্ধ হইয়া আসিল; যে চিন্তা মনোমধ্যে উদিত হইতেছিল তৎসম্বন্ধে সচেতন হইয়া উঠিবা মাত্র, সর্ব্বাঙ্গে একটা চকিত ভীতি শিহরণ অনুভব করিলেন। তিনি জানিতেন যে, তাঁহার প্রকৃতির মধ্যে অবাধ্য পাশবিকতা এত অধিক পরিমাণে লুক্কায়িত আছে, যদ্দ্বারা তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতার জীবন পর্য্যন্ত নষ্ট করিয়া দিতে পারা যায়—যদি সে তাঁহার পথে আসিয়া দাঁড়ায় অথবা তাঁহার কার্য্যে ব্যাঘাত জন্মাইতে আসে! একথা স্মরণ হইবা মাত্র তাঁহার ললাট স্বেদ-সিক্ত হইয়া আসিল—তিনি শিহরিয়া উঠিলেন।

"পাপের অস্তিত্বে অবিশ্বাসী লিলিথের আত্মা!" আপন মনে তিনি বলিলেন—"পাপ যদি না থাকে, তবে এ পাপ-চিন্তা আমার মধ্যে কোথা হইতে আসিল? এ কি আমার নিজেরই রচনা, না আমার অস্তিত্বের সহিত বিজড়িত অবস্থায় এই রক্ত-উত্তেজক তিক্ত-কীট দুঃসময়ের সুযোগের দিকে ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল? মোটের উপর, প্রাচীন বিশ্বাসে যে দেবতাদের দানব-ভীতির সন্ধান পাওয়া যায় তাহার ভিতর কিছু-না-কিছু ছিলই,—কারণ পৃথিবীতে দানব আছেই, আর সে দানবের নাম মানুষ!"

চেয়ার হইতে উঠিয়া তিনি অধীরভাবে কক্ষমধ্যে পদচারন করিতে লাগিলেন,—কি দীর্ঘ আজিকার দিনটা, বর্ষণেরও যেন আজ বিরাম নাই, বাতায়ন কবাটে ক্রমাগতই জলের ঝাপটা লাগিতেছে! সম্মুখের রাজপথ পানে উঁকি মারিলেন,—জনপ্রাণীও নাই,—চতুর্দ্দিকই মলিন, স্থির, পঙ্কিল, নিরানন্দময়। পুনরায় টেবিলের পার্শ্বে আসিয়া তিনি সেই প্রকাণ্ড আরবী-কেতাবখানা খুলিয়া বসিলেন; এই কেতাবখানাই একদিন ফেরাজের হাতে পড়িয়াছিল এবং ইহারই ভিতর হইতে কতকগুলো বিক্ষিপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া আপনাকে সে অসুখী করিয়া তুলিয়াছিল।

"ঈজিপ্ট পুরোহিতদিগের এই সমস্ত পরীক্ষা খুবই সাদাসিদা ধরণের"—পাঠনিরত অবস্থায় তিনি ভাবিতে লাগিলেন—"ইহারা বিজ্ঞান শাস্ত্রের একটীমাত্র গুণাশ্রিত,—সে গুণটী বায়ুমণ্ডলে নিত্যরূপান্তরিত অগণ্য অণু পরমাণুর সংযোজন-কৌশল। এ কৌশল এতই সহজ ও স্বাভাবিক যে, আমার মনে হয়, পুরাকালে হয়তো বায়ুমণ্ডল স্বভাবতঃই এমন অবস্থাপন্ন ছিল যাহাতে ঐ অণুসমূহ আপনা হইতেই আকার প্রাপ্ত হইতে পারিত,—বন-দেবতা, জলদেবী, পরী, অপ্সরী প্রভৃতির যে-সকল সংস্কার আমাদের মধ্যে আজ প্রচলিত, তাহার কারণ ভুল সম্ভবতঃ ঐখানেই; এই সকল ক্ষণস্থায়ী আকৃতি ভাসমান মুহূর্ত্তে মুগ্ধ-মানব-দৃষ্টির সম্মুখে ফুটিয়া উঠিয়া পরক্ষণেই মিলাইয়া যাইত বলিয়াই নানা প্রকার অলৌকিক উপকথার সৃষ্টি হইয়াছে। কুম্ভকার যেমন মৃত্তিকাকে নানারূপ আকার দান করে, সেইরূপ অণু-পরমাণুকে আকার প্রদান করা, রসায়ন-শাস্ত্রের একাংশমাত্র,—তুচ্ছ পরীক্ষা সন্দেহ নাই, তথাপি অজ্ঞ জনসংঘের নিকট ইহা কতই-না বিস্ময়কর মনে হয়!"

টেবিলের টানা খুলিয়া, তন্মধ্য হইতে এল র‍্যামি লাল পাউডারে পরিপূর্ণ একটী বাক্স, এবং ছোট ছোট দুটী বোতল বাহির করিলেন,—ইহাদের একটীতে মরকত-সদৃশ একপ্রকার উজ্জল-সবুজ অসংখ্য বটিকা এবং অপরটীতে পিঙ্গলাভ তরল-পদার্থ রক্ষিত। উপাদানগুলির দিকে চাহিয়া তিনি একটু হাস্য করিলেন,—পরে বাতায়ন-পথে একবার সেই ঘনঘটাচ্ছন্ন বর্ষণ-মুখর অপরাহ্নের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

"সময় কাটানো যাক্—মন্দ কি?" অর্দ্ধ স্বগত স্বরে তিনি বলিলেন—"মাঝে মাঝে একটু আধটু চিত্ত বিক্ষেপও আবশ্যক হয়, এমন কি বৈজ্ঞানিকেরও।"

অতঃপর, একখানি পিত্তল-পাত্রে কিয়ৎ পরিমাণ লাল পাউডার রাখিয়া তিনি তাহাতে অগ্নি-সংযোগ করিলেন। অনতিকাল মধ্যেই উগ্র-গন্ধী গাঢ় ধুমে সমস্ত কক্ষ এরূপ আচ্ছন্ন হইয়া গেল যে তাঁহার নিজের দেহখানা পর্য্যন্ত দেখিতে পাওয়া দুষ্কর হইয়া উঠিল। এই ধুম-শিখা-মধ্যে তিনি পাঁচ ছয়টী পূর্ব্বোক্ত বটিকা নিক্ষেপ করিলেন এবং দেখিতে দেখিতেই তাহারা ধুমরাশির সহিত মিলাইয়া মিশাইয়া গেল; পরিশেষে, ঐ তরল পদার্থের কয়েকবিন্দু তন্মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইল। ফল যাহা হইল তাহা অত্যাশ্চর্য্য,—এমন কি, যে-কোনো দর্শকের নিকট অবিশ্বাস্য হইলেও দোষ দেওয়া যায় না; কারণ ঐ ধুমপুঞ্জ ভেদ করিয়া পাটলাভ একটী আকৃতি ধীরে ধীরে ফুটিয়া উঠিতে লাগিল,—আকৃতি, যাহার চতুর্দ্দিকে ইন্দ্রধনুর বিবিধ বর্ণে বিরঞ্জিত আলোক-রশ্মি, মাল্যের আকারে পরিবেষ্টিত। প্রথমটা অস্পষ্ট বোধ হইলেও, নিমেষ মধ্যেই তাহা স্পষ্টতর হইয়া একটা দৃশ্যমান পদার্থে পরিণত হইল এবং ভাসিতে ভাসিতে প্রায় গৃহতলে নামিয়া আসিল,—পরে উহা আবার উপর দিকে উঠিল এবং ফুৎকার-তাড়িত পালকের ন্যায়, বায়ুস্তরে ঘনীভূত ধুমরাশির উপর কম্পিত হইতে লাগিল। এল র‍্যামির ভাষায় এই "পরমাণু-সমষ্টির ক্ষণিক প্রভা-বিকাশ" পরমুহূর্ত্তেই যাহা প্রতিবিম্বিত করিল, তাহা এক ঢলঢল-যৌবনা সুন্দরীর মূর্ত্তি,—তরঙ্গায়িত তাহার কেশরাশি, বিদ্যুৎভরা তাহার চাহনি, হাস্যোজ্জ্বল তাহার ওষ্ঠযুগল!—কিন্তু এ মূর্ত্তি যে ছায়ারচিত মাত্র, তাহা শীঘ্রই বুঝিতে পারা গেল, কারণ, সুগোল সুঠাম আনন্দময়ী মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করিতে না করিতেই যুবতী মিলাইয়া গেল। তরল হইতে তরলতর হইয়া ধুমপুঞ্জও সরিয়া যাইতে লাগিল,—ক্রমে একেবারেই মিলাইয়া আসিল। অলসভাবে চেয়ারে হেলিয়া পড়িয়া, এল-র‍্যামি তাঁহার পরীক্ষার আরম্ভ, বিকাশ ও পরিসমাপ্তি উপভোগ করিতেছিল; এক্ষণে, উহা শেষ হইয়া যাওয়ার পর, আপন মনে বলিতে লাগিলেন:—

"সৌন্দর্য্যের প্রত্যেক রেখাভঙ্গীটী কি অবিকৃত রূপেই না প্রতিভাত হয়, এবং বাজীকর-রূপে ব্যবসা জমাইতে ইচ্ছা করিলে এই একটী মাত্র পরমাণু সংযোজন-দৃষ্টান্ত হইতেই কত টাকা না সংগ্রহ করিতে পারি! 'মোজেস্' এই জাতীয় বিদ্যায় সুনিপুন ছিলেন; 'বোরুসা' নামে আরও একজন ঈজিপ্টবাসী এই রসায়ন-কৌতুকের কল্যানেই সাধারণের নিকট দেবতা-রূপে চলিয়া গিয়াছিলেন—রাজা নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন—এবং ঐশ্বর্য্যে ও সম্মানে

বিভূষিত হইয়াছিলেন ;—চমৎকার এবং চতুর লোক ছিলেন এই 'বোর্‌সা' ! কিন্তু আমরা,—আমরা আজকাল কাহাকেও দেবতা বলিয়া ভুল করি না,—এমন কি ভগবানকেও নয়; কারণ আমাদের কাছে তিনি সেই 'তাড়ির ঝাঁজ' যা' ক্রমাগতই 'বস্তুর পাঁউরুটীকে' ফাঁপাইয়া তুলিতেছে,—তথচ, কিজন্য যে ঐ তাড়ি বা পাঁউরুটীর অস্তিত্বটা আছে এ-প্রশ্ন চিরদিনই অমীমাংসিত !"

এল র‍্যামি গভীর চিন্তায় নিমগ্ন হইলেন এবং অবিলম্বেই কাগজ কলম টানিয়া লইয়া কয়েকপৃষ্ঠা পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত করিয়া ফেলিলেন। যথাসময়ে ফেরাজ আহার্য্য লইয়া আসিল,—অগত্যা লেখনীর কার্য্য বন্ধ করিয়া, ভ্রাতার সহিত আহারে ব্যাপৃত হইয়া পড়িলেন। আহারকালে এল র‍্যামি বেশ প্রফুল্লভাবেই নানাবিষয়ক আলাপ করিতেছিলেন, কিন্তু যে সকল বিষয়ের আলোচনায় ফেরাজের বিমর্ষভাব বৃদ্ধি পাইবার সম্ভাবনা ছিল, এমন সমস্ত বিষয় তিনি বিশেষ সতর্কতার সহিতই পরিহার করিয়া চলিতেছিলেন। হঠাৎ এক সময় তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আজ সারাদিনের মধ্যে তুমি সঙ্গীতালাপ করলে না কেন ফেরাজ ?"

"তা' বল্‌তে পারিনে"—বিষণ্ণ কণ্ঠে যুবক উত্তর করিল—"আমার মনে হয়, অন্য-সব জিনিসের সঙ্গে সঙ্গীতও ভুলে গেছি।"

ফেরাজের উক্তি অর্থপূর্ণ ;—এল র‍্যামি হাসিয়া উঠিলেন ; সে হাসা প্রফুল্ল ও তৃপ্তিপূর্ণ। "অন্য-সব জিনিস" সেই লিলিথের নামটী, যাহা এল র‍্যামির ইচ্ছাশক্তি তাঁহার ভ্রাতার স্মৃতি হইতে মুছিয়া দিতে সক্ষম হইয়াছে। তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় উৎসাহ-দীপ্ত হইয়া উঠিল, কণ্ঠস্বর আবেগোচ্ছল হইয়া আসিল —স্নেহার্দ্র-ভাবে তিনি বলিলেন :—

"আমার তা' মনে হয় না ফেরাজ,—আমার ধারণা, সঙ্গীত তুমি ভুলে যেতে পার না। এ জিনিসটা তোমার পক্ষে বিদেশী নয়, পরন্তু তোমার স্বভাবের অংশ জাত ;—বস্তুতঃ, এই আনন্দময় অংশটী যদি হারাও তা' হ'লে তোমার জীবনই দুর্ব্বিসহ হ'য়ে উঠ্‌বে। এই যে তোমার ছোট্ট অজ্ঞাত বন্ধুটী"—এইখানে গাত্রোত্থান করিয়া তিনি আবরণ-মধ্য হইতে একখানি সুদৃশ্য বীণাযন্ত্র বাহির করিয়া আনিলেন—"আহা, প্রাচীন কালের সেই 'ম্যাণ্ডোলীন'

হাঁ, আধুনিক আকার প্রাপ্ত হলেও, এ সেই 'ম্যাণ্ডোলীন' ছাড়া আর কিছুই নয়; এ সেই একই যন্ত্র, যা প্রাচীন পম্পাই নগরে যুবকদের প্রেম-গীতকে মধুর করে তুলতো,—একই যন্ত্র যা' থীব্‌স্ ও মেম্ফিস্ নগরের দীর্ঘকেশী ও কৃষ্ণকায়া কুমারীরা তা'দের অদ্ভুত জয়গাথার সঙ্গে অপূর্ব্ব-ভঙ্গীতে বাজাতো। 'ভায়োলীনের' চেয়ে এ যন্ত্রটীকে আমি বেশী পছন্দ করি, কেননা এর আকৃতিটী বড় সুন্দর। নাও ফেরাজ, কিছু একটা বাজাও"—জয়োল্লাসে হাস্য করিয়া 'ম্যাণ্ডোলীনটী' তিনি ভ্রাতার হস্তে তুলিয়া দিলেন এবং তন্ত্রীতল হইতে কূর্ম্মপৃষ্ঠাকার শঙ্খ-খণ্ডটী খুলিয়া লইয়া বলিলেন—"এই,—এই ক্ষুদ্র খণ্ডটীর সাহায্যেই তন্ত্রী সমূহের মধ্যে সঙ্গীত অনুরণিত হ'তে থাকে; মানব-হৃদয়-তন্ত্রী কামানুভূতির স্পর্শে যেমন স্পন্দিত হয়, ঠিক তেমনই তোমার অঙ্গুলি-স্পর্শে ঐ রৌপ্য-তারগুলি সাড়া দিয়ে উঠবে।"

তিনি থামিলেন; একটা অপূর্ব্ব ঔজ্জ্বল্যে তাঁহার চক্ষুর্দ্বয় দীপ্ত হইয়া উঠিল; বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে ফেরাজ তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল। কি সুন্দর স্বর! কি চমৎকার বাগ্মীতা!—পুরুষত্ব ব্যঞ্জক চিন্তাশীল মুখাকৃতি!—সর্ব্বোপরি, তুষার-শুভ্র কেশরাশি তাঁহার লাবণ্যময় আননখানিকে যে সকরুণ মর্য্যাদা দান করিয়াছে, এবং যৌবনের উপর প্রৌঢ়ত্বের আভাষের মত একটা অসঙ্গতির ইঙ্গিত করিতেছে, এইটাই বা কি অপূর্ব্ব! বেচারী ফেরাজ!—তাহার বুকখানি যেন ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতে লাগিল; ভ্রাতার প্রতি ভালবাসা ও প্রচ্ছন্ন শ্রদ্ধা যেন তাহার অবমানিত আত্মসম্মানের সহিত বিরোধ বাধাইতেই চাহিল,—তথাপি—যখন সে অনুভব করিল যে তাহার গোপন গর্ব্ব, বিদ্রোহী-প্রবৃত্তি এবং সন্দিগ্ধ চিত্তে আজ এল র‍্যামির নিপুণ ভাষা ও মোহময় আচরণের প্রভাব-স্পর্শে টানিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে, তখন ঐ অনুভূতির হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য, বিশেষভাবে 'ম্যাণ্ডোলীন'টীর দিকে ঝুকিয়া পড়িয়া কম্পিত-করে সে উহার তন্ত্রীগুলিতে আঘাত করিবার চেষ্টা করিল।

"কামের কথা বলছো তুমি" আনত-নয়নে এবং মৃদুকণ্ঠে ফেরাজ বলিল—"অথচ সে অনুভূতির সঙ্গে তোমার পরিচয় নেই।"

"তাই তো, নেই নাকি!"—বালকের ন্যায় হাস্য করিয়া এল র‍্যামি আসন গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন—"না, তা' যদি না থাকতো তবে আমি মানুষের চেয়ে অনেক বড় হ'তাম। কিন্তু এ বিদ্যুৎ আমার পথের সামনে চমকে গিয়েছে ফেরাজ,—হ্যাঁ নিশ্চয়ই গিয়েছে,—শুধু

আমাকে মেরে ফেল্‌তে পারেনি। রমণীর মত তুচ্ছ ও অসম্পূর্ণ একটা প্রাকৃতিক সৃষ্টির জন্যে বিন্দু বিন্দু করে' দেহরক্তপাত কর্‌তে আমি প্রায় প্রস্তুত হয়েছিলাম!—কতকটা কোমল-বিভঙ্গ চম্পকবর্ণাভ মাংসপিণ্ড, দীর্ঘকেশ, পদ্মপর্ণায়ত চক্ষু আর নির্ঝর-ঝঙ্কার-তুল্য হাসা;—একটা তুচ্ছ জীব, বিড়াল-শাবক অপেক্ষাও হৃদয়হীন, কুক্কুরী অপেক্ষাও অবিশ্বাসিনী। অবশ্য বুদ্ধিমতী ও স্নেহময়ী নারীও জগতে আছেন--কিন্তু অ মরা কচিৎ তাঁদের চাই; মুর্খ আমরা, সুতরাং সে মুর্খতার ফলভোগেও বাধ্য। আমিও একদিন এম্‌নি মুর্খ ছিলাম,—কেন কল্পনা কর্‌ছ যে তা' ছিলাম না? এ কল্পনা আমার পক্ষে আশাপ্রদ বটে, কিন্তু কেন?"

ফেরাজ পুনরায় তাঁহার দিকে চাহিল এবং স্বভাবতঃই একটু হাসিল, যদিও সে হাস্য অনিচ্ছাকৃত।

"সদ সর্ব্বদাই তুমি পার্থিব বৃত্তিগুলোকে ঘৃণার সঙ্গে বিচার কর বলেই মনে হয়,—ফেরাজ বলিল—"তা' ছাড়া একবার আমাকে বলেছিলে যে পৃথিবীতে ভালবাসা বলে কোনো-কিছুর অস্তিত্ব নেই।"

"সত্যিই তা' নেই"—তৎক্ষণাৎ এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"আদর্শ ভালবাসা বা চিরন্তন ভালবাসা নেই। প্রেমের শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম অর্থ যা', সেটা জগতের সম্পত্তি; এ-জগতে তা'র মুক্ত পক্ষদ্বয় আবদ্ধ হ'য়ে আছে—এখানে তা' একটা নীচজাতীয় দৈহিক আকর্ষণ ব্যতীত অন্য কিছুই নয়।"

ফেরাজ তাহার 'ম্যাণ্ডোলীনে' মৃদু-কোমল ঝঙ্কার তুলিল। পরে বলিল:—

"সেদিন আমি দুটী প্রেমিক-প্রেমিকাকে দেখেছিলাম; মনে হয়েছিল, যেন তা'দের সুখ স্বর্গীয়।"

"কোথায় দেখেছিলে?"

"এখানে নয়। আমার সুপরিচিত রাজ্যে—সেই তারার দেশে।"

এল র‍্যামি বিস্মিত কৌতূহলে তাহার দিকে চাহিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না।

"বড় সুন্দর তা'রা;" ফেরাজ বলিতে লাগিল—"একটী ছোট্ট নদীর পুষ্প-প্রফুল্ল তীরে তারা একসঙ্গে বিশ্রাম কর্‌ছিল,—নদীর দু'ধারে নয়ন-রম্য কাননভূমি হাজার হাজার পাখীর

গানে সঙ্গীতময় ; কোথায় লাগে সে-সব পাখীর কাছে আমাদের এই কোকিল কি পাপিয়া। বাতাসটুকু বাঁশীর সুরে ভরপুর,—আকাশখানি গোলাপ-গৌরবে পরিপূর্ণ,—তা'দের যুগল-বাহু পরস্পরের বাহু-সম্বদ্ধ—ওষ্ঠ-যুগল পরস্পরের ওষ্ঠ-সংলগ্ন ! এই পর্যান্ত দেখে, তা'দের আনন্দে আমার কেমন ভয় কর্‌তে লাগ্‌লো—কারণ, আমি নিঃসঙ্গ—আর তা'রা —একত্র !"

ফেরাজের স্বর কাঁপিতে লাগিল এল র‍্যামির স্নিগ্ধ হাস্যে করুণা ভাসিয়া উঠিল।

"তোমার তারারাজ্যের 'প্রেম' স্বপ্নমাত্র, ফেরাজ—" নম্রকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"কিন্তু এখানকার, অর্থাৎ এই নিত্যরূপান্তরিত বস্তুরাজ্যের প্রেম আমাদের মতে 'বাস্তব'—মানেটা হ'চ্ছে,—জানো, কি মানে ?"

ফেরাজ ঘাড় নাড়িয়া জানাইল—'না'।

"মানেটা হ'চ্ছে টাকা—জমীজমা, বাড়ী আর কোম্পানীর কাগজ। ফুল কি জ্যোৎস্না কিম্বা সঙ্গীত এখানকার প্রেমিকদের ক্ষুধা-নিবারণের পক্ষে একেবারেই উপযোগী নয়—তাদের ক্ষুধা আরও একটু মোটা ধরণের, অর্থাৎ একটু অধিক পরিমাণে বস্তু-ঘেঁষা। এখানকার প্রেম, প্রেমের ব্যভিচার—কিন্তু তুমি সে দেশের কথা বল্‌ছো সেখানে এটা সম্পূর্ণ হ'লেও হ'তে পারে—"

সহসা বৃষ্টির ঝাপটা দম্‌কা বাতাসের সহিত মিশিয়া বাতায়ন কবাটে জোরে আঘাত করায় এল র‍্যামির বক্তব্য অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

"উঃ, কি দুর্য্যোগ !" বাহিরের দিকে চাহিয়া ফেরাজ বলিয়া উঠিল—"আর এই বৃষ্টিতে তুমি কিনা আশা কর্‌ছো—"

ঠিক এইসময় বহির্দ্বারে ঘন ঘন করাঘাত-শব্দ শ্রুত হইল, এবং এল র‍্যামি একেবারেই চেয়ারে ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। ফেরাজও 'ম্যাণ্ডোলীন' রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল। আর একবার ঝড়ের ঝাপটা বহিয়া গেল এবং সেই সঙ্গে এক পশলা শিলাবৃষ্টি বাতায়ন-দ্বারে প্রবল আঘাত করিল।

"শিগ্‌গির যাও !" উদ্বিগ্ন স্বরে এল র‍্যামি বলিলেন—"এসেছেন তিনি,—কে তা' বুঝেছো বোধ হয় ? যাও, যাও ফেরাজ, সসম্মানে তাঁকে নিয়ে এস,—একেবারে এই ঘরে।"

ফেরাজ বাহির হইয়া গেল এবং এল র‍্যামি কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ়ের ন্যায় চারিদিকে চাহিতে লাগিলেন,—এম্‌নি একটা ভাব, যেন তিনি নিতান্তই বিপদগ্রস্থ হইয়া পড়িয়াছেন এবং পলায়নের উপায় থাকিলে পলাইতেও প্রস্তুত! তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে শিহরিয়া উঠিল—একটা দীর্ঘনিশ্বাস শব্দও যেন শুনিতে পাওয়া গেল।

"আমার কাছে কি উদ্দেশ্যে!" অস্ফুটস্বরে তিনি বলিলেন—"এই দীর্ঘকালের নিস্তব্ধতার পর, এতকাল আমার কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীন থাকিয়াও, কিজন্য আজ আমার অনুসন্ধানে আসিলেন?"

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

পরশমণি।

—:*:—

জানি না আমি, কখন তুমি
আসিয়া গোপনে
পরশখানি রাখিয়া গেছ
হৃদয়-ভবনে;
বন্ধ ছিল হৃদয়খানি
অন্ধ ছিল আঁখি,
কেমনে গেলে হৃদয়-পটে
চরণ রেখা আঁকি?

রুদ্ধ হৃদি মুক্ত আজি
  নয়নে হেরি আলো,
কে তুমি মোর আঁধার গেহে
  সন্ধ্যা দীপ জ্বালো ?
কে তুমি, কবে—যতনে গাঁথা
  পরায়ে মালাখানি,
অধর পুটে গোপনে দেছ—
  সুধার রেখা টানি ?
চিনেছি তোরে—পরশ-মণি—
  পরশখানি তোর
পরশ করি, করেছে সোনা
  গোপন হৃদি মোর।

শ্রীরেণুকা দাসী।

মনীষী কিশোরীমোহন

বর্ত্তমান যুগে উত্তর-বঙ্গে যে সমস্ত খ্যাতনামা সাহিত্যসেবক জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, স্বর্গী কিশোরীমোহন রায় তন্মধ্যে অন্যতম।

১২৭৮ বঙ্গাব্দের দোল পূর্ণিমার নিশীথিনীতে রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত কাকিনা কিশোরীমোহন ভূমিষ্ঠ হন।

কিশোরীমোহন যোগ্য পিতার যোগ্য পুত্র। সুপ্রসিদ্ধ গোবিন্দমোহন বিদ্যাবিনোদ-বারিধি* ইঁহার জনক। গোবিন্দমোহন কাকিনা রাজের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। কিন্তু কেবল রাজকার্য্যেই তাঁহার কৃতিত্ব পর্য্যবসিত হয় নাই। তিনি অবসর কালে সংস্কৃত ও বঙ্গ-সাহিত্যের অনুশীলন করিতেন। তিনি সিদ্ধান্ত-জ্যোতিষ শাস্ত্রের আলোচনায় বহুকাল অতিবাহিত করিয়াছিলেন। তৎ প্রণীত 'মৃন্ময়ী' এই অনুশীলনের অন্যতম ফল। এতদ্ব্যতীত তিনি 'অষ্টাদশ বিদ্যা' দুই ভাগ, লীলাবতী, হরিবাসরতত্ত্বসার, প্রভৃতি সুধী-জন-প্রশংসিত সদ্ গ্রন্থের প্রণয়ন ও প্রকাশন করিয়াছিলেন। এই মহাত্মার সৎসাহস ও সৎপ্রবৃত্তির একটি মনোরম কাহিনী "বঙ্গের বাহিরে বাঙ্গালী," প্রভৃতি গ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের "চরিত্র-গঠনে" লিপিবদ্ধ আছে। পাবনা জেলার অন্তর্গত উধুনিয়া গ্রাম ইঁহার পূর্ব্ব নিবাস। ইঁহারা বারেন্দ্র কায়স্থ।

কাকিনাতেই কিশোরীমোহনের সুখময় শৈশব অতিবাহিত হইয়াছিল। তিনি অধিক দিন বিদ্যালয়ে পাঠাভ্যাস করেন নাই। কিন্তু তাঁহার বিদ্যানুশীলন আমরণ সমভাবে প্রবল ছিল। তিনি সর্ব্বদা গৃহে বাঙ্গালা, সংস্কৃত ও ইংরাজী সাহিত্য পাঠে নিমগ্ন থাকিতেন। তাঁহার অধ্যয়নে এমনই একটা মত্ততা ছিল যে বৈষয়িক কোন ব্যাপারেই তাহাতে বাধা দিতে পারিতেন না। তাঁহার পাঠতৃষ্ণা এরূপ প্রবল ছিল যে, যখনই কোন নূতন গবেষনাপূর্ণ পুস্তক— ইংরেজী হৌক, বাঙ্গালা হৌক্, আর সংস্কৃত হৌক্—প্রকাশিত হইত তিনি অবিলম্বে তাহা সংগ্রহ করিয়া সাগ্রহে পাঠ করিতেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কিশোরীমোহন 'কেতাব কীট' ছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের সাহায্য ও উপাধি ব্যতিরেকেও যে মাতৃভাষার সেবা করা যায়, বঙ্গ-সাহিত্য-ভাণ্ডারে কিছু দান করিতে পারা যায়, কিশোরীমোহনের জীবনই এ কথার প্রত্যক্ষ সাক্ষী।

কৈশোর হইতেই কিশোরীমোহন ছাত্র-সাহিত্য-সভায় প্রবন্ধাদি পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এই সময় হইতেই তাঁহার হৃদয়াভ্যন্তরে অন্তঃসলিলা সরস্বতীর মত সাহিত্য-স্রোত প্রবাহিত হইত। অষ্টাদশ বৎসর বয়স হইতেই তিনি 'ভারতী,' 'নব্যভারত,' 'অনুসন্ধান,' 'প্রদীপ' প্রভৃতি পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রকাশ করিতে থাকেন।

---

* আশ্বিন (১৩২৭) সংখ্যা "সারথি"তে প্রকাশিত মল্লিখিত "গোবিন্দমোহন বিদ্যা-বিনোদ" দ্রষ্টব্য।

১২৯২ সালে কিশোরীমোহনের ভাবী প্রতিভার নিদর্শন—"হামির" প্রকাশিত হয়। বঙ্গ-ভাষায় তিনিই প্রথম হামিরের মহান্ চরিত্র চিত্রিত করেন। তখন তাঁহার বয়স মাত্র বিশ বৎসর। "আর্য্যদর্শন" সম্পাদক, বহু শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ রচয়িতা সুপ্রসিদ্ধ সাহিত্যিক স্বর্গীয় যোগেন্দ্রনাথ (বন্দোপাধ্যায়) বিদ্যাভূষণ মহাশয় 'হামিরে'র ভূমিকা লিখিয়া দেন। উহাতে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেন যে "আমার দৃঢ় বিশ্বাস, কালে ইনি একজন সুলেখক হইবেন।" বিদ্যাভূষণের বাণী ব্যর্থ হয় নাই। উত্তরকালে সত্যসত্যই কিশোরীমোহন সাহিত্য সমাজে একজন সুলেখক রূপে পরিচিত হইয়াছিলেন।

১৩১৮ সালে কিশোরী মোহন সুরাজ্য নামক গ্রন্থ প্রকাশ করেন। এ'খানি সম্রাট সপ্তম এডোয়ার্ডের ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত মহতী বাণী সমূহের সংগ্রহ ও তাহার প্রাঞ্জল বঙ্গানুবাদ। অনুবাদের ভাষা সহজ, বিশুদ্ধ ও সুন্দর। অমৃতবাজার পত্রিকা, বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান ডেলিনিউজ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ সংবাদ পত্র এই গ্রন্থের সাধুবাদ করেন। এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ আয় তিনি পাবনা এড্ওয়ার্ড কলেজের হিতার্থ দান করিয়াছিলেন। ইহাতে তাঁহার মহত্বের পরিচয় প্রকটিত হইয়াছে।

১৩১৯ সালের ১০ই ভদ্র, বঙ্গের ভূতপূর্ব্ব প্রথম 'গভার্ণার' লর্ড কারমাইকেল মহোদয়ের পাবনা আগমন উপলক্ষে কিশোরীমোহন "সুরাজ" নামক সাপ্তাহিক সংবাদ পত্রের প্রাণ-প্রতিষ্ঠা করেন। ইহার কল্যাণে পাবনাবাসীর অভাব অভিযোগ আলোচনার উপায় উন্মুক্ত ও সাহিত্য সেবার পথ সুগম হয়। 'সুরাজে'র জন্মদিনে কিশোরীমোহণ 'সুরাজের সার্থকতা' প্রবন্ধের একস্থলে লিখিয়াছিলেন ;—"বিধাতার প্রেরণায় নব্য বঙ্গের এই প্রথম রাজপ্রতিনিধি লর্ড কারমাইকেলের শুভাগমন দিবসে 'সুরাজে'র অভ্যুদয় হইল। রাজশক্তি ও জন সাধারণ, পাবনাবাসী ও বঙ্গবাসী বিদ্বজ্জন সমাজের নিকট আমরা ইহার দীর্ঘ জীবনের শুভাশীষ কামনা করি। 'সুরাজ' আমাদের মনোনীত নাম। আমরা সু চাহি, কু চাহি না, সু আসিলেই জ্ঞান আসিবে, জ্ঞান আসিলেই সর্ব্বাঙ্গীণ মনুষ্যত্ব লাভ হইবে।" 'সু'র প্রতি কি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা !

মুহূর্ত্তের জন্য তাঁহার মনে 'সুরাজে'র স্থায়িত্ব সম্বন্ধে সংশয় উপস্থিত হইলেও তিনি তাহারই মধ্যে সান্ত্বনা খুঁজিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার আত্ম-প্রবোধটি কিরূপ, পাঠক দেখুন।—

……তাই আমরা আজ উৎসব করিয়াছি। আজ মায়ের ডাকে আমরা মিলিত হইয়াছি। জানি না, এ আমাদের দুই দিনের উৎসব, কি জীবনব্যাপী উৎসব, কিন্তু দুই দিনের উৎসবেও এ আত্ম প্রসাদ, তথাপি আমাদের পূজাবাড়ীতে অন্ততঃ একবারের জন্যও জননীর সাক্ষাৎ পাইয়াছি।" সুখের বিষয় কিশোরীমোহনের উৎসব দুই দিনেই শেষ হয় নাই, আজিও তাহা আমাদিগকে আনন্দ দান করিতেছে।

কিশোরীমোহনের একটি প্রধান কাজ ছিল, নূতন লেখকগণকে উৎসাহদান, ক্রমে যোগ্য করিয়া তোলা। তাঁহার উৎসাহে অনেক অল্প শিক্ষিত ও সুশিক্ষিত ব্যক্তি লেখনী ধারণ করিয়াছিলেন। তিনি অযোগ্যের মধ্যেও সার্থকতা দেখিতে পাইতেন। তাই তিনি প্রথম সংখ্যা 'সুরাজে' লিখিয়াছিলেন ;—"মায়ের পূজায় কি শুধু যোগ্যেরই একমাত্র অধিকার ? কনিষ্ঠের কি কোন কাজ নাই ? অযোগ্যের প্রাণে কি সাময়িক উচ্ছ্বাসও নাই ? ক্ষণিকের সেই শুভমুহূর্ত্তকে সে কি সার্থক মুহূর্ত্তে পরিণত করিতে পারে না ? নিশ্চয় বোধ হয় যেন পারে। অযোগ্যের সৌভাগ্যে যদি তাহার মনে সদনুষ্ঠানের সাময়িক বাসনাও উদিত হয়, সেও তাহার ব্যর্থ জীবনের সার্থকতা।"

নানা প্রতিকূল অবস্থায় নিপতিত ও ঋণদায়ে জর্জ্জরিত হইয়াও 'মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন'—ব্রতী কিশোরীমোহন আমরণ দারিদ্রের সহিত যুঝিয়া বুকের রক্তসম প্রিয় "সুরাজ"কে জীবিত রাখিয়া গিয়াছেন।

'সুরাজ' প্রতিষ্ঠার দুই বৎসর পরে—১৩২১ সালে, তাঁহার উজ্জ্বল প্রতিভার কনক কিরণচ্ছটা বিকীর্ণ হইল। ইহা তাঁহার সুলিখিত গ্রন্থ "কর্ম্মফল"। এই পুস্তক প্রকাশিত হইবামাত্র তাঁহার যশঃ সৌরভে সাহিত্যকানন আমোদিত হয়। কর্ম্মফল ঐতিহাসিক বৌদ্ধ আখ্যায়িকা। কিশোরীমোহন 'দুঃখ-নির্ব্বাণ-ভিক্ষু-নরনারীর করকমলে সহযাত্রীর পাথের সম্বল' এই পুস্তকখানি অর্পণ করিয়াছেন। 'কর্ম্মফলের ভারতীয় বৌদ্ধ আখ্যায়িকা প্রাচীন যুগ হইতে বর্ত্তমান কাল পর্য্যন্ত প্রাচ্য ও পাশ্চত্য বিভিন্ন ভাষায় অনূদিত আছে। অথচ বঙ্গসাহিত্যে এতদিন পর্য্যন্ত এই আখ্যায়িকা স্থান পায় নাই' দেখিয়া কিশোরীমোহন এই গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হন। তাঁহার ধর্ম্মামৃত পানে বাঙ্গালী ধন্য হইয়াছে।

কর্ম্মফল দুই ভাগে বিভক্ত ; প্রথম ভাগে প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগে আখ্যায়িকা। এই গ্রন্থ ভাষা ও ভাবে, গাম্ভীর্য্য ও মাধুর্য্যে বঙ্গসাহিত্যে অপূর্ব্ব সামগ্রী। ইহা পাঠ কালে পাঠকের হৃদয় কর্ম্মমহাত্ম্যে ভরপূর হয়। বুদ্ধের ধর্ম্ম পুরুষকার ও স্বাবলম্বন শিক্ষা দেয় এবং মানবকে কাপুরুষতা ও পরমুখাপেক্ষিতা হইতে আত্ম-শক্তিতে উদ্বুদ্ধ করে। এই গ্রন্থের অহিংসাতত্ত্বে'র ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ বড়ই প্রাণস্পর্শী ও হৃদয়গ্রাহী। কেবল জীব-বধ হইতে বিরতি, নিরামিষ ভোজন, পশুক্লেশ নিবারণ ও দুঃখীর দুঃখে করুণা প্রকাশই অহিংসার একমাত্র উচ্চ আদর্শ নয়, পরন্তু দুঃখীর দুঃখে দুঃখানুভূতি, সুখীর সুখে সুখানুভূতি যে বুদ্ধের প্রচারিত অহিংসার যথার্থ আদর্শ, তাহা কিশোরীমোহন অতি সুন্দর ভাবে বুঝাইয়াছেন। কর্ম্মের ব্যাখ্যাটি অতি উপাদেয় হইয়াছে। কর্ম্ম প্রাণ, কর্ম্মজীবন, কর্ম্ম পুণ্য, কর্ম্ম ধর্ম্ম, কর্ম্মই যে জীবের একমাত্র সাধ্য এবং কর্ম্মফল যে অবিনশ্বর, তাহাও এই গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে সেই সময় এ দেশের সাময়িক ও মাসিক পত্রিকাতে বিস্তর আলোচনা হইয়াছিল। আমরা এ স্থলে কেবল 'প্রবাসী'র* মন্তব্যের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম—"কর্ম্মফল' একটি ঐতিহাসিক বৌদ্ধ আখ্যায়িকা অবলম্বনে রচিত। পুস্তকের প্রারম্ভে গ্রন্থকার বৌদ্ধধর্ম্মের সার তত্ত্ব "অহিংসা পরমোধর্ম্মঃ" সম্বন্ধে তাঁহার যে প্রবন্ধটি সন্নি-বেশ করিয়াছেন, তাহা কি চিন্তাশীলতায়, কি স্বাধীন চিন্তায়—সকল দিক দিয়াই বিশেষ ভাবে পঠনীয় ও উপভোগ্য হইয়াছে। আমাদের দেশে যাঁহারা বুদ্ধকে নাস্তিক, জড়বাদী বলিয়া অভিহিত করেন, আমরা তাঁহাদিগকে এই প্রবন্ধটি পাঠ করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। লেখকের অহিংসা তত্ত্ব আমাদের এত ভাল লাগিয়াছিল যে, অন্ততঃ তাহার কিয়দংশ প্রবাসীর পাঠকদিগকে উপহার দিবার বড়ই ইচ্ছা ছিল* * যাহা হউক, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে নানা ভ্রান্ত ধারণা—যাহা বহুদিন হইতে আমাদের অনেকের মনে বদ্ধ মূল হইয়া আছে—তাহা এই প্রবন্ধ পাঠে বহুপরিমাণে অপসারিত হইবে।"* *

* আষাঢ়, ১৩২১।

কিশোরীমোহন সর্ব্বদা বিবেকের দ্বারা চালিত হইতেন। গতানুগতিকতা বা তোষামোদ তাঁহার প্রকৃতিবিরুদ্ধ ছিল। বাল্যে 'নব্যভারতে' তাঁহার 'হাতে খড়ি' হয়, পূর্ব্বেই তাহার আভাস দিয়াছি। ১৩১৯ সালে চট্টগ্রামে অনুষ্ঠিত বঙ্গীয়-সাহিত্য-সম্মিলনের ষষ্ঠ অধিবেশনে সভাপতির আসন হইতে সাহিত্যাচার্য্য, অধুনা পরলোকগত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয় 'শুধু ভাবের আকাশ গঙ্গা না বহাইয়া কর্ম্মযোগীর মতন' শিক্ষা ও স্বাস্থ্য তত্ত্বের প্রসঙ্গ তোলেন। 'নব্যভারত' তাঁহাকে 'ধান ভানিতে শিবের গায়ক' বলিয়া ব্যঙ্গ করেন। এই ব্যাপারে কিশোরীমোহন স্বীয় বিচার বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া ত্রিশ বৎসরের নব্যভারত"* শীর্ষক এক প্রতিবাদ প্রকাশ করেন। তাহা হইতে এই কয়টি কথা উদ্ধৃত করিলেই পাঠক তাঁহার স্বাধীন চিন্তার পরিচয় পাইবেন;—"আমাদের সাহিত্যে শুধু কি সদাই অপার্থিব 'কাব্য-কলা' বিরাজ করিবে? দেশে গো-রস জীবন-রস সব নিঃশেষ প্রায়, কবিরা কি খাইয়া কাব্য লিখিবেন? * * আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের আখড়ায় যিনি এই শোকের গানের তান ধরিয়াছেন তাঁহাকে আমাদের কিন্তু বড়ই ভাল লাগিয়াছে। এমন বাঁশী যিনি বাজাইয়াছেন, 'নব্যভারত' তাঁহাকে "ধান ভানিতে শিবের গায়ক" বলেন কেন? 'নব্যভারত অম্লান বদনে এ কথা বলিলেন কিরূপে যে "সাহিত্য-সম্মিলন সভায় পল্লীর উন্নতি ও পানীয় জলের কথা কেন? সে অবান্তর কথা অনভিজ্ঞতার পরিচায়ক ইত্যাদি" হায়, সাহিত্য যে চিরদিন দেশে কালে সমসাময়িক সমাজের নিখুঁত ছবি, ইহাও কি নূতন কথা? সাহিত্য যে আজ জাতীয় জীবনের সর্ব্বপ্রকার গুরুতর দায়িত্ব গ্রহণ করিয়াছে।" * *

'ভারতবর্ষের' জলধরবাবু এক পত্রে জানাইয়া ছিলেন;—"কিশোরীমোহন আমার পরম বন্ধু ছিলেন। তাঁহার ন্যায় কর্ম্মী ও উৎসাহশীল ব্যক্তিকে বন্ধু বলিয়া পরিচয় দিয়া আমি গৌরব অনুভব করিতাম। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে† আমি একজন সহৃদয়, উন্নতচেতা, পর-হিতব্রত বন্ধু হারাইয়াছি।" তিনি যে সাহিত্যিক সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন, ইহা হইতেই তাহা সূচিত হইতেছে।

---

* স্বরাজ, ২রা আষাঢ়, ১৩২০।

† ১৩২১ সালের ১লা পৌষ, বিয়াল্লিশ বৎসর বয়সে তিনি পরলোকগত হইয়াছেন।

"কিশোরীমোহন দেশের সুসন্তান ছিলেন। বহুবার তিনি কংগ্রেসে প্রতিনিধি স্বরূপ যোগদান করিয়াছিলেন। দেশের শিল্প বাণিজ্যের উন্নতি কল্পে তিনি বদ্ধপরিকর ছিলেন। প্রথম ৭ই আগষ্টের সভার পরে তিনি আর বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার করেন নাই।"

"কিশোরীমোহনের কথায় ও কাজে প্রভেদ ছিল না। তিনি তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ বিনয়কুমারের বিবাহে কন্যা পক্ষ হইতে এক কপর্দ্দকও গ্রহণ করেন নাই। তাঁহার অনেক আত্মীয় "দেশ কাল" বিবেচনা করিয়া 'দাঁও' মারিবার জন্য অনুরোধ করিতে বিরত হন নাই। "মুখে যাহা প্রচার করিয়াছি, কার্য্যে অন্য ভাব দেখাইতে পারিব না" পুরুষসিংহ কিশোরী-মোহন এই কথা বলিতেন। * * আমার সাহিত্যিক জীবনে তিনিই আমার প্রথম উৎসাহদাতা। অথচ তিনি এরূপ নিরভিমানী (?) ছিলেন যে, কদাচ আমাকে এ কথা কাহারও নিকট উল্লেখ করিতে দিতেন না। সকল বিষয়েই সকলের সহিত তিনি এইরূপ ব্যবহার করিতেন।"*

দেশের প্রত্যেক সদনুষ্ঠানের সহিত কিশোরীমোহনের হৃদয়ের যোগ ছিল। অনেক কাজে তিনি নিজেই অগ্রণী হইতেন। দেশের হিত চিন্তা তাঁহার মস্তিষ্ক অধিকার করিয়াছিল। তাঁহার প্রবন্ধ রাজিতে আন্তরিক স্বদেশপ্রাণতার একটা সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি ফুটিয়া উঠিত। তিনি দেশকে কি ভাবে দেখিতেন ও বুঝিতেন, তাহা তাঁহার নিজের কথাতেই প্রকাশ করিতেছি;—"আমাদের 'দেশ' কোনটি? সে কি সেই সারি সারি বিদ্যুতালোকে উদ্ভাসিত, অসংখ্য সৌধরাজি সুশোভিত, অশ্বযান সমাচ্ছন্ন নিত্য নৃত্য গান মুখরিত প্রাসাদ নগরী? যে স্থানে অব্যবহিত পার্শ্ববর্ত্তী প্রতিবেশী পরস্পরকে জানে না, যে স্থানে দারিদ্র্যের সহিত ঐশ্বর্য্যের লেশ মাত্র সহানুভূতি নাই, যে স্থানের সকল জিনিষই বাহিরে চক্‌চকে ঝক্‌ঝকে, সেই কি আমাদের বাংলা দেশ? না, তাহা নহে। আমাদের প্রকৃত দেশ সেখানে, যেথায় জ্যৈষ্ঠের নিদাঘে নরনারী কাদা ছাঁকিয়া নিদারুণ পিপাসা নিবারণ করে, যে স্থানে দুই বেলা মোটা ভাত খাইতে পাইলে লোকে পরম ভাগ্যবান্ মনে করে, যে স্থানে অত্যাচার অবিচার, দারিদ্র্য, রোগ শোক দ্বারা লোকে নিয়ত নিষ্পেষিত হইলেও তাহাকে "প্রাক্তন কর্ম্মফল" সংস্কারে

* সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার বি-এ লিখিত 'স্বর্গীয় কিশোরীমোহন'—'ভারতী,' মাঘ, ১৩২১।

অভাব অভিযোগ প্রকাশ করা অনাবশ্যক মনে করে, যে স্থানের স্রোতস্বতী ও 'দীঘি পুষ্করিণী' এককালে সমভাবে সকল লোকের স্বাস্থ্য বিধান করিত, তাহাই ম্যালেরিয়া রাক্ষসীর আবাস স্থান হইয়া দেশের লোকের রক্ত শোষণ করিতেছে..... ইত্যাদি।"

সমাজ সংস্কারে তিনি অত্যন্ত অনুরাগী ও উদ্যমশীল ছিলেন। নিপীড়িত জাতিগণের দুর্দ্দশা দেখিয়া তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। সর্ব্বদা তাহাদিগকে অন্যায় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিবার একটা প্রবল প্রয়াস তাঁহার মধ্যে দেখিতে পাওয়া যাইত। আমাদের এই উক্তির সমর্থন কল্পে তাঁহার কোন প্রবন্ধ হইতে কিয়দংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি;— "বলুন দেখি, জাতিভেদ থাকিবে, অথচ দেশ জাগ্রত হইবে, হিন্দু মুসলমানে ভয়ঙ্কর ভেদ থাকিবে, অথচ এদেশ জগতের সভা মণ্ডলী মধ্যে গৃহীত হইবে, ইহা কি সম্ভব? * * জল অচলদের প্রতি কে দৃষ্টিপাত করে? কে তাহাদিগকে হস্তে ধরিয়া প্রেমের পবিত্র মন্দিরে আনয়ন করিবে? * * জাতিতে, নরনারীতে মহাভেদ। পরিবর্ত্তনের কথা কেহ শুনিতে চায় না। চণ্ডাল চিরদিনই চণ্ডাল থাকুক, তাহাকে শূদ্র-পদ দিও না। নারী চিরদিন অজ্ঞানান্ধকারে থাকুক, তাহাকে জ্ঞানালোক দেখাইও না। বঙ্গে সংস্কারের কথা কাহারও ভাল লাগে না।"

(১) পাবনায় আজ যে সাহিত্যের অভ্যুদয়ের ক্ষীণ আভাস দেখা যাইতেছে, তাহার মূলে কিশোরীমোহন। তিনিই এখানে প্রথমে সাহিত্যের আবহাওয়ার সৃষ্টি করিয়া গিয়াছেন। বহুদিন পূর্ব্বে তিনি তাঁহার পাবনার 'গোল বাড়ী'তে এক সাহিত্য সভার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। প্রতি সপ্তাহে উহার অধিবেশন হইত। পাবনার সাহিত্যানুরাগী শিক্ষিত-বর্গ তাহাতে নিয়মিত ভাবে যোগদান করিতেন। "সঞ্জীবনী"—সম্পাদক বিখ্যাত কৃষ্ণকুমার মিত্র, শ্রীযুক্ত কাশীচন্দ্র ঘোষাল প্রভৃতি প্রথিতযশা; সাহিত্য ও ধর্ম্ম প্রচারকগণ মাঝে মাঝে এই সভায় আসিয়া বক্তৃতাদি করিতেন। ঐ সভায় প্রবন্ধ পাঠ, বক্তৃতা ও নানা জ্ঞানগর্ভ সাহিত্যিক আলোচনা হইত।

(২) কিশোরীমোহনের ঐকান্তিক চেষ্টায় পাবনায় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের শাখা স্থাপিত হয়। তিনি আমরণ উহার সভাপতির পদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া উহার অশেষ উন্নতি

সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার পরলোকগমনের পর উহার অস্তিত্ব কিছুদিন ক্ষীণভাবে বজায় ছিল। এক্ষণে উহা বিলুপ্ত হইয়াছে।

ছাত্র সমাজের প্রতি কিশোরীমোহনের অসীম প্রীতি ও অত্যন্ত অনুরাগ ছিল তিনি মনে প্রাণে বুঝিতেন, ছাত্রগণই দেশের ও সমাজের ভবিষ্যৎ আশা ভরসার স্থল, ইহাদিগকে ভিত্তি করিয়াই ভবিষ্য সমাজ গড়িয়া উঠিবে। তাই ইহাদিগকে এখন হইতেই মহৎ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত করা প্রয়োজন। এতদুদ্দেশ্যে একবার ম্যাট্রীকুলেশন পরীক্ষার শেষদিন তিনি স্বয়ং উদ্যোগী হইয়া পাবনা টাউন হলে ছাত্রগণকে লইয়া এক সভা করেন। তাহাতে তিনি ও স্থানীয় অন্যান্য প্রবীণ নায়কগণ ছাত্রবৃন্দের জীবনের গতিনির্দ্দেশ ও দায়িত্ব বোধ উদ্বোধন কল্পে প্রয়াস পাইয়াছিলেন। তিনি বিদ্যালয়ের পুরস্কার বিতরণ সভাতেও বহুবার ছাত্রগণের উদ্দেশ্যে বহু জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন। কৃতজ্ঞতার চিহ্ন স্বরূপ পাবনার ছাত্রবর্গ তাঁহার নামযুক্ত একটি 'ছাত্র পাঠাগার' প্রতিষ্ঠা করিয়া একদিকে যেমন তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন, অপরদিকে তেমনই তাঁহার পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক কর্ম্মপথে অগ্রসর হইতেছেন।

কিশোরীমোহন দুইটি অভিলাষ অপূর্ণ রাখিয়া গিয়াছেন। প্রথমতঃ তিনি তদীয় পিতৃদেবের জীবনচরিত রচনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। উহার কিয়দংশ মাত্র পৃথিবীর ইতিহাস প্রেসে' মুদ্রণার্থ প্রেরিত হইয়াছিল। তাঁহার আকস্মিক অকাল মৃত্যুতে এবং পরে উপযুক্ত তত্ত্বাবধায়কের অভাবে উহা অদ্যাবধি মুদ্রাযন্ত্রের কবল হইতে বাহির হয় নাই! ঐ গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে আমরা তৎকালের দেশ, সমাজ ও সাহিত্যের অবস্থা সবিশেষ জানিতে পারিতাম। দ্বিতীয়তঃ তিনি 'বিশ্ববীণা' নাম্নী একখানা আদর্শ মাসিক পত্রিকা প্রকাশের সংকল্প করিয়াছিলেন, তাহাও অঙ্কুরে বিনষ্ট হইয়াছে।

শ্রীরাধাচরণ দাস।

সুখের শুল্ক।

(পূরবী)

বিদায় বিদায়, বুক ফেটে যায়
তবুও বিদায় দিতেই হবে।
প্রেমলীলা শেষ ; নিয়তি নিদেশ
মাথা পেতে সখি নিতেই হবে।
এ ভূলোক নহে অলকা ভবন
কোথা শাশ্বত হেথায় মিলন ?
চুম্বনহারা বিম্ব অধরে
বিরহ নিম্ব পি'তেই হবে।
বিনা নিষ্ক্রয়ে কোনো সম্ভোগ
এ মর বিশ্বে নাই গো নাই—
দুই দিন আগে দুই দিন পিছে
সুখের শুল্ক দেওয়াই চাই।
গিলে সুরলোক তপ উপচয়ে
হারাইতে হয় পুন তপ ক্ষয়ে
মিলন স্বর্গে ফিরিতে, বিরহে
পুন তপ আচরিতেই হবে।

শ্রীকালিদাস রায়।

আশা

বড় রাস্তার উপর দুই বন্ধুর ঔষধের দোকানখানা দ্রুত উন্নতির দিকে চলিয়া ক্রমশঃ দোতলা অট্টালিকা হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাঁচ বৎসর পূর্ণ না হইতেই দোকানটা ফাঁপিয়া উঠিয়া দুটী দরিদ্র যুবকের অদৃষ্টে স্বপ্নাতীত সৌভাগ্য দান করিয়াছিল।

অনাদি ধনীর সন্তানই ছিল কিন্তু তার পিতার মৃত্যুর পর ঋণের দায়ে এই দোকানখানা ভাঙ্গাচোরা অবস্থায় বন্ধ করা ছিল বলিয়াই বোধ হয় টিঁকিয়া ছিল, তা ছাড়া ভদ্রাসন বাড়ীখানা অবধি মহাজনেরা নিলাম করিয়া লইয়াছিল, অনাদি তখন আমেরিকায়, কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর সেখানকার খরচ বন্ধ হওয়ায় ধার করিয়াই তাকে দেশে ফিরিতে হইয়াছিল।

সেখান থেকে বিদ্যা কিছু উপার্জ্জন করুক না করুক অনাদি অবিদ্যা কতক কতক বহন করিয়া আনিয়াছিল; কেন না সে তার বাপ মায়ের একমাত্র পুত্র, ভাবী কল্পনা তার খুব উঁচুই ছিল। যখন পরে অদিনে মধুহীন ফুলের মত তাকে সব প্রজাপতির দল মুক্তি দিয়া সরিয়া গেল, তখন দরিদ্র বন্ধু পুলীন আসিয়া পাশে দাঁড়াইল। সে গৃহস্থের ছেলে, বি, এ, পাশ করিয়া চল্লিশ টাকা মাহিনার মাষ্টারী করিতেছিল।

দুই বন্ধুতে পরামর্শ করিয়া এই দোকানখানি পাতিয়া বসে, কিন্তু পুলীনের অক্লান্ত পরিচর্য্যার বলেই যে মা কমলা প্রসন্ন হইয়া চাহিয়াছিলেন, সে কথা অনাদিও কায়মনোবাক্যে স্বীকার করিত।

অনাদির যখন পনেরো বৎসর বয়স, সেই সময়ে তার মাতৃবিয়োগ হইয়াছিল, ছেলে বৌয়ের মুখ দেখিবার সাধপূর্ণ করিয়া তবে তার মা দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। অনাদির স্ত্রী লতিকা বড়লোকের মেয়ে নয়, সেও সামান্য গৃহস্থের ঘরের মেয়ে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত শ্বশুর গৃহ বাস তার ভাগ্যে ঘটে নাই!

শাশুড়ীর মৃত্যুর পর ঘোর মাতাল শ্বশুর ছাড়া সে বাড়ীতে আর কেহ ছিল না। অনাদি এ দেশ ও দেশ ঘুরিয়া তারপর ত আমেরিকায় চলিয়া গিয়াছিল। স্ত্রীর সঙ্গে সেও কোনো সম্পর্ক রাখিত না! সুতরাং স্বামীর সঙ্গে একটু সামান্য পরিচয়ও লতিকার হয় নাই!

সে দিন পুলীন একরাশির অফিসের কাগজপত্র দেখিতেছিল, সামনের টেবিলে টাট্‌কা ডাকটা তখনো সে দেখিবার অবকাশ পায় নাই, এমন সময়ে অনাদি আসিয়া বলিল "আজকের ডাক আসে নি পুলীন ?"

পুলীন কাগজপত্র হইতে মুখ তুলিয়া বলিল "হ্যাঁ এসেছে, ওই যে !"

একখানা টেবিলের কাছে সরাইয়া আনিয়া অনাদি বসিয়া ডাকের চিঠিপত্র খুলিয়া পড়িতে লাগিল। সবগুলি পড়া শেষ করিয়া একখানা চিঠি সে পুলীনের দিকে ঠেলিয়া দিল। পুলীন বলিল "কি ?"

"পড়েই দেখ"

পুলীন তার হাতের কলমটা রাখিয়া চিঠি পড়িল, পড়িয়া বলিল "বাঃ ! এযে সুখবর রে ?"

"চমৎকার ! আর একখানা প'ড়ে দ্যাখ এও একটা সুখবর, ওর চেয়ে বড় রকম সুখবর !"

আর একখানা চিঠি অনাদি পুলীনের হাতে তুলিয়া দিল, পুলীন সেখানা পড়িয়া বলিল "এখানা আজকে তুলে রাখ, এ আর কিছু আজ কিংবা কাল সফল হতে পারে না !"

"কেন পারে না ? না পারবার কারণ ?"

"কারণ ওই আগের চিঠিটা তোমার—আজ তোমার বউ আস্‌বেন আর তুমি বিদেশ যাত্রা ক'রবে, সে হ'তে পারে না, বিদেশ যাত্রাটা আপাততঃ বন্ধ রাখ অনাদি, বরং আমেরিকার অসম্পূর্ণ শিক্ষাটা তোমার আমিই সম্পূর্ণ ক'রে আসি, তুমি গৃহ উপভোগ করো" অনাদি লাফাইয়া উঠিল "তা হবে না ভাই, বউ আসে আস্‌বে, তা ব'লে আমি যাবই, আমার যাওয়া বন্ধ থাকবে না কিছুতেই ।"

পুলীন আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "সেকি কথা ! তিনি থাক্‌বেন কোথায় ?"

"কেন, এই বাড়ীতেই থাক্‌বেন, সঙ্গে তো তাঁর মাও আস্‌ছেন, অসুবিধা কি আর ! হলেই বা আমি কি ক'রবো, আমি কি আস্‌তে বলেছি নাকি ?"

পুলীন রাগ করিয়া চুপ করিল। রাগ হইলে সে কখনও কথা. বলিত না পাশে শক্ত কথা বলিয়া লোককে দুঃখ দিয়া ফেলে! হাতে দু'পয়সা হইয়া অবধি অনাদি আবার বিলাস স্রোতে ভাসিতে চলিয়াছে, বিদেশে কাজ শিখিতে যাওয়া, একটা ছুতা মাত্র!

অনেক বুঝাইয়াও পুলীন তাকে নিরস্ত করিতে পারে নাই। আজ একই সঙ্গে অনাদির শাশুড়ী চিঠি লিখিয়াছেন তিনি আসিয়া মেয়েকে জামাইএর হাতে হাতে দিয়া যাইবেন, অন্য দিক হইতে আমেরিকায় এক বন্ধু অনাদিকে আদর নিমন্ত্রন জানাইয়াছে, অনাদি দ্বিতীয় দিকেই বেশী ঝুঁকিয়াছে!

পুলীনের নীরবতা দেখিয়া অনাদি চেয়ার ছাড়িয়া আসিয়া তার কাঁধে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া বেশ নরম-গলায় বলিল, "তুই বুঝি রাগ ক'রলি ভাই,—রাগ করিসনে, সমস্ত ঠিক ঠিক, আর না যাওয়া চলে না,—চলে কি? দ্যাখ ভেবে।"

পুলীন কেবল বলিল "দেখেছি"

"তবে? বৌ আসে বাড়ীর মধ্যে থাকবে, তাকে বলে দিলেই হবে যে আমি এখন বছর খানেকের মত বিদেশবাসী, আমার সঙ্গে আলাপ সালাপ, ঘুরে এসে হবে"

পুলীন বলিল "তুমিই তাঁকে সে কথা ব'লে যেও, আর কোনো গোল থাকবে না,—আমার ঘাড়ে এই দোকানটাই এখন যথেষ্ট! আর কিছু ঝঞ্চাটে আমাকে ফেলো না তা বলে দিচ্ছি!"

"আচ্ছা, তা বেশ, তাই হবে এখন!" বলিয়া হাসিতে হাসিতে অনাদি খবরের কাগজ-খানা হাতে করিয়া চলিয়া গেল!

(২)

হাড় কাঁপানো কন্‌কনে ঠাণ্ডা শীতের রাত্রে একেই তো বাতাসের হল্‌কা যেন তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মত আসি। গায়ে বেঁধে, তার উপর আবার সন্ধ্যা হইতে টিপ্‌টিপ করিয়া বৃষ্টি ঝরিতে আরম্ভ করিয়াছিল।

আকাশে নক্ষত্র রাজ্যের সকল দুয়ার কপাট বন্ধ; দুর্যোগের রাত্রে সমস্ত বিশ্বপ্রকৃতি যেন একটা অসীম অন্ধকারের কালো চাদর মুড়ি দিয়া মুর্চ্ছিতের মত পড়িয়া আছে! রাস্তা প্রায় জনহীন, অধিকাংশ গৃহস্থের বাড়ীর আলোও নিবিয়া গিয়াছে!

একটী জান্‌লা খুলিয়া তরুণী লতিকা তার ব্যগ্র উৎসুক চোখদুটি পথের উপর পাতিয়া যেন দাঁড়াইয়াছিল। বরফের মত ঠাণ্ডা বাতাসে তার স্বাভাবিক সাদা রংটুকুকেও যেন নিবিড় কালো করিয়া তুলিয়াছিল কিন্তু তাতে তার অপলক চোখের পলক একবারটী পড়িল না!

চারিদিক নিস্তব্ধ; কেবল সদ্যবিধবা প্রৌঢ়া নারীর গোপন কান্নার মত আর্ত্তবায়ুর হা হা শব্দ যেন লুটিয়া বেড়াইতেছিল। ব্র্যাকেটের উপরকার ঘড়িতে টুং টুং করিয়া পিয়োনোর গৎ বাজিয়া তারপর রাত বারোটা বাজিয়া গেল। সঙ্গে সঙ্গে হর্ণ বাজাইতে বাজাইতে অনাদির মোটর গাড়ীবারান্দার নীচে আসিয়া দাঁড়াইল!

সাহেবী পোষাক পরা অনাদি কোন্ এক বড়লোক বন্ধুর বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়াছেন, সঙ্গে আরো একটী বন্ধু আছেন, তিনি এই গাড়ীতেই নিজের বাড়ী যাইবেন। গাড়ীর ভিতর হইতেই তিনি মদিরা মত্ত জড়িত গলায় বলিলেন "Good night!"

টুপী হাতে অনাদি সিঁড়ির উপর দাঁড়াইয়া হাসি মুখে বলিল "Good night! Good night!

জানালা বন্ধ করিয়া লতিকা সরিয়া আসিল। মাথার সুমুখটা বৃষ্টির জলে ভিজিয়া গিয়াছিল, আঁচল তুলিয়া মুছিতে গিয়া দেখিল যে, তাও ভিজা! কাল বৈশাখীর ঘন কালো মেঘের গায়ে বিদ্যুৎ চমকের মত তার বিষণ্ণ কঠিন মুখে হাসি ফুটিল!

পাশের সিঁড়ির দুমদাম জুতার শব্দ তেতালায় উঠিয়া গেল! লতিকা শুনিয়াছিল যে অনাদি সেই দিনই ভোর ছয়টার সময় বিদেশ যাত্রা করিবে, অনেক দিনকার মত। এই সময় একবার উপরে গিয়া দেখা করিলে কেমন হয়? কিন্তু যাওয়া মাত্র যদি নিষ্ঠুর এক প্রশ্ন আসে, কি চাও? তবে তার কি উত্তর দিবে সে? তাড়াতাড়ি সে কাপড় মুড়ি দিয়া ঘরের মেঝের উপরই উপুর হইয়া শুইয়া পড়িল।

ঘড়ের বাহিরে তখনও অসময়ের বৃষ্টির জলধারা ব্যথিতের অশ্রুধারার মত ঝর ঝর করিয়া ঝরিতেছিল। বিবাহের পর নয়টি বৎসর কাটিয়াছে তার বাপের বাড়ী,—স্বামীকে চোখের দেখাও সে দেখে নাই, তাঁর আকৃতিও প্রায় ভুলিয়া গিয়াছিল, আজ আঠারো বৎসরের আপনাকে বহিয়া স্বামীর দুয়ারে আসিয়াও তাঁর দেখা মিলিল না! মিলিবার আশাও শীঘ্র নাই!

রাত্রি ভোর হইতে না হইতে দশ বারোজন চাকর জাগিয়া বাড়ীর আর সব লোককে জাগাইয়া অনাদির জিনিষ পত্র ঠিক করিয়া দিতে লাগিল। বাড়ীর চাকর ও বোকজনের লোকে একতলা হইতে তেতলা অবধি ক্রমাগত যাতায়াত করিতেছিল, লতিকার আর ঘরের বাহির হইবার উপায় নাই দেখিয়া সে জানালা খুলিয়া ঘরেই বসিয়াছিল। আকাশ মেঘলা, টিপ্ টিপুনি বৃষ্টি তখনো চলিয়াছে!

লতিকার মাও তার সঙ্গে আসিয়াছিলেন, কিন্তু জামাইএর সঙ্গে সাক্ষাতের অবসর পাইলেন না, সারাদিন সে বাড়ী ছিল না, রাত বারোটায় বাড়ী ফিরিয়া আবার ভোরেই চলিল, কি করিয়া যে তাকে একটু ডাকিয়া পাঠাইবেন তাই তিনি ভাবিতেছিলেন।

তিনি দেখিলেন একটা ছোকরা চাকর খালি চায়ের বাসনভরা একটা ট্রে হাতে করিয়া যাইতেছে, তাকে ডাকিতেই সে দাঁড়াইল।

লতিকার মা বলিলেন "অনাদি বাবু কোথায় ?

"উপরে আছেন"

"একা আছেন,—না আরো কোনো বাবুলোক আছেন ?"

"অনেক লোক আছেন"

লতিকার মা একটু ভাবিয়া দেখিয়া বলিলেন "একটু ডেকে দিতে পারো তাঁকে !

"এখনই ? সকলের সমুখে বল্‌বো ?"

"না, বাবা, যখন একটু ফাঁক পাবে তখনই বলো, রওনা হবার আগে যেন একবার আমার সঙ্গে একটু দেখা করেন"

"বহুত আচ্ছা !"

বলিয়া ঘাড় নাড়িয়া সে ছোকরা যেন হাঁফ ছাড়িয়া পালাইয়া বাঁচিল! এ বাড়ীতে আসিয়া অবধি তো সে বাবুলোক ছাড়া কোনো মা লোকের দেখা পায় নাই! তাই মা লোক দেখিয়া তারা প্রীত হয় নাই, ভীতই হইয়াছিল! পাছে অবাধ স্বাধীনতায় তাদের বাধা পড়ে!

সূর্য্যোদয় হইতে না হইতে তিনখানা মোটর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া চলিয়া গেল; কোন্‌খানাতে যে অনাদি ছিল লতিকা খুব ভাল করিয়া লক্ষ্য করিয়াও তা বুঝিতে পারিল না, কিন্তু সে চলিয়া গেল। বাড়ীর চাকরদের নিশ্চিন্ত ভাব দেখিয়াই বোঝা গেল যে বাড়ীতে কর্ত্তা কেউ নাই!

যাবার সময়েও অনাদি স্ত্রী বা শাশুড়ীর সঙ্গে দেখা করিয়া গেল না, সে ছোকরা চাকরটাও বলিবার সময় পায় নাই, তাই বলিতে পারে নাই! লতিকার মা হতাশ হইয়া চোখ মুছিতে লাগিলেন! তিনি ঠিক করিলেন আবার লতিকাকে ফিরাইয়া লইয়া যাইবেন, যে জামাই একটা মুখের কথা বলিয়া অভার্থনা করিল না যেখানে আর থাকিবেন না!

সন্ধ্যার কাছাকাছি তিনি একখানা গাড়ী ডাকাইয়া লতিকাকে বলিলেন "চল্‌ লতি, আবার বাড়ী যাই,"

"কেন?"

"এখানে আর কি ক'রে থাক্‌বি! অনাদি তো চলে গেল বছর খানেকের জন্যে,— বাড়ীতে কেবল চাকর বাকরের পাল রইল বই তো নয়!"

লতিকা কোনো উত্তর দিল না। অনেকক্ষণ চুপ করিয়া বসিয়া রহিল! মা আবার বলিলেন "আমি তো এই এখনি যাচ্ছি, তুইও ওঠ্‌"

"আমি যদি না যাই মা, আমাকে একা ফেলেই কি তুমি যাবে।"

"তা কি আর পারি? তবে এখানে পড়ে থেকে তো কোনো লাভ নেই, তার চেয়ে যেমন ছিলি তেমনি চল না কেন?"

মায়ের মুখ পানে না চাহিয়া অন্য দিকে মুখ ফিরাইয়া লতিকা বলিল "না"

"কেন? তবে এইখানেই বসে থাক্‌বি নাকি? সঙ্গে সঙ্গে আমাকেও আট্‌কাতে চাস্‌ যে তা হ'লে!"

"তা হ'লই বা! দিনকতক এখানেই থাক না মা! আমার তো এখানে থাক্‌তেই হবে, আমি আর কোথায় যাব?"

মা বুঝিলেন মেয়ের যাইবার ইচ্ছা একেবারেই নাই, আর বেশী কথা বলিয়া তাকে বিরক্ত করিলেন না। রাত্রিটা কাটিয়া গেল।

(৩)

পরদিন বেলা আটটার সময় পুলীনের চাকর আসিয়া বলিল যে "পুলীনবাবু একবার মায়ের সঙ্গে দেখা ক'রতে চান"

বিষণ্ণ মুখে লতিকার মা বলিলেন "আস্‌তে বল"

সলজ্জ সুন্দর বিনীত যুবকটীকে দেখিয়া লতিকার মায়ের মনটা যেন কতকটা সান্ত্বনা পাইল, অনাদির বন্ধুটি অনাদির মতই ঠিক নয় তা হ'লে। পুলীন অনাদির শাশুড়ীকে প্রণাম করিয়া বলিল "বড় দরকারী কাজে অনাদিকে চলে যেতেই হ'ল, যতদিন সে ঘুরে না আসে, ততদিন আপনাদের যখন যা দরকার হবে যে কিছু অসুবিধে হবে তা আমাকে তখনি জানাবেন"

লতিকার মা বলিলেন "তা যত দরকারই থাকুক অনাদির, দুটো দিন দেরী ক'রে বা আমাদের সঙ্গে দু'একটা কথা ব'লে গেলেও তো পারতো,—বিশেষ আমরা ত এখানকার কাউকেই চিনিনে, জানিনে"—

পুলীন কুণ্ঠিত মুখে বলিল "আমাকে তার ভাইএর মত মনে ক'রবেন, আমরা পাঁচজনে আছি আপনাদের কষ্ট কিছুই হ'বে না, হ'লে বল্‌লাম তো আমাকে ব'লে পাঠাবেন!"

"অবশ্যই পাঠাবো, লতিকাকে বাড়ী যাওয়ার কথা বল্‌লাম সে তাতে রাজি নয়, অগত্যা আমাকে থাক্‌তে তো হ'লই, তার ওপর আজ বছর খানেক হতে চল্‌লো ওর শরীর খারাপ!"

"ডাক্তার ডাকাবার দরকার বুঝলে ব'লে দেবেন" বলিয়া পুলীন চলিয়া গেল। বাস্তবিক অনাদির ব্যবহার তারও একটু ভাল লাগে নাই, নম্রতা ভদ্রতায় সে অনাদির চেয়ে অনেক ভালই ছিল। কিন্তু তবু সে স্বার্থ সম্বন্ধ ছাড়াও অনাদিকে যথার্থই ভালবাসিত। তার নিন্দা সহ্য করিতে পারিত না।

দিন পনেরো কুড়ি পরে একদিন লতিকা অসময় লেপ মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল, তার মা বলিলেন "হ্যাঁরে তোর জ্বর এলো বুঝি?"

লতিকা কাঁপিতে কাঁপিতে বলিল "কি জানি, বড্ড শীত করছে তো !"

"তবেই হয়েছে ; এ জ্বর আর তোর কিছুতেই ছারছে না যে দেখছি !"

এক বৎসর ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া একেই তো সে বড় দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, জ্বরে কম্পে সে হাঁপাইতে লাগিল ! সেদিন রান্না ঘর হইতে খাবার আসিলে সে অসুখ হইয়াছে বলিয়া ফিরাইয়া দিল। তার মা ওকে দুবার দুধ খাওয়ার জন্য অনুরোধ করিতে গিয়া শেষটা রাগ করিয়া গিয়া শুইয়া পড়িলেন সে খাইতে চাহিল না।

কিছুক্ষণ পরে একটা চাকর এক বাটি গরম দুধ আনিয়া লতিকার কাছে রাখিল, লতিকা বিরক্ত হইয়া বলিল "কে তোমাকে এ আনতে বললে?"

চাকরটা বলিল "পুলীনবাবু,—তিনি আপনাকে খেতে পাঠিয়ে দিলেন"

"কোনো দরকার নেই, নিয়ে যাও তুমি"

আর কোনো উত্তর না দিয়া চাকরটা দুধ রাখিয়াই চলিয়া গেল। কিন্তু লতিকা তাহা স্পর্শও করিল না। দুর্ব্বল মন দুর্ব্বল দেহে সে ভাবিতেছিল মরিতে পারিলেই বুঝি হাড় জুড়ায় ! কিন্তু যার অভাবে সে মৃত্যুকে বাঞ্ছনা করিতেছে মৃত্যু আসিয়া কি তার সেই অভাব ঘুচাইয়া দিবে ? বিকল মাথায় ঠিক কিছুই বুঝিতে পারিল না ! সে ঘুমাইয়া পড়িল ! ঘুমের ঘোরে কত রকম উলটা পালটা স্বপ্ন দেখিতে দেখিতে প্রবল জ্বরে তার দুই তিন দিন কাটিয়া গেল !

ঘুম ভাঙ্গিয়া দেখিল তার বিছানার কাছে একটা ছোট টীপয়ের উপর কয়েকটা বেদানা, আঙ্গুরের কৌটা ও ঔষধের গ্লাস রহিয়াছে। পাশের ঘরের দুয়ার খোলা, সেখানে পুলীন বসিয়া লতিকার মায়ের সঙ্গে কথা বলিতেছে। তাকে চোখ মেলিতে দেখিয়া তার মা তার মুখের কাছে ছুটিয়া আসিলেন।

পুলীন তাড়াতাড়ি ঔষধের গ্লাসে ঔষধ ঢালিয়া তাকে খাওয়াইতে গেলে সে মাথা নাড়িল, পুলীন নরম গলায় বলিল "খেয়ে ফেল, ছোট বোনটী আমার ! আমার হাতে খেতে লজ্জা করোনা, মনে কর আমি তোমার ভাই"

চোখ বুজিয়া লতিকা ঔষধটা গিলিয়া ফেলিল। কিছুদিন আগে যখন পুণীনের সাংসারিক অবস্থা খুবই খারাপ, সেই সময়ে তার একটী ভগ্নি একরকম চিকিৎসা অভাবে মারা গিয়াছিল, লতিকার রুগ্ন চেহারার দিকে যখনই চোখ পড়িতেছিল, তখনই সে তার সেই বোনটীকে মনে করিতেছিল। সন্ধ্যার সময় লেডি ডাক্তার লতিকাকে দেখিতে আসিলেন। লতিকা একটু অবাক্ হইয়া তাঁর মুখ পানে চাহিয়া রহিল! লেডি ডাক্তারটি প্রবীনা, অনেক রোগীর চিকিৎসা করিয়া তাঁর হাত পাকিয়াছিল। প্রথম দিনই লতিকাকে দেখিয়া তিনি তাঁর আন্দাজ মত বুঝিয়া লইয়াছিলেন যে পয়সাওয়ালা মস্তকহীন যুবকদের ঘরের তরুণী স্ত্রীদের ভাগ্যে এইতো বাঁধাগৎ!

লতিকা খোলা জানালা দিয়া বসন্তের রক্ত রাঙ্গা বিজয় পতাকার মত পলাশ গাছের দিকে চাহিয়াছিল, পুষ্পিত সজিনা গাছের ফাঁক দিয়া রৌদ্র আসিয়া তার চোখে লাগিতেছিল বলিয়া সে চোখের উপর হাত আড়াল করিয়াছিল, লেডি ডাক্তার জানালাটা বন্ধ করিয়া লতিকার বুক পিঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন!

লতিকা তাঁর মুখ পানে চাহিয়া বলিল "কি দেখলেন? বলুন তো আমি বাঁচ্‌ব না ম'রবো?"

"কি চাও তুমি পাগল মেয়ে?"

"আমি কিছুই চাইনে"

"সেরে যাবে, বেশী দেরী হবে না"

হতাশ ভাবে লতিকা বলিল "সারতে তো আমি চাইনে, আমার সারতে ভাল লাগে না!"

লেডি ডাক্তার বলিলেন "ছিঃ ওরকম পাগলামী ক'রোনা! কি হয়েছে তোমার? কিছুই তো ভয় নেই।"

বিরক্ত হইয়া লতিকা মুখ ফিরাইল। তার আর কথা বলিতে ইচ্ছা করিল না। রোগে রোগে ক্লান্ত হইয়াই তো সে সারিতে আসিয়াছিল, ব্যার্থ নারী প্রাণের তৃষ্ণা লইয়া যে জল পরশে জুড়াইতে আসিয়াছিল তার আসা মাত্রই যে তার অদৃষ্টে তাহা শুকাইয়া গেল—

সাগর শুকালো, মানিক লুকালো অভাগী করম দোষে!"

(৪)

অনাদিকে জরুরি টেলিগ্রাম করিয়া পুলীন উত্তরের আশায় বসিয়াই ছিল তার এখন চলিয়া আসাই যে উচিত বারংবার পুলীন এই কথাই তাকে লিখিতেছিল, কিন্তু সব চিঠির জবাবই আসে না! অনাদির লিখিবার সময় হয় না! স্ত্রীর অসুখের কথায় অনাদির আসন টলিবে না জানিয়া অগত্যা পুলীন নিজের অসুখ জানাইয়া টেলিগ্রাম করিল; কেন না তার ব্যারাম হইলেই দোকান অচল হইবে, দোকান বন্ধ হইলে আর অনাদির খরচ চলিবার কোনো উপায় নাই!

বারান্দার ইজি চেয়ারে শুইয়া পুলীন যখন অনাদির উত্তরের প্রত্যাশা করিতেছিল সেই সময়ে লতিকাকে দেখিয়া দুইজন ডাক্তার তার কাছের চেয়ার টানিয়া বসিলেন। সে বলিল "কেমন দেখলেন?"

ডাক্তারেরা গলার স্বর নামাইয়া পুলীনের কথার উত্তর দিলেন, তাঁদের মুখও প্রসন্ন ছিলনা, পুলীন বলিল "এমন সিরিয়াসের কথা তো আপনারা পূর্ব্বে বলেন নি?"

"ক্রমাগতই তো বল্‌ছি,—ওঁর স্বামীকে এই খবর কি আপনি জানান নি?"

"জানিয়েছি বই কি? কিন্তু তবুও শেষ সময়ে তার সঙ্গে যে দেখা হবে এমন তো মনে ক'রতে পারছিনে; এর জন্যে তো মিথ্যের আশ্রয় নিতেও বাধ্য হলাম তবু!"

"ঈশ্বরের ইচ্ছা। তবে এঁর স্বামী থাক্‌লে চিকিৎসা শুশ্রূষা এসব তিনি নিজের চক্ষে দেখে সান্ত্বনা পেতে পারতেন!"

পুলীন বলিল "চিকিৎসা বা শুশ্রূষা বিষয়ে কি আপনারা আরো বেশী কিছু হওয়া উচিত মনে করেন? তা হ'লে সে জন্যে তো কিছু আটকাবে না, বললেই হ'তে পারে।"

"আর সে সময় নেই, তবে প্রথমে যেদিন আমরা দেখি, তার আগেই চিকিৎসা হওয়া উচিত ছিল বই কি?"

"তার আগে তো উনি এখানে ছিলেন না, সুতরাং সে কথা বলিতে পারি না" বলিয়া পুলীন চেয়ারে সোজা হইয়া বসিল। চাকরে অনাদির টেলিগ্রাম আনিয়া দিল। ব্যস্ত ভাবে লেফাপা ছিঁড়িয়া পুলীন পড়িল, অনাদি তিন চার সপ্তাহ পরে রওনা হইবে যদি ইতিমধ্যে পুলীনের সুস্থ সংবাদ না পায়!

টেলিগ্রাম হাতে করিয়া সে রুগীর ঘরে গিয়া ঢুকিল! লতিকা তখন খুব বেশী জ্বরের ঝোঁকে প্রলাপ বকিতেছে, লাল জবাফুলের মত চোখ দুটীতে ক্রমাগত জল গড়াইয়া

পড়িতেছে, বিছানার একপাশে চেয়ারের উপর লেডি ডাক্তার গালে হাত দিয়া বসিয়া আছেন। তাঁর মুখও শুষ্ক উদাস !

পুলীন লতিকার মায়ের কাছে গিয়া অনাদির টেলিগ্রামের কথা বলিল। তিনি বলিলেন, "তিন চার সপ্তাহ, মানেও তো এক মাস!"

পুলীন বলিল "মাসখানেকের মধ্যে অনাদি এসে পৌঁছুতে পারতো ! লতিকা চুপ করিয়া মায়ের মুখপানে চাহিয়া শুনিতেছিল, পুলীন চুপ করিবামাত্র সে আর্ত্তগলায় লেডি ডাক্তারের দিকে চাহিয়া বলিল "আমাকে আর একমাস বাঁচাতে পারেন ? একটী মাস মোটে।"

কিন্তু তখন আর তার একটী দিনেরও আয়ু নাই, সমস্ত তেল পুড়িয়া সলিতাটুকু জ্বলিতে-ছিল মাত্র ! নেভে নাই কেবল আশা আকাঙ্ক্ষার অনির্ব্বাণ শিখা, জন্ম জন্মান্তরেও যাহা মানুষকে তাড়া করিয়া করিয়া দাহ করে !

মাস খানেক পুলীনের খবর না পাইয়া চিন্তিত বিরক্ত, অনাদি যখন ফিরিয়া আসিল, তখন দোকানঘর প্রায় বন্ধ, পুলীন শরীর সারিতে পশ্চিমের বায়ু পরিবর্ত্তনে গিয়াছে ! কেবল বিষণ্ণমুখ চাকরগুলি সেই শ্রীহীন বাড়ীখানার এদিক ওদিক ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল !

শ্রীনীহারবালা দেবী।

গ্রন্থ-সমালোচনা।

টলষ্টয়ের গল্প,—শ্রীযুক্ত দুর্গামোহন মুখোপাধ্যায়, বি এ, সঙ্কলিত। মেসার্স মুখার্জ্জি বোস এণ্ড কোং, ১ কর্ণওয়ালীস ষ্ট্রীট, কলিকাতা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ১০৬ পৃঃ রেশমী কাপড়ের সুন্দর বাঁধাই। ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট। মূল্য ১৲ টাকা। প্রসিদ্ধ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ মহাশয় ইহার ভূমিকা লিখিয়াছেন।

জগত বিখ্যাত টলষ্টয়ের পরিচয় নূতন করিয়া প্রদান করা অনাবশ্যক। তাঁহার ন্যায় প্রতিভাবান উপন্যাসিক, বিশ্বপ্রেমিক, দরিদ্রবান্ধব, সমাজসংস্কারক জগতে দুর্ল্লভ। 'তিনি দরিদ্র-নারায়ণের সেবায় আত্মোৎসর্গ করিয়াছিলেন। কায়মনবাক্যে তিনি দরিদ্র ও দুঃস্থ লোকদিগের উপকার ও সাহায্য করিবার জন্য স্বকীয় অর্থ অকাতরে ব্যয় করিতেন। 'তিনি প্রধানতঃ দ্বিবিধ উপায়ে দরিদ্র ও অশিক্ষিত কিংবা অর্দ্ধ শিক্ষিত লোকদের সেবা করিতেন। প্রথমতঃ তাহাদের সঙ্গে একত্রে শারীরিক পরিশ্রম করিয়া ; দ্বিতীয়তঃ—খুব সহজ ভাষায় লিখিত ধর্ম্মোপদেশ প্রদানে তাহাদের চরিত্র ও মনুষ্যত্বের বিকাশ করিয়া। জনসাধারণের শিক্ষার

জনাই তাঁহার এই গল্প লেখা।' মনুষ্য চরিত্রে তাঁহার অভিজ্ঞতা, মানুষের চরিত্র-দৌর্ব্বল্যে তাঁহার আন্তরিক সহানুভূতি, দরিদ্রের দুঃখে করুণা বিগলিত তাঁহার খৃষ্টতুল্য প্রাণের প্রার্থনা, তাঁহার গল্পগুলিতে প্রকটিত হইয়া তাঁহার ছোট গল্প জগতের অতুলনীয় করিয়াছে। এগুলি বাস্তবতায় যেরূপ খাঁটি, সাহিত্য-শিল্পেও তদ্রূপ অনিন্দ্য। এরূপ গল্পের অনুবাদ সর্ব্ব ভাষায় বাঞ্ছনীয়; দুর্গামোহনবাবু ইহার কয়েকটীর বাঙ্গলা অনুবাদ করিয়া মাতৃঋণ পরিশোধে ধন্য হইয়াছেন। তাঁহার ভাষা সুন্দর, প্রাঞ্জল, গতিশীল, পাঠ কালে অনুবাদ বলিয়া মনে হয় না। এরূপ অনুবাদের আদর হইবে নিশ্চয়,—আমরা আশা করি গ্রন্থকার আমাদিগকে টলষ্টয়ের আরও রচনা উপহার দিয়া আনন্দিত ও উপকৃত করিবেন।

নাটক ও নাটকের অভিনয় ও অন্যান্য প্রবন্ধ,—রচয়িতা ৺ক্ষেত্রনাথ ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক—গ্রন্থকারের পুত্র শ্রীযুক্ত অবনিনাথ ভট্টাচার্য্য,—এম-এ, বি-এল, ১০৬.৩ আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডঃ ক্রা ১৬ পেজি ৯০ পৃষ্ঠা। মূল্য ॥০ আনা। কাগজের মলাট,—ছাপা কাগজ সুন্দর।

৺ক্ষেত্রনাথবাবু এক সময়ে এডুকেশন গেজেটের সম্পাদক ছিলেন। এই প্রবন্ধগুলি উক্ত গেজেটে প্রকাশিত হয়,—শ্রীযুক্ত অবনিবাবু তাহা পুস্তকাকারে পুনর্মুদ্রিত করিয়া সকলের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। প্রবন্ধগুলি সুচিন্তিত ও সুলিখিত। নাটক ও উপন্যাসে পার্থক্য কোথায়; নাটকের প্রকৃতি ও বিশেষত্ব কি—এ সকল অতি সুন্দর ভাবে ইহাতে বিশ্লেষিত হইয়াছে। গ্রন্থকার দীনবন্ধুবাবুর নাটক অবলম্বনে তাঁহার উক্তি পরিস্ফুট করিয়াছেন,—তাঁহার চরিত্র বিশ্লেষণ সূক্ষ্ম দৃষ্টির পরিচায়ক। অভিনয় এবং বাঙ্গলা নাটক রচনায় উন্নতি প্রভৃতি আবশ্যকীয় বিষয়ের আলোচনা ও বিদ্যাসাগর মহাশয়ের "ভ্রান্তি বিলাস" এবং বিহারীলাল চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের 'বঙ্গসুন্দরী' কাব্যের সমালোচনা এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এরূপ গ্রন্থ বঙ্গীয় পাঠক সমাজে সমাদর লাভ করিবে আমাদের আশা,—এ শ্রেণীর আলোচনা যত বেশী প্রকাশিত ও পঠিত হয় ততই মঙ্গল।

প্রদোষ-সংবাদ,—একটি শিশুর ক্ষুদ্র জীবন কাহিনী। শ্রীআনন্দমোহন সাহা রচিত। প্রদোষকুমার—আনন্দমোহনবাবুর পুত্র। অকালে প্রাণের দুলাল, সংসারের সুখ, বন্ধন হারাইয়া শোকসন্তপ্ত পিতা হৃদয়ের সমস্ত পুঞ্জিভূত হাহাকার মূর্ত্ত করিয়া যে শোক গাথা রচনা করিয়াছেন—তাহা সমালোচনার অতীত—তাহা নির্ব্বিচারে অন্তরে অন্তরে অনুভব করিবার। আমরা তাঁহার শোকে সহানুভূতি জ্ঞাপন করিয়া, সেই সর্ব্বসন্তাপহারীর নিকট করজোরে প্রার্থনা করিতেছি—তিনিই পুত্রহারাকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
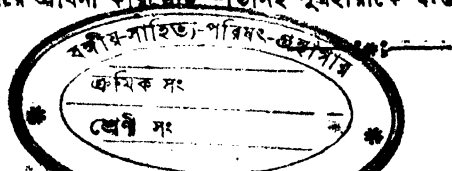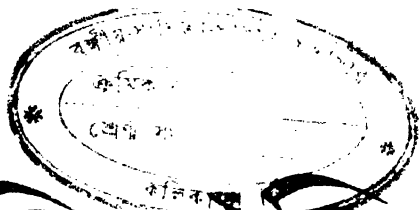
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

৫ম বর্ষ। } ফাল্গুন, ১৩২৭ সাল। { ১ম খণ্ড, ৪র্থ সংখ্যা।

তুমি ও আমি।

—:*:—

হয়তো গোপনে বসিয়া বিরলে একা
রাখিয়া সুমুখে স্বর্ণ মুকুরখানি,
যতনে আঁকিছ সীঁথীর সীমার রেখা—
অথবা দিতেছ অঞ্জন চোখে টানি'।

আমি যে এখানে বসি' বাতয়ান পাশে
বিষাদ নয়নে চাহি আকাশের পানে,
জানি না কেন যে নয়নে অশ্রু ভাসে—
ব্যথিত হৃদয় কেন নাহি বাধা মানে!

সিক্ত বসনে কণক-অঙ্গ ঢাকি'
হয়তো এখন ফিরিছ সখীর সাথে,
আর্দ্র-চরণ-চিহ্ন পিছনে আঁকি
ধন্য করিছ ধূলিকা চরণ পাতে।

পেলব-অঙ্গ-পরশ হারাবে বলি'
বসন তোমার কাঁদিয়া কাঁদিয়া মরে,
পথ মাঝে তাই যখন যেতেছ চলি'
বসন-প্রান্ত ভিজায়ে অশ্রু ঝরে।

এখানে আমার নীরব নয়ন লোর
করুণ কপোলে এঁকেছে বিষাদ রেখা,
সন্ধ্যার মত উদাসী হৃদয় মোর
বুকের ভিতরে কাঁদিয়া মরিছে একা।

জ্যোছনা নিশায় যখন শয়ন 'পরে
স্বপনের কোলে আবেশে ঘুমায়ে রবে,
আধ বিকশিত অধরে ক্ষণিক তরে
স্বপন-মিলন-হাসিটী ফুটিবে যবে;

তখন হয়তো জ্যোছনা-ধৌত রাতে
নীরবে নিরালা বসিয়া আপন ঘরে
বিরহ-বিধুর-মলিন অশ্রু পাতে
তোমারি মুরতি আঁকিব মানস 'পরে।

স্বপনের শেষে যখন জাগিবে তুমি
বিহগের তানে আকুলিবে যবে প্রাণ,
তখ — স্বপনে কেন সে গিয়াছে চুমি'—
এ কথা স্মরিয়া করিবে কি অভিমান ?

তখন এখানে আমার অলস আঁখি
হেরিবে বিফল রজনী হ'য়েছে ভোর,
তুমি কি তখন নয়নে অশ্রু মাখি'
বলিবে—রজনী সার্থক আজি মোর ?

শ্রীরেণুকা দাসী

চিররহস্য সন্ধানে।

:০:-

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ।

নিরুপায় ভাবে দাঁড়াইয়া এল র্যামি শুনিতে লাগিলেন ; সদর দ্বার মুক্ত ও পুনরায় অর্গল বদ্ধ হইল,—তৎপরে ক্ষণকাল স্তব্ধ,—পরে বহির্দালানকক্ষে দৃঢ় চরণক্ষেপ-শব্দ,—এ সমস্ত তাঁহার সজাগ কর্ণে প্রবেশ করিল। পরক্ষণেই ফেরাজ পুনঃপ্রবিষ্ট হইল,—সঙ্গে তেজঃপুঞ্জকায় এক দীর্ঘবপু মহাপুরুষ,—তাঁহার আভূমিচুম্বিত অঙ্গ-চ্ছদটী বর্ষাবারিসিক্ত, মস্তক ও মুখমণ্ডল উক্ত পরিচ্ছদের একাংশে অর্দ্ধ বৃত।

"নমস্কার এল র্যামি জ্যারানোস্"—মৃদু গম্ভীর স্বরে উচ্চারিত হইল—"এঃ, সমস্ত ভিজে গিয়েছে ; দালানেই এগুলো খুলে আসা উচিত ছিল কিন্তু আমি ঠিক জানতাম না যে তুমি এখানে একলা আছ"—বলিতে বলিতে আর্দ্র বহিরাবরণগুলি উন্মোচন করিয়া তিনি ফেরাজের হস্তে প্রদান করিলেন এবং সন্ন্যাসীবেশে আত্মপ্রকাশ করিয়া প্রফুল্লকণ্ঠে বলিলেন—"তা' ছাড়া,

আমাকে অতিথিরূপে গ্রহণ করতে তুমি স্বীকৃত হবে কিনা সে বিষয়েও আমি নিশ্চিত ছিলাম না।"

"আপনার ন্যায় অতিথিকে গ্রহণ করতে আমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত"—ইতস্ততঃ সহকারে সম্মুখে অগ্রসর হইয়া, কেমন একপ্রকার সঙ্কোচের সহিত তিনি বলিলেন—"এ তো আমার সৌভাগ্যের কথা। আপনার আগমন এ দীন-কুটীরখানিকে গৌরবান্বিত তো করেছেই, সেই সঙ্গে আশীর্ব্বাদও বহন করে এনেছে।"

"বেশ গুছিয়ে বলেছো এল র‍্যামি!" ঈষদ্দীপ্ত-নয়নে সন্ন্যাসী বলিলেন—"এমন সুন্দর বক্তৃতা কোথায় শিখ্‌লে? যতদূর মনে পড়ে, আগে তুমি অসংযত-বাক্ অবাধ্য স্বভাবেরই লোক ছিলে,—এখনও দেখ্‌ছি, বিনয় জিনিসটা তোমার প্রকৃতির সঙ্গে ঠিক খাপ খায়নি, অর্থাৎ তোমার অভ্যস্ত ধর্ম্ম হয়ে ওঠেনি।"

এল র‍্যামির মুখ রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল, কিন্তু তিনি উত্তর করিলেন না। এই প্রশান্ত-দর্শন, উন্নত-ললাট, ভক্তি-সৌম্য-আনন ও তেজপুঞ্জ-কলেবর যোগীপুরুষটীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া একমুহূর্ত্তেই তাঁহার ক্ষুদ্রত্ব যেন স্পষ্ট হইয়া উঠিল। দারুপাত্র ও অন্যান্য আহার্য্য-সহ ফেরাজ অগ্রসর হইয়া আসিল, কিন্তু স্মিতাননে অসম্মতি জ্ঞাপন করিয়া আগন্তুক সাগ্রহ-স্নেহে ফেরাজকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন; পরে বলিলেন:—

"ছেলেটী বেশ বড় হ'য়ে উঠেছে তো এল র‍্যামি! সাইপ্রাস দ্বীপে যখন আমাদের কাছে সঙ্গীতাদির আলোচনা শুনতে গিয়েছিল, তখন ছোট্টটী দেখেছিলাম। যুবকের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল,—তবুও তোমার ক্রীতদাস?"

এল র‍্যামির মুখভাবে একইকালে অতুনয় ও অপ্রসন্নতা প্রকাশ পাইল।

"আপনি ভুল কচ্ছেন"—তিনি বলিলেন—"ফেরাজ আমার সহোদর ও সুহৃৎ, এ অবস্থায় ক্রীতদাস হ'তে পারে না। বাতাসেরই মত সে স্বাধীন।"

"কিম্বা ঈগল-পক্ষীরই মত পুনঃ পুনঃ শৈল-নীড়ের পানে ছুটে আস্‌তে অভ্যস্ত"—ঈষৎ হাসিয়া আগন্তুক উত্তর করিলেন—"এক্ষেত্রে তুমিই সেই নীড়, আর পাখীও বেশীক্ষণ অনুপস্থিত থাকৃতে পারে না।"—ঠিক এই সময়, কি-এক-অজ্ঞাত-প্রেরণায় পরিচালিত হইয়া

ফেরাজ এই মহাপুরুষটীর সম্মুখে নতজানু হইয়া বসিল। চকিতে তৎপ্রতি দৃষ্টিনিক্ষেপ করতঃ সন্ন্যাসী বলিলেন—"কি বালক, কি চাও?"

"আপনার আশীর্ব্বাদ,"—কুণ্ঠিতভাবে ফেরাজ বলিল। "আমি শুনেছি যে আপনার স্পর্শ শান্তিপ্রদ,"—আর আমি—আমি বড় দুঃখী, বড়ই অশান্তি কাতর।"

"পৃথিবীতে ঝড়ের মধ্যেই যে আমরা বাস করি, বৎস"—করুণাভরা চক্ষে ফেরাজের দিকে চাহিয়া স্নেহার্দ্রস্বরে তিনি বলিলেন—"এখানে অতীন্দ্রিয় চেতনায় ছাড়া আর কোনোখানেই শান্তি নেই। এ শান্তি তোমার ঐ উন্মেষিত যৌবন, ঐ প্রফুল্ল স্বভাবের মধ্যে অবশ্যই নিহিত আছে,—যদি তা' না থাকে প্রার্থনা করি, ভগবান তোমাকে যেন তা' দান করেন! এর চেয়ে ভাল আশীর্ব্বাদ আমি জানিনে।"

আগন্তুক যুবকের মস্তকে হস্তার্পণ করিলেন,—সে স্পর্শে ফেরাজের সর্ব্বশরীর যেন পুলক-কণ্টকিত হইয়া উঠিল; মনে হইল যেন কোন্ বুকজুড়ানো স্বচ্ছন্দ সুধা-প্রবাহ তাহার শিরায় শিরায় সঞ্চারিত হইতেছে।

"আজও কি সরল, কি শিশু-স্বভাব, তোমার এই কনিষ্ঠ সহোদরটী!" সহসা এল র‍্যামির দিকে ফিরিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"সে আশীর্ব্বাদের প্রার্থী, কিন্তু তুমি এ-সব প্রয়োজন ছাড়িয়ে গিয়েছ!"

এল র‍্যামি চোখ তুলিয়া চাহিলেন,—রুদ্ধ যাতনা ও গর্ব্বে পরিপূর্ণ দুটী কৃষ্ণতার চক্ষু,—কিন্তু উত্তর করিলেন না। সন্ন্যাসী স্থির দৃষ্টিতে তাঁহাকে লক্ষ্য করিলেন এবং একটী চকিত দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করিয়া বলিলেন:—

মার্জ্জনা জুড়ায় বটে, লুপ্ত তবু নাহি করে মরমের ক্ষত!"—বাস্তবিকই, ক্ষমা করা সহজ, কিন্তু বিস্মৃত হওয়া বড়ই কঠিন। অনেক কথা তোমাকে বলবার আছে এল র‍্যামি,—কারণ পৃথিবী থেকে বিদায় গ্রহণ করবার পূর্ব্বে এই আমার শেষ সাক্ষাৎ।"

অজ্ঞাতসারে ফেরাজ একটা অস্ফুট শব্দ করিল।

"কি বল্‌ছেন আপনি," রুদ্ধ শ্বাসে সে জিজ্ঞাসা করিল—"মৃত্যু সম্ভাবনা আপনার বক্তব্যের উদ্দেশ্য নয় বোধ হয়?"

"নিশ্চয়ই না!" স্নিগ্ধহাস্যে সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"জীবন সম্ভাবনাই আমার বক্তব্যের উদ্দেশ্য। কোনো কোনো লোক একে মৃত্যু বলে বটে, কিন্তু আমরা আরও কিছু বেশী জানি,—জানি যে মৃত্যু অসম্ভব।"

"কিন্তু নিশ্চয় করে' বলা যায় না"—এল র‍্যামি বলিতে যাইতেছিলেন। বাধা দিয়া সন্ন্যাসী প্রফুল্ল কণ্ঠে বলিলেন—"সে তোমার নিজের সম্বন্ধে, বন্ধু! কিন্তু আমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিঃসংশয়—আমার শিষ্যসম্প্রদায়ও তাই। ধূলা যে পরিমাণে ধ্বংসশীল, আমার গঠনোপাদানে তদপেক্ষা ধ্বংসশীল কিছুই নেই। প্রত্যেকটী ধূলিকণা জীবন-বীজে পরিপূর্ণ,—আমিও সেই ধূলির সমধর্ম্মী; আমিও সেই জীবন-বীজের অধিকারী, যা' অনন্ত-কাল ধরে পুনঃ পুনঃ প্রসারিত হ'য়ে চলে।"

সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে এল র‍্যামি তাঁহার অতিথির দিকে চাহিলেন। শারীরিক সামর্থ্য ও জীবনী-শক্তির মূর্ত্ত প্রতিরূপ হইয়াও তিনি কিনা আপনাকে তুচ্ছ একটী ধূলিকণার সহিত তুলনা করিলেন! সে ধূলি আবার জীবন-বীজে পরিপূর্ণ!—হাইতো! তবে কি সত্যই এ ব্রহ্মাণ্ডে এমন কিছু নাই; এমন একটীও তুচ্ছতম বা ক্ষুদ্রতম কিছু নাই; যাহার সম্পূর্ণ উচ্ছেদ সম্ভব? লিলিথ যে বলিয়াছেন 'জগতে মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই,' সে কি তবে সত্য কথা? অধীর উৎকণ্ঠার সহিত এল র‍্যামি বারংবার প্রশ্নটাকে মনোমধ্যে আন্দোলিত করিতে লাগিলেন; এতই নিবিষ্ট চিত্তে বিষয়টীর কথা তিনি ভাবিতেছিলেন যে, তাঁহাদের উভয়কে একত্র রাখিয়া ফেরাজ যখন কক্ষ ত্যাগ করিয়া গেল, তখন তাহার দ্বার-রুদ্ধ-করার অল্প একটু শব্দেই তিনি প্রবলভাবে চমকিয়া উঠিলেন।

ক্ষণকাল নিঃশব্দে কাটিল। সন্ন্যাসী এল র‍্যামির আপন চেয়ারখানিতে নীরবে উপবিষ্ট এবং এল র‍্যামি পার্শ্বে দণ্ডায়মান; ভাবে বোধ হইতেছে, যেন তিনি কিছুর অপেক্ষা করিতে-ছেন,—অথচ তাঁহার দৃষ্টিতে অনুনয় ও অহঙ্কার একইকালে প্রকাশ পাইতেছে। বাহিরে ঝড় ও বৃষ্টি প্রবলবেগেই চলিয়াছে এবং কক্ষাভ্যন্তরে উজ্জ্বল আলোক-দীপ্তি অনাড়ম্বর পাঠ-গৃহ-খানিকে নয়নরম্য করিয়া তুলিয়াছে। অবশেষে সন্ন্যাসীই এই গাঢ় নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিলেন।

"আমার আগমনে বোধ হয় তুমি একটু আশ্চর্য্য হ'য়েছো"—ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন—"বিশেষতঃ সে আগমন যখন এমন কোনো লোকের কাছে, যে আমাদের প্রীতি-বন্ধন ছিন্ন করে' পলাতক, এবং যে আমাদের শ্রেষ্ঠতম ও পবিত্রতম গোপনীয়তাটীকে কাজে লাগিয়ে স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে জীবন আর প্রকৃতির মধ্যে থেকে বৈজ্ঞানিক উপাদান সংগ্রহের চেষ্টায় আছে। হয়তো তুমি মনে করেছো যে ঐ খবরই আমি নিতে এসেছি—হয়তো ভেবেছো যে তোমার অতিপ্রাকৃতিক উচ্চাশা সম্ভূত বৈজ্ঞানিক-অনুসন্ধানের ফলাফলই জানতে এসেছি,—হায়, হায়, এল র‍্যামি! আমার সম্বন্ধে কিছুই তুমি জানো না! .... আরাধনা আমাকে যে-বিজ্ঞানে দীক্ষা দিয়েছে, তোমাদের ঐ বিজ্ঞান-শাস্ত্রের অধিকার কোনোকালেই সেখানে পৌঁছুতে পারবে না—তোমার সারা-জীবনের কার্য্য-তালিকায় এমন কোনো বিষয়ই নেই যা' আমি বুঝতে অক্ষম—সৌরমণ্ডল-বহির্ভাগের এমন একটী সংবাদও তুমি আমাকে দিতে পার না যা' আমার কাছে নতুন। অথবা সম্ভব হলে, তোমাকে রক্ষা করতে।"

দারুণ বিস্ময়ে এল র‍্যামির কৃষ্ণ-তার নয়ন-যুগল বিস্ফারিত হইয়া উঠিল। "আমাকে রক্ষা করতে?" তিনি প্রতিধ্বনি করিলেন—রক্ষা? কি থেকে? আমার কাছে এরকম কোনো উদ্দেশ্যে আগমনের প্রয়োজন তো বেশ বোধগম্য হ'চ্ছে না!"

"হ'চ্ছে না, তা'র কারণ তোমার আত্মম্ভরিতা,—হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই"—তিরস্কারের স্বরে সন্ন্যাসী বলিলেন—"কারণ তুমি দেখবে না যে, চিরন্তন রহস্য-যবনিকা সাধারণ লোকের জীবনের দিক থেকে তোমার কাছে যদিও বা একটু উত্থিত হ'য়ে থাকে, তবু তোমার নিজের জীবনের সামনে তা' গাঢ়-ছায়াময় হয়েই আছে,—তোমার অন্তর্দৃষ্টি তা' ভেদ করতে অক্ষম। এ তথ্য তুমি বুঝবে না যে, অপরের মনোবৃত্তি বিশ্লেষণ করিবার শক্তি আয়ত্তীভূত হলেও, নিজের বৃত্তি বোঝবার শক্তি তোমার নেই। রহস্যের বিপরীত প্রান্ত থেকে তুমি কার্য্য আরম্ভ করেছো এল র‍্যামি,—তোমার উচিত ছিল, আগে আপন রিপু-গুলিকে আয়ত্তাধীন করা এবং তৎপরে অন্যের দিকে দৃষ্টিপাত করা। ফলে, বিপদ-প্রায় তোমার সামনে এসে পড়েছে—এই বেলা সময় থাকতে থাকতে সাবধান হও,—নিদান-কাল উপস্থিত হবার আগে সত্যকে স্বীকার করে নাও।"

অধীর সন্দেহে কথাগুলি শুনিয়া, বিরক্তিপূর্ণ কণ্ঠে এল র্যামি বলিলেন—"সত্যকে স্বীকার কর্ব্ব? কোন্ সত্য? সর্ব্বত্র, সকল সময়ে সত্যকেই কি আমি খুঁজে বেড়াচ্ছিনে? সত্যকেই কি প্রমাণ কর্ত্তে চাইছি নে? যে-কোনো সত্যই আমাকে অবলম্বন করতে দিন না, মজ্জমান ব্যক্তির রজ্জু ধারণের মতই প্রাণপনে আমি তাকে আঁকড়ে ধরবো!"

দুঃখ ও করুণা-মিশ্রিত স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে ক্ষণকাল এল র্যামিকে নিরীক্ষণ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"এতকাল পরে এখনও কি তুমি সেই 'পাইলেটের' প্রশ্নই উত্থাপন করছো?"

"হাঁ,—এখনও 'পাইলেটের' প্রশ্নই উত্থাপন করছি!" স্পর্দ্ধাভরে এল র্যামি বলিলেন—"আপনারই কথা ধরি,—জানি, আপনি মহৎ, জ্ঞানী, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ পরম পণ্ডিত ব্যক্তি; কিন্তু এত পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও যে দেবতার আপনি দাস, তিনি মানবীগর্ভসম্ভূত মনুষ্যমাত্র! এটা বাস্তবিকই আমার কাছে অস্বাভাবিক, অসমঞ্জস, প্রহেলিকাবৎ মনে হয়। স্বীকার করি, আপনার দেবতা আদর্শ মহাপুরুষ,—তাঁর নামে কোনো শপথ করলে সে শপথ হয়তো আমি প্রাণপনে রক্ষাও কর্‌বো; কিন্তু তাঁর দেবত্বে কোনোমতেই আমি বিশ্বাস স্থাপন কর্ত্তে পারি না—না, কোনোমতেই না!—তবে এটুকু স্বীকার করি যে, আমাদের সকলেরই মধ্যে যে-হিসাবে দেবত্ব আছে সে হিসাবে তিনও দেবতা,—তদতিরিক্ত কিছুই নন। নারীগর্ভজাত একজন,—সে কিনা জগৎ-ত্রাতা! কল্পনাটা উচ্চদরের বটে, কিন্তু একেবারেই অলৌকিক!"

অধীরভাবে কক্ষমধ্যে কয়েকবার পাদচারণ করিয়া পুনরায় তিনি আরম্ভ করিলেন—"যদিও বা একথা আমি বিশ্বাস কর্ত্তে পার্ত্তাম—'যদি'র কথা বলছি,—তবু এরকম একটা কার্য্যকে কোনোমতেই বিশেষ কিছু মনে করা আমার পক্ষে সম্ভব হ'ত না। কারণ, প্রত্যেক ব্যক্তিগত মানবজীবনই তা'র জাতীয় জীবন বা ধর্ম্ম সংস্কার করতে সক্ষম।"

"তোমার মতন?" শান্তস্বরে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন। "তুমি কি করেছো, শুনি?"

"আমি কি করেছি?" এল র্যামি বলিলেন—"কেন—কিছুই না! আপনি ভাবেন যে আমি গর্ব্বী, আমি উচ্চাভিলাষী,—কিন্তু তা' নয়; আমি জানি যে আমার জ্ঞান অতি সামান্য। প্রমাণের কথা বলতে গেলে—কিন্তু যাক্, একক্ষেত্রেও ঐ একই উত্তর,—কিছুই আমি প্রমাণ করিনি।"

"তবে? সমস্ত পরিশ্রম তা' হলে ব্যর্থ হয়েছে তোমার?"

"কিছুই ব্যর্থ হয় না,—এমন কি আপনার যুক্তিতেও এইকথা বলে। আপনার যুক্তি—তা'দের অনেকগুলি—বেশ সুন্দর এবং হৃদয়গ্রাহী সন্দেহ নেই; বিশেষ, ঐ যে কথাটী, যাতে নাকি বলেন যে প্রকৃতির ভাণ্ডার থেকে একটী শব্দ কিম্বা একটু গন্ধ পর্য্যন্ত নষ্ট হয় না, এটীকে আমি যথার্থ বলেই বিশ্বাস করি। কিন্তু আপনার সমস্ত উপদেশ গ্রাহ্য করা আমার পক্ষে অসম্ভব। আপনার সঙ্গে সম্বন্ধ যে আমি নিঃশেষ করে দিয়েছি তা'র কারণ, আমার আত্মা আপনার সমস্ত অভিমতের ছাঁচে আপনাকে ঢালাই করতে পারেনি। এ বিদ্রোহ নয়—না, তা' আপনি বলতে পারেন না! কারণ, আপনার ওপর আমার শ্রদ্ধা বা ভালবাসা যথেষ্টই ছিল,—এমন কি আজ পর্য্যন্ত আমি আপনাকে এতই শ্রদ্ধা করি যে কোনো জীবিত ব্যক্তিকেই সে রকম করতে পারিনে; কিন্তু তাই বলে' যে গণ্ডিকাটকে আপনি অত্যাবশ্যকীয় মনে করেন তা'র মধ্যে গলা বাড়িয়ে দেওয়ায় আমার প্রবৃত্তি সায় দেয় না। আপনাকে দীন মনে করে', সর্ব্বপ্রথমে আপন দৌর্ব্বল্য স্বীকার করে', তবে কার্য্য আরম্ভ করতে হবে!—নিশ্চয়ই না!—অক্লান্ত উচ্চাভিলাষই শক্তির জনক, আভূমি-প্রণত বশ্যতা নয়।"

"এ বিষয়ে মতভেদ আছে—" ধীরকণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন—"কিন্তু সে যাই হোক্, তোমার উচ্চাভিলাষে বাধা দেবার চেষ্টা কোনোকালেই আমি করিনি,—আমি শুদ্ধ বলেছিলাম ঈশ্বরকে তোমার সঙ্গে নাও; তাঁকে বাইরে ফেলে রেখো না; তিনি আছেন। আছেন বলেই, তাঁ'র অস্তিত্ব সকল কার্য্যে সকল বিষয়েই জড়িত করে নিতে হবে,—এমন কি, একবিন্দু শিশিরের যদি বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করবার দরকার হয়, তা'হলেও ঈশ্বরকে বাদ দেওয়া চলবে না। তাঁকে বাইরে রাখলে সমস্ত চেষ্টা ভস্মে ঘি ঢালা'ই হবে—সকল রহস্যের চাবীটীই বাদ পড়বে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যেতে পারে, তুমি নিজেই আজ এক রুদ্ধদ্বারে আঘাত করছো,—এমন একটা শক্তির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়েছো যা' তোমার চেয়ে যথেষ্ট পরিমাণে প্রবল।"

"ঈশ্বরের প্রমাণ চাই আমি!" পরিচ্ছন্ন সতেজকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"প্রকৃতি আপন অস্তিত্ব প্রমাণ করছে; ভগবানও তেমনি আপনাকে সপ্রমাণ করুন!"

"তা' কি তিনি করছেন না ?" মিশ্রিত তেজ ও গাম্ভীর্য্যের সহিত সন্ন্যাসী বলিলেন—"তাঁ'র প্রমাণ পাবার জন্যে সাধারণ একটা ফুল ছাড়া আর কোথাও যাবার আবশ্যক আছে কি ?"

অবজ্ঞাভরে ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"প্রকৃতি যিনি, তিনি প্রকৃতিই; ঈশ্বর- থাকেন যদি—তবে তিনি ঈশ্বরই। ঈশ্বরের কার্য্যাবলী যদি প্রকৃতি মধ্যপথেই হয়, তা' হ'লে এটা বিস্ময়কর যে তিনি সমস্ত বস্তুকে স্বংধ্বংসী করে' নিয়মিত করছেন। আপনি ফুলের কথা বল্‌তে চান,—বেশ,—এদের মধ্যে ব্যাধির বীজও আছে, আবার আরোগ্যের বীজও আছে; কিন্তু কোনটা যে কি তা' জানবার জন্যে হতভাগ্য মানবজাতিকে বহুবর্ষ ধরে' অধ্যয়ন করতে হয়, অনেককাল পরিশ্রম করতে হয়। এর জন্যে দায়ী কে? প্রকৃতি না ঈশ্বর? শিশুরা অজ্ঞান,—বিষাক্ত ফলের অপকারীতার কথা তা'রা কিছুই জানে না অথচ সে ফল খেয়ে মারা পড়ে। বস্তুতঃ, আমার অভিযোগের কারণই এইখানে,—কোন্‌টা যে মন্দ সে সম্বন্ধে আমাদের অভিজ্ঞতা নেই, আমাদের অভিজ্ঞ করে তোলাও হয় না। নিজের চেষ্টায় এগুলো আমরা বেছে নিতে বাধ্য হই। কাজেই আমার বিশ্বাস, যে অজ্ঞতা আমাদের পক্ষে অনিবার্য্য তা'র জন্যে শাস্তির ব্যবস্থা করা ঐশী শক্তির দিক থেকে প্রচণ্ড নির্ম্মমতা ছাড়া আর কিছুই নয়। অপর পক্ষে, ঐ স্বয়ং-ধ্বংসশীলতার নিয়ম চলেছেও বেশ চমৎকার; খাদক যিনি, তিনিও আবার খাদ্য হয়ে দাঁড়াচ্ছেন! প্রকৃতপক্ষে আমি যতদূর বুঝি, তা'তে বোধ হয় যে এই নিয়মটাই চিরন্তন। এ ব্যবস্থা যে নিতান্তই বিসদৃশ, নিতান্ত বিশ্রী, তা'তে কি আর সন্দেহ আছে? সৃজন-ব্যাপারের কথা ধরা যাক্; কতকগুলো মৌলিক উপাদানের অস্তিত্ব যদি স্বীকার করে নেওয়া যায় তা' হ'লে এ ব্যাপার খুবই সোজা; দৃষ্টান্ত স্বরূপ, এইদিকে লক্ষ্য করুন—" এইখানে এল র‍্যামি কক্ষকোণ হইতে একখণ্ড সরু ইস্পাতের ডাণ্ডা লইয়া আসিলেন এবং বাক্স হইতে হীরকচূর্ণের মত একপ্রকার উজ্জ্বল পাউডার বাহির করিয়া বলিলেন—"যদি এই ডাণ্ডাটাকে আকর্ষণীরূপে ব্যবহার করে পাউডারটুকুকে কাজে লাগাই, তা' হ'লে কি ঘটে দেখুন!"

অতঃপর পাউডারটুকুকে বায়ুমণ্ডলে নিক্ষেপ করিয়া পূর্ব্ব-কথিত দণ্ডটীকে তিনি তন্মধ্যে ঘুরাইতে আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে শূন্যগর্ভ হইতে এক সুবৃহৎ উজ্জ্বল গোলক উত্থিত হইয়া ক্ষিপ্রগতিতে ঐ আন্দোলিত দণ্ডটীর নির্দ্দেশ অনুসরণ করিতে লাগিল। সন্ন্যাসী চেয়ার হইতে অর্দ্ধোত্থিত হইয়া সবিশেষ আগ্রহ ও একাগ্রতার সহিত এই ব্যাপার প্রত্যক্ষ করিতে লাগিলেন, এবং এল র‍্যামি ক্লান্তিবশতঃ দণ্ডটীকে নিম্নে নামাইয়া রাখিলেন। এদিকে, পূর্ব্বোক্ত উপায়ে সৃষ্ট গোলকটী ক্ষণকাল ধরিয়া আপনা আপনিই শূন্যে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল।

সহাস্যে সেদিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া এল র‍্যামি বলিয়া উঠিলেন "যদি ঐ গোলক-টাকে কাঠিন্য প্রদান করে' শূন্যে প্রেরণ করতে পার্ত্তাম, তা' ছাড়া ওটাকে চিরকাল ঘূর্ণায়মান রাখবার নৈপুণ্য আমার থাকতো, তা' হ'লে কালে ঐ গোলক আপন পারিপার্শ্বিক অবস্থায়, আমিও যে সৃষ্টিকর্ত্তার একজন চলনসই অনুকারী হ'তে পার্ত্তাম সে বিষয়ে সন্দেহ কি?"

ঠিক এই সময় গোলকটী চূর্ণ হইয়া তুষার কণিকার মত শূন্যে মিলাইয়া গেল,—কার্পেটের উপর বৃত্তাকার শ্বেত-ধূলিবৎ একটু পদার্থ ব্যতীত আর তাহার কোনো চিহ্নই রহিল না। এল র‍্যামি সন্ন্যাসীর মন্তব্যের প্রতীক্ষায় ছিলেন, কিন্তু তিনি কিছুই বলিলেন না দেখিয়া নিজেই আরম্ভ করিলেন—"এখন বুঝতে পারছেন, আশা করি, যে আমার সন্তোষের জন্যে বিশেষ রকম প্রমাণের দরকার হয়। আমি প্রত্যক্ষ প্রমাণ চাই, ধোঁয়াটে কল্পনা নিয়ে ভুলে থাকতে পারিনে।"

সন্ন্যাসী চোখ তুলিয়া চাহিলেন; কি অনুসন্ধিৎসু প্রশান্ত দৃষ্টি সে!—বক্তার মুখের উপর সে দৃষ্টি নিবদ্ধ হইল।

"তোমার গোলক একটা তথ্য বটে"--স্নিগ্ধস্বরে তিনি জানাইলেন—"কারণ তা' চক্ষুঃগোচর হয়েছে, দীপ্ত হয়ে উঠেছে এমন কি ঘূর্ণিতও হয়েছে; তবু তা' সত্য নয়, তা' জীবন-হীন; এই পর্য্যন্ত বলা যায় যে, তথ্য বিশেষের এ একটী উৎকৃষ্ট প্রমাণ। কিন্তু ঐ ক্ষণধ্বংসী গোলকটাকে পর্য্যন্ত তুমি সৃজন করতে পার্‌তে না, যদি ভগবান ঐ উপাদানগুলিকে তোমার

হাতে তুলে না দিতেন। আক্ষেপের বিষয়, এ কথাটা তুমি ভুলে যাচ্ছ। কার্য্যের উপযোগী উপাদান না পেলে কেউই কাজ কর্ত্তে পারে না,—এখন প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে এই যে, ঐ সমস্ত উপাদান এসেছে কোথা থেকে ?"

ব্যঙ্গভরে হাসিয়া এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"আপনাকে যে ভক্তশ্রেষ্ঠ বলা হয় তা' ঠিকই! বাস্তবিকই, আপনার বিশ্বাস অসাধারণ আশ্চর্য্য;—কি ইহলৌকিক, উভয়বিধ জীবন সম্বন্ধেই আপনার ধারণা অতি সুন্দর। মাঝে মাঝে মনে হয়, আপনার ঐ ধারণা বরণ করে নিতে পারলে মন্দ হ'ত না। কিন্তু না, তা' আমি পারিনে। আপনা রপথ আমার কাছে আদৌ স্পষ্ট বা যুক্তিযুক্ত বলে' মনে হয় না,—অনেক রকম করে' এটা ভেবে দেখেছি। মূল পাপের দৃষ্টান্ত গ্রহণ করা যাক্—এ মূল পাপ কি ? কি জন্যেই বা তা'র অস্তিত্ব ঘটেছিল ?

"তার অস্তিত্ব নেই—" দ্বিধাশূণ্যচিত্তে সন্ন্যাসী বলিলেন—"যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমাদের মন তা'কে সৃষ্টি না করছে। সেই জন্যেই' তাকে বিনাশ করবার দায়িত্বও আমাদের নিজের।"

এল র‍্যামি নিরুত্তর,—চিন্তা করিতে লাগিলেন। লিলিথও এই একই কথা বলিয়াছিল।

"আমরাই যদি সৃষ্টি করেছি"—অবশেষে তিনি বলিলেন—"আর যদি একজন সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বর আছেন, তবে আমাদের তিনি সৃষ্টি করতে দিয়েছেন কেন ?"

ঈষৎ অধীর ভাবে যোগীপ্রবর তাঁহার চেয়ারখানি এল র‍্যামির দিকে ঘুরাইয়া লইলেন; পরে বলিলেন :—

"বারবার তোমাকে বলেছি এল র‍্যামি, যে, প্রত্যেকটী ব্যক্তিগত মানব ভগবান স্বকীয় দান ও দায়িত্ব 'স্বাধীন ইচ্ছার' অধিকারী; এই যে তুমি আজ ঈশ্বরের প্রমাণ খুঁজে বেড়াচ্ছ, তোমার বোঝা উচিৎ যে ভগবানের প্রতিকৃতির সঙ্গে আমাদের নিকট-সম্বন্ধের একমাত্র প্রমাণই ঐখানে। ঐশী নিয়ম আছেই আছে,—আমাদের জীবনের সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্যই হচ্ছে সেগুলিকে জানা বা বুঝতে চেষ্টা করা,—তারপর আমাদের ভাগ্য আমাদের নিজের হাতে; যদি সে নিয়ম অগ্রাহ্য করি, তা' হ'লে তা'র পরিণাম ফলও আমরা অবশ্যই ভোগ করবো।

যদি আমরা অন্যায় সৃষ্টি করি, তা' হ'লে আপনারা নষ্ট না করা পর্য্যন্ত তা' থেকে যাবে; 'মঙ্গল' আমাদের 'সৃষ্টি করবার' দরকার হয় না, কারণ ব্রহ্মাণ্ডের নিশ্বাসটা পর্য্যন্ত মঙ্গলময়,—ইচ্ছা করলেই এই মঙ্গলের মধ্যে আমরা জীবন-প্রতিষ্ঠা করতে পারি। বস্তুতঃ, একথা নিয়ে তোমার সঙ্গে এত বেশী আলোচনা হয়ে গিয়েছে যে পুনরালোচনা বাহুল্য বলেই বো'ধ হয়; মানবীয় কিম্বা স্বর্গীয় অভিজ্ঞতা যা' শিক্ষা দিতে পারে সে দিকে না গিয়ে তুমি যে নিজেই আপন অদৃষ্ট গ'ড়ে তুলছো বা তা'কে নিজের ইচ্ছামত আকার দিচ্ছ, এ সত্য যদি তুমি দেখেও না দেখ তা' হ'লে আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি, যে তুমি অন্ধ। কিন্তু যাক্, সময় নষ্ট করার দরকার নেই,—অন্য কথা কওয়া যাক্; আজ তোমাকে একটা বিশেষ কোনো খবর দিতেই আমি এসেছি, তা' শুনলে সম্ভবতঃ তোমার কষ্ট হবে।" ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া, বিষন্ন-মৃদুকণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন—"হাঁ, কষ্টটা অবশ্যই কিছু গুরুতর হবে, তা'র জ্বালা কিছুকাল মনেও থাকবে,—কিন্তু উপায় নেই, আদেশ প্রচারিত হয়ে গিয়েছে,—আর কয়েক দিনের মধ্যেই লিলিথের আত্মাকে মুক্ত করে দিতে তুমি বাধ্য হবে।"

এল র‍্যামি অকস্মাৎ শিহরিয়া উঠিলেন,—তাঁহার মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল,—পরক্ষণেই তাহা মৃত্যু-বিবর্ণবৎ হইয়া গেল।

"আপনার কথা হেঁয়ালীর মত বোধ হচ্ছে"—চেষ্টাকৃত শুষ্ক উচ্চারণে তিনি বলিলেন—"কি জানেন তা'র—কেমন করে' শুনলেন—"

বাকী কথা এল র‍্যামির মুখেই রহিয়া গেল, আর বাহির হইল না; সন্ন্যাসী ক্ষুব্ধ দৃষ্টিতে তাঁহার এই অবস্থা লক্ষ্য করিলেন।

"ঈশ্বরের শক্তি-বিচারের চেষ্টা ক'র না, এল র‍্যামি!"—গাঢ়স্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন—"কারণ দেখা যাচ্ছে, মানুষের শক্তির পরিমাপ করাই আজও তোমার সাধ্যায়ত্ত হয় নি। আশ্চর্য্য! তুমি কি মনে কর যে তোমার গোপন পরীক্ষা-ব্যাপার পরীক্ষক ছাড়া আর সকলের কাছেই অপরিজ্ঞাত?—না, সে তোমার ভুল! তোমার এই পরীক্ষার প্রত্যেক ক্রম—তোমার এই মহারহস্য-পথে গর্ব্বিত পদক্ষেপ, এই যাবতীয় নশ্বর চিত্তের অচিন্তিত-পূর্ব্ব, দুঃসাহসিক রহস্য-ভেদের চেষ্টা আমি আগাগোড়া লক্ষ্য করে আসছি; কিন্তু জেনো

এতবড় বিস্ময়কর ব্যাপারেরও সীমা আছে—আর সে সীমাপ্রান্ত প্রায় তোমার পায়ের কাছে এসে পড়েছে। এখন বন্দীকে মুক্ত করে' দিতে তুমি বাধ্য!"

"কখনও না!" সতেজে এল র‍্যামি গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"আমি জীবিত থাক্‌তে তা' হবে না! তা'কে ত্যাগ করবার আগে ঐশীশক্তিকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করবো!—প্রত্যেক প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারেই সে আমার, সে আমার!"

"ক্ষান্ত হও"—তিরস্কারের স্বরে যোগীপুরুষ বলিলেন—"নিজের জন্যে যে কর্ম্মফল গড়ে ভুলেছো তা' ছাড়া আর কিছুই তোমার নয়। ঐ অদৃষ্টই শুধু তোমার; প্রাক্তন অবশ্যই সম্পূর্ণ হবে; সেই প্রাক্তনই যথাসময়ে লিলিথকে তোমার কবল থেকে বিছিন্ন করবে।"

এল র‍্যামি নয়নদ্বয়ে একই কালে ক্রোধ ও যন্ত্রনা ফুটিয়া উঠিল।

"আমার অদৃষ্ট সম্বন্ধে আপনার কি করবার আছে?" এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমার ভাগ্যে কি সঞ্চিত আছে না আছে, আপনি তা' কেমন করে জানবেন? লোকে বলে বটে যে আপনার আধ্যাত্ম-দৃষ্টি খুবই তীক্ষ্ণ, কিন্তু এ আধ্যাত্মদৃষ্টি কল্পনা আর অনুমান ব্যতীত অন্য কিছুই নয়। এর দ্বারা ভুলপথে চালিত হওয়া আশ্চর্য্য নয়; বিশেষতঃ, আপনি নিজেই স্বীকার করেন যে কেবলমাত্র ধ্যান ও প্রার্থনা-বলেই এ শক্তি লাভ করতে পেরেছেন;—অপরপক্ষে, আমার আবিষ্ক্রিয়া বহুবর্ষব্যাপী বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল। প্রার্থনার মধ্যে বিজ্ঞান নেই!"

"নেই নাকি?"—সন্ন্যাসী আসন পরিত্যাগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং সম্রাট যেরূপ তিরস্কারের ভঙ্গীতে পৌরুষহীন প্রজার সম্মুখীন হন ঠিক তেমনিভাবে এল র‍্যামির সহিত মুখোমুখী দাঁড়াইয়া বলিতে লাগিলেন—"তা' যদি হয় তবে এত পাণ্ডিত্যসত্ত্বেও তুমি নির্ব্বোধ,—শব্দ রহস্যের অতি সাধারণ নিয়মটা পর্য্যন্ত জান না। আজও কি তুমি বোঝো নি, আজও কি তুমি শিখতে পারোনি যে, ব্রহ্মাণ্ডের রন্ধ্রে কোটী কোটী সুরে শব্দ সমূহ বিকম্পিত হ'চ্ছে? মানব-কণ্ঠ-নির্গত একটীও চীৎকার, একটীও চুপিকথা লুপ্ত হয় না—এমন কি, পক্ষীর কাকলী বা পত্রের মর্ম্মরটুকু পর্য্যন্ত সঞ্চিত থেকে যাচ্ছে। সমস্তই শ্রুত হ'চ্ছে—সমস্তই জমা থাক্‌ছে—সমস্তই পুনঃপুনঃ প্রতিধ্বনিত হ'য়ে আসছে। এই যে আধুনিক

খেলনা টেলিফোন আর ফনোগ্রাফ—এগুলোর আবশ্যকতা কি যদি তা' তোমাকে চিরন্তন নিয়ম সম্বন্ধে সচেতনই না করে? ঈশ্বর—সেই বিরাট, সর্ব্বসহ, চিরপ্রেমময় ঈশ্বর, শুনতে পাচ্ছেন যে, পরিব্যাপ্ত শব্দ-সমুদ্র ক্রুদ্ধ ক্লিষ্ট কণ্ঠ থেকে তাঁর নামের ওপর নিদারুণ অভিসম্পাতে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হ'চ্ছে; তাঁর অনন্ত-প্রসারে, চীৎকার অশ্রুজল ও উন্মাদহাস্য বিক্ষোভ—তরঙ্গে ফেটে পড়ছে; কিন্তু এ সমস্ত সত্ত্বেও, চিরপ্রবাহিত সঙ্গীত-নির্ঝর সকল ক্রটীকে ছাপিয়ে ছাড়িয়ে নিত্য-আনন্দময় হ'য়ে উঠছে;—সে সঙ্গীত পরিপূর্ণ, সুমধুর সুপবিত্র,—সে সঙ্গীত চিরন্তন প্রার্থনার। প্রার্থনায় বিজ্ঞান নেই! এমন বিজ্ঞান তা'তে আছে যার প্রচণ্ড শক্তিবসে মহাশূন্য বজ্রদীর্ণ হ'য়ে শতধারায় ভেঙ্গে পড়ে,—এমন বিজ্ঞান আছে যা'তে স্বর্গের কনকদ্বার অনায়াসেই মুক্ত হ'য়ে যায়,—এমন বিজ্ঞান আছে, যা' নর-নারায়ণের সংযোগ-শৃঙ্খলকে ব্যাপ্তিপথে প্রসারিত করে' জগত থেকে জগদান্তরে ছুটিয়ে দেয়, বা' কোটী কোটী জগতকে বেষ্টন করে' ধরে, যা'র তড়িৎ-বার্ত্তার প্রবাহ কোনো প্রাকৃতিক শক্তিই ছিন্ন করতে পারে না।"

উচ্ছ্বসিত আবেগে সন্ন্যাসী তাঁহার বক্তব্য শেষ করিলেন; এল র‍্যামি নীরবে শুনিলেন কিন্তু ইহা তাঁহাকে স্পর্শ করিয়াছে বলিয়া বোধ হইল না।

"বুঝেছি, কথাগুলো বাজে খরচই হ'ল"—সন্ন্যাসী পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"কেননা, তুমি আত্মসর্ব্বস্ব। তোমার মস্তিষ্ক আবিষ্কারের গর্ব্ব রাখে,—তোমার বাহু যে দুশ্চেষ্টায় সাহস করে তা' সম্পাদন করতে তুমি সর্ব্বদাই প্রস্তুত; একনো কারুর পরামর্শ, কিম্বা ভগবান বা মানুষের সাহায্য তোমার দরকার হয় না। সব সত্য,—তথাপি এও সত্য যে, লিলিথের আত্মাকে আর তুমি ধরে রাখতে পারবে না।"

সন্ন্যাসীর স্বর প্রগাঢ় অথচ সুমিষ্ট; এল র‍্যামি মুখ তুলিলেন এবং সাগ্রহে ও সন্দিগ্ধ বিস্ময়ে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিলেন। তাঁহার বোধ হইতে লাগিল যেন এই আগন্তুকের অবস্থান গৌরবে কক্ষখানি জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে! সেই প্রশান্ত আননমণ্ডলের পবিত্রতা, সেই বিনম্র অথচ শাসনক্ষম নয়নদ্বয়, এল র‍্যামি অধিকক্ষণ দেখিতে পারিলেন না,—সহসা তাঁহার গর্ব্বিত শির যেন কোন অজ্ঞাত প্রেরণায় মহাপুরুষের সম্মুখে শ্রদ্ধানত হইয়া আসিল।

"সত্যই আপনি মহাপুরুষ"—ধীরে ধীরে তিনি বলিলেন—"শক্তিতে দেবতার মত, সারল্যে শিশুর মত। সকল বিষয়ে না হ'লেও অনেক বিষয়ে আমি আপনার ওপর আস্থা-স্থাপন কর্ত্তে পারি। সেই জন্যে,—যে উপায়েই হোক্ যখন আমার গোপনীয়তা সম্বন্ধে আপনি অভিজ্ঞ হ'তে পেরেছেন, তখন—আসুন আমার সঙ্গে,—আমার বৈজ্ঞানিক গবেষণার প্রধানতম বিস্ময় আপনাকে দেখিয়ে দেব; দেখিয়ে দেব, কোন্ জীবন আমি দাবী করি,—কোন্ আত্মা আমার শাসনাধীন। আপনার বারণ মান্তে আমি অক্ষম, কারণ এমন কোনো বিষয়ে আপনি আমাকে সাবধান কর্ত্তে চাইছেন যা' থেকে নিবৃত্ত হওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব। 'অসম্ভব' বল্‌ছি এইজন্যে যে মানবী লিলিথ, ঈশ্বরের লিলিথ, ঈশ্বরের ইচ্ছামত মারা গিয়েছে; কিন্তু আমার লিলিথ আমার ইচ্ছায় বেঁচে আছে। আসুন, দেখুন,—তারপর বুঝতে পারবেন, কি জন্যে আমি—(আমি, ঈশ্বর নই)—আমার সঞ্জীবিত আত্মাটীকে নিজস্ব সম্পত্তি মনে করতে চাইছি!"

আবেগ-কম্পিত গর্ব্বিত-কণ্ঠে ঐ কথা কয়টী উচ্চারণ করিয়া, এল র‍্যামি আপন পরীক্ষাগারের দ্বার উন্মোচন করিলেন এবং নিঃশব্দ ইঙ্গিতে আহ্বান করতঃ পথপ্রদর্শকরূপে অগ্রসর হইলেন। সন্ন্যাসী নীরবে তাঁহাকে অনুসরণ করিতে লাগিলেন,—চরণপাত মৃদুমন্থর এবং চিন্তাশীল আননমণ্ডলে ক্ষোভের ছায়া।

বিংশ পরিচ্ছেদ।

মন্ত্র-নির্জ্জিত লিলিথ যেখানে পালঙ্ক-শায়িতা, সেই বিবিধ-বর্ণোজ্জ্বল সুরম্য কক্ষে এল র‍্যামি তাঁহার অতিথিকে লইয়া আসিলেন। দ্বারপার্শ্বে জ্যারোবার সহিত সাক্ষাত হওয়ায় সে কথা কহিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, কিন্তু প্রভুর আদেশ-সূচক ইঙ্গিতে আত্মসম্বরণে বাধ্য হইয়া অগত্যা ঐ অপূর্ব্ব দর্শন যোগীপুরুষটীর পানে বারকতক অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়াই ক্ষান্ত হয়।

তাহার আশ্চর্য্য হইবার কারণও ছিল যথেষ্ট; প্রথমতঃ ওরূপ তেজঃপুঞ্জ-কলেবর পূর্ব্বে কখনও সে দেখে নাই,—দ্বিতীয়তঃ, যতদিন ধরিয়া সে এখানে আছে, তন্মধ্যে কোনো

দর্শকই লিলিথের বিশ্রামকক্ষে প্রবেশ করিবার অধিকার পাইয়াছে বলিয়া তাহার মনে হয় না।

অতিথি-সহ এল র‍্যামি কক্ষ প্রবিষ্ট হইলে জ্যারোবা ক্ষণকাল অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া রহিল। কিজন্য যে আগন্তুক সহজেই ঐ গোপন কক্ষে প্রবেশ করিতে পাইল তাহা স্থির করিতে না পারিয়া সে অত্যন্ত কৌতূহলী হইয়া উঠিল এবং একেবারেই নিম্নতলে নামিয়া আসিয়া ফেরাজের অন্বেষণে ছুটিল; উদ্দেশ্য,—ফেরাজের নিকট হইতে রহস্য-বিবরণ সংগ্রহ করিয়া লইবে। কিন্তু রাত্রি তখন দশটা বাজিয়া গিয়াছে এবং ফেরাজও নিদ্রামগ্ন,—এত গাঢ় সে নিদ্রা, যে বহুক্ষণ ডাকাডাকি করিয়া, এমন কি গা-ঠেলাঠেলি করিয়াও জ্যারোবা তাহাকে জাগাইতে পারিল না। অবশেষে হাল ছাড়িয়া দিয়া আপনার যৎসামান্য আহার্য্য প্রস্তুত করিবার জন্য সে রন্ধনশালায় প্রবেশ করিল,—স্থির করিল, ফেরাজ উঠিবামাত্র পুনরায় তাহাকে পাকড়াও করিবে এবং আগন্তুকের নামধাম আগমনের উদ্দেশ্য প্রভৃতি জানিয়া লইয়া রহস্যটা পরিষ্কার করিবার চেষ্টা করিবে।

ইতিমধ্যে, এল র‍্যামি ও তাঁহার সঙ্গী লিলিথের পালঙ্ক-পার্শ্বে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং কিয়ৎকাল ধরিয়া নীরবে সেই শান্ত সৌন্দর্য্য নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন। এল র‍্যামি লক্ষ্য করিলেন যে সন্ন্যাসী তাঁহার এত বড় আশ্চর্য্য কীর্ত্তিটী সম্বন্ধে সম্পূর্ণ উদাসীনই রহিয়াছেন, অধিকন্তু তাঁহার চক্ষে এমন একটা ভাব প্রকাশ পাইতেছে যাহা প্রশংসাব্যঞ্জক তো নহেই পরন্তু কৃপাপ্রকাশক।

মনে মনে যথেষ্ট বিরক্ত হইয়া কতকটা শুষ্ককণ্ঠে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এখন আশা করি, লিলিথকে দেখ্‌তে পাচ্ছেন? কি-অবস্থায় সে রয়েছে তাও হয়তো দেখ্‌ছেন?"

"ঠিক নয়!" ধীরভাবে সন্ন্যাসী বলিলেন—"যে-অবস্থায় দেখানো তোমার ইচ্ছা, ঠিক সে-অবস্থায় আমি দেখ্‌ছিনে; তবে আমি তা'কে দেখেছি,—যদিও, তুমি দেখ্‌তে পাওনি!"

হাড়ে হাড়ে চটিয়া এল র‍্যামি সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন; বলিলেন:—

"সকল কথাই হেঁয়ালীতে বলার কি দরকার? সোজা ভাষায় আপনার বক্তব্যের উদ্দেশ্যটা কি?"

"যা' বলেছি, আমার বক্তব্যের সোজা উদ্দেশ্যই তাই"—সংযতস্বরে যোগীবর উত্তর করিলেন —"আমি বল্‌তে চাই যে লিলিথকে আমি দেখছি। সে লিলিথ 'লিলিথের আত্মা';—চোখের সাম্‌নে যে পঞ্চভূতের কাঠামোটা দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্ছে তা' নয়—কিম্বা, বৈদ্যুতিক প্রবাহবলে যা'কে ধ্বংস থেকে রক্ষা করা হ'চ্ছে সেও নয়। এ লিলিথ—যতই নয়ন-রম্য হোক্, মৃতদেহ ছাড়া আর কিছুই না।"

বৰ্দ্ধিত বিরক্তি ও বিস্ময়ে, ক্রুদ্ধ কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"কোনো মৃত দেহ কখনো নিশ্বাস ফেল্‌তে পেরেছে? মৃতদেহ কখনও নড়েছে? মৃতদেহের উপর কখনো বর্ণ-তরঙ্গ দেখা গিয়েছে? যখন প্রথম পরীক্ষা আরম্ভ করি, এ দেহ তখন শিশুদেহ-মাত্র ছিল, কিন্তু এখন এটী সর্ব্বাঙ্গ-সুন্দর নারীদেহ,—তবু কি বল্‌বেন, এটা শব!"

"ফেরাজকে তুমি নিজে যা' বলেছিলে তা'র চেয়ে বেশী কিছুই আমি বলিনি,"—শান্তকণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন—"জ্যারোবার প্ররোচনায় তোমার আজ্ঞা-লঙ্ঘন করে' বালক যখন এই কক্ষে এসেছিল, সে-সময় তুমিই কি তা'কে বলনি যে লিলিথ মৃত?"

এল র‍্যামি চমকিয়া উঠিলেন; এ-কথা শুনিয়া তাঁহার বিস্ময় যেন শতগুণ বাড়িয়া গেল।

"আশ্চর্য্য!"—আবেগভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন "এ-খবর আপনি কেমন করে জান্‌লেন, কোথায় পেলেন? বাতাসটাও কি দূরদূরান্তের খবর আপনার কাছে নিয়ে যায়? আলোক-টাও কি আপনার চোখের সাম্‌নে দৃশ্য নকল কর্‌তে থাকে? নইলে কেমন ক'রে আপনি এত বড় ক্ষমতা লাভ কর্‌লেন যাতে ইচ্ছা মাত্রই যে-কোনো খবর টের পান?"

সন্ন্যাসী গম্ভীরভাবে হাস্য করিলেন।

"আমার কার্য্য-প্রণালী একটীমাত্র, এল র‍্যামি,—" তিনি বলিলেন—"আর সে-প্রণালী তুমি নিজেও জানো; অথচ, সে রহস্য-রাজ্যে প্রবেশ কর্‌বার জন্যে আমার সাহায্য পেলেও তুমি তা' গ্রহণ কর্‌তে চাও না। 'আমার সাহায্য ব্যতিরেকে কেউই পিতৃ-সান্নিধ্য লাভ করতে পারে না'—খুবই পুরোণো কথা; এত বার পড়েছো এত বার শুনেছো যে তার আসল অর্থটা হয়তো নূতন করে আর মনেই লাগে না। 'পিতৃসান্নিধ্য-লাভ' মানে হচ্ছে—আধ্যাত্ম-পথে প্রবেশ-লাভ, পরাজ্ঞান-লাভ,—কিন্তু সে সব কথায় তোমার বিশ্বাসই যখন নেই, তখন

যেতে দাও। যখন তুমি ফেরাঙকে বলেছিলে যে লিলিথ মৃত, তখন যথার্থ কথাই বলা হয়েছিল ;—নিশ্চয়ই সে মৃত,—শুষ্ক তরুর বর্ণ বা পত্র-সঞ্চালন শক্তি কৃত্রিম উপায়ে রক্ষা করা সম্ভব হলেও, সে যেমন মৃত, এও তেম্‌নি মৃত। এ-দেহের শ্বাস-প্রশ্বাস কৃত্রিম—এর শিরা বা ধমনীতে প্রবাহিত তরল পদার্থটা রক্ত নয়, এক প্রকার বৈদ্যুতিক সঞ্জীবন-রস,—তা ছাড়া এ-দেহটাকে চিরকাল এমনিভাবে রক্ষা করাও হয়তো সম্ভব হতে পারে। তবে, এর বৃদ্ধি অক্ষুণ্ণ থাকবে কি না তা' একটা বৈজ্ঞানিক সমস্যা ; থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে,— সম্ভবতঃ আত্মার সঙ্গে যোগাযোগ বন্ধ হলেই আর এটা বাড়বে না। এই যে বৃদ্ধি, যা' তোমার কাছে খুবই বিশিষ্ট বলে মনে হচ্ছে,—এ বৃদ্ধির কারণ আর কিছুই না, শুধু মস্তিষ্ক-যন্ত্রটার চলাচল মাত্র। যখন এই আধারটার ভেতর দিয়ে তুমি আত্মাকে কথোপকথনে বাধ্য কর, সে সময় মস্তিষ্কে বেশ একটু সাড়া পড়ে, সুতরাং মেরুদণ্ডে বা পেশীসমূহেও সে সাড়া সঞ্চালিত হতে থাকে,—ফলে দেহের প্রসার ও বৃদ্ধি অনিবার্য্য। মোট কথা, এটা কৃত্রিম উপায়ে সচেতন শবদেহ,—লিলিথ নয় ; লিলিথ যে, তাকে আমি জানি।"

"লিলিথ যে, তা'কে আপনি জানেন !" বিমূঢ়-বিস্ময়ে এল র্যামি বলিয়া উঠিলেন—"আপনি জানেন…! এ বক্তব্যের অর্থ কি ?"

"আমি এমনভাবে লিলিথকে জানি, যেমন তুমি জানো না ; এমনভাবে আমি তা'কে দেখেছি, যেমন তুমি দেখনি। সে এক নিঃসঙ্গ জীব,—এক ভ্রাম্যমান আত্মা, যে চিরদিন প্রতীক্ষা করছে, চিরকাল আশা করছে। এক চিরপ্রেমময়ের ভালবাসা ছাড়া আর কোনো ভালবাসা না পেয়ে, তারায় তারায়, জগতে জগতে সে ঘুরে বেড়াচ্ছে ;—অতি সুন্দরী এক অপ্সরী, কিন্তু বৃন্তহীন পুষ্প কিম্বা সঙ্গীহীন বিহঙ্গীর মতই অসম্পূর্ণ। তবে, তার ভাগ্যের পরিবর্ত্তন আরম্ভ হ'য়েছে,—আর বেশী দিন তা'কে একা থাকতে হবে না,—কাল পূর্ণ হ'য়ে এসেছে,—আর কয়েক দিনের মধ্যেই সৃষ্টির চরম পরিপূর্ণতা 'প্রেম', তা'কে বন্ধনমুক্ত ক'রে স্বাধীনতা-গৌরবের শ্রেষ্ঠতম আনন্দ রাজ্যে প্রেরণ করবে !"

আবেগ-উচ্ছল কোমল-কণ্ঠে যখন তিনি এই কথাগুলি বলিতেছিলেন, এল র্যামির মুখমণ্ডল সে-সময় মসী-ম্লান হইয়া আসিতেছিল,—চক্ষুর্দ্বয় দীপ্তিময় এবং হস্ত পদ বিকম্পিত হইতেছিল,—

বোধ হইতেছিল, যেন মনে মনে তিনি কি একটা ভীষণ সংকল্প আঁটিতেছেন। যাহা হউক, অবশেষে আত্মসম্বরণে সক্ষম হইয়া, নিপুণ ঔদাস্য-ভরে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এ কি আপনার ভবিষ্যদ্বাণী?"

"না, ভবিষ্যদ্বাণী নয়—এ সত্য;" প্রশান্তস্বরে সন্ন্যাসী বলিলেন—"বিশ্বাস না হয়, লিলিথকেই জিজ্ঞাসা কর না কেন? সেও তো এখানে রয়েছে।"

"এখানে?"—বিমূঢ়-দৃষ্টিতে এল র‍্যামি চারিদিকে চাহিলেন, বক্তার দিক হইতে সে-দৃষ্টি একেবারেই পালঙ্ক-শায়িত "শবের" প্রতি নিবদ্ধ হইল—"এইখানে বলছেন? স্বভাবতঃই তো এখানে সে থাকবে।"

পুনরায় তাঁহার দৃষ্টি লিলিথের শায়িত তনুখানির উপর পড়িল।

"না, এখানে নয়"—পালঙ্কের দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"কিন্তু, ঐখানে!"

কক্ষমধ্যভাগের এমন একটা স্থানে তিনি অঙ্গুলি-নির্দেশ করিলেন, যেখানে কক্ষ-বিলম্বিত আলোকাধার হইতে কুসুমাঙ্কিত কার্পেটের উপর একটি স্নিগ্ধ স্বর্ণাভ ছায়া বিকীর্ণ করিতেছিল এবং ভিনিসীয় পণ্যের দীর্ঘ স্ফটিকাধার হইতে এক ঝাড় সদ্যঃস্ফুট তাজা গোলাপ, বাতাসকে গন্ধমধুর করিয়া তুলিতেছিল। এল র‍্যামি সেদিকে চাহিলেন,—কিন্তু আলোকাধারের ছায়া বা গন্ধময় পুষ্পগুচ্ছ ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাইলেন না।

"ঐখানে?"—হতবুদ্ধি হইয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কৈ?"

"দুর্ভাগ্য তোমার এল র‍্যামি, যে দেখতে পাচ্ছ না!" অনুকম্পাভরে সন্ন্যাসী বলিলেন—"তোমার দৃষ্টির এই অন্ধতা দ্বারা প্রমাণ হ'চ্ছে যে আজও তোমার চোখের সামনে থেকে যবনিকা উঠে যাই নি। লিলিথ ঐখানে রয়েছে, আমি বলছি, রয়েছে;—ঐ গোলাপগুলির কাছেই সে দাঁড়িয়ে আছে,—তা'র শুভ্র তনুখানি বিদ্যুত-প্রভার মত উজ্জ্বল, কেশরাশি প্রাতঃসূর্য্যের গৌরব-দীপ্ত-মণ্ডিত, দৃষ্টি ঐ পুষ্পগুলির দিকে নিবদ্ধ। ঐ সব ফুলগুলিও তা'র আবির্ভাব-সম্বন্ধে সম্পূর্ণ সচেতন, কারণ, মানুষ যখন কিছুই দেখতে পায় না, ফুলেরা সে সময় অপ্সরীদের আগমন স্পষ্ট বুঝতে পারে। তা'র চতুর্দ্দিকে দূরতম তারকার বিকম্পিত আলোক-রশ্মি গোলাকারে বেষ্টন করে রয়েছে; এখনও সে নিঃসঙ্গ,—তা'র চক্ষুদুটী আগ্রহ ও মিনতিতে পরিপূর্ণ,—তুমি কি তা'র সঙ্গে কথা কইবে না?"

উক্তপ্রকার বর্ণনা শুনিয়া, এল র‍্যামির বিস্ময়, বিরক্তি, ও ভয় একেবারে সীমা অতিক্রম করিল,—ঘৃণাভরে তিনি বলিলেন :—

"কথা কইব ?...না,—আপনি যদি এতই স্পষ্ট দেখ্‌তে পাচ্ছেন, তবে তা'কেই কথা কইতে বলুন !"

"তা'র কথা তুমি বুঝতে পারবে না"—সন্ন্যাসী বলিলেন—"যতক্ষণ পার্থিব ভাষায় পার্থিব আধারের ভেতর দিয়ে উচ্চারিত না হ'চ্ছে ততক্ষণ কিছুই বুঝ্‌বে না"—পালঙ্ক-শায়িতার দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করিয়া তিনি বলিতে লাগিলেন—"অন্ততঃ, সে কি বলছে তা' একেবারেই বুঝ্‌বে না ; তবু যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমি কথা কইতে বল্‌ছি।"

"আমি কিছুই ইচ্ছা করি না"—বিরক্তির সহিত এল র‍্যামি বলিলেন—"আপনি যদি তা'কে দেখ্‌তে পাচ্ছেন বলেই মনে করেন,—যদি আপনার এই কাল্পনিক জীবটীকে কথা কওয়াতে সক্ষম হন, তা' হ'লে তাই করুন ; কিন্তু আমি যতদূর জানি তা'তে বল্‌তে পারি যে এক আমার সঙ্গে ছাড়া আর কারুর সঙ্গেই লিলিথ কথা কয় না।"

সন্ন্যাসী কৃতাঞ্জলিপুটে দণ্ডায়মান হইলেন এবং প্রার্থনার অনুরূপ স্বরে বলিলেন--

"লিলিথের আত্মা !—ভগবৎ-প্রিয়-প্রদেশসমূহের অতন্দ্র-পথিক ! যদি ঈশ্বরানুগ্রহে আমার স্বপ্ন-দৃষ্টি যথার্থ হয়, তবে তুমি কথা কও !"

কক্ষ মধ্যে নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। লিলিথের দৃশ্যমান দেহখানির উপর এল র‍্যামি একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। তিনি ভাবিতেছিলেন, ঐ তন্দ্রাচ্ছন্ন দু'খানি সুবঙ্কিম অধরপুটের ভিতর দিয়া ছাড়া, অন্য কোনোপ্রকারেই প্রত্যুত্তর আসা সম্ভব নয় ;—কিন্তু সন্ন্যাসীর দৃষ্টি সম্পূর্ণ বিপরীত দিকেই নিবদ্ধ রহিল। সহসা ঘরের ভিতর হইতে, জ্যোৎস্না-পাতে-জল-কলস্বরের ন্যায় একপ্রকার অপূর্ব্ব কোমল সঙ্গীত ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিল!—সমস্ত হর্ম্ম্যখানি সে তরল রাগিণীর উত্থান-পতনে যেন মধুবৃষ্টি করিতে লাগিল!—কি সুন্দর, সুমিষ্ট স্বর-লহরী-লীলা! শুনিলেই মনে হয়, যেন কোনো অবোধ্য ভাষা, কোনো অকল্পিত পূর্ব্ব ভাবাভিব্যক্তি তাহার মধ্যে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে। এল র‍্যামি হতবুদ্ধি হইয়া শুনিতে লাগিলেন ; এমন স্পষ্ট, অথচ করুণ মধুর সুর পূর্ব্বে কখনই তিনি শুনিয়াছেন বলিয়া মনে

হইল না। যেমন সহসা আরম্ভ হইয়াছিল, ঠিক তেমনি সহসাই স্বর থামিয়া গেল এবং সন্ন্যাসী এল র‍্যামির দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

"শুনলে ?" তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"কিছু বুঝলে ?"

"কি বুঝবো ?" অধীরভাবে এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"সুর ছাড়া আর কিছুই শুনতে পাই নি তো !"

গাঢ় অনুকম্পায় এল র‍্যামির দিকে চাহিয়া শান্ত কণ্ঠে সন্ন্যাসী বলিলেন—"তোমার আধ্যাত্ম-বোধ বড় বেশীদূর অগ্রসর হয় নি এল র‍্যামি !—লিলিথ কথা কইছিল ; তা'র কথাই ঐ সঙ্গীত।"

এল র‍্যামি কাঁপিয়া উঠিলেন ; তাঁহার সতেজ স্নায়ুগুলি হঠাৎ যেন কতকটা আলোড়িত হইয়া উঠিল। যে ব্যক্তিটী আজ তাঁহার পার্শ্বে দণ্ডায়মান,—তাঁহার সত্যনিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থ জ্ঞান, 'প্রতারণা' ব্যাপারটার উপর তাঁহার আন্তরিক ঘৃণা অথবা কাহাকেও প্রতারিত করা-সম্বন্ধে প্রয়োজনাভাব প্রভৃতির কথা এল র‍্যামি বিশেষরূপেই জানিতেন ; আরও জানিতেন যে "অদৃশ্য ও মানব বুদ্ধির অগম্য ব্যাপার-সমূহের" সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতা অতীব বিস্ময়কর। কিন্তু এ-সকল সত্ত্বেও ঐ সম্মানার্হ অতিথিটীর সম্বন্ধে মনে মনে তিনি এই অভিযোগ পোষণ করিতেন যে, যে-সমস্ত অলৌকিক ব্যাপারের কথা তিনি বলিয়া থাকেন সেগুলি হয়তো তাঁহারই মস্তিষ্কের 'অবাস্তব ক্রিয়া-মাত্র' এবং অসাধারণ কল্পনা-শক্তিই এ-সকল বিশ্বাসের জন্য দায়ী। এক্ষণে সন্ন্যাসীর সহিত চোখোচোখি হওয়ায়, এল র‍্যামি যখন দেখিলেন যে সে নয়নদুটী সরলতা, পবিত্রতা ও করুণারই আধার-সদৃশ, তখন তাঁহার বাক্‌শক্তি যেন লুপ্ত হইয়া আসিল। পরক্ষণেই, কিয়ৎ পরিমাণে আত্মসম্বৃত হইয়া, কম্পিত অথচ ঈষৎ-কর্কশ-কণ্ঠে তিনি বলিলেন—"আপনার কথায় বিশ্বাস করবো না, কিন্তু লিলিথের আত্মা যদি, আপনার কথা মত, এখানে উপস্থিতই থাকে—তা' ছাড়া যদি সে কথা ক'য়ে থাকে, তবে নিশ্চয়ই আমি সে-বক্তব্যের অর্থ সংগ্রহ করতে পারি !"

"অবশ্য পারো !" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"তোমার নিজ-প্রণালীতে তা'কে তা'র বক্তব্য পুনরুক্ত করতে বল।"

কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় অথচ রহস্যোদ্ভেদে অতিরিক্ত ইচ্ছুক হইয়া, এল র‍্যামি তন্দ্রামগ্না যুবতীর দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন এবং তাহার বাহু দু'খানি আপন হস্তে গ্রহণ করিয়া যথানিয়মে আহ্বান করিলেন। অনতিবিলম্বেই উত্তর আসিল—

"এখানেই আছি!"

"কতক্ষণ থেকে তুমি এখানে আছ?" এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"যতক্ষণ থেকে আমার বন্ধু এসেছেন।"

"সে বন্ধু কে, লিলিথ?"

"যিনি আপনার পাশে দাঁড়িয়ে আছেন।"

"কিছুক্ষণ আগে এই বন্ধুর সঙ্গে তুমি কি কথা কয়েছিলে?"

"হ্যাঁ!" সম্মতিটী যেন দীর্ঘশ্বাসের মত শুনাইল।

"যা' বলেছিলে, আবার কি তা' বল্‌তে পার?

ক্লান্তভাবে সুন্দর বাহুটী বিস্তৃত করিয়া লিলিথ বলিল,—

"বলেছিলাম যে আমি বড়ই ক্লান্ত; ক্লান্ত, কেননা, যা'র অস্তিত্ব নেই এমন সমস্ত জিনিস অসীমের মধ্যে ক্রমাগতই আমাকে খুঁজে ফিরতে হয়। একটা একগুঁয়ে ইচ্ছা আমাকে পাপ অন্বেষণ কর্‌তে বলে,—আমি খুঁজি, কিন্তু পাইনে। শেষে যখন সত্যের সংবাদ বহন ক'রে আনি,—তখন তা' নামঞ্জুর হয়, কাজেই আমি ক্ষুব্ধ হই। মানুষের মিথ্যা-স্বপ্নের এই অন্ধ কারাগারটা ছাড়া ভগবানের সমস্ত সৃষ্টিই অপার সৌন্দর্য্যময়। তবে কি জন্যে আমি এখানে আবদ্ধ? ঐ আলোক রাজ্যেই আমি প্রবেশ কর্‌তে চাইছি!—অন্ধকার আর ভাল লাগ্‌ছে না!"—লিলিথ থামিল, পরে বলিল—"এই কথাই আমি বন্ধুকে বলেছিলাম।"

একটা অস্পষ্ট বেদনা ও আকস্মিক আত্মগ্লানি অনুভব করিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"আমিও কি তোমার বন্ধু নই, লিলিথ?"

শায়িতার দেহের উপর দিয়া যেন একটা হিল্লোল তরঙ্গিত হইয়া গেল। পরক্ষণেই যেন অনিচ্ছা-সত্ত্বে অথচ পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে উত্তর আসিল—

"না!"

এমনি সহসা এল র‍্যামি শায়িতার হস্তদ্বয় পরিত্যাগ করিলেন, যেন কেহ তাঁহাকে দংশন করিল; সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মুখমণ্ডলও পাণ্ডুরবর্ণ ধারণ করিল। তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—

"কেন এত বিচলিত হ'চ্ছ? আত্মা কখনও মিথ্যা বলে না, অপ্সরী কখনও মন-রাখা কথা কইতে পারে না। কেমন ক'রে সে তোমাকে বন্ধু মনে করবে বল? আপন স্বার্থ-সিদ্ধির জন্যে তাকে তুমি এখানে আটক করে রেখেছো। প্রকৃতি বিশ্লেষকের কাছে একটা বিচ্ছিন্নদেহ প্রজাপতি যে-রকম, এও তোমার কাছে তার বেশী কিছু নয়ই। প্রজাপতির আশা আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, ভালবাসা আছে, আনন্দ আছে, নির্দ্দোষ স্বাধীনেচ্ছা আছে; এমন কি একটা স্বধর্ম্মও আছে। কিন্তু যে চশমা-পরিহিত-চক্ষু বৈজ্ঞানিক তার সুন্দর ডানা দুখানি ভেঙ্গে দিতে চায়, তার কাছে ওসমস্তর মূল্য কি? লিলিথের আত্মা, প্রাচীর-গাত্রবাহী পুষ্পিত লতাটীরই মত স্বভাবতঃই ওপরদিকে উঠতে চাইছে, কিন্তু তুমি স্বাভাবিক আকর্ষণী-শক্তি-বলে (যা'তে না কি দুর্ব্বল মাত্রেই সবলের বশ্যতা স্বীকারে বাধ্য হয়) এই আত্মিক বিভূতীকে তোমার হিংস্র অধিকার-তলে (একটা নির্দ্দিষ্ট-কাল পর্য্যন্ত) ধ'রে রাখ্‌তে সক্ষম হয়েছে। হ্যাঁ—আমি 'হিংস্র'ই বলবো,—কারণ যাঁরা পরম জ্ঞানী, তাঁরা প্রেমিক হ'তেও বাধ্য,—কিন্তু তোমার জ্ঞান স্বেচ্ছাচারিতাকেই জাগিয়ে তুলছে। তবে কথা এই যে, এত নৈপুণ্য, এত সূক্ষ্ম হিসাব-সত্ত্বেও তোমার এই মহাপরীক্ষার অবশ্যম্ভাবী পরিণাম আজও তোমার বোধগম্য হয় নি।"

এল র‍্যামি জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে চাহিলেন, কিন্তু কথা কহিলেন না।

"বাস্তবিকই আমি ধারণা করতে পারি নি যে, কেন তোমার ভবিষ্যদ্‌দৃষ্টি এটা এতদিনেও দেখতে পেলে না"—সন্ন্যাসী বলিতে লাগিলেন—"লিলিথের দেহ তোমার চোখের ওপরই শৈশব থেকে যৌবনে উত্তীর্ণ হয়ে এসেছে; কি উপায়ে? না—এমন কতকগুলো উপাদানের সাহায্যে যা জড়-প্রকৃতি আমাদের হাতে তুলে দিয়েছে!—এমন কতকগুলো শক্তির সাহায্যে যাদের কাজে লাগাবার অধিকার, প্রকৃতির কাছ থেকে আমরা পেয়েছি! তা' যদি হয়, অর্থাৎ জড়প্রকৃতির সাহায্য নিয়ে জড়দেহ যদি বৃদ্ধি পায়—তবে আত্মার পক্ষেই বা অপরিবর্ত্তিত অবস্থায় থাকা কেমন ক'রে সম্ভব হ'তে পারে? প্রত্যেকটী নূতন অভিজ্ঞতার মধ্যে

দিয়ে এর প্রসার বাড়ছে – আকাঙ্ক্ষা বাড়ছে—জ্ঞান বৃদ্ধি হচ্ছে এবং প্রেমের চির-প্রয়োজন তার জীবনকে আদিম প্রেম-উৎসের দিকে নিয়ে যাচ্ছে। যতই দিন যাচ্ছে ততই লিলিথের আত্মা অমর-চেতনালোকে জেগে উঠছে,—চতুর্দ্দিকের পরী-স্বর্গগুলির সঙ্গে ততই তার পরিচয় ঘটছে.—সেই সমস্ত প্রদেশের অধিবাসীবৃন্দের সঙ্গে সে আত্মীয়তা অনুভব করছে এবং এসমস্ত জ্ঞানগরীমার ভেতর দিয়ে তার শক্তিও ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। ·····এই পরিণাম সম্বন্ধেই তোমাকে আমি সাবধান ক'রে দিচ্ছি এল র‍্যামি,—শীঘ্রই তা'র শক্তিবল তোমার শক্তিকে নিস্তেজ করে দেবে, আর তোমার প্রভুত্ব ওখানে খাটবে না।"

"একটা স্ত্রীলোকের আত্মা! শুধু একটা স্ত্রীলোকের আত্মা, একথা ভুলে যাবেন না!"—স্বপ্নজড়িম-স্বরে এল র‍্যামি ব'ললেন—কেমন করে' সে আমার ওপর জয়লাভ করবে? বশ্যতা-স্বীকারেই যে চির'দন অভ্যস্ত, কোমলতাই যা'র প্রকৃ'ত, লঘুতাই যা'র সর্ব্বস্ব,—কেমন ক'রে' সে এত শক্তি ধারণ করবে? অবশ্য, আপনি হয়তো বলবেন যে আত্মার স্ত্রী-পুরুষ ভেদ নেই।"

"না, সে রকম কিছুই আমি বলবো না"—ধীরকণ্ঠে সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"কারণ তা' সত্যকথা হবে না; সমস্ত সৃষ্ট পদার্থেরই স্ত্রী-পুরুষ ভেদ আছে। 'নারী এবং পুরুষ তিনিই সৃষ্টি করেছেন'—সেই উক্তিটী স্মরণ কর—'এবং সে সৃষ্টি তাঁর নিজেরই গঠনের অনুরূপ'।"

এল র‍্যামির চক্ষুর্দ্বয় বিস্ময়-বিস্ফারিত হইয়া গেল।

"কি! একি সম্ভব যে আপনি ভগবানের ওপর পুরুষত্ব ও নারীত্ব দুটোই আরোপ করতে চান?"

"দুটী শক্তি ব্রহ্মাণ্ডকে শাসন করছে,"—পরিচ্ছন্ন কণ্ঠে যোগী-প্রবর বলিতে লাগিলেন—"একটী, যে না কি পুরুষ, হ'চ্ছে 'প্রেম'; এবং অপরটী, যে নারী, হ'চ্ছে 'সৌন্দর্য্য'। এই উভয়-শক্তির একত্র সংস্থিতিই 'ঈশ্বর'; যেমন, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে মিলে পূর্ণাঙ্গ। প্রেম ও সৌন্দর্য্যের মিলন থেকেই পুঞ্জ পুঞ্জ বস্তু-সৃজনা বিচিত্র স্পন্দন নিয়ে আবির্ভূত হ'চ্ছে,—এবং ঈশ্বর যখন মানুষকে আপন গঠনের অনুরূপ করে' গড়েছিলেন, তখন তা' পুরুষ ও নারী এই উভয়বিধরূপেই প্রকাশ পেয়েছিল। জগতে জীবন-বিকাশের সর্ব্বপ্রথম অবস্থা থেকে,—যে-অত্যাশ্চর্য্য বিবর্ত্তন-ফল আজ মানবজাতিতে পরিণতি-লাভ করেছে তা'র ক্ষীণতম প্রারম্ভ

থেকে, সামুদ্রিক তরুলতা বা কীটপতঙ্গও স্ত্রীপুরুষ-ভেদের দাবী করে' আসছে। এ ভেদ ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী,—প্রকৃতির যাবতীয় স্তরে চিরকাল অবিচলিত শৃঙ্খলায় এ ভেদ রক্ষিত হয়ে আসছে। এমন কি, বায়ুমণ্ডল বা ব্যোমও স্ত্রীপুরুষ-ভেদে বিভিন্ন; তা'দের সংযোগ-ফলেই জীবন উৎপন্ন হয়।"

"আপনার কাল্পনিক শৃঙ্খলার দৌড় অত্যন্ত বেশী, বাস্তবিকই অত্যন্ত বেশী!" ঈষৎ শ্লেষ ও বিস্ময়ভরে এল র‍্যামি বলিলেন।

"আর তোমার দৌড় অত্যল্প,—কারণ কার্য্যের পক্ষে ব্যাঘাতজনক হ'লে যে-কোনো-আইনের বিরুদ্ধেই তুমি বিদ্রোহী হয়ে ওঠো"—সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"প্রমাণ, তোমার দৃঢ়বিশ্বাস যে লিলিথের আত্মাকে যতদিন ইচ্ছা তোমার খেয়ালের আজ্ঞাবহ করে' রাখতে পারবে। অপর পক্ষে, নিয়ম এই যে, যথা নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে-আত্মার মুক্তি অনিবার্য্য। যদি লিলিথকে ঐ ভঙ্গুর দেহখানার মধ্যে পুনরাবদ্ধ করে' আবার মানব-জীবন-যাপন করাতে সক্ষম হ'তে, তা' হলে ব্যবস্থা হয়তো অন্য রকম হ'ত; কিন্তু তা' তুমি পার না, কারণ ও-দেহ এখন এতই মৃত যে লিলিথের বর্ত্তমান পরিপুষ্ট আত্মাকে আর তা'র ধারণ করবাই শক্তি নেই।"

"আপনার এই রকম অনুমান?" অন্যমনস্কভাবে এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন, কিন্তু তাঁহার চিন্তাস্রোত সহসা যেন একটা নূতনতর পথে প্রবাহিত হইল।

সদয় দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"শুধু অনুমান নয়, এটা আমি জানি!"

তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাঁহার দিকে চাহিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"আপনি এমন একটা ভাব দেখাতে চান, যেন বেশীর ভাগ রহস্যই আপনার জানা; কিন্তু এ-বিষয়ে নিজেকে আমি আপনার চেয়ে অনেক বেশী বিনয়ী মনে করি। 'আমি জানি'—এতখানি স্পর্দ্ধার কথা কখনও আমি বলতে পারিনে,—সৌরজগৎ আমার চক্ষে চির চঞ্চলই মনে হয়—আজ যে-সব তথ্য দেখতে পাই, কাল হয়তো দেখি যে অন্য কতকগুলি নূতন তথ্য তা'দের স্থান অধিকার করে' আগেকারগুলিকে অনাবশ্যক করে' তুলেছে—"

"কিছুই অনাবশ্যক নয়"—বাধা দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"এমন কি, তথাকথিত তথ্যটী পর্য্যাপ্ত নয়। ভ্রমের ভেতর দিয়েই সত্যের সন্ধান পাওয়া গিয়ে থাকে। এই সত্য আবার, এক মহাসত্যের দিকে অঙ্গুলি-নির্দ্দেশ করে; সে সত্য—ঈশ্বর।"

"আগেই আপনাকে বলেছি যে, ঈশ্বরের প্রমাণ চাই আমি"—তীক্ষ্ণ হাস্য-সহ এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"এমন প্রমাণ যা' আমাকে সন্তুষ্ট করতে পারে। বর্ত্তমানে আমি কেবল শক্তিতেই বিশ্বাস করি।"

"কিন্তু সে-শক্তির উৎস কোথায়?" সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন।

"সেটা কালে আবিষ্কার করবো। শুধু 'কোথায়' নয়, কেন যে সে-শক্তি উৎসারিত হয় তাও জানবো। ইতিমধ্যে সকল রকম পাঞ্চভৌতিক বা আধ্যাত্মিক সম্ভাবনাই পরীক্ষা করে দেখ্‌তে হবে। এ পরীক্ষা যতদূর অগ্রসর হয়েছে তা'তে আমার বিশ্বাস যে লিলিথ-ঘটিত এই ব্যাপারকে অবশ্যই আপনি বিস্ময়কর বলে' স্বীকার করবেন।"

"না, তা' ঠিক করি নে;" গম্ভীর-স্বরে সন্ন্যাসী বলিলেন—"তুমি যা' করেছো, একাজ অধিকাংশ প্রাচ্য-যাদুবিশারদই করতে পারে; অবশ্য যদি আবশ্যক মত ইচ্ছাশক্তি তা'দের থাকে। দেহ থেকে আত্মাকে বিচ্ছিন্ন করে' নেওয়ার পরও দেহকে সজীব রাখা এতই সাধারণ ব্যাপার যে, অনেকেই একাজ করেছে এবং পরেও অনেকে করবে; কিন্তু অস্বাভাবিক দ্বন্দ্বে দেহ ও আত্মাকে পরস্পর-যুধ্যমান করে তুলতে, ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে সঙ্গে নিষ্ঠুরতারও দরকার হয়।"

"আপনি কি বলতে চান যে আমার কার্য্যের মধ্যে কিছুই আশ্চর্য্য নেই?"

"কেমন ক'রে থাকবে?" সন্ন্যাসী বলিলেন—"বর্ব্বরতার মধ্যে আশ্চর্য্য কি আছে? আশ্চর্য্য যদি কিছু থাকে তবে সে তুমি নিজে। স্বেচ্ছাবৃত দৃষ্টিহীনতার চরমতম উদাহরণ, তোমার মধ্যে ছাড়া আর কোথাও আমি দেখিনি ব'লে মনে হয় না।"

ক্রোধে এল র‍্যামির মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল; কিন্তু অসাধারণ আত্মসংযম বলে তৎক্ষণাৎ তাহা দমন করিয়া, তিনি নিঃশব্দে দাঁড়াইয়া রহিলেন। সন্ন্যাসী সস্নেহে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিলেন; পরে প্রীতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে করুণা বর্ষণ করিতে করিতে, কোমল কণ্ঠে বলিলেন:—

"এল র‍্যামি জ্যারানোস্! তুমি আমাকে ভালরকমই জানো,—জানো যে তোমাকে প্রতারণা করা আমার স্বভাব-বিরুদ্ধ। অতএব আমার কথা শোন;—ওড়বার আগে পাখী যেমন, কিম্বা ফোটবার আগে ফুল যেমন, ঠিক সেইরকম অবস্থাতেই লিলিথের আত্মাকে আমি দেখ্‌তে পাচ্ছি। চিরোজ্জ্বল আলোক সাগরের কিনারায় এসে সে দাঁড়িয়েছে; এ-সমুদ্রের বিকম্পিত উর্ম্মিলীলা তা'র অন্তরতম চেতনাকে স্পর্শও করেছে। কিন্তু তুমি?—এতখানি মনীষা—এতবড় জড়-শাসন-শক্তি সত্ত্বেও তুমি দাঁড়িয়ে আছ এক কৃষ্ণ-সাগরের কূলে! কেন পতন-কামনা কর্চ্ছ? কিজন্যে আলোর বিনিময়ে অন্ধকারকে বরণ কর্ত্তে চাইছো?"

"সম্ভবতঃ, আমার কার্য্যাবলী বর্ব্বর-জনোচিত বলে"—শ্লেষতীব্রস্বরে এল র‍্যামি উত্তর করিলেন; পরে বলিলেন—"আপনি আমার প্রতি অবিচার কর্চ্ছেন,—সে যাই হোক্, সব কথা এখনও আপনি শোনেন নি। আপনার ধারণা যে আমার পরিশ্রম ব্যর্থ হয়েছে,—কিন্তু আপনাকে দেখাবার মত এখনও আমার কতকগুলি লিপিবদ্ধ পরীক্ষা-ফল আছে,—এসমস্ত পাণ্ডুলিপিই আমি আপনাকে প্রদান কর্‌তে চাই। যদি সেগুলিকে যথার্থ ই নব-আবিষ্কার বলে' মনে করেন, তা' হ'লে সে-সব আবিক্রিয়া আপনাদের ধর্ম্মসংঘে রক্ষাও কর্‌তে পারেন। আজ যা' আপনার চক্ষে বৈজ্ঞানিকের ভ্রান্তধারণা বলে' বোধ হ'চ্ছে কালে তাই হয়তো বিশ্বমানবের ব্যবহারিক অবলম্বন হ'য়ে দাঁড়াবে।"

সহসা থামিয়া এল র‍্যামি লিলিথের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং তাহার হস্তদ্বয় গ্রহণ করতঃ কয়েকবার ডকিলেন। শীঘ্রই উত্তর আসিল—

"এইখানেই আছি"।

"আর এখানে থেকো না, লিলিথ"—স্নেহ-কোমল-স্বরে এল র‍্যামি বলিলেন—"যাও, তোমার আকাঙ্ক্ষিত স্থানে বিশ্রাম কর। এ-পৃথিবীতে পুনরাহ্বান না করা পর্য্যন্ত আনন্দ ভোগ করগে।"

বন্দিনীকে মুক্তি দিবার পর সন্ন্যাসীর দিকে ফিরিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"দেখ্‌লেন বোধ হয় যে আমি নিষ্ঠুর নই, তা'কে স্বাধীনতাও আমি দিয়ে থাকি?"

"এ স্বাধীনতা সম্পূর্ণ নয়"—সন্ন্যাসী বলিলেন—"সেইজন্যে তা'র আনন্দও ক্ষণিক।"

অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—

"কি যায় আসে, যদি তা'র মুক্তিকাল বাস্তবিকই নিকটস্থ হয়ে থাকে? আপনার শুভাশীর্ব্বাদে কয়েকদিনের মধ্যেই তো সে মুক্ত হবে!"

সন্ন্যাসীর নয়নযুগল প্রশান্ত জয়োল্লাসে দীপ্ত হইয়া উঠিল।

"নিশ্চয়ই তা' হবে!"

এল র‍্যামি বক্তার দিকে চাহিলেন,—একটা ক্রুদ্ধ উত্তর তাঁহার মুখে আসিয়াছিল, কিন্তু কষ্টে সংযত হইয়া বলিলেন—

"আপনার কথায় সন্দেহ করে' অবিনয়ের পরিচয় দেব না! তবে, এটুকু আপনাকে স্মরণ করিয়ে দেওয়ায় হয়তো দোষ নেই যে জগতে কিছুরই নিশ্চয়তা নেই—"

"বিধাতার বিধানগুলি ছাড়া!"—উত্তেজিতস্বরে সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"সে বিধান অটল,—এবং তা'র বিরুদ্ধে তোমার সকল চেষ্টাই ব্যর্থ এল র‍্যামি! তা'র বিরুদ্ধে তোমার সকল শক্তি-সামর্থ্যই ভেসে যাবে,—এবং আজ যারা এই জ্ঞান-গরিমায় বিস্ময়প্রকাশ কচ্ছে, ক্রমশঃ পরস্পরকে তা'রা সেই একই পুরাতন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করবে—'কি দেখ্‌তে বাইরে গিয়েছিলে?'......এই প্রশ্নের উত্তরটাই তোমার ভাগ্য-পরিচায়ক হবে—'বায়ুকম্পিত একগাছা উলুখড়'!"

বক্তব্যশেষে একেবারেই পশ্চাৎ ফিরিয়া, এমন কি লিলিথের দেহটার দিকে আর দৃক্‌পাত-মাত্র না করিয়া সন্ন্যাসী কক্ষত্যাগ করিলেন। কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ়বৎ এল র‍্যামি ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে জ্যারোবার উদ্দেশে ঘণ্টাধ্বনি করিয়া, ত্বরিতচরণে ঐ আশ্চর্য্য অতিথিটীর অনুসরণ করিলেন।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

হেমন্তে বঙ্গ।

—ঃ*ঃ—

মালকোশ-বাহার—তবুতঙ্গা।

ছোট ছোট ঢেউ তুলি' ঐ
নদীটি আজ ছুট্‌ছে ত্বরা,—
ঐ ত তোমার ওড়্‌না মা গো
গিলে-দিয়ে চুনট্‌-করা!
ফিকে রঙীণ ঐ কাঁচুলি
সবুজ ক্ষেতে যাচ্চে দুলি,'
নীলাম্বরী শাড়ীটি ঐ
নীল আকাশে মোহ-ভরা!
রক্ত-কমল আল্‌তা পায়ে
সিঁদুর ভালে তরুণ রবি,
নিখুঁত তোমার রূপচ্ছবি
দাঁড়া মা আজ তুল্‌বে কবি।
তোমার স্তুতি কণ্ঠে ছাঁকি'
প্রভাতী আজ গাইবে পাখী,
ভরা-ক্ষেতের রূপটি মা তোর
নিখিল জন-মন-হরা!!

শ্রীচণ্ডীচরণ মিত্র।

স্বরলিপি।

—ঃ০ঃ—

শ্রীমতী মোহিনী সেন গুপ্তা।

অস্থায়ী।

১´ ০ ১´ ০
II{ । । সা । সা ধ্‌া ন্‌া I সা -া মা । মা মা । I
০ ০ ছো ট ছো ট টে উ তু লি ঐ ০

১´ ০ ১´ ০
I মা মা -া । গা গা -া I মা -া ধা । ধা ধা -া }I
ন দী ০ টি আ জ্‌ ছু ট্‌ বে স্ব রা ০

১´ ০ ১´ ০
I{ -া । ধা । র্সা র্সা র্সর্সা I না- -র্সা র্সনর্সনা । ধা ধা -া I
০ ০ ঐ ত তো মার ও ড়্‌ না০০০ মা গো ০

১´ ০ ১´ ০
I পা পা -ধা । পা পা -া I মা মা -পা । মা মা -া }II
গ লে ০ দি য়ে ০ চু ন ট্‌ ক রা ০

অন্তরা।

১´ ০ ১´ ০
II{ । । ধা । ধা না র্সর্সা I র্রা । র্সা । না র্সা -া I
০ ০ ফি কে র ঊীণ্‌ ঐ ০ কাঁ চু লি ০

১´ ০ ১´ ০
I র্সা র্গা -া । । র্রা র্রা I র্সা-া-না । র্সা র্সা -া }I
স বু জ্‌ ০ ক্ষে তে যা চ্‌ চে ছু লি ০

১´ ০ ১´ ০
I{ -া । ধা । র্সা -র্সা র্সা I না না -া । ধা ধা । I
০ ০ নী লা ম্ব রী শা ড়ী ০ টি ঐ ০

I । পা পা -ধা পা পা I মা মা -পা | মা মা -া }II
নী লা • কা শে মো হ • ভ রা •

সঞ্চারী।

II -া । সা | -সা মা মমা I মা -া মা | মা মা -া I
র ক্ত ক মল্ আ ল্ তা পা য়ে •

I । । মা | মমা গা গা I মা মা -ধা | ধা ধা -া }I
• সিঁ দূর্ ভা লে ত রু ণ্ র বি •

I{ -া । ধা র্সর্সা র্সা র্সর্সা I না র্সা -না | ধা ধা -া I
• নি খুঁত্ তো মার্ রূ প • চ্ছ বি •

I । । পা ধা পা পপা I মা -পা মা | মা মা -া }I
• দাঁ ড়া মা অ:জ্ তু ল্ বে ক বি •

আভোগ।

I{ -া । ধা ধধা ননা র্সা I না -র্রা র্সা | না র্সা -া I
• তো মার্ স্তু তি ক ন্ ঠে ছাঁ কি •

I র্সা র্গা -া | । র্রা র্রর্রা I র্সা -া না | র্সা র্সা -া }I
প্র ভা • • তী আজ্ গা ই ছে পা খী •

I{ -া । ধা র্সা র্সা র্সর্সা I না -া না | ধা ধাঃ -ঃ I
• • ভ রা ক্ষে তের্ টি মা তো র্

I পা পা ধা পা পা -া I মা মা -পা | মা মা -া }II II
নি খি ল- জ ন- • ম ন- • হ রা •

হিন্দু বিবাহ-পদ্ধতি এবং অসবর্ণ বিবাহ।

বিবাহ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে একটি বন্ধন, উভয়ে মিলিত হইয়া সংসার যাত্রায় সুখী হইবার স্পৃহা ইহার মূলে—জীব-প্রবাহ বৃদ্ধি করা বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য। সমাজে যত প্রকার সংস্কার আছে, তন্মধ্যে বিবাহই প্রধানতম সংস্কার বা অনুষ্ঠান, এবং ইহাই সমাজ বন্ধনের মূলভিত্তি। বিবাহ সংস্কার নাই, বর্ত্তমান সভ্যতার যুগে এরূপ সমাজ কোথাও আছে কিনা সন্দেহ। তবে, সমস্ত জগতের কথা অদ্য আমাদিগের আলোচ্য বিষয় নহে। এই পুণ্যভূমি ভারতে স্মরণাতীত কাল হইতে যে বিবাহ প্রথা প্রচলিত আছে, তদ্বিষয়ে, বোধহয়, কাহারও সন্দেহ নাই। কারণ সকল দেশীয় পুরাতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ একবাক্যে বলিতেছেন যে, ভারতে আর্য্যজাতিই সর্ব্বাগ্রে বিবাহের উচ্চ আদর্শ মানব-সমাজে উপস্থিত করিয়াছেন। বস্তুতঃ, যুগে যুগে আর্য্য মহর্ষিগণ কতদিক দিয়া কত প্রকারে যে বিবাহপ্রথার দোষগুণের সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাহা একমুখে বলিয়া শেষ করা যায় না। এমন কি, তাহা সংক্ষেপে সমালোচনা করিতে গেলেও একখানি বৃহৎ গ্রন্থ হইয়া পড়ে।

আর্য্যজাতির মধ্যে বিবাহ একটা সামাজিক প্রধানতম সংস্কার একথা বলিলেও যথেষ্ট হইল না। কারণ, ইহা হিন্দুর ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। ঋষিগণের মতে বিবাহ একটা মহাযজ্ঞ; সুতরাং তদ্রূপভাবেই তাঁহারা হিন্দু শাস্ত্রে বিবাহের বিধি বিধান করিয়াছেন। তাই প্রাচ্য-বিদ্যামহার্ণব শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ বসু, তাঁহার বিশ্বকোষের একস্থলে লিখিয়াছেন,—"পবিত্রতম মন্ত্রময় যজ্ঞই হিন্দু বিবাহের একমাত্র সঙ্গতি; যজ্ঞের অনলে এই বিবাহের আরম্ভ, কিন্তু শ্মশানের অনলে এই বিবাহ-বন্ধন বিনষ্ট করিতে পারে না। * * * সুতরাং হিন্দুর বিবাহ স্ত্রীপুরুষের সংযোগের একটী সামাজিক রীতি নহে, ইন্দ্রিয় বিলাসের সামাজিক বিধি নির্দ্দিষ্ট নির্দ্দোষ উপায় নহে, অথবা গার্হস্থ্য ধর্ম্মের নিমিত্ত স্ত্রীপুরুষের একটী সামাজিক বন্ধন বা Contract নহে; ইহা একটী কঠোর যজ্ঞ এবং জীবনের একটী মহাব্রত।"

বৃহদারণ্যকোপনিষদেও দেখা যায়, উপনিষৎকার ঋষিগণ বিবাহের উচ্চ আদর্শ প্রদর্শন জন্য বলিয়াছেন, "ব্রহ্মা স্বয়ং দ্বিধাবিভক্ত হইয়া, একাংশে পতি ও অপরাংশে পত্নীর সৃষ্টি

করিয়াছেন " (১) সুতরাং বিবাহরূপ যজ্ঞ উভয়ের উক্ত মিলন না হইলে একটী পূর্ণ মনুষ্যের উৎপত্তি বা গঠন হয় না। ব্যাসদেবও তাঁহার সংহিতার একস্থানে বলিয়াছেন ;— "পুরুষ যে পর্য্যন্ত জায়া অর্থাৎ স্ত্রীপ্রাপ্ত না হয়, তাবৎকাল অর্দ্ধ থাকে।" (২) এই জন্যই হিন্দু শাস্ত্রানুসারে স্ত্রীবিহীনের যজ্ঞাদি কোনও ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবারও অধিকার নাই।

দেশ, কাল, পাত্র এবং সমাজের অবস্থা ভেদে, আর্য্য ঋষিগণ, শাস্ত্রে আট প্রকার বিবাহের উল্লেখ করিয়াছেন। যথা ;—১। ব্রাহ্ম, ২। আর্ষ, ৩। প্রাজাপত্য, ৪। দৈব, ৫। আসুর, ৬। গান্ধর্ব্ব, ৭। রাক্ষস এবং ৮। পৈশাচ।

১। বেদজ্ঞ অর্থাৎ শিক্ষিত ও সচ্চরিত্র পাত্রকে আহ্বান করিয়া, অর্চ্চনা করতঃ, বস্ত্রালঙ্কারে বিভূষিতা কন্যা সম্প্রদান ব্রাহ্ম বিবাহ।

২। বরের নিকট হইতে দুইটি মাত্র গোধন লইয়া কন্যাদান আর্ষ বিবাহ।

৩। "তোমরা উভয়ে একত্র হইয়া ধর্ম্মের সহিত জীবন যাপন কর," এইমাত্র বলিয়া কোনও পাত্রকে কন্যাদান প্রাজাপত্য বিবাহ।

৪। কন্যার পিতা কোনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের দ্বারা যজ্ঞানুষ্ঠান করিয়া, যজ্ঞের দক্ষিণা স্বরূপ তাঁহাকে কন্যাদান দৈব বিবাহ।

৫। কন্যা ও কন্যার পিতা বা ভ্রাতাকে ধন দান করিয়া কন্যা গ্রহণ করা আসুর বিবাহ।

৬। বর ও কন্যা পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইয়া কন্যার পাণিগ্রহণ করা গান্ধর্ব্ব বিবাহ।

৭। বলপূর্ব্বক কন্যা গ্রহণ করা রাক্ষস বিবাহ।

৮। নিদ্রিত অবস্থায় কন্যা হরণ করিয়া গ্রহণ করা পৈশাচ বিবাহ।

---

(১) "স ইমমেবাত্মানং দ্বেধাপাতয়েৎ
ততঃ পতিশ্চ পত্নী চাভবতাম্।" বৃহদারণ্যকোপনিষদ্।

(২) "যাবন্ন বিন্দতে জায়াং
তাবদর্দ্ধো ভবেৎ পুমান্।" ব্যাসসংহিতা।

এই অষ্টবিধ বিবাহের মধ্যে শেষোক্ত দুইটি পূর্ব্বেই আইন দ্বারা রহিত হইয়াছে। অপর ছয় প্রকার বিবাহের মধ্যেও দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য এবং গান্ধর্ব্ব বিবাহ প্রথাও, যে যে কারণেই হউক বর্ত্তমান সময়ে ভারতের সর্ব্বত্র প্রচলিত নাই। সুতরাং বলিতে গেলে, কতক পরিবর্ত্তিত অবস্থায় হইলেও, ব্রাহ্ম এবং আসুর এই দ্বিবিধ বিবাহ প্রথাই এইক্ষণে প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচলিত আছে। এতদুভয়ের মধ্যেও অর্থাৎ পণগ্রহণে কন্যা সম্প্রদান আইনসিদ্ধ হইলেও শাস্ত্রমতে দোষাবহ ও ঘৃণার্হ। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্ম বিবাহই শ্রেষ্ঠ এবং সর্ব্বত্র সমাদৃত।

মানবজাতি সামাজিক জীব বলিয়াই অপরাপর জীবজন্তু হইতে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। বিবাহই সেই সমাজ বন্ধনের মূলভিত্তি বা আদি কারণ। হিন্দুদিগের মধ্যে যে দশবিধ সামাজিক সংস্কারের ব্যবস্থা আছে, তন্মধ্যে বিবাহ সংস্কারই সর্ব্বপ্রধান। তাই স্বর্গীয় ভূদেববাবু তাঁহার পারিবারিক প্রবন্ধের একস্থানে লিখিয়াছেন, স্বার্থ ও পরার্থ এই দুই ভাবের পূর্ণ মিলনই বিবাহ সংস্কারের প্রধান উদ্দেশ্য। এই উপায়েই দুই হৃদয়ের স্বার্থ বুদ্ধি সংশোধিত হইয়া পরার্থভাবে অনুপ্রাণিত এবং একীভূত হয়।" বস্তুতঃ, স্বার্থত্যাগ এবং পরার্থভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া অপরের সুখসুবিধার জন্য শক্তি প্রয়োগই সমাজ রক্ষা এবং সামাজিক উন্নতির মূল। এই শিক্ষা এবং দীক্ষা একমাত্র বিবাহবন্ধন হইতেই সমধিক পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। স্ত্রী স্বামীর জন্য এবং স্বামী স্ত্রীর জন্য, পক্ষান্তরে স্বামীস্ত্রী উভয়ে একপ্রাণ হইয়া, পুত্রকন্যাগণের সুখ সুবিধার জন্য প্রাণপণ করিতেও কুণ্ঠিত হয় না। তাই হিন্দুর বিবাহের মন্ত্রে আছে, "তোমার হৃদয় আমার হউক, আমার হৃদয় তোমার হউক আর আমাদের উভয়ের হৃদয় এক হইয়া পরমেশ্বরের হউক।" এই রূপে উভয় হৃদয় এক হইয়া পরমেশ্বরের হওয়া, আর ধর্মভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া পরার্থভাবে সমাজের সেবায় স্বার্থত্যাগ করা একই কথা।

বিবাহের আর একদিক বা শ্রেষ্ঠলক্ষ্য জন সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়া সমাজের পুষ্টি সাধন করা। কি হিন্দু, কি মুসলমান, কি খৃষ্টান সকল ধর্মশাস্ত্রই একবাক্যে এই কার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব এবং গুরুত্ব অনুভব করিয়া তদনুরূপ আদেশ এবং উপদেশ দিয়াছেন। হিন্দুর বিবাহ-বিধিকর্ত্তা মনু বলিয়াছেন, "পুত্রার্থে ক্রিয়তে ভার্য্যা পুত্রপিণ্ড প্রয়োজনম্।" অর্থাৎ পুত্রের জন্যই

ভার্য্যাগ্রহণ অর্থাৎ বিবাহ করা আবশ্যক। আবার গীতার ৩য় অধ্যায় ১০ম শ্লোকে মহর্ষি ব্যাস দেব বলিয়াছেন,—

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ সৃষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্॥"

অর্থাৎ পুরাকালে প্রজাপতি ব্রহ্মা স্বয়ং যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারা জীবের সৃষ্টি করিয়া মানব সন্তানগণকে বলিয়াছেন,—তোমরাও আমার দৃষ্টান্তের অনুসরণ করিয়া কামধুক্ যজ্ঞের অনুষ্ঠান কর এবং তদ্দ্বারা প্রজা বৃদ্ধিকর।" পক্ষান্তরে, যাহার সন্তান জন্মে নাই শাস্ত্রানুসারে তাহাকে নরকগামী হইতে হয়। কারণ শাস্ত্রানুসারে পুৎনামক নরক হইতে উদ্ধার করে বলিয়াই পুত্র নাম হইয়াছে।

ধর্ম্মগ্রন্থ বাইবেলে যে দশাজ্ঞার উল্লেখ আছে, তাহার প্রথম আজ্ঞায় লিখিত আছে, পরমেশ্বর কহিলেন, "হে আদি মানব, তুমি এইক্ষণে পৃথিবীতে যাইয়া এই নারীকে পত্নীত্বে বরণ করতঃ জনসংখ্যা বৃদ্ধিকর, তোমার প্রতি ইহাই আমার প্রথম আদেশ। আমার এই অনুজ্ঞা জগতে দৃষ্টান্ত স্বরূপ হউক।" বাইবেলের আর এক স্থানে আছে, যিশু বলিয়াছেন, যে কেহ শিশুদিগকে গ্রহণ করে অর্থাৎ জন্মায় সে আমাকেই প্রাপ্ত হয়।

খৃষ্টধর্ম্ম প্রচারক মহাত্মা মাউন্টফিল্ড বলিয়াছেন,—

"যদি কেহ একটী শিশুকে আনন্দিত করিতে পারে, তাহার এই সদনুষ্ঠানের কালে স্বর্গের পথে জয়বাদ্য বাজিয়া উঠে অর্থাৎ স্বর্গে জয়ধ্বনি হয়।" ধর্ম্মগ্রন্থাদিতে প্রজনন-ক্রিয়া-সম্বন্ধে এইরূপ ধর্ম্মভাবের অনেক কথাই বর্ণিত আছে।

আবার সমাজশক্তি বা জাতীয় উন্নতির দিক দিয়া দেখিতে গেলেও জনসংখ্যার বৃদ্ধি অর্থাৎ আধিক্যই জাতীয় শক্তি এবং জাতীয় উন্নতির মূলীভূত। বিবাহরূপ যজ্ঞই সেই জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রধান সহায়। সুতরাং যেরূপ বিধি-বিধান হইলে, বিবাহ-পদ্ধতি যে প্রণালীতে অনুষ্ঠিত হইলে, সমাজে জন-সংখ্যার বৃদ্ধি হইতে পারে তাহাই আমাদের সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। হিন্দুবিবাহ-বিধিকর্ত্তারাও এই মূল উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য স্থিরতর রাখিয়াই বিবাহে বরকন্যা নির্ব্বাচনের বিবিধ বিধি বিধান করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু পরিতাপের বিষয়, যুগপরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে সেই-সকল বিধিব্যবস্থার সার্থকতা না হইয়া, আধুনিক সমাজনেতাগণের বিবেচনার ত্রুটীতে হিতে বিপরীত

হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং তাহারই ফলে এইক্ষণে শ্রেষ্ঠ ও আদর্শস্থানীয় হিন্দু জাতি ধ্বংসোন্মুখ জাতিতে পরিণত হইয়াছেন।

অনেকেই ডাঃ উপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম, ডি, আই, এম, এস মহাশয়ের নাম অবগত আছেন। তিনি হিন্দুজাতির জনসংখ্যার ক্রমে অল্পত হইতেছে দেখিয়াই "Dieing race of Bengal" নামে একটী প্রবন্ধ লিখিয়া তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি নিখিল বঙ্গদেশায় হিন্দু এবং মুসলমান এই দুই প্রধান জাতির জনসংখ্যা এবং বংশবৃদ্ধির পরস্পর তুলনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে হিন্দুর সংখ্যা ক্রমে ক্রমেই হ্রাস হইতেছে। আদম শুমারী অর্থাৎ সেন্‌সাস্ রিপোর্ট সমালোচনায়ও তাহাই প্রমাণিত হইতেছে। গত ১৮৭২ সনে সর্ব্বপ্রথম ব্রিটীশ রাজ্যভুক্ত ভারতবর্ষে জনসংখ্যার গণনা আরম্ভ হইয়াছে তৎসহ পরবর্ত্তী সেন্‌সাসের তুলনায় বঙ্গদেশের হিন্দুর সংখ্যা যে ক্রমেই হ্রাস হইতেছে তাহা বেশ জানা যায়।

	সন	হিন্দুর সংখ্যা	মুসলমানের সংখ্যা	কম ও বেশী
১।	১৮৭২	১ কোটী ৭১ লক্ষ	১ কোটী ৬৭ লক্ষ	হিন্দু ৪ লক্ষ বেশী
২।	১৮৮১	১ কোটী ৭২ লক্ষ	১ কোটী ৭৯ লক্ষ	মুসলমান ৭ লক্ষ বেশী
৩।	১৮৯১	১ কোটী ৮০ লক্ষ	১ কোটী ৯৬ লক্ষ	মুসলমান ৬ লক্ষ বেশী
৪।	১৯০১	১ কোটী ৯৪ লক্ষ	১ কোটী ২০ লক্ষ	হিন্দু ৭৪ লক্ষ বেশী

এইক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে যে একই আবহাওয়ায় এবং একইস্থানে পাশাপাশি বাস করিয়া এবং একই রাজার শাসনাধীনে সমসুখদুঃখ ভোগের অংশী থাকিয়াও এই দুই জাতির মধ্যে জনসংখ্যার এতাধিক হ্রাসবৃদ্ধির কারণ কি? কর্ণেল মুখোপাধ্যায় যৌনসম্বন্ধে অর্থাৎ বিবাহ পদ্ধতির দোষগুণ বা বিভিন্নতা ছাড়াও হিন্দু মুসলমানদিগের সামাজিক রীতিনীতি, বাসস্থানের ইতর বিশেষ এবং আহারাদির পার্থক্য প্রভৃতি আরও কয়েকটী কারণের উল্লেখ করিলেও তন্মধ্যে হিন্দুর বিবাহ ঘটিত দোষত্রুটি অর্থাৎ বর্ত্তমান সময়ে প্রচলিত বিধিব্যবস্থাই ইহার প্রধান কারণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

হিন্দুবিবাহ-বিধিকর্ত্তারা যে কয়েক প্রকার বিবাহ-পদ্ধতির বিষয় বলিয়া গিয়াছেন, তাহার সমস্তগুলি যে এইক্ষণে সর্ব্বত্র অবাধে চলিতেছে না তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর যে যে

বিবাহপ্রথা এইক্ষণে হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে, তাহারও কার্য্য এই জাতিভেদের জন্য সর্ব্বত্র যথারীতি প্রচলিত নাই। অথচ বিবাহে বরকন্যা নির্ব্বাচন সম্বন্ধে প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থাদিতে যে সকল বিধি-নিষেধের উল্লেখ আছে তন্মধ্যে জাতিভেদের বিশেষ কোনই উল্লেখ দেখা যায় না। অধিকন্তু অনুলোম এবং প্রতিলোম এই দুই হিন্দুবিবাহ পদ্ধতি যে অতি প্রাচীন কালেও হিন্দু-সমাজে প্রচলিত ছিল তাহার প্রমাণের বা দৃষ্টান্তের অভাব নাই। এমন কি পূর্ব্বে অনুলোম-পদ্ধতি মতে ব্রাহ্মণদিগের ব্রাহ্মণেতর জাতীয়া কন্যার পাণিগ্রহণেরও শাস্ত্রসম্মত বিধিব্যবস্থা ছিল এবং তদ্রূপ বিবাহোৎপন্ন সন্তানগণের উত্তরাধিকারসূত্রে পৈতৃক সম্পত্তির মালিক দখলিকার হইতে কোনই বাধা ছিল না। এখনও মণিপুর প্রভৃতি অঞ্চলে তদ্রূপ অনুলোম বিবাহপদ্ধতি প্রচলিত আছে। পক্ষান্তরে, ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণের কন্যাকে নীচবর্ণের কোন বর গ্রহণ করিলেও প্রতিলোম বিবাহ-পদ্ধতি-মতে তাহার বিবাহ শাস্ত্রসিদ্ধ হইত। তবে সামাজিক প্রথানুসারে তদ্রূপ বিবাহিত দম্পতিকে নীচ বর্ণের সমাজভুক্ত হইতে হইত, এইমাত্র প্রভেদ। আসাম-প্রদেশে এখনও তদ্রূপ অনুলোম ও প্রতিলোম উভয় পদ্ধতিমতেই বিবাহ হিন্দুসমাজে প্রচলিত আছে। তবে অনুলোম পদ্ধতিমতে বিবাহ হইলে, তাহাদিগকে উভয় জাতি হইতে পৃথক হইয়া 'বড়িয়া' নামক এক অভিনব বা নূতন জাতি ভুক্ত হইতে হয়। এই স্থলে উল্লেখ করা অসঙ্গত নয় যে আসামে বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, বৈদ্য কায়স্থাদি জাতির ন্যায় বিবাহকালে কন্যাকে গোত্রান্তরিত হইতে হয় না; কারণ আসামে তদ্রূপ বংশ-পরিচায়ক কোন গোত্র নাই। কাজেই অসবর্ণ বিবাহ করিয়া বরকে কন্যার সমাজভুক্ত হইতে বিশেষ কোনও বাধা দেখা যায় না।

মহর্ষি মনু প্রভৃতি বিবাহ বিধি কর্ত্তারা বিবাহে বরকন্যা নির্ব্বাচনে অর্থাৎ যে সকল কুলে বিবাহ করিতে নিষেধ করিয়াছেন তন্মধ্যে নিম্নলিখিত দশটাই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। মনু সংহিতায় আছে, "গো, মেষ এবং ধন ধান্যাদি সমৃদ্ধি সম্পন্ন হইলেও নিম্নলিখিত দশকুলের কন্যা গ্রহণ করিবে না; যথা।—১। হীনক্রিয় অর্থাৎ যে কুলে জাতকর্ম্মাদি সংস্কার যথাবিধি অনুষ্ঠিত হয় না। ২। নিষ্পুরুষ অর্থাৎ যে বংশে কেবল কন্যা সন্তানই জন্মে। ২। নিশ্ছন্দ অর্থাৎ যে বংশ বেদাদি শাস্ত্রচর্চ্চা বা বিদ্যাচর্চ্চা বর্জ্জিত। ৪। রোমশ অর্থাৎ যে কুলের সন্তান সন্ততিগণ বহুলোম বিশিষ্ট হইয়া জন্মে। ৫। যে বংশ অর্শরোগাক্রান্ত।

৬। ক্ষয়ী অর্থাৎ যে বংশ রাজযক্ষ্মা রোগাক্রান্ত। ৭। মন্দানল অর্থাৎ যে বংশের লোকেরা সর্ব্বদা মন্দাগ্নি রোগে কাতর। ৮। অপস্মারী অর্থাৎ যে বংশে মূর্চ্ছা রোগ প্রধান। ৯। শিত্রী অর্থাৎ যে বংশ ধবল রোগ প্রাপ্ত। ১০। কুষ্ঠী অর্থাৎ যে বংশের লোক কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত এ ছাড়া, সগোত্র এবং সপিণ্ড স্থলেও বিবাহ অবৈধ। স্মৃতিশাস্ত্রেও লিখিত আছে," ভার্য্যা অর্থাৎ স্ত্রীই যখন ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ কালপ্রাপ্তির মূলীভূত, তখন বিবাহ করিবার পূর্ব্বে কন্যার শুভাশুভ লক্ষণাদি বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার পাণিগ্রহণ করা কর্ত্তব্য। (১) তদর্থে কন্যার কুলশীলাদি বংশগত দোষগুণাদি ২। জ্যোতিষ শাস্ত্রানুসারে জন্মকুষ্ঠী দৃষ্টে গ্রহ নক্ষত্র এবং গণাদি এবং ৩। দৈহিক লক্ষণাদি অর্থাৎ হস্ত পদাদির চিহ্ন দৃষ্টে শুভাশুভ গণনা, এই ত্রিবিধ উপায়ে বিবাহ কন্যা নির্ব্বাচনের ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রমতেও বর ও কন্যার দৈহিক উপাদান অর্থাৎ ধাতুগত সাম্য ও বৈষম্য পরস্পর তুলনা করিয়া বিবাহে কন্যা নির্ব্বাচনের বিধি ব্যবস্থা আছে। এতদ্ব্যতীত কৃত্যচিন্তামণি নন্দিকেশ্বর পুরাণ এবং চরক ও সুশ্রুতাদি শাস্ত্রগ্রন্থেও বিবাহে কন্যানির্ব্বাচনের বা পাত্রী পরীক্ষার বহু বিধিব্যবস্থা আছে; কিন্তু তাঁহার কোনও গ্রন্থাদিতেই সুলক্ষণা সম্পন্ন কনা পাইলে হিন্দুর বর্ণভেদের আপত্তিতে তাহার পাণিগ্রহণের নিষিদ্ধ বিধিকুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তাহা হইতেই বোধহয়, "কন্যারত্ন দুষ্কুলাদপি" এইরূপ কথা সমাজে চলিত আছে। বিশেষতঃ দেশকাল এবং অবস্থাভেদে সকল নিষেধ সকল সময়ে ব সকল যুগে ঠিক খাটে না বা খাটান সম্ভব পর হয় না। তাই, হিন্দুর প্রধান বিধিকর্ত্তা মহর্ষি মনু তাঁহার সংহিতায় লিখিয়াছেন।

"অন্যে কৃতযুগে ধর্ম্মাস্ত্রেতায়াং দ্বাপরে পরে।
অন্যে কলিযুগে নৃণাং যুগহ্রাসানুরূপতঃ। ১। ৮৫। মনু"

অর্থাৎ যুগানুসারে মনুষ্যের শক্তি হ্রাসহেতু সত্য যুগের ধর্ম্ম, ত্রেতাদি অন্য যুগে, ত্রেতাযুগের ধর্ম্ম পরবর্ত্তী অন্যযুগে ঘটে না। দ্বাপর যুগের বিশেষতঃ কলিযুগের ধর্ম্ম অন্যরূপ। সুতরাং এতদ্বারা বেশ বুঝা যাইতেছে যে শাস্ত্রকর্ত্তারাও দেশ কাল এবং অবস্থাভেদে বিধিনিষেধের

(১) ধর্ম্মার্থকামমোক্ষণাং দারাসম্প্রাপ্তিহেতবঃ।
পরীক্ষ্যাস্তে প্রযত্নেন পূর্ব্বমেব করগ্রহাৎ॥ স্মৃতি॥

অন্যথাচরণ যে অনিবার্য্য, পক্ষান্তরে, অবস্থানুসারে বা বিধিব্যবস্থা করা কর্ত্তব্য তাহা জানিতেন। প্রধানতঃ এই জন্যই অনেক স্থলে শাস্ত্রে একই বিষয়ে সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ মতও দৃষ্ট হয়।

প্রাতঃস্মরণীয় স্বর্গীয় মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয় যখন বিধবা-বিবাহ বিষয়ক আইন বিধিবদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তখন তিনি বিধবার বিবাহ যে শাস্ত্র সঙ্গত তদ্বিষয়ে নবদ্বীপের পণ্ডিতমণ্ডলীর মতামত অর্থাৎ পাঁতি সংগ্রহের জন্য তথায় গমন করিলে, পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেকে তাঁহার সহিত একমত হইয়া বলিয়াছিলেন, "অগাধ হিন্দু ধর্ম্ম শাস্ত্রের আলোচনা করিলে যুক্তিপূর্ণ কোন ব্যবস্থারই হিন্দু শাস্ত্রসম্মত বচনের অভাব হয় না। এমন কি গোহত্যা হিন্দুর শাস্ত্রে মহাপাপ বলিয়া সকলেই জ্ঞাত আছেন; কিন্তু সেই গোবৎস হত্যা করিয়াই প্রাচীনযুগে গৃহস্থের গৃহাগত অতিথির সৎকার করিবার ব্যবস্থা ছিল; এজন্য গো শব্দের অর্থ অতিথি। অতএব আপনি আপনার প্রস্তাবিত বিষয়ে নবদ্বীপের মহারাজার মতামত জানিয়া আসুন। তিনি আপত্তি না করিলে বিধবা-বিবাহ আইন যাহাতে বিধিবদ্ধ হয়, তদ্রূপ পাঁতি দিতে প্রস্তুত আছি।"

হিন্দু বিবাহের বিধি ব্যবস্থা আদর্শস্থানীয় হইলেও নানা কারণে এইক্ষণে তন্মধ্যে কতকগুলি গুরুতর দোষ প্রবেশ করাতেই যে হিন্দুসমাজ এইক্ষণে ধ্বংসের মুখে উপস্থিত হইয়াছে একথা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে। বিবাহ ঘটিত সেই সকল দোষের মধ্যে ১। শিশু বা বাল্য বিবাহ; ২। কৌলীন্য প্রথা এবং তৎজনিত বহু বিবাহ পক্ষান্তরে, বিবাহের অভাব; ৩। বিধবা বিবাহের অপ্রচলন; ৪। বিবাহে পণ গ্রহণ; ৫। অসবর্ণে বিবাহের অপ্রচলণ। এই পঞ্চ মহাপাপের ফলেই আমাদের সমাজ শক্তি অর্থাৎ জন সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস পক্ষান্তরে, সমাজ বক্ষে বহুপ্রকার মহাপাপের অনুষ্ঠান হইতেছে। বস্তুতঃ বিবাহের আটা আটিতেই অনেক সময় লোক চক্ষুর অগোচরে ব্যভিচারাদি পাপ সমাজ নীরবে বক্ষে ধারণ করিতেছে।

১। বাল্যবিবাহ—কি শারীরিক, কি মানসিক বা নৈতিক বাল্যবিবাহ আমাদিগের সকল প্রকার শিক্ষা এবং উন্নতিরই অন্তরায়। সুতরাং, অবস্থানুসারে বর এবং কন্যা প্রত্যেকেরই বিবাহের বয়স বৃদ্ধি হওয়া প্রার্থনীয়। প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে এই সামাজিক কুপ্রথা দূরীকরণ জন্য ঢাকাতে যখন "বাল্যবিবাহ নিবারণী সভা" স্থাপন এবং সেই সভা

হইতে "মহাপাপ বাল্য বিবাহ" নামে মাসিক পত্রিকা প্রচারিত হয় ; তখন যে সকল রক্ষণশীল সমাজপতি নানা বিভীষিকা দেখাইয়া তদ্বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন, এইক্ষণে আমরা তাহাদিগের পরিবারেই ১৪।১৫, এমন কি, ততোধিক বয়সের অবিবাহিতা কন্যা অবাধে বিরাজ করিতে দেখিতেছি। এখন আর "অষ্টবর্ষা ভবেৎ গৌরী নববর্ষা তু রোহিণী" ইত্যাকার শাস্ত্র-বচন কাহাকেও আবৃত্তি করিতে শুনা যায় না। এবং বয়োধিকা কুমারী কন্যা গৃহে থাকিলেও পিতা মাতা ও জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে নিরয়গামী হইবার ভয়ে ভীত ও সঙ্কুচিত হইতেও দেখা যায় না অতএব বিবাহের পূর্ব্বে যাহাতে পুত্রকন্যাগণ যথোচিত শিক্ষিত হইতে পারে, পিতামাতার সর্ব্বাগ্রে তাহাই দেখা কর্ত্তব্য। শিক্ষাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত অবলম্বনের যে প্রাচীন রীতি আছে, প্রত্যেক শিক্ষার্থী বালক বালিকারই সেই ব্রত অবলম্বন করা সর্ব্বথা বিধেয়।

উপযুক্ত বয়োপ্রাপ্ত এবং সুশিক্ষিত হইলে, পুত্র কন্যাগণকে বিবাহে স্বাধীনতা দিতেও বিশেষ কোন আশঙ্কার কারণ দেখা যায় না। নিজে নিজের জীবনসঙ্গী বা সঙ্গিনী মনোনীত করিয়া লইবেন, ইহা অপেক্ষায় সুখের বিষয় আর কি হইতে পারে। "ধরিয়া বাঁধিয়া প্রেম, আর মাজিয়া ঘষিয়া রূপ" হয় না! তবে অবশ্যই, কোন কোন স্থলে ইহাতে ভ্রম প্রমাদ ঘটিতে পারে। এরূপ অবস্থায় বিশেষ সতর্ক এবং সাবধানতার সহিত জীবনের এই গুরুতর কার্য্যে অগ্রসর হইতে হইবে। বিশেষতঃ ; স্বাধীন ভাবে কার্য্যে করিতেও অভিভাবকগণের আদেশ এবং উপদেশ শিরোধার্য্য করিয়া চলিতে বিশেষ কোন বাধা দেখা যায় না, তাহাতে বরং শুভ ফলই ফলে।

২। কৌলীন্য প্রথা ও তজ্জন্য বহুবিবাহের প্রচলন—এই বিবাহ প্রথার মহাপকারিতা এইক্ষণে শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিয়াছেন তাই ক্রমে ক্রমে এই মহাপাপ বিবাহ প্রথা আমাদের সমাজ বক্ষ হইতে বিদূরিত হইতেছে বা হইয়াছে বলা যায় ; সুতরাং এ বিষয়ে এইক্ষণে অধিক কিছু লিখিবার আর প্রয়োজন দেখা যায় না।

৩। বিধবা বিবাহ—হিন্দু সমাজে বিধবা বিবাহের অপ্রচলন জন্য বালবিধবাদিগের দারুণ দুঃখ কষ্ট এবং দুরবস্থা দেখিয়াই মহাত্মা বিদ্যাসাগর মহাশয়ই বিধবা বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ করিতে বদ্ধপরিকর হয়েন এবং তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় এই সমাজ ব্যাধির

প্রতিকার জন্য বিধবা বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হইয়া থাকিলেও ব্রাহ্মণাদি দ্বিজ জাতির মধ্যে ইহার প্রচলন অধিক নহে।

৪। বিবাহে পণ গ্রহণ—হীনাবস্থাপন্ন লোকের অবস্থানুসারে বরপক্ষের নিকট মূল্য বা পণগ্রহণে কন্যা সম্প্রদান করিবার কুপ্রথা পূর্ব্বেও আমাদের সমাজে প্রচলিত ছিল এবং অল্পাধিক পরিমাণে এখনও আছে। কিন্তু মূল্য দ্বারা বর ক্রয় করিয়া সেই ক্রীত পাত্রের নিকট কন্যা সম্প্রদান রূপ বরপণ গ্রহণে বিবাহপ্রথা আধুনিক। তাই, "পণগ্রহণে বিবাহ" পুস্তিকার একস্থলে লিখিত হইয়াছে,—"যে ত্রিকালজ্ঞ মুনিঋষিগণ, পরবর্ত্তী যুগে সমাজের কিরূপ কি পরিবর্ত্তন হইবে, তাহা দিব্য চক্ষে দেখিয়া সমাজের ভাবী চিত্র অঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারাও বিবাহ-প্রথার এতদ্রূপ বিপরীত পরিণতির অর্থাৎ কন্যাগণের পরিবর্ত্তে সমাজে বরপণ প্রথা প্রচলিত হইবে, তাহা কল্পনাও করিতে পারেন নাই। বস্তুতঃ বর ক্রয় করিয়া আনিয়া তাহার হস্তে কন্যারত্ন সমর্পণ করিতে হইবে, ইহা তাঁহাদিগের কল্পনারও বাহিরে ছিল; নচেৎ এমনা কন্যাপণ গ্রহণের পাপ অপেক্ষায়ও, ঘোরতর পাপ এবং অধিকতর নরক যন্ত্রণার ব্যবস্থা করিতে তাহারা ত্রুটি করিতেন না। এবং কন্যার মল-মূত্রাদী ভক্ষণের ব্যবস্থা স্বাধীন পুরুষ বরদিগের জন্যই বিধিবদ্ধ হইত, সন্দেহ নাই। যাহা হউক এতদ্বারা দেখা যাইতেছে যে, বরপণ গ্রহণে বিবাহের প্রথা পূর্ব্বে ছিল না। এই অভিনব বিবাহ প্রথা পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে এইক্ষণে আমাদের সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে।

যদিচ, পাশ্চাত্য শিক্ষা এবং সভ্যতা আমাদিগের কতকগুলি সামাজিক কুরীতি দূরীকরণে সহায় হইয়াছে, আমরা ইহা স্বীকার করিতে বাধ্য; কিন্তু আবার তৎসঙ্গে সঙ্গেই এমন কতকগুলি পাশ্চাত্য কুনীতি ও কুপ্রথা আমাদিগের সমাজবক্ষে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়াছে এবং ক্রমে করিতেছে, যাহা সত্বর দূরীভূত করিতে না পারিলে, আমাদিগের সমাজ অচিরে উচ্ছন্ন যাইবে। তন্মধ্যে বিবাহে বরপণ গ্রহণরূপ মহানিষ্টকারী কুপ্রথা একটি বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য। এই প্রথা পূর্ব্বে ছিল না; সুতরাং ইহা শাস্ত্রোক্ত অষ্টবিধ বিবাহের শ্রেণীভুক্ত করা যাইতে পারে না। তবে শাস্ত্রে আসুর, রাক্ষস এবং পৈশাচ এই যে ত্রিবিধ অপকৃষ্ট বিবাহ

প্রথার বর্ণনা আছে, এই পণ গ্রহণে বিবাহ প্রথা সেই তিনের সমাহার বলিলে বলা যাইতে পারে মাত্র।

শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস এম, এ, তাঁহার "বিবাহে পণ গ্রহণ" নামক পুস্তকের এক স্থলে লিখিয়াছেন;—"বিবাহ ভগবানের একটি বিচিত্র বিধান। প্রেম বিবাহের ভিত্তি; প্রেমিক হৃদয় নর নারী পরস্পরের প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেমে আকৃষ্ট হইয়া একসূত্রে গ্রথিত হইবে; সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে পরস্পরের দিকে তাকাইয়া পরস্পর গভীর আনন্দ, আশা ও বল অনুভব করিবে এবং উভয়ে একত্র হইয়া ঈশ্বরের ও মানবের সেবাতে নিযুক্ত হইবে, ইহাই বিবাহের প্রধানতম উদ্দেশ্য।" তিনি আরও বলেন:—"জীবপ্রবাহ রক্ষিত ও বর্দ্ধিত করাও বিবাহের অন্যতম উদ্দেশ্য। কিন্তু বিবাহকে হীন চক্ষে দর্শন করা, স্বার্থ সাধনের উপায় মনে করা ও কুবাসনা পরিতৃপ্তির প্রশস্ত পথ বলিয়া গ্রহণ করা, মহাপাপ। লাভ লোকসানের গণনা দ্বারা বিবাহ বিধি নিয়মিত করা গুরুতর অন্যায়। বিবাহের ভিত্তি যদি প্রেম হইল, দম্পতির মধ্যে প্রেমের দৃঢ় বন্ধন সংঘটিত হওয়ার উপরই যদি ভবিষ্য জীবনের সুখশান্তি নির্ভর করিল, তবে বিবাহে পণ গ্রহণ করা একেবারে অসম্ভব। বিবাহ যদি প্রেমের মিলন হইল এবং প্রেম মিলনেই যদি ভবিষ্য জীবনের সুখ দুঃখ নির্ভর করিল, তবে যেখানে দেনা পাওনার হিসাব, সেখানে মানমর্য্যাদার গোলযোগ, সেখানে প্রকৃত বিবাহ—আদর্শ বিবাহ—হইতে পারে না। ইহাকে দোকানদারী বল, ব্যবসায় বল, ক্ষতি নাই; কিন্তু ইহা প্রকৃত বিবাহ নহে। এ বিবাহে শরীর তৃপ্ত হইতে পারে, কিন্তু আত্মা তৃপ্ত হয় না। অনেক স্থলে এরূপ ঘটিতে দেখা যায় যে, অর্থলোভী যুবক অর্থের জন্য রূপ লাবণ্য ও বিদ্যাবুদ্ধি সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া অনুপযুক্তা কন্যাকে বিবাহ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সময়ে অনেকস্থলেই বিবাহের মূলে প্রেম নহে, কেবল অর্থ। অর্থ, গহনা ও বর সজ্জার উপর বর্ত্তমান শিক্ষাভিমানী যুবকগণ আত্মবিক্রয় করিতেছেন। যাঁহারা নানা বিষয়ে সংস্কারের জন্য সর্ব্বদা ব্যস্ত, তাঁহারাও বিবাহের সময় অর্থ লালসা পরিত্যাগ করিতে পারেন না।"

যে হউক, বরপণ গ্রহণে বিবাহ যে অশাস্ত্রীয় এবং অবৈধ, তাহা প্রমাণ জন্য, আমরা এতাধিক আর কিছুই বলিতে ইচ্ছা করি না। কারণ, সমাজবক্ষে ইহা প্রচলিত থাকিলেও

এই বেচা কেনার বিবাহকে শাস্ত্র সম্মত বা বৈধ বলিয়া প্রমাণ করিতে প্রায় কাহাকেও মস্তক উত্তোলন করিতে দেখা যায় না। অধিকন্তু, স্নেহলতা দেবীর আত্মহত্যায় লজ্জিত এবং দুঃখিত হইয়া বঙ্গ বিহার এবং উড়িষ্যার খ্যাতনামা পণ্ডিতবর্গও সমবেত হইয়া একবাক্যে ইহা আধুনিক এবং অবৈধ ও সমাজের পাপকলঙ্ক বলিয়া অনতিবিলম্বে দূরীকৃত করিতে সমাজের নায়কদিগকে অনুরোধ করিয়াছেন। হিন্দুশাস্ত্রেও এরূপ ক্রয় বিক্রয়ীর নরক যন্ত্রণা ভোগের ব্যবস্থা আছে। এরূপ অবস্থায় এই কুপ্রথা সমাজে প্রবেশাধিকার লাভ করিয়া, আমাদিগের কিরূপ, কি দুর্দ্দশা ও দুর্গতি ঘটাইয়াছে এবং ভবিষ্যতে ঘটাইবে, আমরা কি তাহা ভাবিয়া দেখি। স্বার্থের বশবর্ত্তী হইয়া আমরা শাস্ত্রাচারবিরুদ্ধ কার্য্য করিতে কিছুমাত্র ভীত বা কুণ্ঠিত হইতেছি না।

অসবর্ণে বিবাহ :—বিবাহের ক্ষেত্র সঙ্কীর্ণ এবং সীমাবদ্ধ হইলে যে মানবের প্রজনন শক্তি হ্রাস হয় এবং ইহাই যে মানব জাতির শারীরিক এবং মানসিক শক্তিসমূহের ক্রম-বিকাশের প্রধান অন্তরায়, তাহা সকল কালের এবং সকল দেশের মনীষিগণই একবাক্যে স্বীকার করিয়া আসিতেছেন। ভিন্ন ভিন্ন জাতির উত্থান ও পতন বিষয়ে সভ্যতার ইতিহাসই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তস্থল। হিন্দুর শাস্ত্রে এবং আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থেও এই জন্য এক রক্ত মাংসে অর্থাৎ স্বগোত্রে এবং নিকট সম্বন্ধস্থলে বিবাহ নিষিদ্ধ। পাশ্চাত্য দেহতত্ত্ববিৎ পণ্ডিতগণ এই মতেরই পোষণ করিতেছেন। মহাত্মা টম্সন্ তাঁহার হেরিডেটারি (বংশানুক্রম) গ্রন্থে লিখিয়াছেন, "বিবাহের ক্ষেত্র বিস্তৃত না হইলে, বর ও কন্যার অল্পতা বা অভাব জন্য অযোগ্য পাত্র ও পাত্রীর বিবাহ বন্ধনে বদ্ধ হইতে বাধ্য হয়; ইহাই সামাজিক অধঃপতনের মূল কারণ। অন্তর্ব্বিবাহ এবং বহির্ব্বিবাহ এই দ্বিবিধ প্রথা অবলম্বিত না হইলে, কোনও সমাজেরই উন্নতির আশা করা যায় না। কারণ বহির্ব্বিবাহই বিভিন্ন জাতীয় জনগণ মধ্যে যৌনসম্বন্ধ স্থাপন করিয়া সমাজে নবজীবন স্থাপন করে।" চিন্তাশীল সমাজ হিতৈষী শ্রীযুক্ত নিখিলনাথ রায়ও তাঁহার "মানব সমাজ" গ্রন্থের একস্থলে লিখিয়াছেন, "বিবাহের ক্ষেত্র সংকীর্ণ করা গুরুতর অন্যায়। ইহাতে এক রক্ত পুনঃ পুনঃ মিশ্রিত হইয়া জাতীয় ধ্বংশ উৎপন্ন করিয়া থাকে।"

জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত অতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের এক সুশিক্ষিতা কন্যার সহিত দেশমান্য মহাত্মা সার, এস্, পি, সিংহের পুত্র সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার সিংহের সহিত এবং অপর এক কন্যার সহিত লেপ্টেনান্ট কর্ণেল কে, সি, গুপ্তের পুত্র সিভিলিয়ান শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্তের বিবাহ সম্বন্ধ তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল। এইক্ষেত্রে উভয় পক্ষই সুশিক্ষিত এবং আমাদের জাতীয় গৌরব স্থানীয়। তাঁহারা অসবর্ণে বিবাহের অপকারিতা বুঝিতে পারিলে অবশ্যই স্ববর্ণে বিবাহের বন্দোবস্ত করিতে পারিতেন।

হিন্দু সমাজে কুলীন ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে মেলবন্ধন, অপরাপর ব্রাহ্মণ, বৈদ্য এবং কায়স্থাদি সমাজে প্রাদেশিকতা এরূপ বদ্ধমূল হইয়াছে যে পূর্ব্ববঙ্গে ও পশ্চিমবঙ্গে রাঢ় ও বারিন্দ্রে স্ববর্ণেও কন্যা আদান প্রদান অর্থাৎ বিবাহ অবাধে প্রচলিত নাই। অসবর্ণে বিবাহ প্রথা প্রচলিত না থাকাই, আমার বিবেচনায়, বর্ত্তমান সময়ের প্রাদেশিকতা রূপ জাতিবিদ্বেষের এক প্রধাণ কারণ। পক্ষান্তরে বিবাহে বরপণ গ্রহণ রূপ মহাব্যাধি ক্রমে যেরূপ সংক্রামিত হইতেছে, বিবাহ ক্ষেত্রের সংকীর্ণতা দূরীভূত না হইলে, ইহার প্রভাবও ক্রমেই বর্দ্ধিত হইবে এবং এই মহাপাপে সমাজ অধিকতর কলুষিত হইবে। সত্যের অনুরোধে একথা বলাও আবশ্যক যে, বিবাহে বংশানুক্রম অর্থাৎ বংশের দোষগুণ দেখা একান্ত কর্ত্তব্য। সুতরাং অসবর্ণেই হউক অথবা স্ববর্ণেই হউক, তাহা নির্ব্বাচন করিবার অধিকার সর্ব্বত্রই কর্ম্মকর্ত্তা-দিগের উপরে নির্ভর করে।

আর একভাবে দেখিতে গেলে, হিন্দুসমাজে বিবাহের ক্ষেত্র উপরোক্ত রূপ নানা কারণে সংকীর্ণ হওয়াতে 'ঠগ্ বাছতে গাঁ উজার' অর্থাৎ সমাজের লোক সংখ্যা ক্রমেই বাহিরে যাইতে বাধ্য হইয়াছে। বিবাহ বিষয়ক ১৮৫০ সনের ২১ আইন এবং ১৮৭২ সনের ৩ আইন, হিন্দুর বিবাহক্ষেত্রের সংকীর্ণতারই ফলস্বরূপ। ডাঃ কর্ণেল মুখোপাধ্যায় তাহার "Dieing raee of Bengal". পুস্তকের এক স্থানে লিখিয়াছেন, "১৮৫০ সনের ২০ আইন বিধিবদ্ধ হওয়াতে তাহার ফলে হিন্দু সমাজ গুরুতর ক্ষতিগ্রস্থ হইয়াছে। যদিচ ভারতবাসীরা উক্ত আইনের বিপক্ষে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত করিয়াছিল; এমন কি, পার্লিয়ামেন্টেও আবেদন প্রেরিত হইয়াছিল; কিন্তু তখনও হিন্দুরা একথা ভালরূপ বুঝিতে পারিয়াছিল না যে, ভবিষ্যতে এই আইনের ফলে বহুসংখ্যক হিন্দু খৃষ্ট ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইবে।" অপর স্বর্গীয়

মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের বিশেষ চেষ্টা যত্নেই ১৮৭২ সনের বিবাহ বিষয়ক ৩ আইন বিধিবদ্ধ হইয়াছে। সাধারণ কথায় ইহাকে ব্রহ্ম-বিবাহ আইন বলিলেও কার্য্যতঃ তাহা নহে। হিন্দু সমাজে অসবর্ণ বিবাহ বিধিসিদ্ধ না থাকাতেই এরূপ সময়োচিত আইন বিধিবদ্ধ করার আবশ্যকতা জন্মে। এই বিবাহে বর ও কন্যাকে অনেকস্থলে অনিচ্ছায় হইলেও, "আমি হিন্দু নহি" এই কথা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে হয়। অথচ সেই ব্রাহ্ম নামধারী হিন্দুরাও এইক্ষণে "আমি হিন্দু নহি" এই কথা বলিতে ইচ্ছুক নহেন। এইস্থলে ভবিষ্যৎদর্শীর ন্যায় একথা বলা বোধ হয় অত্যুক্তি হইবে না যে উপরোক্ত রূপ আইনগত বাধা না থাকিলে, অচিরকাল মধ্যে এই ব্রহ্ম সম্প্রদায়ের প্রাচীন কালের অহিন্দু বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বী এবং পরবর্ত্তী বৈষ্ণব ধর্ম্মাবলম্বীদিগের ন্যায়, হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইবার কোনই বাধা হইত না। বৌদ্ধ ধর্ম্মাবলম্বীগণ এবং বৈষ্ণব সম্প্রদায় একে হিন্দু সমাজের অন্তর্ভুক্ত হওয়াতে জাতি ভেদের তীব্রতা যে অনেক পরিমাণে হ্রাস হইয়াছে, ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র বিশেষতঃ এই আসাম প্রদেশই তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থল।

সমাজ সংস্কারে রাজবিধি —সামাজিক কোনও রীতিপদ্ধতি সমাজের অহিতকারী এবং অযৌক্তিক বলিয়া বিবেচিত হইলে সমাজের শক্তি বলে তাহার সংশোধন এবং পরিবর্ত্তনই স্বাভাবিক এবং সঙ্গত। কিন্তু সমাজ তদ্রূপ শক্তিশালী না হইলে, তদ্রূপ স্থলে রাজার সাহায্য গ্রহণে বা রাজশক্তি প্রয়োগে বিশেষ কোনও অনিষ্টের কারণ দেখা যায় না। পক্ষান্তরে সমাজের দোষগুণ বা মঙ্গলের জন্য রাজাও ধর্ম্মতঃ দায়ী। যদিও প্রাতঃস্মরণীয়া মহারাণী ভিক্টোরিয়া স্বয়ং ভারতের রাজ্যভার গ্রহণ কালে বলিয়াছিলেন যে, "প্রজার সামাজিক বিশেষতঃ ধর্ম্ম নৈতিক কোনও কার্য্যে বা বিধি বিধানের উপর রাজশক্তি পরিচালিত হইবে না, কিন্তু তৎপরে, ইংরেজ রাজপুরুষগণ মনুষ্যত্ব এবং কর্ত্তব্য বুদ্ধির অনুরোধেই কোন কোন স্থলে সে কথা রক্ষা করিয়া চলা সঙ্গত মনে করেন নাই। তাহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ (১) সহমরণের প্রথা রহিত; (২) গঙ্গাবক্ষে সদ্যজাত শিশু সন্তান বিসর্জ্জন; (৩) বিধবা বিবাহ বিষয়ক আইন এবং (৪) চৈত্র সংক্রান্তির দিন মনুষ্যের জিহ্বায় বাণ বিদ্ধ এবং পৃষ্ঠে বড়শী বিদ্ধ করিয়া চড়ক ঘুরান প্রভৃতি বিষয়ক আইনের বিধিবদ্ধই এইস্থলে বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

আমরা সামাজিক জীব এবং আদর্শস্থানীয় হইলেও, আমাদিগের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা নানা সঙ্গত এবং অসঙ্গত কারণে নিতান্তই শিথিল এবং হীন হইয়া পড়িয়াছে। বিশেষতঃ প্রায় প্রত্যেক বিষয়েই সমাজের হিতৈষী নেতাদিগের মধ্যে ও মতের ঐক্য দেখা যায় না। এরূপ অবস্থায়, সম্ভবপর হইলে, সামাজিক দোষ দূরীকরণে রাজার সাহায্য গ্রহণ করা অসঙ্গত নহে, এবং পূর্ব্ববর্ত্তী সমাজ সংস্কারক মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এবং দয়ারসাগর বিদ্যাসাগর প্রভৃতিও সেই উপায়েই প্রশস্ত মনে করিয়া তাহা অবলম্বনে সাধনা সিদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। রাজপুতদিগের কন্যাহত্যা, সাগর ও গঙ্গাবক্ষে সন্তান বিসর্জ্জন, সতীদাহ নিবারণ এমন কি, চড়কে মানুষের জিহ্বায় বাণ ও পৃষ্ঠে বড়শী বিদ্ধ প্রভৃতি বর্ব্বর প্রথা সমাজনেতাগণের নিজ শক্তি বলে কখনও সম্পূর্ণরূপে এবং এত শীঘ্র রহিত হইত না। পক্ষান্তরে সামাজিক পাপ ও দোষের জন্য রাজাও ধর্ম্মতঃ এবং ন্যায়তঃ দোষী এবং ফলভোগী। সুতরাং তাহা দূর করিতে যথোচিত উপায় অবলম্বন করা রাজারও কর্ত্তব্য। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বঙ্গের ছোট লাট মহামতী ইলিয়ট সাহেব বাহাদুরের শাসন সময়ে পণপ্রথা আইন দ্বারা রহিতের চেষ্টা হইয়াছিল। এই কুপ্রথা সমাজ হইতে দূরীভূত করিতে তাঁহার বিশেষ আগ্রহও দেখা গিয়াছিল। কিন্তু, বঙ্গের রক্ষণশীল সমাজপতিগণের তদ্বিরুদ্ধে চেষ্টা ও আন্দোলনের ফলে তাঁহার ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। বস্তুতঃ যখনই কোন সামাজিক কুপ্রথা দূর করিতে গবর্ণমেণ্ট ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখনই দেখা যায় যে, ঘোর নিদ্রাভিভূত কুম্ভকর্ণ সদৃশ রক্ষণশীল দলের একটা সাময়িক জাগরণ হয়। তখন দেশে মহা হৈ চৈ পড়িয়া যায়! সভা সমিতির এবং দেশসংস্কারকগণের আন্দোলন ও বাক্ বিতণ্ডায়, মনে হয়, তাই ত এরূপ জাগ্রত জীবন্ত জাতির সমাজ সংস্কারে আবার বিদেশী ও বিজাতীয় রাজপুরুষগণের অনধিকার চর্চ্চার প্রয়োজন কি? "সংস্কার ত জাতির ভিতর হইতেই ফুটিয়া উঠা স্বাভাবিক ও সঙ্গত।" তখন সমাজপতিগণও বলিয়া বসেন; "যাও--তোমরা দূরে সরিয়া যাও; এজন্য আমরা তোমাদিগের সাহায্য গ্রহণ করা নিতান্তই অসম্মানজনক মনে করি। আমরা আমাদিগের দোষ যখন বুঝিতে পারিয়াছি, তখন তাহার প্রতিকারও আমরাই করিতে পারিব। আমাদিগের ধমনীতে যে এখনও সেই আর্য্য শোণিত প্রবাহিত হইতেছে।" বস্তুতঃ সেই সাময়িক উত্তেজনায় তখন তাহারা জাগরিত হইয়া, "বাজ্‌রে শিঙ্গা বাজ এই রবে", এই

ফুটাতে যদি না পারি পট 'পরি
কেমনে সে বিনে তার প্রাণ ধরি
সেরূপ ঢুঁড়িতে দিবা বিভাবরী
অরূপ সাগর শুধু হাতড়াই,
আপনাকে তুলিকা হাতে ভাবি তাই

শ্রীকালিদাস রায়।

ব্যলন-স্মৃতি।

—:০:—

(৩)

আমাদের সাহিত্যসমাজ রাজনৈতিক সমাজের কুটিলনৈতিক সমাজ মনে করিয়া সর্ব্বদাই দূরে রাখিতে চেষ্টা করে। বিশেষতঃ ভারতবর্ষের সাহিত্যসেবীগণ সাবধানতার সহিত কুটিল-নৈতিক সমাজকে দূরে রাখিতেছেন। পাছে এপ্রবন্ধ রাজনীতি দোষে দুষ্ট হয় ইহা আশঙ্কা করিয়া সর্ব্বাগ্রেই বলিতেছি, ইহা একটী অতি প্রাচীন বংশীয় রাজর্ষি-জীবনের ঘটনা। এ ঘটনার সহিত পাশ্চাত্য রাজনৈতিক নীতির কোন সম্বন্ধ নাই।

অদ্য পৃথিবীতে সমস্ত দিকে পার্শ্বপরিবর্ত্তন করিয়াছে। পশ্চিম গগনের রবি এক্ষণে নিশা যাপন করিয়া অরুণোদয়ের সহিত পূর্ব্ব গগনে দেখা যাইতেছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে যে কুটিলনীতি ছিল তাহা অস্তগামী হইয়াছে। তখন ছিলেন Administratorগণ রক্ষণশীল নীতির পক্ষপাতী। বর্ত্তমান বৃটিশনীতি হইয়াছে উদারনীতি, সহানুভূতি তাহার মানদণ্ড এবং সহৃদয়তা তাহার হৃদ্‌যন্ত্রের 'তাপদণ্ড' (Thermometer)। পূর্ব্বকালে স্বাধীন রাজাদের অবস্থা ছিল একপ্রকার এখন হইয়াছে অন্যপ্রকার। পূর্ব্বে স্কুলের ছেলেদের মত ইঁহারা

ব্যবহৃত হইতেন। সেলামি তোপের আওয়াজের তারতম্য অনুসারে রাজাগণ পলিটিক্যাল-এজেন্ট সাহেবের অনুজ্ঞানুসারে চালিত হইতেন।

কথা ঠিক এবং সত্য হলপ করিয়া বলিতে পারি ও ত্রিপুরা-রাজাকে প্রমাণ স্বরূপ ধরিয়া নিতে পারি যে অবস্থায় বীরচন্দ্র পতিত হইয়াছিলেন ইহাকে দুরবস্থা বলা যাইতে না পারিলেও এঅবস্থা সুব্যবস্থা বলা সাধুভাষা হইবে না। খাঁটী হিন্দু রোগীকে রোগের দরুণ কুক্কুট-জাতীয় পাখীর জুস্ ব্যবস্থা করা যেমন সুব্যবস্থা নহে তেমন প্রাচ্য রাজন্যকে পাশ্চাত্যভাবে ধর্ম্মকর্ম্ম করিবার জন্য যদি ব্যবস্থা করা যায় তাহা হইলে কতদূর মর্ম্মান্তিক হয় পাঠকবর্গ বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

১৮৯৯ খ্রীষ্টাব্দে দেশীয় রাজ্যের রাজাদের অবস্থা ছিল "না থর্‌কা না ঘাট্‌কা" কারণে-অকারণে গভর্ণমেণ্ট তাঁহাদের প্রতি রুষ্ট হইতেন এবং তুষ্টও হইতেন। দেশীয় রাজ্যে পররাষ্ট্র বিভাগের দরজা সর্ব্বদা বন্ধ থাকিত। যদি কোন কারণে উদ্ঘাটিত করিবার সুযোগ ঘটিত তাহা হইলে যে চিত্র প্রকাশ পাইত তাহা পাঠকবর্গের রুচিকরও হইবে না মুখরোচকও হইবে না।

জলপাইগুড়ি ম্যালেরিয়া রোগগ্রস্ত হইয়া বাড়ী প্রত্যাগমন করিলাম এবং মাসাবধি কাল শয্যাগত ছিলাম। দরবারে কি হইতেছে এবং কি করিতেছে ইহা আমি জানিতাম না শুনিতাম না; একদিন সত্য সত্য অমৃতবাজারে দেখিলাম;—

"Maharaja should engage the service of a Barrister to draft letters for him in a matter like this. Every one will tell his Honour that the Maharajah is incapable of giving offence, and he is one of the noblest of men in India."

মহারাজার উচিত একজন ব্যারিষ্টার নিযুক্ত করিয়া যথাযথ যুক্তিসহকারে গভর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়া জানান যে তাঁহার মত ব্যক্তি রাজশক্তির অসম্মান করিতে পারেন না। তাঁহার লিখিত পত্রের উদ্দেশ্য, কিছুতেই গভর্ণমেণ্টকে অসম্মান করা নহে।

সেই মর্ম্মে একখানি পত্র গভর্ণমেণ্টের উদ্দেশ্যে লিখিতও হইয়াছিল ও ব্যারিষ্টারপুঙ্গবকে পূর্ণপাত্র দানে তুষ্ট করার ত্রুটী হয় নাই। ইতিমধ্যেই সপ্রতি ব্যারিষ্টার দুর্গামোহন দাস মহাশয়

আসিয়া বাক্যযন্ত্র দিয়া এসব বালির বাঁধগুলিকে সরাইয়া দিলেন এবং আপাততঃ দুই কূল রক্ষা করিয়া দিলেন। পিতৃদেবকে বলিয়া গেলেন "ঠাকুর-সাহেব একদম হাজার বছর"। তাঁহার উপদেশ মত শ্রীশ্রীযুত মহারাজ গভর্ণমেণ্টকে পত্র লিখিয়া দিলেন।

এদিকে উমাকান্ত বাবুর কার্য ভার গ্রহণের দিন স্থির হইল। আম-দরবারে তিনি উপস্থিত হইয়া সনন্দগ্রহণ করিবেন। দরবার আহ্বান করিতে হইল আমাকে। প্রথম খটকা বাজিল পাদুকা লইয়া, নগ্ন পদে মহারাজকে নজর দিতে হইবে। এবং যোড় হাতে রাজকার্য আরম্ভে অনুমতি চাহিতে হইবে। উমাকান্ত বাবু প্রায় বারো তের বৎসর ক্রম ধরে Asst: Political Agent ছিলেন। তখন তিনি রাজদরবারে উপস্থিত হইতেন না খাস দরবারে ছাড়া। হিন্দুরাজার দরবার যে কি গাম্ভীর্যপূর্ণ এবং ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ইহা তিনি কদাচ দেখিতে পান নাই। কাজেই তিনি নজর দিবেন কিনা ইহা বিবেচ্য রহিল, কিন্তু পাদুকাত্যাগ করা তাঁহার পদের মর্য্যাদা,—তিনি ত্যাগ করিবেন না। এভাবে তিনি Confidentially মহারাজাকে জানাইয়া দিলেন, তখন আমি উপস্থিত ছিলাম এবং মহারাজ আরামে আয়াসে ছিলেন। পত্রখানা সজোরে আমার উপর ছুড়িয়া মারিলেন এবং বলিলেন "তোর কাজ তুই করবি আমাকে জ্বালাস কেন।" আমি পত্রখানা পাঠ করিয়া অবাক্ হইলাম এবং ভাবিলাম ইহার ব্যবস্থা করা দরকার; প্রথমেই যদি দাসভাবের অভাব হয় উমাকান্তবাবুর নামের পদবীর মাহাত্ম্য রক্ষা করা দায় হইবে। পরদিন প্রাতঃকালে আমি উমাকান্ত বাবুর বাসা Residency বাঙ্গালায় উপস্থিত হইলাম। অনেক বাদানুবাদের পর স্থির হইল "Be Roman when you are in Rome"। চাকুরি যদি করিতে হয় চাকরের মত চলিতে হইবে। Political Agentএর সহকারীরূপে থাকুন আমরাও "Political Babu" বলিয়া সম্বোধন করিব। তখন পাদুকা ও "নজর" একই স্থানে থাকিবে।

দরবার হইল। মন্ত্রী উমাকান্ত বাবু পাদুকাবিহীন হইলেন এবং "Political Babu"-এর স্থানে "মন্ত্রী বাহাদুর" পদবী পাইলেন। বীরচন্দ্র শ্রীহস্তে তাঁহাকে মন্ত্রীত্বের সনদ দান করিলেন। উমাকান্ত বাবু জোড় করে তাহা গ্রহণ করিলেন; চোপদার তাঁহার পূর্ণ নাম ফুকারিতে ছিল। মন্ত্রী বাহাদুর স্বকীয় কর্ম্মে নিযুক্ত হইলেন। সে দিন সন্ধ্যার সময় মন্ত্রী

বাহাদুর এক পত্র লিখিলেন "তিনি রেসিডেন্সিতে বসবাসের জন্য গভর্ণমেণ্টের অনুমতি পাইয়াছেন।" পূর্ব্বে তিনি মহারাজকে "প্রিয় ও শ্রদ্ধেয় মহারাজ" সম্বোধন করিয়া পত্র লিখিতেন। অদ্যকার পত্রেও সে ভাষাই ঠিক রাখিলেন। কেহ কেহ আপত্তি করিয়াছিল, কিন্তু বীরচন্দ্র বীর্য্যবন্ত রসিকের ন্যায় বলিয়াছিলেন, "প্রিয় ও শ্রদ্ধেয়" এই দুই শব্দই ভুল। অনেক দিন চলিয়াছে, আরও কয়টা দিন চলুক। তোমরা আপত্তি কর কেন? আপত্তি বন্ধ হইয়া গেল কিন্তু তাহার পিছনে একটি ক্ষুদ্র মানব হস্তের ন্যায় অকালে মেঘ সঞ্চার হইল।

উমাকান্ত বাবু বহুকাল এরাজ্যে আছেন এবং ইহার ছিদ্র অনেক তিনি জানিতেন। Confidential ভাবে কতশত কথা জানিতেন তাহা আমরা জ্ঞাত নহি। সর্ব্বাগ্রে তিনি Budget প্রস্তুত করিতে বসিলেন। অতি সহজ কাজ বালিকাও পারে। কোন বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রী কেমন করিয়া জল আনিবে পরিদর্শক জিজ্ঞাসা করিলে উত্তর পাইল "ঘড়া লইয়া ঘাটে যাইব, এবং ঘড়া জলে ফেলিয়া আসিব।" পরিদর্শক মহাশয় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন তাহা হইলে জল আনা হয় কিরূপে?" শিক্ষিতা মেয়ে উত্তর দিল "ঘড়া গেল জলে, গেল ভগ্নাংশমতে গেল, গেল কাটা গেল ঘড়া এবং জল রহিল। প্রায় এই ভাবেই রাজসংসারকে কাটাকাটি করিয়া Budget ও Heading রহিয়া থাকে। হিন্দু রাজার সংসার এবং প্রাচীন রাজ্যের সংসার,—কত আবর্জ্জনা? এই আবর্জ্জনার মধ্য হইতে "আয় ব্যয় সামঞ্জস্য" করিয়া বজেট ঠিক প্রস্তুত করা অদ্য বীরচন্দ্র মাণিক্যের পৌত্রের আমল পর্য্যন্ত ঘটিয়া উঠা দুরূহ হইয়া পড়িতেছে। সচরাচর বলিতে গেলে পৃথিবী বেষ্টিত ব্রিটীশ সাম্রাজ্যে British Budget স্থিরতা রক্ষা করার কেমন মাথার কাজ তাহা সকলে জানেন। ত্রিপুরা রাজ্যে বজেট হইল "ছিন্নমস্তা" দেবীর তুল্য। কারণ এখানে পদমর্য্যাদা কর্ম্মচারীবর্গ চায়। দুই দিকে দুইটী ডাকিনী যোগিনী যেমন রুধির ধারা পান করে, তেমনি স্বহস্তে ছিন্নমুণ্ড রাজ্যের আয়ের ধারা পান করিতেছে এ দৃশ্য আমার ২৪ বৎসর বয়স হইতে ৫৮ বয়স পর্য্যন্ত ৩৪ বৎসর যাবত দেখিয়া আসিতেছি। Budget প্রায় সর্ব্বদাই রক্ষিত হয় না কিন্তু দোষ দিবার বেলা অষ্ট ধাতুর দেবতা রাজাকেই দিয়া থাকি। Department এর উপর Department যেন গ্রহের উপর উপগ্রহ বৎ চক্রবৎ পরিবর্ত্তিত

হইয়া থাকে একথা আমার বিশ্বাস। "শাসন", Administration "সংসার" 'Household Expenditure' এবং "নিজ তহবিল" 'Private purse' নামক তিনটী বিভাগ যখন হইল তখন তাহা যেন তিন সতীনের ঘর হইয়া উঠিল। Budget ব্যাপার লইয়াই পাকা খেলোয়ার বীরচন্দ্র বেশ খেলাই খেলিলেন। মন্ত্রী বাহাদুর সমস্ত প্রস্তাব মঞ্জুর করিলেন। পূর্ব্বে ষ্ট্যাম্পের আয় ছিল ৮০০০৲। ১০০০০৲ টাকা। ইহার আয় লইয়াই "নিজ তহবিল" নামক একটা তহবিল রক্ষিত হইত। নগদ তহবিল তখন রাজ্যের আয় ৪।৫ লাখ। উমাকান্ত বাবু ষ্ট্যাম্পের আয় শাসন বিভাগে গ্রহণ করিয়া Average এর উপর ১২০০০৲ টাকা সাবাস্ত করিয়া দিলেন। মনে করিলেন ৮০০০৲ স্থলে মহারাজ পাইলেন ১২০০০৲ টাকা; বীরচন্দ্র মুচ্‌কি হাসি হাসিলেন। তবুও তিনি বাধ্যকরের ন্যায় চলিতে লাগিলেন। Give him enough rope to hang himself ইহাই বীরচন্দ্রের চরম উদ্দেশ্য ছিল বলিয়া মনে এখন হয়। এদিকে কর্ম্মচারী সংখ্যা বৃদ্ধি হইল বহুৎ। প্রায় দুই বৎসর এই ভাবে কাটিয়া গেল। Budget মিলিল না Heading এ গোলমাল বাধিয়াছে, এবং Treasury balance রক্ষিত হইতেছে না। তিন তহবিলেই ত্রিদোষ ঘটিয়া গেল। বীরচন্দ্র যখন দেখিতে পাইলেন তিনি অনেক খেলা খেলিয়াছেন, বৃদ্ধকালে অনেক ঝুলনায় ঝুলিয়াছেন, রোগে জরাজীর্ণ তিনি স্থান পরিবর্ত্তন করিয়া—

"ভগ্ন ঢাকে যথাসাধ্য
বাজিয়ে যাব জয় বাদ্য"

তিনি দেখিতে পাইলেন এক তহবিলের টাকা তিন তহবিলে খরচ হইতেছে কিন্তু ঝোল যার যার পাতের দিকে টানিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ঝোলের সংখ্যা অত্যন্ত কমিয়া গেল। বাস্তবিক Administration Expenditure নানা উপায়ে অতিশয় বর্দ্ধিত হইয়া গেল।

বিশেষ কারণ, বীরচন্দ্র কর্ম্মময় জীবনে একটি কর্ম্ম হইতে বিরত ছিলেন, তিনি কোন দিন কোন প্রধান কর্ম্মচারীর নিকাশ তলপ করিতেন না। এবার বীরচন্দ্রের নিকাশ দিতে হইবে, যে নিকাশ না দিবার দরুণ Government সহিত তিনি লড়াই করিয়াছেন। Political

Agent হয়রাণ হইয়াছেন রাজদ্বারের প্রস্তর খণ্ডের উপর মাথা ঠুকিয়াও আদায় করিতে পারেন নাই এজন্য তিনি তদানীন্তন লাটগণের সহিত মনোমালিন্য ঘটিবার ভয়ে ভীত হন নাই। Administration Report নামে একটা নিকাশ নবমন্ত্রী উমাকান্তবাবু (ভূতপূর্ব্ব Political Babu) দিতে চান যেমন অন্যান্য Modern Advanced রাজ্যে দিয়া থাকে for gerneral publication, ইহাতে দোষ কি? বরং আমরাও Modern State নামে অভিহিত হইব এবং মহীশূর বরদা প্রভৃতি রাজ্যের অনুকরণ বা অনুগমন করিতে পারিব, আর Goverament সন্তুষ্ট হইবেন হয়ত বা মহারাজ "উপাধির বৃষ্টিতে" স্নান অবগাহন করিতে পারিবেন। তখন মহারাজ ঈষৎ হাস্য বদনে উত্তর দিয়াছিলেন "মহীশূর প্রভৃতি রাজ্য ব্রিটিশ শাসনাধীনে অনেক দিন থাকিয়া "মাব পরিবর্ত্ত মাসার কোলে" লালিতপালিত হইয়াছিল তাহার সঙ্গে আমার তুলনা? আমার ঘরে এখনও এ অবস্থা ঘটে নাই, এখনও ত্রিপুরা ষ্টেট কোর্টঅবওয়ার্ডসে যাইবার কারণ ঘটে নাই। বিশেষতঃ আমাদের প্রাচীন পরিবারে অনেক জঞ্জাল লুক্কায়িত আছে। সেগুলিকে পরিষ্কার করিবে কে আমি জানি না, যে পর্য্যন্ত এ রাজ্যে ঐ সব থাকিবে Administration report Fool's cap কাগজে প্রকাশ করিয়া Fool বলিতে দিলে আমার মাথায় গাধার টুপি পরাইয়া দিতে হয়। এবং মিথ্যা কথা বলার পাপ ঘটে। দুই একটা রাজ্যের Administration Report আমাকে দেখাইয়াছেন তাহাতে Model State বলিয়া লোকে বলে কিন্তু আমি জানি ঐসব রাজ্যের আভ্যন্তরিক অবস্থা। কাজেই ইহা প্রকাশ হইবার পক্ষে মন মানিতেছেনা।

উমাকান্তবাবু নাছোরবান্দা, তিনি একদিন মহারাজকে Private audience এ নিয়া কি বুঝাইয়াছেন এবং কি বুঝিয়াছেন আমরা বলিতে পারি না। কিন্তু পরদিন সকালবেলা Foolscap এ ছাপান Administration Report আসিয়া দরবারে উপস্থিত হইল। উমাকান্ত বাবুর বিরুদ্ধবাদীরা হৈ চৈ এবং কান্নাকাটি আরম্ভ করিয়া দিল। "স্নানঘর" হইতে আমাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন এবং হুকুম করিলেন "তিনি নির্জ্জনে থাকিতে চান এবং বাগানবাড়ীতে যাইয়া Microscope দ্বারা জীবাণুর বীজ পরীক্ষা করিতে চান"। এভাবে তিনি প্রায় সপ্তাহ কাল কাটাইয়া দিলেন। ইতি মধ্যে আমাকে একদিন জনান্তিকে বলিয়াছিলেন "তোদের ইংরাজীতে (তামাসাচ্ছলে একথা অনেকবার বলিতেন) বলে King's

Confidence যদি হ্রাস হয় তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ মন্ত্রীকে পদত্যাগ করিতে হয়। এটা বড় ঠিক কথা। মন্ত্র যে দিতে পারে এবং মন্ত্র যে নিতে পারে তাহাদের সম্বন্ধ অতি পবিত্র। তবে "বীজমন্ত্রের অধিকার থাকা দরকার। বীজই যদি নষ্ট হয় মন্ত্রের অধিকার তাহার চলিয়া যায়; এই Microscope যন্ত্রদ্বারা আমি তাহা স্পষ্ট টের পাইয়াছি। তিনি আমাকে পৃষ্ঠে হাত দিয়া Microscope দেখাইতে লইয়া গেলেন এবং যন্ত্রের মধ্যে চক্ষু দিয়া দেখিতে বলিলেন। আমি প্রথমে কিছুই দেখিতে পাইলাম না। তখন বীরচন্দ্র হাসিয়া বলিলেন "আমি বৃদ্ধ ব্যক্তি তাই Lens যে focus এ আছে তাহা তোর যুবকচক্ষুর নিকট out of focus হইয়া পড়িবে বৈ কি? Rack & Pinion দ্বারায় আমার focus ঠিক হইল। তখন দেখিলাম একখানা slide এ কতকগুলি সতেজ জিনিষ গতিবিধি করিতেছে, তাহারা জীবিত আছে। আর একখানা slide এ দেখিতে পাইলাম কতকগুলি মৃত জীবাণু পড়িয়া আছে। বীরচন্দ্র তখন আমাকে বুঝাইয়া বলিলেন "এগুলি পুরুষের বীর্য্যের নমুনা। ৪,৫ দিন চেষ্টা করিয়া তাহাদিগকে পাওয়া গিয়াছে। এইটা মনে রাখিলেই হইবে বীর্য্য যদি মৃত হয় তাহাতে উৎপাদন শক্তি হীন করিয়া দেয়। তখন পুরুষ অপকর্ম্ম করিতে বসে। আমাদের বর্ত্তমান Administration এর অবস্থা এই" কটাক্ষপূর্ব্বক ঈষৎ হাস্য করিয়া তিনি যে কথা বলিয়াছেন তাহার অর্থ মর্ম্মান্তিক; কাজেই অর্থ করা অসম্ভব।

কিছু দিন পরে উমাকান্ত বাবুকে বরখাস্তের পরওয়ানা জারি হইল। তাহার অভিলষিত কাজ এবং বার্দ্ধক্য অবস্থায় একমাত্র করণীয় নিজ পুত্রগণের হস্তে মন্ত্রীর আফিসের বিভাগগুলি ভাগ করিয়া দিলেন এবং নিজে স্বাস্থ্যরক্ষার্থে যে কয়দিন বাঁচিয়াছিলেন কলিকাতা ও দার্জ্জিলিং এর নিকটস্থ কার্শিয়ং বাস করিতে লাগিলেন।

এখানে আমি একটা কথার অবতারণা করিতেছি। উমাকান্ত বাবুর পরম শত্রুও একথা বলিতে পারিবে না কেবল স্বার্থপর দল বিশেষ ব্যতীত যে তাহার মধ্যে racial পাপ ছিল ও এই জন্য বৈদ্যকুলের পক্ষপাতী ছিলেন। অনেক দেশীয় রাজ্যে অদ্য পর্য্যন্ত একটা দলাদলি বা intrigue ছিল ও আছে। কিন্তু ইঁহারাই ভিন্ন রাজ্য বা বৃটীশরাজ্য হইতে সমাগত এবং দলাদলির মুখ্যপাত্র। শাক্ত বৈষ্ণব দল এবং জাতিবিশেষের প্রাধান্যতা লইয়া দেশীয় রাজ্যে কুপ্রথা যাহার। দুঃখের বিষয় advertisement দ্বারা উমাকান্ত বাবু যে শিক্ষিত লোক (?)

পাইয়াছিলেন তাহাতে বৈদ্য জাতি অত্যধিক ছিল এবং ইহাই administration report-এর পাতায় পাতায় ছিল। বীরচন্দ্র মানিক্য ইহাকেই বলিতেন "admiring report" Reformation তাঁহার মূলমন্ত্র কিন্তু দার্শনিক Bacon বলিয়াছেন 'Reform therefore without bravery or scandal of former crimes and persons' অভিজ্ঞ লোকের এই কথায় কেহ বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিল না এবং উমাকান্ত বাবুও পারিলেন না। ইহা বিধিবিড়ম্বনা বলিতে হইবে।

Bengal Goverment রুষ্ট হইয়াছিলেন; যে লোককে মন্ত্রীপদে ভার দিয়া উদ্দেশ্য হাসিল করিয়া অর্থাৎ Administration Report প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহাকে তাড়াইয়া দিলে আবার হয় ত নদীযুদ্ধের প্রয়োজন হইবে। কিন্তু বীরচন্দ্র মানিক্য এই উর্ণনাভ তুল্য আবরণ ভাঙ্গিয়া দিলেন। নিজ পুত্রদ্বয়কে মন্ত্রী হইতেও ক্ষমতা অনেক অল্প পরিমাণে দান করিয়া তিনি পিতার কর্ত্তব্য কার্য্য করিয়াছিলেন; রাজার কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন এবং আশ্রিত-বৎসল-গণের আশ্রয়স্থল হইয়াছেন। রাজপুত্রগণ রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং কুটুম্ব শ্রেণীর রাজ কুটুম্ব ঠাকুরবর্গ তাঁহাদের অধীনস্থ ছিলেন। দলে দলে নব্য পাশ করা টিয়াপাখী আমদানি বন্ধ হইল এবং Budget ও Heading স্বস্থানে পঁহুছিয়া গেল। মহারাজ হিমালয়বাসে আরামে ছিলেন। অনেক ঝুলন তাঁহাকে সহ্য করিতে হইয়াছিল কিন্তু এক্ষণে তিনি ঝুলনমঙ্গল গীত গাহিবার জন্য সুপ্রশস্ত সময় পাইলেন। একথা শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ বাবু স্পষ্ট জানেন। কিন্তু তাঁহার শেষ ঝুলন তাঁহাকে স্বাস্থ্যহানি ঘটাইয়াছিল। ৩৪ বৎসর পর্য্যন্ত তিনি রাজ্যভার পাইয়া শেষ বয়সে ভারাক্রান্ত হইয়া হয়রাণ হইয়াছিলেন। তাঁহার জীবনে এত কালের ঘটনা এবং রটনা স্তূপীকৃত হইয়াছিল যে তাহা বর্ণনা করিতে আমি অক্ষম। কারশিয়াং বাসকালে তিনি প্রায়ই বলিতেন :—

"ইংরেজী শাস্ত্রমতে রাজার স্বাধীনতা অর্থ পরের চর্ব্বিত খাদ্য গলাধঃকরণ করা। দাঁত পড়িলে নকল দাঁতের আবশ্যক হয়। তুই দেখিস্ আমার একটা দাঁতও পড়ে নাই। আমি কেন পরের চর্ব্বিত জিনিষ ভক্ষণ করিব? দাদা মহারাজ ইংরেজী ভাষা পাঠ করিলেই প্রায়শ্চিত্ত ব্যবস্থা করিতেন। আমি কিন্তু ইংরেজী ভাষা শিক্ষা করা উচিত মনে করিয়াই

তোদের বিদেশে পাঠাইয়াছিলাম। পাশফাশের জন্য নহে, অভিজ্ঞতালাভ করিবার জন্য। যদি তোদের দ্বারা রাজ্যের কোন সেবা না হয় তাহা হইলে তোরা মরিয়া যা, আমি অতি বৃদ্ধের মত নকল দাঁত বাঁধাইয়া লইব।"

রাজপদ সেবা করিয়া অনেক সময় অনেক কথা শুনিয়াছি অনেক আন্তরিক কথা অন্তরে আছে তাহা প্রকাশ করিয়া পাঠকবর্গের কর্ণশূল উৎপাদন করিতে চাই না। তবে বর্ত্তমান সময়ের আমাদের রাজনৈতিক আকাশ পরিস্কার হইয়াছে, শারদীয় আকাশে ছায়াপথ পর্য্যন্ত সুস্পষ্ট দেখা যাইতেছে। কেবল মাত্র দিগ্‌দর্শন যন্ত্রের প্রয়োজন। তাহা হইলে দিশেহারা হইতে হইবে না। বীরচন্দ্র একদিন বলিয়াছিলেন কোন এক ঠাকুর লোক কর্ম্মচারী স্থলে একজন এম্, এ, বি, এল্, ৭০, টাকা মাসিক বেতনে সস্তায় পাইয়া উমাকান্ত বাবু পুলকিত হইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের মাত্রায় যদি আমাদের উপযুক্ত অনুপযুক্ত ভেদ করিতে হয় তাহা হইলে আমাকে সর্ব্বাগ্রে বরখাস্ত করিতে হয়। এম্, এ, বি, এল্, রাজা না হইয়া এম্, এ, বি, এল্, যুবরাজ না হইয়া যদি নিজ নিজ কর্ত্তব্যপালন করিতে পারে তাহা হইলে আমার জ্ঞাতি কুটুম্বও পারিবে। আমার জীবনে ইহা ঠিক জানি। "সস্তায় পস্তাইতে হয়।"

এই নীতির মর্য্যাদা রক্ষার্থে বর্ত্তমান সময়ে বিকানীরের মহারাজা তাঁহার ৮ বৎসর বয়স্ক বালক যুবরাজকে "প্রধান মন্ত্রী" পদে নিযুক্ত করিয়াছেন এবং এই জন্যই দরবারে বসিয়াছেন।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে বৃদ্ধ বীরচন্দ্র যে উদ্দেশ্যে এবং যে ভাবে নিজ পুত্রগণকে রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন ইহা নিশ্চয়ই দূরদর্শী লোকের অকাট্য প্রমাণ। পাকা হাতে এবং ৩৪ বৎসর একাধিক্রমে একটি স্বাধীন রাজ্য যিনি সুশাসন করিয়া গিয়াছেন ইহাতে আমি বলিতে পারি তিনি সংসারের নাগরদোলায় দুলেন নাই কিন্তু ঝুলনমঙ্গল:গীতের সঙ্গীত সমূহের বৈষ্ণব ভাবুক ছিলেন। মর্ম্মস্পর্শী তাঁহার হৃদয়ের ভাব ঝুলনে ঝুলিয়াছিল এবং তিনি বৈষ্ণব দার্শনিকের জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। বৈষ্ণব তন্ত্র এবং রাজনৈতিক তন্ত্র এক জিনিষ। একথা স্বয়ং ভাবুক তন্ত্রের জীবের জ্ঞাতব্য বিষয়।

এই বিষয়ে আমাদের কবি নবীনচন্দ্র সেন যাহা বলিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করা গেল, "বীরচন্দ্র মানিক্য বড় চতুর লোক ছিলেন। তাহার বোধ হয় সন্দেহ হইয়াছিল এজেন্ট

মহাশয় (উমাকান্ত বাবু) কেবল তাঁহার মন্ত্রী হইবার জন্য তাঁহার উপর এ সকল উৎপীড়ন ঘটাইয়াছেন।" তাঁহার প্রকাশিত "আমার জীবন" পঞ্চম ভাগ ৩৭৫ পৃষ্ঠা পাঠ করিলে ইহার বিস্তারিত বিবরণ পাঠকবর্গ বুঝিতে পারিবেন।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

ধর্ম্ম

ধর্ম্ম যাহার মর্ম্মে নাহিক,
কর্ম্ম তাহার অসার অতি,
হিন্দুদর্শন করেছে দর্শন
সারা ধরণীর ইহাই গতি।
তুচ্ছ করিয়া ধর্ম্ম যতই
উচ্চ জগতে উঠিবে তুমি,
ততই তোমারে করিবে তুচ্ছ
তব উচ্চতার ভিত্তি ভূমি।
যে তোমারে আছে করিয়া ধারণ
সেই শুধু, ভাই, তোমার ধর্ম্ম,
ভিত্তি সে তব; তুচ্ছি তাহারে
নারিবে সাধিতে কোনও কর্ম্ম।

শ্রীআশুতোষ মহলানবীশ

মায়ের বুক।

—ঃ*ঃ—

(১)

লালবাজারের চৌধুরীরা বনিয়াদি বড়লোক, এঁরা প্রাচীন সম্ভ্রান্ত মুসলমান, এঁদের সকলেরই একাধিক বিবাহ ছিল, তার মাঝে বর্ত্তমান জমীদারই কেবল কলিকাতা হইতে বি, এ, পাশ করিয়া সভ্য হইয়া ছিলেন বলিয়া একটীর বেশী বিবাহ করেন নাই।

চৌধুরীসাহেবের স্ত্রী আলিমন বিবির বয়স এখন প্রায় চল্লিশের কাছাকাছি, বড় ছেলে বসির উপযুক্ত হইয়া উঠিয়াছে; প্রথম প্রথম চৌধুরীসাহেবের যে সভ্যতার আলো লাগিয়াছিল, নিজের জমিদারীর মোসাহেবদের পাল্লায় পড়িয়া আর পাড়াগাঁয়ের হাওয়ার গুণে কিছুদিন বাদেই সে সভ্যতার আলো নিভিয়া ছাই হইয়া গেল। যে আলো আপনা হইতে না জ্বলিয়া উঠে তার আয়ু আর কতটুকু?

আলিমন বিবি চৌধুরীসাহেবের কাকার কন্যা, ছেলে বেলা হইতেই উভয় উভয়ের সহিত নিবিড়ভাবে পরিচিত, ইঁহাদের বিবাহে নূতনত্ব কিছু ছিল না। কিন্তু আলিমন বিবি চারিটী সন্তানের মা হইবার পর চৌধুরীসাহেব ষোড়শী সুন্দরী ময়নাকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিলেন।

আলিমন বিবি রাগিয়া বকিয়া কোনো অসন্তোষই দেখাইলেন না কিন্তু স্বামীর সঙ্গে একবার দেখাও করিলেন না; তাঁর নীরব কঠিন গাম্ভীর্য্য দেখিয়া তাঁর কোলের খুকিটী পর্য্যন্ত ভয় পাইয়া গেল। ঝিচাকরেরাও কেউ কর্ত্তার মহলে যাইবার জন্য ব্যস্ত হইল না, পাছে কর্ত্রীর কোপ আরও বাড়িয়া যায়!

কিন্তু চৌধুরীসাহেবের অনুপস্থিতে আলিমন তাঁর প্রত্যেক জিনিষগুলি ময়নাকে বুঝাইয়া দিয়া সরিয়া আসিলেন। ময়নার তো কোনো দোষ ছিল না, সে কেবল আড়ষ্ট হইয়া চাহিয়া রহিল। আলিমন ঘরের মেঝের ট্রাঙ্ক উজার করিয়া কাপড় গহনা বাছিতেছিলেন। প্রথম যৌবনে কোন্ বসনে কোন্ ভূষণে স্বামীকে প্রীত দেখিয়াছেন সেই কথা মনে করিয়া সেগুলো

ময়নাকে দান করিলেন। কিন্তু গহনার বাক্স খুলিয়াই তাঁর হাত চলিল না, এই গহনা তিনি সতীনকে কেন দিবেন, আজ বাদে কাল তো বসিরের বৌ আসিবে, সে পরিবে।

চুপ করিয়া একটু ভাবিয়া তিনি নিতান্ত হাল্‌কা দু'একখানি গহনা ময়নাকে দিয়া বাকী গহনাশুদ্ধ বাক্সটা বন্ধ করিয়া ফেলিলেন। কিন্তু পিতার এই কাণ্ড দেখিয়া মায়ের চেয়ে বেশী চটিল বসির।

বসির লেখাপড়া বেশী করে নাই, সেটা তার নির্লিপ্ত বাপের দোষে কি তার নিজেরই দোষে তা ঠিক্ বলা যায় না। সরস্বতীকে বিদায় দিবার আগেই তার ঘাড়ে দুষ্ট সরস্বতী ভর করিয়াছিল! একে সে বড়লোকের ছেলে, তাতে আঁট ছিল না, কাজেই অনেকগুলি কুসঙ্গী জুটিয়াছিল, অল্প দিনের মধ্যেই অধঃপাতের মাঝামাঝি দাঁড়াইয়াছিল। আলিমন তার বিবাহ দিয়া তাকে ঘরবাসী করিবার জন্য খুব চেষ্টায় ছিলেন। ছেলের জন্য আর তাঁর মনস্তাপের সীমা ছিল না, লজ্জায় তিনি লোকের কাছে বড় ছেলের নামও মুখে আনিতেন না ছেলের সঙ্গে কথা বলিতে গেলে রাগে, দুঃখে, ঘৃণায় তাঁর বুক ফাটিত।

এমনি যখন তাঁর মনের অবস্থা, সেই সময়ে তাঁর স্বামী কিনা ৪২।৪৩ বৎসর বয়সে একটী ষোড়শী বিবাহ করিয়া আনিলেন, এ ঘটনা তাঁর এত বড় আক্ষেপের কথা যে, এ নিয়া আর একটী কথাও তিনি বলিতে পারিলেন না, বলিবেন বা কাকে? তাঁর স্বামী তো অন্যায় কিছুই করেন নাই, তাঁর বংশে সকলে যাহা করিয়া আসিতেছেন তিনিও তাই করিয়াছেন, এতে আর তাঁর বলিবার কি আছে?

ময়নার বিবাহের পর প্রায় বৎসরখানেকের মধ্যে চৌধুরীসাহেব অনেক চেষ্টা করিয়াও আলিমন বিবির সঙ্গে একটু বুঝাপড়ার অবকাশ পাইলেন না, আলিমন প্রায় প্রতিদিনই স্বামীর আহারের সময় উপস্থিত থাকেন, কিন্তু বাড়ীর উপযুক্ত সব ছেলেগুলিই তখন সেখানে খাইতে বসে, সুতরাং সেখানে কোনো কথা তোলা যায় না।

কিন্তু আলিমন মুখে কিছু না বলিলেও তপ্ত অগ্নিগর্ভ লোহার মত তাঁর চোখমুখ ফাটিয়া যেন তীব্র রাগের জ্বালা বাহির হইতে থাকিত, সেই দপ্-দপে দুই চোখের দিকে চাহিয়া তাঁর অপরাধী স্বামীটী কায়মনে গুটাইয়া যাইতেন।

একদিন প্রাণপণ সাহস করিয়া তিনি আলিমনের ঘরে ঢুকিয়া পড়িলেন। আলিমন তাঁর গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিয়া বলিলেন "কি ?"

মাথায় হাত বুলাইয়া একটু ইতস্ততঃ করিয়া বলিলেন "না, কিছু না—"

দাঁত দিয়া ঠোঁট কামড়াইয়া তীব্র গলায় আলিমন বলিলেন "কিছু না আবার কি ?"

বিপন্নভাবে চৌধুরীসাহেব বলিলেন "হ্যাঁ, একটা কথা আছে বটে, তা তোমার কি এখন সময় হবে ?"

"বল"

"বসিরের একটা বিয়ের কথা এসেছে, তারা—"

আলিমন আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন ;—"বসিরের বিয়ে ? তা সে ভাবনা তোমার কেন বল দেখি ?"

"কেন, বসিরের কি বিয়ের সময় হয়নি ? এ মেয়েটী না কি ভালো—"

"কে বল্লে, ময়না বুঝি ?"

শুধু তা নয়, অন্য লোকেও বলেছে।"

আলিমন বলিলেন,—"এ সম্বন্ধে আমার বল্‌বার কোনো কথা নেই, তোমার আর বসিরের বুদ্ধিতে যা' আসে করগে তাই।"

চৌধুরীসাহেব বলিলেন "এ তোমার রাগের কথা তো নয়, একটু বিবেচনার কথা।"

ক্ষোভের হাসি হাসিয়া আলিমন বলিলেন ;—"আমার বিবেচনায় কিছুই হবে না, বসির নিজকে কারো অধীন ব'লে মনে করে না, কাজ তার ইচ্ছামতই তো হবে।"

নিজেই এক সময়ে বসিরের মত জানিবেন বলিয়া চৌধুরীসাহেব উঠিলেন। অন্য সময়ে আলিমন শুনিলেন যে ময়নারই একটী ভাইঝির সঙ্গে বসিরের বিবাহ প্রস্তাব উঠিয়াছে, চৌধুরী সাহেব সেই পক্ষে হইয়াছেন, মেয়েটী চৌধুরীসাহেব বলিলেন 'ভালো'—কিন্তু সে সুন্দরী নয় কালো।

আর পাঁচটা মায়ের মত আলিমনও বসিরের স্ত্রীটী যে সুন্দরী হইবে এই আকাঙ্ক্ষাই মনে মনে পোষণ করিতেন, দ্বিতীয়তঃ রূপের চটকে ভুলাইয়া যে স্বামীকে ঘরে রাখিতে পারিবে

তেমনি মেয়ে তিনি চাহিতেছিলেন। তার মাঝে এই স্বামী ও সতীনের গরজটা তাঁর বিশ্রী স্বার্থময় মনে হইল, তিনি সতীনের উপর হাড়েহাড়ে চটিয়া গেলেন।

একদিন ময়না এই কথা তুলিতেই তিনি বলিলেন "বয়সে আমি তোমার চেয়ে ঢের বড় ময়না, ছেলের বিয়ের কথা নিয়ে তুমি আমাকে পরামর্শ দিও না, আমার ছেলের আমি ভাল বংশে বিয়ে দেব; তুমি এতে কোনো কথা বোল না।"

ময়না গরীবের ঘরের মেয়ে, সে আলিমনের কথার উপর আর কথা বলিতে পারিল না, মনে মনে রাগ করিয়াও মুখে চুপ করিয়া রহিল।

(২)

সেদিন খুব ভোরে, তখনো আলিমন তাঁর শোবার ঘর হইতে বাহির হন নাই, তাঁর ছোট খুকীর সর্দ্দি-জ্বর হওয়ায় তিনি ঘুম ভাঙ্গিলেও তাকে লইয়া ঘরেই ছিলেন, পাছে ভোরের হাওয়ায় তার ঠাণ্ডা লাগে।

ছয় মাস আগে বসিরের বিবাহ হইয়াছিল তার বৌ আমিনা শাশুড়ীর ঘরের সামনের দালানে চৌকীতে বসিয়া, মেজ ননদের সঙ্গে কথা বলিতেছিল; শীতের জন্য তখনও কোনো জানালা বা দরোজার পরদা একটুও সরানো হয় নাই; দুয়ারের বাইরে দাঁড়াইয়া ময়না ডাকিল "আমিন্।"

আমিনা শশবাস্তে উঠিয়া পরদা সরাইয়া বলিল "আসুন মা!"

"দিদি উঠেছেন?"

আমিনা একটু আশ্চর্য্য হইয়া বলিল "ওঠেন নি তো! ডাক্‌বো কি?"

ময়না অল্প একটু হাসিয়া বলিল "আমার নাম ক'রে ডাক্‌তে গেলে সকাল বেলা না হোক ঝাঁটা খাবে, থাক্!"

"যদি বিশেষ দরকার থাকে তো তিনি ব'কবেন কেন, জেগেই শুয়ে আছেন" বলিয়া আমিনা উত্তরের আশায় ময়নার মুখের দিকে তাকাইল। আলিমন মনের সাধ মিটাইয়া সুন্দরী দেখিয়া বউ আনিয়াছিলেন, বৌয়ের গুণে তাঁর বসির অবধি অনেক শান্ত হইয়া গিয়াছিল।

তবে ময়নার উপর তিনি আরও প্রসন্ন হন নাই, বরং দিন দিন তাঁর ঘৃণা বিদ্বেষ বাড়িয়া

চলিতেছিল। ময়নাকে যে তিনি কত ঘৃণা, কি অবজ্ঞা করেন তা ময়না বোধহয় তাঁর চেয়েও বেশী জানিত! সে মনে প্রাণে আলিমনকে অবিশ্বাস করিত, ভয় করিত। একটু পরেই আলিমন উঠিয়া আসিলেন, অসময়ে ময়নাকে দেখিয়া বলিলেন "ব্যাপার কি? এদিকে পায়ের ধুলো পড়লো যে! তাও এত সকালে!"

ময়না বসিয়াছিল, আলিমনকে দেখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল, বলিল "তোমাকে একবার ডাক্‌ছেন!"

ভুরু কুঁচকাইয়া অপ্রসন্ন মুখে আলিমন বলিলেন "আমাকে? কেন?"

ময়না আবার নম্রভাবে বলিল "তা তো জানিনে, তবে শরীর ভালো নেই, তাই আস্‌তে পারলেন না, বল্‌লেন! যাবে এখন?"

আলিমন একটু চমকাইলেন, বলিলেন "শরীর ভাল নেই? কেন কি হয়েছে? কই আগে তো আমি খবর পাই নি।"

ময়না চুপ করিয়া রহিল; চোখে মুখে জল দিয়া আসিয়া আলিমন বলিলেন "চল, যাই।"

একটা রাগ মুড়ি দিয়া চৌধুরী সাহেব শুইয়াছিলেন, আলিমনের আসার শব্দ পাইয়া মাথার ঢাকা খুলিয়া বসিলেন, বলিলেন "শরীরটে ভাল না থাকায় তোমার ঘরে না গিয়ে ডাকালাম তোমায়—তা—"

আলিমন বলিলেন "থাক্, কৈফিয়ত দেবার দরকার নেই, কি হয়েছে তোমার?"

"ক দিন থেকে আমাশা মত হয়েছিল, কাল রাত্রে জ্বরও হয়েচে, গা হাতপায়ে ব্যাথা মনে হচ্ছে, তার ওপর কাল সন্ধেবেলা খবর পেলাম, তোমার বসির একরাশ ধার ক'রে আমার মাথা খেয়ে রেখেছে একেবারে!"

আলিমনের মুখ রাগে রক্তবর্ণ হইয়া উঠিল। শরীর খারাপ বলিয়া স্বামী তাঁকে খোঁজেন নাই, ছেলের গুণ শুনাইবার জন্য তাকে ডাকাইয়াছেন! ছেলে সম্বন্ধে সকল দায়ীত্বই কি তাঁর একার? একটু পরে রাগ সামলাইয়া আলিমন শান্ত ভাবে বলিলেন;—"এ খবর কি তোমার আগেই পাওয়া উচিত ছিল না? কেন যে তা পাওনি তা তুমিই জানো।"

চৌধুরী সাহেব আলিমনের উত্তরে খুসী হইলেন না, বলিলেন "তারপর! এখন আমায় কি ক'রতে হবে তাই বল, তাঁর ধার শোধ ক'রতে গেলে তো আমার জমিদারী বিক্রি হবে

যায়, খাজনার টাকা জোটাব কোথা থেকে! বল দেখি কি করি?"

আলিমন বললেন,- "এই জন্যে আমাকে ডাকিয়েছ কি? আমি যা বল্‌বো তা তুমি শুনবে কি? আমি বলি বসিরের ধার বসিরই শোধ করুক, না করে জেল খাটুক, তুমি কেন তা শোধ দিতে যাবে?"

তিক্ত স্বরে আলিমনকে শুদ্ধ তিক্ত করিয়া দিয়া চৌধুরীসাহেব বলিলেন—

"কোথা থেকে শোধ ক'রবে তোমার বসির? আমার মরণ না হলে তো আর এ ধন দৌলত বসিরের হাতে যাচ্ছেনা! সে টাকা পাবে কোথা?"

"না পায় টাকা জেল খাটবে, যাক্ তোমার জন্যে ডাক্তারকে খবর দেওয়া হয়েছে তো!"

"ডাক্তারকে? না, এ ক'দিন দেই নি, অমনিই সেরে যাবে ভেবেছিলাম, আজ খবর দেবো ভাব্‌ছি, কিন্তু তুমি বলো ওধারের যথার্থ কি করা উচিত।"

"যথার্থই বল্‌লাম, তোমার কিছু করাই উচিত নয়, সত্যিই বসির জেল খাটবার ছেলে নয়, যখন তেমন অবস্থা হবে তখন না হয় বিবেচনা করা যাবে, এখন ও সব কথা কানে তুলো না! আমি তা হ'লে উঠি, ডাক্তার আনতে কারোকে পাঠিয়ে দি?"

"বসিরকে ডেকে ও কথা বল্‌বো কি? একেবারে স্বাধীন হয়ে মাথায় চ'ড়ে বসেছে যে!"

"কি বল্‌বে বলো, তার জন্যে আমার অনুমতি নেওয়ার দরকার কি?"

"না, শেষে আবার রাগটাগ করবে!"

আলিমনের মুখ আবার লাল হইয়া উঠিল। কিন্তু রাগ প্রকাশ করা তাঁর স্বভাব নয়, তাই চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন "তোমার জ্বর কি এখনো আছে মনে করছো?"

"আছেই ত মনে হচ্ছে, মাথা খুব ভার বোধ হচ্ছে যে!"

আলিমন উঠিয়া গিয়া বসিরকে ডাকাইলেন। বসিরকে ডাকাইয়া পরে তাঁর মনে হইল অন্য কাহাকেও বলিলেই হইত! বসির আসিয়া বলিল "কেন ডাক্‌ছো মা?"

আলিমনের গা জ্বলিয়া গেল। এই হতভাগার কুপুত্রের জন্যই না তাঁর স্বামী অহেতুক তাঁকে কথা শুনাইলেন, তাঁর গর্ব্বোদ্দীপ্ত উঁচু মাথা এই একটী মাত্র কারণেই আহত হইয়া নামিয়া পড়ে! কিন্তু বসিরকে তিনি সে কথা কিছু বলিলেন না, সোজাসুজি বলিলেন—

"ডাক্তারকে একবার খবর দাও, তোমার বাবার অসুখ করেছে।"

"কি হয়েছে ?"

"জ্বর হয়েছে, পেটও খারাপ, যাও খবর পাঠাও গে।"

"যাই" বলিয়া বসির চলিয়া গেল। আলিমন প্রকাণ্ড একটা নিঃশ্বাস ফেলিয়া সংসারের নিয়মমত আদ্যন্ত ব্যবস্থা সারিয়া যাইতে লাগিলেন কিন্তু প্রত্যেক কাজে, প্রতি পলকে তাঁর মনকে পীড়িত করিতে লাগিল স্বামীর জ্বর-শুষ্ক মুখখানি! অবোধ ছেলে মানুষ ময়না,—সে আবার সেবা করিবার আরাম দিবার কি জানে?

মনে মনে তিনি বিরক্ত হইলেন, কয়দিন থেকে যে আমাশা, কই সে কথা তো তাঁকে কেউ জানায় নাই, আজিও জানাইত না, যদি বসিরের জ্বর কর্ত্তাকে ত্যক্ত না করিত!

(৩)

ডাক্তার সকালে আসিয়া কর্ত্তাকে দেখিয়াশুনিয়া গেলেন, সন্ধ্যায় আলিমন আসিয়া স্বামীর কাছে বসিলেন, মাকে ঢুকিতে দেখিয়া তাঁর ছোট মেয়েটিও অনেক দিন পরে বাপের ঘরে ঢুকিল। আলিমনের পাঁচটী সন্তানের মধ্যে বসির বড় ছেলে, মেজ ছেলে সিরাজ, মেয়ে তিনটি ছেলেদের ছোট, তাও দুটী মেয়ে শ্বশুরবাড়ীতেই বেশী থাকে, ছোটটী বছর সাতেকের, সে সদা সর্ব্বদা মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই থাকে। সিরাজ বিদেশবাসী, সে কলিকাতাতেই থাকিয়া লেখাপড়া করে, কচিৎ-কখনো বাড়ী আসে!

চৌধুরীসাহেব শুইয়াছিলেন, তাঁর জ্বর কিছু বেশী হওয়ায় একটা চাকর মাথায় বাতাস দিতেছিল, মেয়ে আসিয়া মাথায় হাত দিতেই মুখটা ফিরাইয়া তিনি প্রসন্ন মুখে বলিলেন—"আরে,—বুড়ি যে!"

যেন কতকাল 'পরেই মেয়ের সঙ্গে দেখা সাক্ষাত! আলিমন বলিলেন—"ডাক্তার কি বলে গেল? জ্বরটা এবেলা বাড়্‌লো কেন?"

"ডাক্তার আর তার কি ক'রবে, আমার ভোগান্তি,"—

"আমাশার ওপর স্নানাহার চালালে কেন? সেটা বোধ হয় ভাল হয় নি, সাবধানে থাকলে জ্বরটা হ'ত না হয় তো!"

"যা হবার তা হ'ত নিশ্চয়ই, সাবধানে থাকলেও হ'ত, না থাকলেও হ'ত !"

আলিমন জানিতেন তাঁর স্বামী চিরদিনই এমনি আরামপ্রিয় অলস প্রকৃতির মানুষ, তাঁর এ কথার আর কি উত্তর দিবেন ? আলিমন খানিকটা চুপ করিয়া থাকিলেন,—কেমন একটা দুর্ভাবনায় মনটা তাঁর কাঁপিয়া উঠিল।

আলিমনের মেজ মেয়েও তখন শ্বশুর বাড়ী হইতে আসিয়াছিল, বাপের অসুখ শুনিয়া সেও সাহস করিয়া তাঁকে দেখিতে আসিল, মাকে আসিতে না দেখিলে বিমাতার মহলে এরা কেহই কোনও দিন আসিতে সাহস করিত না অবশ্য। মাকে দেখিলেই সন্তানদের অধিকার বোধ জন্ময়।

চৌধুরীসাহেবের হাতপা জ্বালা করিতেছিল, মেজমেয়ে আসিয়া পায়ে হাত বুলাইতে বসিল। ডাক্তার বলিয়া গিয়াছিলেন, রাত আট্‌টায় টেম্পারেচার লইয়া তাঁকে খবর দিতে, আট্‌টা বাজিতেই বসিরও থার্মোমিটার হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিল।

ময়না মাথার কাপড় টানিয়া এক কোণে সরিয়া দাঁড়াইল, স্ত্রীসন্তানে তার স্বামীর চারিদিক ভরা, তার একটু দাঁড়াইবার স্থানও যেন সেখানে নাই ; তার এ সব মোটেই ভাল লাগিল না,—আলিমনের সঙ্গে সঙ্গে তাঁর সব ক'টি সন্তানই বাপের খাটখানা ঘিরিয়া দাঁড়াইয়াছে ! তবুও তো সিরাজ এখানে নাই, সে আবার মেডিকেল কলেজে পড়ে, সে থাকিলে হয় তো এই ঘরেই দিনরাত কাটাইত !

বাপের টেম্পারেচার লইয়া আসিয়া বসির ডাক্তারকে চিঠি লিখিতে বসিলে আমিনা আসিয়া কাছে দাঁড়াইল। বাড়ীশুদ্ধ সকলে মিলিয়া ওঘরে যাওয়ায় সে বেচারা বড় একা পড়িয়াছিল, সে বলিল "কতটুকু জ্বর দেখলে ?"

"বেড়েছে,—ডাক্তারকে জানাতে হবে"

আমিনা স্বামীর মুখপানে চাহিয়া বলিল "নিজেই যাবে এখন ?"

বসির ডাক্তারকে চিঠিলেখা শেষ করিয়া মুড়িয়া বলিল "না, সরকারকে দিয়ে পাঠাচ্ছি, কেন, আমি গেলে তোমার আপত্তি আছে ?"

"তা আর নেই ? তবে বাড়ী ব'সে থাকা তো তোমার চলে না, কি ক'রবে এখন ? গান করবে ?

"হুঁ—গানেরই সময় বটে !"

"নয় কেন ? এমন সুন্দর চাঁদের আলো, ফ্লুট টা এনে দেবো ?"

বসির হাসিতে হাসিতে বলিল "সে আর বাড়ী ব'সে হয় না, তা হ'লে বেরুতে হয় ।"

"তাইতো,—আমিও তো সেই কথাই ব'লছিলাম গো, তা তো পছন্দ হ'ল না, দেখালে যেন কতই উদাসী, কোনো বিদেই জানা যেন নেই একেবারে !"

"বাপ্ ! বচনের তোড় কি ? আচ্ছা, আসি ঘুরে" বলিয়া বসির ডাক্তারকে চিঠি পাঠাইতে বলিয় সরকারের হাতে চিঠি দিতে গেল ! আমিনা বাড়ীর পিছন দিককার বাগানটায় নামিয়া এদিক ওদিক বেড়াইয়া জ্যোৎস্না উপভোগ করিতে গেল ।

ফাল্গুন মাসের কুয়াসা জড়িত জ্যোৎস্না, বাগানে ও পুকুরের জলে ছড়াইয়া পড়িয়াছিল । রাত্রেও কোকিল ডাকিতেছিল ; বাগানে লম্বা লম্বা দুখানা লোহার আসন পাতা ছিল, একখানা পরিষ্কার খোলা যায়গায় আর একখানা কামিনী গাছের ঝোপের নীচে । বেড়াইতে বেড়াইতে আমিনার মনে হইল ঝোপের নীচের বেঞ্চখানায় কে যেন বসিয়া আছে !

সেখান থেকে আর দু চার পা আগাইলেই তার শ্বশুরের ঘরের পিছনের দিকের সিঁড়ি, সুতরাং আমিনা মনে করল বুঝি তার মেজ ননদ এইদিক দিয়া আসিয়া বসিয়াছে, তা ছাড়া বাড়ীর ভিতর আর কে আসিবে ? দাসদাসীরা সকলেই তখন কাজকর্ম্মে ব্যস্ত । আমিনা অতর্কিতে গিয়া ননদকে চমকাইয়া দিবার মতলবে পা টিপিয়া টিপিয়া কাছে গিয়া দেখিল তার শাশুড়ী ময়না হাঁটুর মাঝে মুখ গুঁজিয়া বসিয়া প্রাণ ভরিয়া কাঁদিতেছে ! আমিনা অবাক হইয়া সসঙ্কোচে থমকিয়া দাঁড়াইল ! তার ভয় হইল, পাছে ময়না মনে করে যে সে বুঝি ময়নার কান্না দেখিতেই আসিয়াছিল, তাই মানে মানে পালাইবার চেষ্টা করিতেই গোলাপ গাছের কাঁটায় রঙীণ সাড়ীখানির আঁচল বাধিয়া গেল, এমন সময় ময়না চোখ মুছিয়া মুখ তুলিয়া তাকে দেখিয়া ফেলিল, বলিল "কে আমিন ?" আমিনা কাঁটা হইতে কাপড় উদ্ধার করিতে করিতে বলিল "হ্যাঁ, মা !"

এদিকে যেমন সে পালাইবার পথ পাইতেছিল না, অন্যদিকে তেমনি কাপড়ও ছাড়াইতে পারিতেছিল না; প্রতিক্ষণেই ভয় হইতেছিল ঐরে বুঝি ময়না বলিয়া বসে আমার কান্না দেখতে এসেছ বুঝি ?

কাপড় ছাড়াইয়া সে ময়নার কাছে গিয়া দাঁড়াইতেও ময়না সে-কথা বলিল না, বলিল "এই ঠাণ্ডায় বাগানে এসেছো আমিন, অসুখ ক'রবে যে !"

আমিনা মাথা নামাইয়া বলিল "এখুনি ঘরে যাচ্ছিলাম, বেশীক্ষণ তো আসিনি"

ময়না কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিল, তারপর বলিল "আচ্ছা আমিনা, তুমি আমাকে কি ভয় কর ? আমার সঙ্গে তোমরা ত কেউ মেশ না ?"

আমিনা একথার উত্তর খুঁজিয়া পাইল না, সত্যি যে শ্বশুরের শেষ-পক্ষের আদরিণী বলিয়া তারা ময়নাকে বিদ্বেষভরা ভয় করিত !

ময়না ভাঙ্গা গলায় বলিল "তুমি আমাকে কাঁদতে দেখে অবাক হ'য়ে গেছ আমিন্, দেখ না এ বাড়ীতে কেউ আমাকে মিছি মিছি আদর করেন, কেউ ঘেন্না করেন, কেউ রাগ করেন, কেউ বা ভয় করেন কিন্তু কেউ তো একটুও ভালবাসেন না, যে দুঃখের সময় কাছে গিয়ে একটু দাঁড়'বো, এতে কান্না কার না পায় বলো তো !"

আমিনা কি বলিবে ঠিক না করিয়াই কেবল বলিল "তাতো' সত্যি মা !" আর কোনো কথা বলিবার পূর্ব্বেই আমিনা শুনিল আলিমন ডাকিতেছেন "আমিন্ আমিন্ !"

সে ছুটিয়া বাড়ীর ভিতরকার উঠানে গিয়া দাঁড়াইতেই আলিমন বলিলেন, ষ্টোভ জ্বেলে খানিকটা গরম জল ক'রে পাঠিয়ে দাও তো। বেশী জল গরম ক'রতে গিয়ে দেরী ক'র না যেন, এক গ্লাস হ'লেই হবে !"

"আচ্ছা" ! বলিয়া আমিনা তাড়াতাড়ি জল গরম করিতে গেল। ময়নার সঙ্গের আলাপটা আর শেষ করিতে পারিল না !

(৪)

ছয়টী মাস পড়িয়া পড়িয়া ভুগিয়া চৌধুরী সাহেব নিজের বিষয় সম্পত্তির আয় ব্যয়ের হিসাব আলিমনকে ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে বসিলেন। পঁয়তাল্লিশ ছিয়াল্লিশ বৎসর

বয়স কিছু এমন বেশী নয় যে আর বাঁচা চলে না, তবে যম যে অত বিচার করিতে বসে নাই তা তিনিও বুঝিতেছিলেন।

তাঁর অবর্ত্তমানে বিষয় চালাইবার বুদ্ধি আলিমন ছাড়া আর কারো ছিলনা, বসির বোকা নয় বটে তবু চৌধুরীসাহেব তাকে হিসাব পত্র দিতে ইচ্ছা করিতেন না! তাই সব কথা আলিমনকেই শুনাইতে হইত।

কথায় কথায় আলিমন জানিলেন যে গত বৎসর খাজানার দায়ে যে তালুক কখানা যাইতে বসিয়াছে তিনি সরকারের কাছে শুনিয়াছিলেন সেইগুলি সবই ময়নার হইয়া গিয়াছে, অথচ এর বাষ্পও তিনি আগে জানিতে পারেন নাই, হয়তো সুদীর্ঘ কালই স্বামী তাঁর কাছে একথা গোপন করিয়া রাখিতেন।

রাগে আলিমন জ্বলিয়া উঠিলেন, তাঁর স্বামী কিনা এমনি অবিবেচক, আলিমনকে জানাইয়া যদি তিনি ময়নাকে দিতেন এই সংসারের সমস্ত বৈভব, তবু যে আলিমন না বলিতে পারিতেন না, এটুকু বিশ্বাস—এত বছরকার একত্র বাসের পরও স্বামী কি তাঁকে একটুও চেনেন নাই?

পূর্ণগর্ভা ময়নার গর্ভে কি আছে জানিবার আগেই আলিমন জানিলেন যে তাঁর গর্ভের সন্তানদের অংশীদার আসিয়াছে! ময়নার পেটে সন্তান আসিবার আগেই স্বামী তার বিলি ব্যবস্থা করিয়াছেন আর তাঁর সন্তানদের জন্য তো একটু ভাবেন নাই! স্বামী যদি অমনভাবে মুমূর্ষ না হইতেন তাহা হইলে এতদিনকার চাপা আগুণের রাশি হয় তো আলিমন সেইদিনই উজাড় করিয়া ঢালিতেন!

একথা শুনিতে বসিরেরও বেশী দেরি হইল না, সে বাপের উপর রাগে অন্ধ হইয়া ময়নার মৃত্যু কামনা করিল, ফলে স্বামীর মৃত্যুর আগেই ময়নার শত্রুপুরীতে বাস হইল। মনের আশঙ্কায় উদ্বেগে তার শরীরও খারাপ হইতে লাগিল! কেই বা তখন তার অত খোঁজ করে! আলিমন তো স্বামী লইয়াই মহাব্যস্ত!

আষাঢ় মাসের অবিরল বর্ষার মাঝে চৌধুরীসাহেব শেষ নিঃশ্বাসে রোগজীর্ণ দেহের বাঁধন কাটাইয়া গেলেন! স্বামীকে বিদায় দিয়া আলিমন সংসারের আর কোন দিকে না চাহিয়া

মুখ ঢাকিয়া পড়িয়া রহিলেন! কিছুক্ষণের জন্য তাঁর মনে হইল এসংসারের সকল কর্ত্তব্য তাঁর শেষ হইয়া গেল!

সপ্তাহের মধ্যেই ময়না একটী চাঁদপানা পুত্র সন্তান প্রসব করিয়া জ্বরে শয্যাগত হইয়া পড়িল। এ শিশু এবাড়ীর কাহারো আদরের ধন নয়, কেউ ইহার অনিষ্টে ক্ষতিবোধ করিবে না, জানিয়াই ময়না কাহাকেও ডাকিয়া ছেলেটীর একটু সেবার ভার দিল না! ময়নার নিজের মা ছিল না, থাকিলে হয়তো এ অদিনে তার পাশে দাঁড়াইয়া তাকে সাহায্য করিতে পারিতেন, অন্ততঃ তার হাতে ঐ শিশুটার ভার দিয়া সে আরাম পাইত!

সারিয়া উঠিবার প্রবল আগ্রহ থাকিলেও ময়নার গায়ের উত্তাপ হুহু করিয়া বাড়িতে লাগিল, ছেলের দিকে চাহিয়া তার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল। দাসীরা তাকে কোনো দিনই ভয় করিত না, কথাও বড় একটা শুনিত না কিন্তু প্রভুর মৃত্যুর পর হইতে আর তাদের দেখা পাওয়া ত দুর্ঘট হইয়া উঠিল, তারা সে মহালই প্রায় ত্যাগ করিতে বসিয়াছিল, নিয়ম মত দুবেলা কাজ করিয়া যাইত মাত্র। অবিশ্রান্ত বৃষ্টি, পচাবর্ষা, বৃষ্টির শব্দে বাদল হাওয়ায় এক ঘরের কথা অন্য ঘরের শুনা যায় না, ভিজা বিছানা সাতদিনেও শুকায় না, এমনি দুর্দ্দিনে চোখের জলে ভাসিয়া ময়না ভাবিল, হায় আমায় বিষয় ভরসা না দিয়ে যদি সতীন ভরসা দিয়ে যেতেন তা হলেও বুঝি আজ প্রাণ পেয়ে বাঁচতাম! কাঁদিতে কাঁদিতে ক্লান্ত হইয়া সে ঘুমাইয়া পড়িল। ঘুমাইবার আগে তার কেবলি মনে হইতেছিল জাগিয়া আর ছেলের জীবন্ত মুখ সে দেখিবে না। ঐ নিবু নিবু ক্ষীণ প্রদীপটি ততক্ষণে নিবিয়াই যাইবে।

আলিমন তাঁর ভাঙ্গা মনপ্রাণ লইয়া শুইয়াই ছিলেন, হঠাৎ কি মনে করিয়া ব্যগ্রভাবে ডাকিলেন "আমিনা, শুনে যাও" আমিনা মুখের কাছে আসিয়া বলিলেন "কি বলছেন মা? যাও তো ময়না কেমন আছে দেখে এস তো! দেখে এসে আমায় খবর দিও কেমন আছে,"

আমিনা ময়নাকে দেখিতে যাইতেছিল পথে তাকে দেখিয়া বসির হাসিয়া বলিল "কি দেখ্‌তে যাচ্ছো, আমাদের ভাগীদার দুষমন?"

আমিনা বলিল "সিরাজ কি তা নয়?"

"সে তো ভাই,"—

"এও তাই, যাক্ দুষমন হোক্ আর যাই হোক আমার সে কথায় কাজ নেই, আমি দেখে এসে মাকে খবর দেব, দেরি হ'লে আবার মা রাগ ক'রবেন, তুমি সরো আমি যাই।"

"যাও, গিয়ে যেন আবার তুমিও সেবা ক'রতে বসো না"

আমিনা হঠাৎ রাগিয়া গেল, মুখ লাল করিয়া বলিয়া উঠিল "বাঃ তা কেন বসবো না, সেবার যদি দরকার থাকে, আমি নিশ্চয়ই ক'রবো, তা ব'লে হয়েছে জীব মারা যাবে?"

বসির খুব খানিকটা হাসিয়া বলিল "হ্যা তুমি সেবা করলেই সে বেঁচে যাবে আর মারা যাবে না, তুমি একজন ডাক্তার কি না, আর যায়ই যদি মারা, তাতেই বা ক্ষতি কি?"

আমিনা আর কোনো উত্তর না দিয়া ব্যস্ত পায়ে ময়নার ঘরের দিকে চলিয়া গেল। তখন শিশুটি কাঁদিয়া কাঁদিয়া নাল হইয়া গিয়াছে, ময়নার জ্বরের ঘোরে প্রায় অজ্ঞান, এক একবার সে মাথা তুলিয়া ছেলের দিকে চাহিতেছিল কিন্তু কিছু করিবার ক্ষমতা তার তখন একেবারেই নাই!

আমিনার মুখের খবরে একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাসের সঙ্গে "আল্লা!" বলিয়া আলিমন উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পাঁচটি সন্তানের মা তিনি, তাঁর সে বুক—সুধা-ক্ষরিত মায়ের বুক;—তাঁর বুক থাকিতে কি না শিশুটা স্থান পাইবে না! মাতৃহৃদয় তো সঙ্কীর্ণ নয়, সে যে বিস্তীর্ণ ঠাঁই, আলিমন চোখ মুছিতে মুছিতে গিয়া সতীনের শিশুকে বুকে তুলিয়া আগুনের সেঁকে তাকে আমার দিতে বসিলেন!

বিছানায় শুইয়া শুইয়াই ময়না দেখিল, আলিমন তাকে ঠিক তাঁর মেয়েটির মতই যত্ন করিতেছেন! বড় মেয়েরও একটী ছেলে হইয়াছিল তিনি তাকে আদর করিয়া দাদা বলিতেন অভ্যাস দোষে ময়নার ছেলেকেও তিনি দাদা বলিয়া ফেলিয়া আবার জিব কাটিয়া বলিতেছেন "বাবা!" ময়না আরামের নিঃশ্বাস ফেলিল, বিশ্বে এক সব মায়ের বুক!

শ্রীনীহারবালা দেবী।

কমলের ব্যথা।

-:*:-

হে মম রবি তপন ও গো নিখিল সবিতা !
কবে এ বাহু—বন্ধ-পাশে আসিবে দেবতা ?
উচ্চ গিরি মূর্দ্ধা ভেদি
অসীম মহা-আকাশ ছেদি
রচিত তব জ্যোতির বেদী
কেহ না যেখানে
পৌঁছে কভু কেমনে আমি যাইব সেখানে ?
সুদূরবাসী জীবন বঁধু পরাণ প্রিয় হে
লোচন জলে বল্লী আশা আর কি বাঁচিবে ?
তুমি তো নভ অসীম শিরে
নিম্নে আমি নিপান-নীরে
এ দূর ব্যবধানের মাঝে
চাহিয়া কেবলি,
বাঁচন এ যে, সাধন এ যে, বিফল সকলি !
ক্ষণেক তরে যে দিকে নরে নারে গো চাহিতে
সেদিক্ হতে আমার আঁখি চাহেনা ফিরিতে !
ভুবনভরা তোমার আলো
তোমার ছায়া, তাহারে ভাল
বাসিয়া কত বহিব ও গো
আকুল তৃষাতে ?
মরীচিকা এ কাটিবে নাকি আমার আশাতে ?

বাসনা মম মৃণাল হয়ে পঙ্ক পাতালে
ডুবিতে চাহে গভীর দুখে হানিয়া কপালে
হতাশা ক্ষীণ কণ্টকিত
জীবন মধু বিলুণ্ঠিত
অন্ধ আঁখি মুদিয়া আসে
তোমার বিহনে—
ভরিয়া দিক্ তিমির জাগে আমার জীবনে !

শতেক ফুল বর্ণবাসে বিহগ-সঙ্গীতে
নিত্য তব অর্ঘ্য রচে বিপুল মহীতে।
সিঁদুর-রঙা তোমার পথে
আমিও নিতি সকাল হ'তে
ঢালি যে মধু সারাটি দিন
গন্ধ-বরণে—
কিছু কি তার পৌঁছেনাক তোমার চরণে ?

কেমনে সেথা পশিবে মম বেদনা কাহিনী
মুখর যেথা সতত শত সুখের রাগিণী !
না যাক্—থাক' উচ্চে তুমি
রহিব আমি আঁকড়ি ভূমি
তোমারি রূপ-মুগ্ধ ; আর
রহিবে জাগিয়া
আমার প্রেম, চির এ চিত্তে তোমারি লাগিয়া।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

বিদেশী।

—:*:—

আমাদের দেশে কতকগুলি জিনিষ ছিল না, অন্য দেশ হইতে আসিয়াছে এবং কালক্রমে সেইগুলি আমাদের নিজস্ব মধ্যে গণ্য হইয়া পড়িয়াছে। আমরা সেগুলিকে আপনার করিয়া বিদেশীগণের আবিষ্কারের কথা বিস্মরণ হই।

সার ওয়াল্টার র‍্যালে আমেরিকা হইতে ইংলণ্ডে তামাক আনেন ও তথা হইতে ভারতে সর্ব্বত্রে প্রচারিত হইয়া পড়ে। এই তামাকের প্রচলন প্রবর্ত্তন লইয়া একটী সুন্দর গল্প আছে। ইংলণ্ডে আসিয়া র‍্যালে একদিন তামাক খাইতেছেন, একজন অবোধ ভৃত্য তাঁহার গায়ে এক বাল্‌তি জল ঢালিয়া দিল। র‍্যালে হতবুদ্ধি হইয়া উঠিয়া পড়িলেন, তখন ভৃত্যটী ভীত ও চকিত হইয়া বলিল "আপনি কি বিষের বাত মুখে দিয়াছেন তাতে আপনার পেটে আগুন লাগিয়াছিল নাক মুখ দিয়া ধোঁয়া বাহির হচ্ছে তাই আমি জল ঢেলে দিয়েছি।"

স্পেন দেশীয় লোক প্রথমে আমেরিকা হইতে ইউরোপে আলু আনেন। ওয়াল্টার র‍্যালে ইংলণ্ডে আলু আনিয়া নিজের বাগানে আলু চাষ করেন। আলুকে লোকে বিষাক্ত ফল মনে করিয়া কেহ ব্যবহার করিত না। ফরাসী রাজ চতুর্দ্দশ লুই নিজের বাগানে আলুর চাষ করিলেন, আলুর শাদা ও বেগুনে রংয়ের ফুল হইল। লুই তাঁহার রাণীকে আলুর ফুল পরিতে বলিলেন—রাণীর অনুকরণে তাঁহার সঙ্গিনীগণ ফুল ব্যবহার করিতে লাগিলেন; রাণী ও সঙ্গিনীগণের অনুকরণে সম্ভ্রান্ত মহিলাও আলুর ফুল পরিতে লাগিলেন, এইরূপে আলুর চাষ আরম্ভ। তখন ফুলের জন্য আলুর চাষ হইত, ক্রমে আলু খাইবার জন্য চাষ হইতে লাগিল। পিরুরাজ্যের গবর্ণর-পত্নী সিঙ্কোনা স্পেনে কুইনীনের ছাল আনিয়াছিলেন, সেই অবধি কুইনীনের নাম সিঙ্কোনা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে ইহাকে পিরুবীয়াল বার্ক বলিত। ইহার অধিকার সম্বন্ধে একটী কিম্বদন্তী আছে। এক সময়ে স্পেনীয় সৈন্য দলের মধ্যে ভয়ঙ্কর জ্বরের আবির্ভাব হয় তাহাতে বহু সৈন্য প্রাণত্যাগ করে। কিন্তু কতকগুলি সৈন্যকে জ্বর আক্রমণ করিতে পারে নাই অনুসন্ধানে জানা গেল যে, ঐ সকল সৈন্য নিকটস্থ যে জলাশয়ের জল ব্যবহার করিত তাহাতে কুইনীন গাছের পাতা ও শাখা প্রশাখা পড়িত। পরে নানারূপ বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দ্বারা সিদ্ধান্ত হইল যে কুইনীন জ্বর নাশ করিতে অব্যর্থ ঔষধ।

আমেরিকা হইতে ভুট্টা ও জনার ইউরোপ ও ইংলণ্ডে আইসে, আমেরিকা অধিবাসীগণকে ইণ্ডিয়ান (Indian) বলা হইত বলিয়া ভুট্টা ও জনারকে ইণ্ডিয়ান কর্ণ বলা হয়।

আল্‌পাকা মেষের লোম হইতে পাওয়া যায়। এই সকল মেষকে আমেরিকা হইতে ইউরোপে রাখিবার চেষ্টা হয়—কিন্তু জল বায়ুর দোষে মেষ বাঁচে নাই এখন পিরু ও চিল্লী প্রদেশে মেষেরা বিচরণ করে ও সেই সকল মেষের লোম দেশবিদেশে রপ্তানি করা হয়।

কপিও আমেরিকার যুক্তরাজ্যের ফল, তথা হইতে ডেরাডুনে প্রথমে আনা হয়। এখন সেই কপি সমস্ত যায়গায় জন্মিতেছে।

জন ক্রেরায় বিলাতীকুমড়ার চাষ করেন ও তাঁহার অনুকরণে পর্টুগালে নানাস্থানে কুমড়ার চাষ হইতে থাকে। ক্রমে উহা ভারতে আইসে।

ব্রুকেলভন্‌ বিলাতী আমড়ার চাষ সাউথ বরোতে করেন ও একটী আমড়া আকবরকে উপহার দেন। আকবর সেই চাষ সম্বন্ধে বিবরণ চাহিয়া আনেন ও সেই অবধি ভারতে সর্ব্বত্র চাষ হইতেছে।

আকনড়ে— তাল গাছের আড়ে, আছে আকনড়ে
ছেলেধরার ভয় হয়েছে পথে বেরিওনারে বাবা।
চিনি দেবে খাবা, খাবা, মুখে বল্‌তে দেবে না বাবা
বানিয়ে দেবে হাবাগোবা—একা পথে যেওনারে বাবা।

এই সকল ছড়ায় বর্গীর ভয়ের ন্যায় যে আকনড়ের ভয় দেখান হইয়াছে—ইহা "আরাকাণ"বাসী পর্ত্তুগীজবাসী জলদস্যুদেরই উদ্দেশ্য করিয়া বলা হইয়া থাকে। পর্ত্তুগীজ-বাসী জলদস্যুগণ নিম্ন বঙ্গের নানা স্থানে জঘন্য দাস ব্যবসা করিত। তাহারা বালক বালিকা হরণ করিয়া গোয়ার হাটে লইয়া গিয়া বিক্রয় করিত। আরাকাণী হইতে আকনড়ে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। শিবপুর কাহিনীতে এই বিষয় বিশদভাবে বর্ণিত করিয়াছে এবং গ্রন্থ-কর্ত্তাও আকনড়ে আরাকাণী হইতে উদ্ভূত বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছে। কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ইহাদের উল্লেখ আছে,

"ফিরঙ্গীর দেশখান্‌ বাহে কর্ণধারে
রাত্রিতে বাহিয়া যায় "হারমদের" ডরে"

হারমদ অর্থাৎ আরমাডা—ইহা স্পেনীয় আরমাডার (Spanish Armarda) অপভ্রংশ। ইহারাও পর্ত্তুগীজবাসী জলদস্যুগণের সহিত বালকবালিকা হরণে বড় আগ্রহ দেখাইত। আমাদের মেরী ফরাসী রাণী ও স্পেনীয়গণের মেরী (Mary) অর্থাৎ যীশুর মাতার নাম হইতে আসিয়া পড়িয়াছে। পর্ত্তুগালের চিন্তরা (Cintra) নগর হইতে আনীত নেবু ও সন্তরা নেবু হইয়াছে। আনারস পর্ত্তুগালের আনীত আনানাস (Annas) ফল হইতে উদ্ভূত। আমাদের প্রমারা খেলা পর্ত্তুগীজদের খেলার অনুকরণ আসিয়াছে একবালে Primeiro খেলা পর্ত্তুগীজদের বৈঠকের অঙ্গ ছিল। আমাদের বেহালা পর্ত্তুগীজদের violar রূপান্তর মাত্র,

পর্ত্তুগীজদের অনুকরণে ও আদর্শে আমাদের মহিলাগণ ফিরিঙ্গী খোঁপা বাঁধিতেন ও বাঁধিয়া থাকেন। ফিরিঙ্গী খোঁপা পর্ত্তুগীজ মহিলাগণের বড়ই প্রিয় ছিল। "পূর্ব্বে এদেশে কর্ত্তারা কবেদার জুতা ব্যবহার করিত তাহাও ফিরিঙ্গীদের অনুকরণের ফল।" এখানে ফিরিঙ্গী অর্থে পর্ত্তুগীজ বুঝিতে হইবে। ইটালী campos হইতে কম্পাস হইয়াছে। পর্ত্তুগীজদের বলতি হইতে বাল্‌তি, গামলিউ হইতে গামলা, কেদরি হইতে কেদারা, ক্যানেস্তর হইতে ক্যানেস্তারা, বিস্তুর হইতে বিস্কি, রেস্তস্তর হইতে রেস্তো, সেগো হইতে সাবু, মলেসা হইতে মাল্‌সা, পেদাস্তর হইতে পাদরি, টোকাহিও হইতে টাকা, জন্‌লা হইতে জানালা, চালাহি হইতে জালা ইত্যাদি শব্দ সম্ভূত হইয়াছে।

শ্রীমাধুরীমোহন মুখোপাধ্যায়।

ছিটেফোঁটা

চিন্তাশীল আমাদের ভাবনাটা এইবার বড্ড ভারী হইয়া দাঁড়াইল। অনেক যত্ন চেষ্টায় যদি বা দেশটাকে আলোকের কাছাকাছি নিয়া আসা গিয়াছিল—কতকগুলি বয়াটে ছেলের খামখেয়ালি আর জন-কতক হুজুগে লোকের হৈ-চৈ হয়রাণীতে তা আবার আদিমের ঘোর অন্ধকারের দিকেই ফিরিয়া চলিল। আবার না কি সেই সাবেকী ভাষা চলিবে—"মহর্ণেষু" গোছের বুলি আর মুণ্ড আর্ক-ফলা হইবে পাণ্ডিত্যের সনদ। মরিয়াছিল যাহা তাহাই হইবে সচল—এদিকে এমন মোলায়েম—as free as air and as rich as Marowaris যে ভাষা—এত দিন দরবারে, সভায় ফুর্‌-ফুর্ করিয়া ভাসিয়া চলিত—তাই হইবে কি না dead—এতদিনে জাতিটাও সত্যই dead হইতে চলিল। মেয়েদের উচ্চ শিক্ষা দূরে আস্তাং, সামান্য শিক্ষাও দেওয়া হইবে না—তাদের বরাতে নাচিল—টাকরাস আর চরকা,—থোড়, বড়ি, খাড়া, বঁটী, হাতা, খুন্তি-তো আছেই। কি ভীষণ! কি আক্ষেপের কথা!

ছেলের দলের প্রথম অবশ্য শিক্ষণীয় অর্থাৎ Compulsory হইল অবাধ্যতা। দলে দলে তারা ইস্কুল-কলেজ ছাড়িয়া বাহির হইয়া আসিল—মা, বাপ, শিক্ষক, অধ্যাপক—তঁাদের কথায় নির্ভয়ে দেখাইয়া দিল—অঙ্গুলী-বিশেষ! অথচ হবেন তো সব এক ভবঘুরের দল—কাজ-কর্ম্ম চাক্‌রী-বাক্‌রী যা সরকারী খয়রাৎ—তার তো কোনো আশাই রহিলনা।

যুদ্ধ-মেডেল করোনেশন-মেডেল, সরকার-পক্ষের এমন সব শোভন-লোভন দান তো স্বপ্নেও পাইবার আর আশা করিতে পারিবেন না। বৃত্তি হইবে ইহাদের ভিক্ষা—মাথায় উঠিবে পায়ের ভূষা—অর্থাৎ জুতা। দেশের সম্মুখে দেয়ালা-দীপের যে আলেয়া, জৌলুসে জ্বলিয়া উঠিতেছিল, এক লহমায় তাই করিয়া দিল এরা কোল-আঁধার। বুড়ো-হাবড়া আমরা তবু যে একটু আশা ধরিয়া বাঁচিয়াছিলাম—শেষ বয়সে যদি বা M. L. C. বা Executive Councillor এর বাপের মর্য্যাদা পাইয়া মোটরে-চড়া শফরে সদ্য-হাওয়ায় হারানো স্বাস্থ্য উদ্ধার করিয়া লইতে পারি সে গুড়ে পড়িল—পাথুরে বালি। কিন্তু চীৎকার করিয়াই বা কি করিব কালের হাওয়াই বহিতে সুরু করিল—ঘুরিয়া-ঘারিয়া। বুদ্ধিমানের কথায় কেউ কান দেয় না!

মেয়েরা যদি কেবল চরকাই কাটিবে তবে লেখাপড়া শিখিয়া বল-সঞ্চয় করিবে কখন? উচ্চ শিক্ষায় নারীর সকল দুর্ব্বলতা নষ্ট ক'রে শক্তি তার Lieutenant General এর চেয়ে দড় ও বড় হইয়া উঠে। এমন দৃঢ় চরণে তারা দাঁড়াইতে শেখে যে দরকার হইলে শত্রু-সৈন্যের বুকের উপর দিয়া সবুট পা সদাপে ফেলিয়াও অনায়াসে চলিয়া যাইতে পারে। এইরূপ বীরত্বের উদাহরণ শিক্ষিতা মহিলাদের মধ্যে বিরল নহে। আরো শুনিতেছি এইরূপ দৃষ্টান্তের মর্য্যাদা বাড়াইবার জন্যই মহামান্য হাইকোর্ট এবার নারীর আদালতে ওকালতী করিবার ষোলআনা অধিকার দিয়া সই ও শীল মোহর সংযুক্ত সে বিজ্ঞাপন দামামা দ্বারা ঘোষণা করিবেন।

জাতীয় শিক্ষা বা গৌড়ীয় বিদ্যা-সংসদ—আমাদের ন্যায় বুদ্ধিমান লোকের কাছে এসব কথা নিতান্তই অর্থহীন। জাতি থাকিলে—তবে তো তার শিক্ষা আর সংসদ। বাঙালীর আত্মায় হাতুড়ির উপর হাতুড়ি অনবরত মারিয়া গেলেও সত্যিকার সাড়া পাওয়া যায় না তার আবার—স্বরাজ জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়—যত বাজে কথা। বাবা-সকল যারা বাহির হইয়া গিয়াছ আবার ভারি ভারি বাঁধানো বইগুলি কাঁধে বহিয়া ধীরে ধীরে কলেজে ইস্কুলে গিয়া লক্ষ্মী ছেলেটীর মত অধ্যাপকের মুখস্থ বক্তৃতা মন দিয়া শুন। বিদ্যালাভ হইবে। অধ্যাপক বেচারীদেরও রুজি মারা যাইবে না।

ক্ষপণক।

সমালোচনা।

পল্লীব্যথা।*

পল্লীবহুল বাঙ্গলা দেশের সাহিত্যে পল্লীর কথা বড় বেশী শুনি না কেন? ইহার কারণ বোধহয় আর কিছুই নয়—আমাদের সাহিত্যিকদের আসল দেশটার সঙ্গে পরিচয় নিতান্ত ক্ষীণ। পাশ্চত্য প্রভাবের আবহাওয়ায় তাঁহাদের মানসকুসুম বিকশিত। অশেষ দুঃখ-দৈন্য-পীড়িত পল্লীর প্রতি তাঁহাদের নাড়ীর টান থাকিবে কি করিয়া?

এ কথা রবীন্দ্রনাথই বোধহয় সর্ব্বপ্রথম অনুভব করেন। স্বর্গীয় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার যখন পল্লীজীবন লইয়া 'ফুলজানি' প্রভৃতি উপন্যাস লিখিতে আরম্ভ করেন তখন তিনি এই উপন্যাসিককে উৎসাহিত করিয়া লিখিয়াছিলেন—'বাংলার অন্তর্দ্দেশবাসী নিতান্ত বাঙ্গালীদের সুখদুঃখের কথা এ পর্য্যন্ত কেহই বলে নি।' (ছিন্নপত্র, ১০ পৃষ্ঠা) আর কবির কর্ত্তব্যও যে শিক্ষাদীক্ষাহীন দুর্দ্দশাগ্রস্ত দেশবাসীর "মূঢ় মূক ম্লান মুখে" ভাষা ও তাহাদের নৈরাশ্যপীড়িত হৃদয়ে আশা দেওয়া তাহাও তিনি কবিতায় উজ্জ্বল ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন।

ইহার পর অনেক দিন চলিয়া গিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক সাহিত্যিকগণ কেহ বা একখানি পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়া কেহ বা উপন্যাসে বা গল্পে একটুআধটু পল্লীর কথা শুনাইয়া আপনাদের কর্ত্তব্য শেষ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইতিমধ্যে দেশের হাওয়া ফিরিয়া গিয়াছে। স্বদেশিকতার একটা প্রবল বন্যা দেশের উপর দিয়া বহিয়া যাইতে আরম্ভ হইয়াছে। ফলে শিক্ষিত সম্প্রদায় দেশের প্রকৃত অবস্থাটি জানিবার জন্য একটা আন্তরিক আগ্রহ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন; এবং আমাদের আধুনিকতম সাহিত্যেও সে ভাবটি ফুটিয়া উঠিতেছে। সমালোচ্য কাব্যগ্রন্থখানি তাহারই একটি নিদর্শন।

নবীন কবিদের মধ্যে কালিদাস রায় পল্লীচিত্র অঙ্কণে সমধিক কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। তাঁহার এক একটি পল্লী-কবিতা স্কচ্ কবি বার্ণসের কবিতার ন্যায় উজ্জ্বল; সুন্দর। তাঁহার পরেই কবি কুমুদরঞ্জন মল্লিকের নাম করা যাইতে পারে। তাঁহার পল্লী কবিতার Homeley ভাব বা সরল অনাড়ম্বর মাধুর্য্য বেশ উপভোগ্য। যতীন্দ্রমোহনের পল্লীগাথা-গুলিতে প্রকৃত কবিত্ব ও প্রদীপ্ত সহানুভূতি আছে। রবীন্দ্রশিষ্য কবিবর প্রমথনাথ রায় চৌধুরী প্রৌঢ় বয়সে তাঁহার 'চিত্র ও চরিত্রে' অত্যাচার জর্জ্জরিত পল্লীবাসীর যে কয়েকটি চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা যেমন সত্য তেমনই সুন্দর।

উদীয়মান কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় আলেখ্য গ্রন্থে পল্লীর দুঃখের কাহিনীই আমাদিগকে শুনাইয়াছেন। পল্লীর দুঃখে তাঁহার হৃদয় গলিয়াছে, তাঁহার সেই আন্তরিক

---

* কবিতার বই, শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য একটাকা।

যাহা এই গ্রন্থে নানা কবিতায় বিভিন্ন আকারে মূর্ত্তি-লাভ করিয়াছে। তিনি পল্লীকে ভালবাসেন। প্রথমে কয়েকটি কবিতায় তাহার সৌন্দর্য্য, সুখ ও শান্তি দেখাইয়া পরে তাহার আধুনিক দুরবস্থা নিপুণভাবে বিচিত্র করিয়াছেন। সে চিত্র কি শোচনীয়!

পথে চলা লোক দেখিনা আঁধার বাড়ীঘর ;—
শ্মশানঘাটে দৈত্যদানা করলে কি গো ভর!
মানুষ দেখে মানুষ ডরে শ্যাওড়া গাছে উঠ্ছে ভরে'
পথ অপথের ঠিক ঠিকানা রইল না যে আর
বিদায় দেমা বিদায় দেমা বিদায় দে এবার!
পল্লীবালা কুটিরআলা কাঁপ্ছে জ্বরের ঝোঁকে,
বিধবা মা কাঁদছে শুয়ে মরা ছেলের শোকে।
কাঁদচে চাষা মনের দুখে প্যায়দা মশাই দাঁড়িয়ে রুখে,
কোথায় প্রীতি শান্তিকোথা? কেবল কথার সার।
বিদায় দেমা বিদায় দেমা বিদায় দে এবার!

ইহাই এখানকার পল্লীগ্রামের সাধারণ অবস্থা। ইহার উপর জমীদারের জুলুম আছে। কাজেই হতভাগ্য পল্লীবাসী কাঙালের

পাঁজর ভাঙ্গিয়া নিশিদিনমান বহিছে দীর্ঘশ্বাস
নাহিক একটু সুখ।

কবি সাবিত্রীপ্রসন্ন হৃদয়বান্। তিনি দুঃখীর দরদ প্রাণের মধ্যে অনুভব করিয়াছেন। তাঁর পল্লীব্যথার অনেক কবিতা পড়িতে পড়িতে চক্ষু অশ্রুসিক্ত হইয়া আসে। 'সমাজ সয়তানের' অত্যাচারকাহিনী বড় করুণ অথচ বড় সত্য। নির্ম্মম সমাজের কি চৈতন্য হইবে না? যাহারা সবার অধম দীনের হ'তে দীন তাহারা কি চিরকাল এইরূপ নিপীড়িতই হইতে থাকিবে?

'অকেজো নারী', 'ভাই ফোঁটা', 'সুধার ভাগ' প্রভৃতি কবিতাগুলির সহিত পল্লীর কোন সম্পর্ক দেখি না; এগুলি এই গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার স্বার্থকতা কি?

কোন কোন কবিতা ছন্দে ও ভাষায় কবি কালিদাস রায়ের কবিতা স্মরণ করাইয়া দেয়। উদাহরণ স্বরূপ 'পল্লীরাণী' কবিতাটি উল্লেখ করা যাইতে পারে। ইহা কালিদাস রায়ের 'বালিকা বধূ'র হুবহু অনুকরণ।

তাহা হইলেও গ্রন্থখানি পড়িয়া আমরা প্রীত হইয়াছি এবং সকলকেই ইহা আমরা পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

শ্রীকৃষ্ণবিহারী গুপ্ত।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
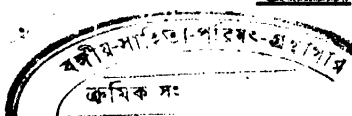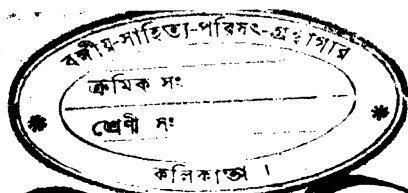
"তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ

৫ম বর্ষ। } চৈত্র, ১৩২৭ সাল। { ১ম খণ্ড, ৫ম সংখ্যা।

বসন্ত বরণ।

শীতের কুহেলিজাল দূরে অপসারি কে গো তুমি মোহন-সুন্দর,
বিশ্বে আসি দিলে দেখা বিক্ষেপিয়া চরণ মন্থর !
প্রস্ফুট অধরে তুলি হাসির কল্লোল
আঁখি কোণে লুকাইয়া কটাক্ষ বিলোল
এস—চন্দনের গন্ধে ভরি মলয় বাতাসে
নেহারিবে বিশ্ব আঁখি বিপুল উল্লাসে।

ধরা'পরে আজি এ কি নব আয়োজন !
অঙ্গে অঙ্গে জাগে এ কি পুলক স্পন্দন

স্নিগ্ধ শ্যাম লতাচয়, নব ঘন কিশলয়
সাজায়েছে সংকারে কনক ছটায়
ধূসর আকাশ তল করি নীল নিরমল
নব প্রাণ দিল আনি এই বসুধায়।

মুকুলিত সহকারে উপবেশি মধুস্বরে
কোকিল পাপিয়া আসি গাইছে ললিত গান
শূন্য বকুলের তলে ছেয়ে দিল ফুলদলে
প্রস্ফুটিত বেলাগুলি খুলি দিল মন-প্রাণ।

করি বন সুশোভিত ধন ঘন মুখরিত,
চপল মধুপ দল করিতেছে মধুপান
নীলিম আকাশে শশী, আবেশে পড়িছে খসি
জ্যোৎস্না তরঙ্গে আজি হ'ল বিশ্ব ভাসমান।

স্বরগ সুষমা রাশি ঘেরা কল্পনায়
সাজায়েছে ধরণীরে পুষ্প-মেখলায়।
দূর দূরাগত সেই বাঁশরীর তান
ভেসে এসে ভরায়েছে নিখিলের প্রাণ
অশোক কিংশুক ঐ আবির ছড়ায়
মাধবের ফুল দোল বাসন্তি—নিশায়।

শ্রীকিরণবালা দেবী।

চিররহস্য সন্ধানে।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

নীচে নামিয়া আসিয়া এল র‍্যামি সন্ন্যাসীকে তাঁহারই কক্ষে মুক্ত-বাতায়ন-সম্মুখে উপবিষ্ট দেখিতে পাইলেন। বৃষ্টি ধরিয়া গিয়াছে,—কয়েকটী উজ্জ্বল তারকা লঘু-মেঘাবরণের ভিতর দিয়া উঁকি মারিবার চেষ্টা করিতেছে, এবং আর্দ্রভূমি ও সিক্ত শষ্প-পুষ্পাদির ভিতর হইতে এমন একটী মিষ্ট গন্ধ বাহির হইতেছে যাহাতে বোধহয় যে সমস্তই যেন সহসা আজ কোনো অভিনব প্রেরণা বলে নবীভূত।

"ফুরায়ে গিয়াছে শীত,—বরষাও গেছে চলি' অভিনয়-শেষে ;
জাগো, জাগো প্রিয় মোর, জাগো হে সুন্দর,—
এস নামি' সুমধুর হেসে!"

এল র‍্যামিকে কক্ষপ্রবেশ করিতে দেখিয়া, তাঁহারই উদ্দেশে উক্ত পংক্তি কয়টী অর্দ্ধস্বগতঃ-ভাবে উচ্চারণ করতঃ সন্ন্যাসী বলিলেন—"লণ্ডন-সহরের এই বিশাল লোকারণ্যের মধ্যেও প্রকৃতি তাঁর বসন্ত-দূতকে পাঠাতে ভোলেন নি,—এই দেখ!" দক্ষিণ হস্তখানি প্রসারিত করিয়া তিনি তদুপরি একটী সুন্দর পতঙ্গকে উপবিষ্ট দেখাইলেন ; পতঙ্গটীর স্বচ্ছ পাখাদুটী যেন হীরকের মত জল্ জল্ করিতেছিল।

"জান্‌লা খুলে দিতেই এটী আমার হাতের ওপর উড়ে এল," স্নেহের সহিত পতঙ্গটীকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন—"আহা, এদের ভাষা বোঝবার ক্ষমতা যদি আমাদের থাকে, তবে পুষ্পরাজ্যের কতই-না মনোরম কাহিনী এর কাছ থেকে পেতে পারি! হয়তো কত আফিম-ফুলের-প্রাচীর-ঘেরা পুষ্প-প্রাসাদের কথা,—কত অরুণ-রঞ্জিত-গোলাপ-পাপড়ির নাচ-ঘরের কথা,—কত পতি-গতপ্রাণা বিহঙ্গীর অমর ভালবাসার কথা, কিম্বা কতই মধুমক্ষিকার রাজনৈতিক বাদ প্রতিবাদের কথা! বাস্তবিক,—কি বলে' আমরা জ্ঞানের বড়াই করি! এই ক্ষুদ্রতম পতঙ্গটীও আমাদের চেয়ে অনেক বেশী জানে—এর কাছেও আমাদের অভিজ্ঞতা হার মেনে যায়।"

"নিজের অধিকার যতটুকু, সে হিসাবে অবশ্যই বেশী"—এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"কিন্তু সৃজন-ব্যাপারে আমাদের যে-পরিমাণ অধিকার, তা'র তুলনায় অত্যল্পই জানে। অতএব নিক্তির ঝোঁক কোনোদিকেই বেশী নয়। সে যা' হোক্, এখন দেখ্‌ছি যে বিজ্ঞান বা ভক্তির চেয়ে কবিত্বটাই আপনার মধ্যে বেশী।"

"সম্ভবতঃ!" পতঙ্গটীকে নৈশ-অন্ধকারে পুনরায় ছাড়িয়া দিয়া সন্ন্যাসী স্মিতমুখে উত্তর করিলেন—"তবে কথা এই, যে, কবিরা প্রায়ই সর্ব্বোৎকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক হ'য়ে থাকে, কারণ তা'রা আপনাদের বৈজ্ঞানিক ব'লে' জানেই না। বড় বড় বৈজ্ঞানিকেরা যা' আবিষ্কার কর্‌তে নীরস বর্ষ-যাপন করেন, কবি হয়তো খুবই সহজে সে-তথ্যে উপনীত হন। তুমি যে বৈজ্ঞানিক, এ-সম্বন্ধে একবার সচেতন হ'য়ে উঠ্‌লে আর তোমার দ্বারা কিছু হবে না। সে যা' হোক্, নিজেকে 'কবি' বলবার সাহস আমার নেই; তবু যদি কোনো উপাধি-গ্রহণ আবশ্যকই হয়, তবে সবিনয়ে বল্‌বো যে আমি একজন সহমর্ম্মী মাত্র।"

"আমার সঙ্গে তো আপনার সহানুভূতি নেই"—শুষ্ককণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন।

"আমার সহানুভূতিতে বর্ত্তমানে যে তোমার দরকারই নেই বন্ধু,—তুমি নিজেই যে এখন নিজের নিয়ন্তা। তবে, কখনও যদি দরকার হয়, অবশ্যই তখন পাবে।"

ফুল্লচিত্তে কথাগুলি বলিয়া সন্ন্যাসী হাসিলেন, কিন্তু এল র‍্যামি সে হাস্যে যোগ না দিয়া টেবিলের টানা খুলিলেন এবং অল্প অন্বেষণেই দু'তাড়া পাণ্ডুলিপি বাহির করিয়া সন্ন্যাসীর সম্মুখে নিক্ষেপ করিলেন।

"পড়ুন"—জয়দৃপ্ত দৃষ্টিতে শিরোনামটা নিরীক্ষণ করিতে করিতে তিনি বলিলেন।

"সরমা-নক্ষত্রের অধিবাসীবৃন্দ; তাহাদিগের রীতি-নীতি ও ক্রমোন্নতি-রহস্য"—নির্দ্দেশ-অনুসারে পাঠ করিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"বেশ কথা; তা'তে কি?"

"তা'তে কি!" সগর্ব্বে এল র‍্যামি বলিলেন—"ভ্রাম্যমান আত্মার কাছ থেকে এই যে বিবরণ সংগ্রহ করা হ'য়েছে, এ কি মূল্যবান নয়?"

প্রত্যুত্তর না দিয়া সন্ন্যাসী দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিটার শিরোনামা পড়িলেন—"নেপচুন-গ্রহ; বর্ত্তমান সম্রাট দশম অষ্টলভিয়ানের অধীনে এতন্মধ্যস্থ সহস্রাধিক ভিন্ন জাতির একত্র-বাসের

বিবরণ'—পরে বলিলেন—"বেশ, স্বীকার করা গেল যে অট্টলভিয়ান একজন শাসন-দক্ষ মস্ত লোক!"

এল র‍্যামি অধীর হইয়া উঠিলেন ; বিরক্তিপূর্ণ স্বরে উত্তর করিলেন—"এটা যে উপভোগ্য তা' অবশ্যই আপনাকে স্বীকার কর্‌তে হবে, কেননা, এ বৃত্তান্তকে সঠিক বলে' জানা যেত না, যদি—"

"রোসো, রোসো, অত উত্তেজিত হ'য়ো না"—বাধা দিয়া সন্ন্যাসী বলিলেন—"তুমি নিজেই কি তা'দের সঠিক বলে' জেনেছো ? এস, সত্যবাদী তুমি, স্বীকার কর যে তা' মান্‌তে পারো না ! না, এ বিশ্বাস কিছুতেই তোমার থাক্‌তে পারে না,—বরং, এইটে মীমাংসা করতে না পেরেই তুমি আশ্চর্য্য হও যে, কোথা থেকে সে এমন সমস্ত খবর পান যার সঙ্গে ইহ জগত বা বহিঃ-প্রকৃতির বিন্দুমাত্র সম্পর্ক নেই। অবশ্য, তোমার চেষ্টা-ফল যে উপভোগ, একথা আমি মানি,—আরও মানি যে, তুচ্ছতম তৃণটীর ক্ষয়বৃদ্ধি পর্য্যন্তও উপভোগ্য। তবে কথা এই, যে, তোমার আবিষ্ক্রিয়া এমন-কিছুই নয় যা' আমার কাছে নতুন মনে হ'তে পারে ; কারণ এ-সব জানবার উপায় আমার নিজেরই আছে।" মুহূর্ত্তের জন্য সন্ন্যাসী স্থির দৃষ্টিতে এল র‍্যামির দিকে চাহিলেন, পরে পুনরায় আরম্ভ করিলেন—"তোমার লিলিথ ছাড়া আরও অনেক বিদেহী আত্মা আছে, যারা অনেকগুলি গ্রহ পর্য্যটন করে' ফিরে এসেছে এবং তাদের ভ্রমণকাহিনী বিবৃতও করেছে। আমাদেরই কোনো শাখা-সঙ্ঘে ঐ রকম একটী আত্মার এক বর্ণনা লিপিবদ্ধ আছে, যা'তে মঙ্গল-গ্রহের সঠিক বৃত্তান্ত, তা'র প্রাকৃতিক দৃশ্য, তা'র নগর গ্রাম প্রভৃতি, এমনকি তা'র ব্যক্তি বা জাতিগত বিশেষত্বগুলির বিষয়ও স্পষ্ট বুঝতে পারা যায়। এগুলি হ'চ্ছে আবিষ্ক্রিয়ার আরম্ভ মাত্র,—চাবীর জন্যে আকুলতা মাত্র,—মূল চাবীটা হয়তো পরে এক সময় পাওয়া যাবে।"

"কিসের চাবী ?" এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"নক্ষত্র-রহস্যের না জীবন-রহস্যের ?"

"সমস্ত রহস্যের !" দৃঢ় কণ্ঠে সন্ন্যাসী জানাইলেন—"যা' কিছু আজ জটিল বা অস্পষ্ট মনে হ'চ্ছে, সে সমস্তরই। এম্‌নি সহজে সমস্ত রহস্য আমাদের কাছে প্রকাশ হ'য়ে পড়্‌বে যে আমরা হয়তো আশ্চর্য্য হ'য়ে ভাব্‌বো, এত সহজ বিষয়টা আগে কেন বুঝি নি। আগেই

বলেছি এল র‍্যামি, যে আমি একজন সহমর্ম্মীমাত্র ; ভগবান জানেন, জগতের এই অনর্থক দুঃখদৈন্যের সঙ্গে আমার সহানুভূতি কত গভীর। সেদিন পথে একটী গরীব লোকের সঙ্গে দেখা হ'ল,—তা'র একমাত্র পুত্রটি মারা গিয়েছে। সে বল্‌লে যে কিছুতেই তা'র বিশ্বাস নেই,—বল্‌লে, লোকে যেটা ভগবানের করুণা মনে করে সেটা প্রকৃতপক্ষে নিষ্ঠুরতা। 'কি জন্যে একে কেড়ে নিলে সে ?'—শিশুর শবদেহটী বুকে আঁকড়ে ধ'রে বেচারী ডুকরে কেঁদে উঠ্‌লো —'আমার জীবনের অবলম্বন, আমার নয়নের তারা, আমার এই বুকের ধনটুকু থেকে কি জন্যে আমি বঞ্চিত হলুম ? যদি নিশ্চয় জান্‌তে পারা যেত যে পরলোকে আবার আমার বাছাকে জীবন্ত দেখ্‌তে পাবো, তা' হ'লে আর দুঃখু কি ছিল ? সেক্ষেত্রে, ভগবানের করুণায় বিশ্বাস আস্‌তো—হয়তো ভাল হবারও চেষ্টা করতুম্। কিন্তু তা' কৈ জান্‌তে পারি ?—না, তা' পারিনে ; পারিনে বলেই বুক ফেটে যায়। ভগবান যদি থাক্‌বেন, তবে এ-বিষয়ে আমাদের নিশ্চিন্ত আশ্বাস দিয়ে কেন তিনি সুখী কর্‌বেন না !'...বস্তুতঃ, তা'র সেদিনকার সেই কান্না আমার বুকে খুবই বেজেছিল। তবু, চাবী যে একদিন পাওয়া যাবেই এ-সম্বন্ধে আমি নিশ্চিন্ত,—তা' ছাড়া আমার বিশ্বাস যে, সে-চাবী আমাদের হাতের কাছেই আছে ; আমরা তারই কাছে কাছে ঘুর্‌ছি—হঠাৎ একদিন তা' হাতে ঠেকে যাবে।"

"খাসা !—কিন্তু যে সব কোটী কোটী প্রাণী অতীত যুগে কোনোরকম রহস্য-সন্ধান না পেয়ে অতৃপ্ত প্রাণে মর্ত্ত্য ছেড়ে গেছে, তাদের জন্যে দায়ী কে ?"—এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"প্রকৃতি আপন নিয়ম প্রকাশ কর্‌তে সময় নেয়,"—সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"আর সে সময় আমাদের কাছে সময় ব'লে গণ্য হ'লেও প্রকৃতির কাছে নিতান্তই নগণ্য। প্রকৃতির গণনা-প্রণালী যে কি রকম তা' আমাদের প্রামাণ্য বৈজ্ঞানিক তথ্যটা থেকেই মোটামুটি বোঝা যায়,—দৃষ্টান্তস্বরূপ, যে ধূমকেতুটা ১৭৬৪ সালে দেখা গিয়েছিল তা'রই কথাই ধরা যাক্। গণিতবেত্তাদের সূক্ষ্ম হিসাবে স্থির হ'য়েছে যে এই উজ্জ্বল জগতটা (কারণ ধূমকেতুও একটা জগত), আপন কক্ষে একবার আবর্ত্তন কর্‌তে ১২২—৬৮৩ বৎসর নেয় ! অথচ, প্রকৃতি কি ঈশ্বরের দিক থেকে তুচ্ছ একটা ধূমকেতুর আবর্ত্তন-কাল কালের মধ্যেই নয় !"

এল র‍্যামি ঈষৎ শিহরিয়া উঠিলেন।

"মোটের ওপর, এই অনন্ত ব্যাপ্তি কি অসীম কালের চিন্তাটা পর্য্যন্ত ভয়ঙ্কর ! শূন্যদৃষ্টিতে চাহিয়া তিনি বলিলেন—"কারণ, ২২--৬৮৩ বছরের মধ্যে আমরা দেহত্যাগ করে' নিরুদ্দেশই হয়ে যাই।"

"নিরুদ্দেশ হই, না উদ্দেশ্যের বুকের ওপর গিয়ে পড়ি ?" কোমলস্বরে সন্ন্যাসী জিজ্ঞাসা করিলেন—"কারণ, উদ্দেশ্য একটা আছেই—এবং আজই হোক কি কালই হোক্, আমরা তা' জানতে বাধ্য ; নইলে সৃষ্টিটা অতি দীন অতি আনাড়ীর কাজ হ'য়ে দাঁড়ায়।"

"আমরা যদি জানতে বাধ্য হই"—এল র‍্যামি বলিলেন—"তা' হ'লে প্রাণীমাত্রেই তা' জানতে বাধ্য, কেননা অত্যাচারের পীড়ন কারুর বরাতেই কম নয়। তুচ্ছতম অনুপরমাণুটীও তা' হ'লে ঐ উদ্দেশ্য জানবার অধিকার রাখে—কুকুর, বেড়াল, পাখী, মানুষ ; এমন কি ফুলগুলো পর্য্যন্ত এ রহস্যের অর্থ জানতে অধিকারী।"

"যদি ফুলেরা আগেই না জেনে থাকে !" সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"যা' নাকি খুবই সম্ভব !"

"আপনার যেরকম চিন্তাপ্রণালী, তা'তে সবই তো 'সম্ভব'—" অধীর কণ্ঠে এল র‍্যামি উত্তর করিলেন। "অধিকমাত্রায় যদি কেউ কল্পনাপটু হয়, তা' হ'লে এমনও দেখা বিচিত্র নয় যে রাতদুপুরে আকাশের গায়ে মই লাগিয়ে পরীর ঝাঁক তা'তে ওঠানামা ক'রছে। কিন্তু যাক্,—এ পাণ্ডুলিপি দুটো তা' হলে আপনার দরকার নেই ?"

"না, নিজের কোনো দরকার নেই," অতিথি উত্তর করিলেন—"তবে যদি তুমি ইচ্ছে কর, তা' হলে অবশ্য আমার দায়িত্বে ওদের নিরাপদে রেখে দিতে পারি,—কেননা, তুচ্ছ আবিষ্ক্রিয়াও অনেক সময় সাহায্যপ্রদ হয়ে থাকে। ভালকথা, বৈজ্ঞানিক আবিষ্ক্রিয়ার কথায় ক্রেমলীনের কথা মনে এলো ; মাস দুয়েক আগে তা'র একখানা চিঠি পেয়েছিলাম। আমার আশঙ্কা হ'চ্ছে যে সেই চুম্বক-চক্রটাই তা'র ধ্বংসের কারণ হবে।"

"একরকম একটা সুসংবাদে অবশ্যই তিনি খুব খুসী হবেন !"—

ব্যঙ্গভরে এল র‍্যামি উত্তর করিলেন।

"খুসীর কথা হ'চ্ছে না। স্বেচ্ছায় যদি কেউ বিপদের মুখে এগিয়ে যায় তা'হ'লে বিপদ অবশ্যই তা'র জন্যে পথ ছেড়ে সরে দাঁড়াবে না। আমি বরাবর ক্রেমলীনকে জানিয়ে

এসেছি যে তা'র প্রস্তাবিত প্রণালীটা যথেষ্ট নিরাপদ নয়,—এমনকি, ১৫ বছর আগে, আমার মুখে বিশেষ কোনো প্রস্তরের অত্যদ্ভুত আলোক-প্রতিফলন-শক্তির কথা শুনে যখন সে আফ্রিকায় গিয়েছিল, তখনও তা'কে ঐ একই কথা বলেছিলাম। সে যাই হোক, দীর্ঘ অধ্যবসায়ের ফলে সে যে তা'র সংকল্পিত প্রহেলিকাটা প্রায় পরিষ্কার করে' আনবার যোগাড় করেছে, তা' স্বীকার করতেই হবে। এবার যখন তুমি তার সঙ্গে দেখা করতে যাবে, তা'কে ব'ল' যে, সেই থালাখানার পিঠে যেটা তৃতীয় রশ্মি সেইটাই হ'চ্ছে মঙ্গল-গ্রহের; যদি (—মনে রেখো' এ 'যদি' বেশ একটু শক্ত 'যদি,'—) ঐ রশ্মির গতি অনুসরণ করা তা'র পক্ষে সম্ভব হয় তবেই উক্ত গ্রহের সঙ্কেত অনুসরণ করা হবে। অবশ্য সে সঙ্কেতের অর্থ বুঝতে পারা না পারার কথা স্বতন্ত্র--তবে অন্য সমস্ত আলোকতরঙ্গ থেকে সহজেই ঐ বিশেষরশ্মিটা এই উপায়ে সে বেছে নিতে পারবে।"

"ভাসমান সহস্র-রশ্মির ভেতর থেকে কোন্‌টা যে তৃতীয় রশ্মি তা' কেমন করে বলা যাবে?" এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

"বলা অবশ্যই শক্ত, তবে চেষ্টা করা যেতে পারে,"—সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"প্রথমতঃ, বেশ পুরু একখানা কালো চাদর দিয়ে থালাখানা আবৃত করে নিতে হবে; পরে যখন সেটা আকাশ-কেন্দ্রের ঠিক মুখোমুখী হ'য়ে আসবে, সেইসময় থালার পিঠে বেশ সতর্ক দৃষ্টি রেখে আবরণখানা ঝট্ করে' খুলে ফেলতে হবে। এক মিনিটের মধ্যেই তিনটে রশ্মি-তরঙ্গ পর পর দেখা দেবে,—ঐ তৃতীয়টাই হ'চ্ছে মঙ্গল-গ্রহের। ঐ তৃতীয় রশ্মিটার গতি-অনুসরণ চেষ্টা করলে বিশেষ কিছু বুঝতে পারা খুবই সম্ভব। অবশ্য, যদি কিছু সাহায্য হয় এই ভেবেই আমি এ পরামর্শ দিচ্ছি—কারণ তা'র অক্লান্ত উদ্যম করুণ হ'লেও বিস্ময়কর সন্দেহ নেই। কিন্তু, এ-চেষ্টা থেকে নিবৃত্ত হ'লেই সে সব-চেয়ে ভাল করতো। অথবা,—কে জানে!—বিধিনির্দ্দিষ্ট সমাপ্তিই হয়তো এক্ষেত্রে মঙ্গলময়!"

"এ সমাপ্তি যে কি, তা' আপনি জানেন বোধ হয়?"—এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রশ্নকর্ত্তার সন্দিগ্ধ দৃষ্টির দিকে প্রশান্তনয়নে চাহিয়া সন্ন্যাসী উত্তর করিলেন—"জানি,—যা'রা আমার জীবন বা কার্য্যাবলীর সম্পর্কে এসেছে বা ছিল তা'দের যেমন জানি, নিজের

যেমন জানি, কিম্বা তোমার যেমন জানি, ঠিক তেমনিই এ সমাপ্তির (অথবা আরম্ভের) কথাও জানি।"

"কিন্তু কেমন করে' তা' জানবেন ?" তিক্তকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিয়া উঠিলেন—"যা' ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত, তা'র কথা কে নিশ্চয় করে' আপনাকে বল্‌তে পারে ?"

"ছবি যেমন আগে থেকেই চিত্রকরের কল্পনায় ফুল্‌তে থাকে"--সন্ন্যাসী বলিলেন—"তেমনি ব্যক্তিগত জীবনের প্রত্যেকটী দৃশ্য, আকাশে, বাতাসে আলোকে ও বর্ণে ভাস্‌তে থাকে। এর কারণ বলা অসম্ভব, যেহেতু নর-ভাষা তা' প্রকাশে অক্ষম। কেউ কেউ সেটা স্পষ্ট 'দেখ্‌তে' পায়—আর, 'দেখ্‌তে' পেলে স্বেচ্ছায় কেউ অন্ধ হ'তে চায় না।" সন্ন্যাসী থামিলেন,—পরে বলিলেন—"দৃষ্টান্তস্বরূপ, আমি এই ঘরটাকে যেরকম দেখছি, তুমিও যদি সেইরকম দেখ্‌তে পেতে এল র‍্যামি !"

অর্দ্ধবিস্ময়ে অর্দ্ধ-অবজ্ঞায় বক্তার দিকে চাহিয়া এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তা' কি আমি পাচ্ছিনে ?"

সন্ন্যাসী আপন বাম বাহুখানি প্রসারিত করিয়া ধরিলেন।

"প্রথমতঃ বল দেখি.—আমার এই হাতখানা আর তোমার শরীরের মাঝখানের ফাঁকে কিছু দেখ্‌তে পাচ্ছ কি ?

এল র‍্যামি মাথা নাড়িলেন—"কিছুই না !"

শুনিয়া, সন্ন্যাসী উর্দ্ধদৃষ্টিতে চাহিলেন, এবং উদাত্ত-গম্ভীর স্বরে, কম্পিত উচ্চারণে বলিলেন—

"হে জগদীশ্বর—যাঁর চিন্তাই সৃষ্টি এবং সৃষ্টিই চিন্তা,—মুহূর্ত্তের জন্য একবার আপনার এই সৃষ্ট জীবটীর দৃষ্টি-সম্মুখ থেকে জড়ত্বের কৃষ্ণ-যবনিকা অপসারিত করুন ; একবার—একটীবার মাত্র, তা'কে এমন অধিকার দান করুন, যা'তে নর-নয়নেই সে আপনার অমর-দূতকে দেখ্‌তে পায় !"

উদ্ধৃত বাক্যগুলি উচ্চারিত হইবামাত্র এলর‍্যামির বোধ হইল, যেন সেই কক্ষের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত একটা চকিত বিজলী-ঝলক চক্ষু ধাঁধিয়া দিয়া গেল। কিংকর্ত্তব্য

বিমূঢ়বৎ তিনি নয়নদ্বয় হস্তাবৃত করিলেন,—পরক্ষণেই হাত সরাইয়া আবার চাহিলেন,—এবং যাহা দেখিলেন, তাহাতে একেবারে নির্ব্বাক্, নিশ্চল, স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাঁহার চক্ষের সম্মুখে অতি স্পষ্ট এক অপূর্ব্ব মূর্ত্তি,—সাদৃশ্য অনেকটা মানবীয়, অথচ সাদৃশ্য-শূন্যতাও প্রচুর, বর্ণহিল্লোলাবরঞ্জিত এক অপরূপ আকার, যাহার চতুর্দ্দিকে কনকজ্যোতিঃ ও সন্ধ্যারক্ত রাগ, গোলাপ-কান্তি ও নীলিমা-দীপ্তি রেখায়-রেখায় তরঙ্গায়িত! এই মানববিস্ময় মূর্ত্তিখানি অটল-মহিমায় এলর‍্যামি ও সন্ন্যাসীর মধ্যস্থলে দণ্ডায়মান,—তাঁহার জ্যোতির্ম্ময় বাহুদুটী যেন উভয়কে পরস্পরের নিকট হইতে তফাৎ রাখিবার অভিপ্রায়েই উভয়ের দিকে প্রসারিত,—স্নিগ্ধজ্যোতিঃ দুখানি নয়নে, একটা সাগ্রহ সতর্কতা সপ্রকাশ এবং সর্ব্বাঙ্গে অসীম ধৈর্য্যের অক্লান্ত মহিমা! অপরিমেয় শক্তি ও সৌন্দর্য্যের আধার ঐ মূর্ত্তিখানি আপনার আলোকিত আবির্ভাবে উভয়ের মাঝখানে অকম্পিত-চরণে অবস্থিত,—দুইটী দর্শকের দৃষ্টি তাঁহার উপর নিবদ্ধ,—একজনের দৃষ্টি নির্ভীক, শ্রদ্ধানত অথচ অভ্রান্ত, কিন্তু অপরের দৃষ্টি বিস্মিত, ভীত ও হতবুদ্ধির পরিচায়ক। আর এক মুহূর্ত্ত,—এলর‍্যামি প্রাণপণ চেষ্টায় কথা কহিবার উদ্যোগ করিলেন, কিন্তু অবকাশ পাইবার পূর্ব্বেই উক্ত জ্যোতিঃশরীর আলোক-মুকুট-শোভিতশিরে তাঁহার দিকে স্থির-নয়নে চাহিলেন। সে অপূর্ব্ব দৃষ্টিবল এলর‍্যামিকে নির্ব্বাক করিয়া দিল—সর্ব্বাঙ্গে শৈথিল্য অনুভব করাইল; সেই সরল, পবিত্রোজ্জ্বল, নয়ন-দ্যুতিতলে তিনি শিহরিয়া উঠিলেন,—শ্বাসরুদ্ধপ্রায় হইয়া পড়িলেন,—আপন অজ্ঞাত-সারে কৃতাঞ্জলিপুট হইলেন এবং কতক ভয়ে কতক হতাশায়, তন্দ্রা-চালিত ভক্তের মত নতজানু হইয়া বসিলেন!—সহসা একটা মৃত্যু-তিমির-প্রগাঢ় শৈত্যানুভূতি যেন তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিতে লাগিল—তাঁহার চেতনা তিরোহিত হইল,—অতীত ও বর্ত্তমান তাঁহার স্মৃতি-সমুদ্রে নিরুদ্দেশ হইয়া গেল।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ।

যখন জ্ঞান হইল, সে সময় বেশ বেলা হইয়া গিয়াছে। প্রথমেই এলর‍্যামি বুঝিতে পারিলেন যে তাঁহার মস্তক একজনের উরুদেশের উপর রক্ষিত এবং চোখে মুখে ঠাণ্ডা জলের ঝাপটা প্রদত্ত হইতেছে। কিন্তু কে এ কার্য্য করিতেছে? ফেরাজ কি?—হ্যাঁ নিশ্চয়ই

ফেরাজ! ধীরে ধীরে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া বিস্মিত দৃষ্টিতে তিনি তাহার দিকে চাহিলেন এবং উঠিবার চেষ্টা করিলেন।

"ব্যাপার কি?" ক্ষীণস্বরে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"এ সব কেন? আমি তো সুস্থই আছি! নয় কি?"

"নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই!" ভ্রাতাকে কথা কহিতে দেখিয়া প্রফুল্ল ফেরাজ সাগ্রহে বলিয়া উঠিল—"সুস্থ বৈকি,—তবে তুমি মূর্চ্ছিত হ'য়ে পড়েছিলে। এইখানে অচেতন অবস্থায় পড়ে আছ দেখে আমার বড়ই ভয় হয়েছিল—"

ভ্রাতার স্কন্ধে ভর দিয়া এলরামি কষ্টে উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ক্ষীণস্বরে বলিলেন—"অচেতন! আশ্চর্য্য তো!—অতিরিক্ত পরিশ্রমে কতকটা দুর্ব্বল হয়ে পড়েছিলাম বটে,—কিন্তু অচেতন! যাই হোক্, তিনি কোথায়?"

"কে? গুরুদেব?—ভয়ার্ত্তের মত মৃদু উচ্চারণে ফেরাজ বলিল—"তিনি চলে গিয়েছেন, আর কোনো পাত্তাই নেই; কেবল ঐ শিলমোহর করা খামখানা টেবিলের ওপর পড়ে আছে।"

"কৈ?" তাড়াতাড়ি ফেরাজের হস্ত ত্যাগ করিয়া, উদ্দিষ্ট খামখানি লইবার জন্য তিনি টেবিলের দিকে অগ্রসর হইলেন এবং পাইবামাত্রই তাহা খুলিয়া ফেলিলেন,—তাহাতে একটীমাত্র পংক্তি ছিল—"সাবধান, পরিণাম আসন্ন! প্রেমের মধ্যে দিয়ে অবিলম্বেই লিলিথের মুক্তি আসছে।"

আর কোনো কথা নয়। বারংবার তিনি উহা পাঠ করিলেন,—পরে একটী দেশালাই-এর কাঠি ধরাইয়া কাগজখানিতে অগ্নিসংযোগ করিলেন। পরক্ষণেই কক্ষমধ্যে চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া এলোরামি বুঝিলেন যে, নেপচুন ও সরমা নক্ষত্র সম্বন্ধীয় পাণ্ডুলিপিদ্বয় তিনি লইয়া গিয়াছেন। অতঃপর ভ্রাতার দিকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

"কতক্ষণ গিয়েছেন তিনি? সদর দোরখানা কি দেওয়ার শব্দ পাওনি?"

ফেরাজ অধীরভাবে বলিল—"না; আমি বড্ড ঘুমিয়ে ছিলাম। কিন্তু ঘুমের ঘোরে হঠাৎ একসময় মনে হলো, কে যেন আমার গায়ে হাত দিলে—অমনি ঘুম ভেঙে গেল।

দেখ্‌লাম, খুব রোদ্দুর উঠে গিয়েছে, আর কে দূরে 'ফেরাজ' 'ফেরাজ' বলে ডাক্‌ছে। ভাব্‌লাম, সে তোমারই স্বর—তাই এই ঘরে ছুটে এলাম। কিন্তু তোমাকে ঐরকম অবস্থায় দেখে, সে যে কি ভয়ই হ'লো,—উঃ এখনও মনে কর্‌লে গা শিউরে ওঠে,—ভাব্‌লাম, বুঝিবা আর তোমায় ফিরে পাবো না!"

সস্নেহে ভ্রাতার দিকে চাহিয়া এল র‍্যামি মৃদুহাস্য-সহ বলিলেন—"যদি তাই হ'ত, তাতেই বা ভয় কিসের ভাই? মৃত্যু,—সে তো জীব-মাত্রেরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ। পরকালের অস্তিত্ব যদি অস্বীকারও করা যায়, তা' হ'লেও বল্‌তে হবে যে মৃত্যু একটা সমাপ্তি,—দুঃখের, দুর্ভাবনার, অনন্ত অনিশ্চয়তার সমাপ্তি। এত আরামের আর কি কিছু হ'তে পারে?—আমার সন্দেহ আছে।"

একটী দীর্ঘ-নিঃশ্বাস ত্যাগ করিয়া তিনি চেয়ারের উপর বসিয়া পড়িলেন। ফেরাজ দূরে দাঁড়াইয়া ক্ষণকাল উৎসুকনেত্রে তাঁহার দিকে চাহিয়া রহিল; পরে বলিল—

"আমিও ঠিক এই কথাই ভাবি এল র‍্যামি! আমারও মনে হয় যে, ঐ সমাপ্তি, যা'কে পৃথিবীশুদ্ধ লোক এত ভয় করে, ঐ সমাপ্তিই হয়তো সর্ব্বোত্তম। তবে, আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি এত বলে যে, জীবনও সুখ-ভোগ্য কিছু; চাই কেবল, সেই ভোগের উপযোগী হ'তে শিক্ষা করা।"

"সেটা যৌবন-স্বপ্ন, ফেরাজ, যৌবন-স্বপ্ন!" অবজ্ঞাভরে এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"উচ্ছৃঙ্খল ঘোড়াগুলো মনে ভাবে যে, জগতের যত মাঠ, সে কেবল তা'দের দৌড়াদৌড়ি করবার জন্যেই তৈরি;—এই শ্রেণীর কতকগুলো নির্ব্বোধ লোক, যা'দের সঙ্গে আজ তুমি সম-অবস্থাপন্ন, তা'রাও ঐ জাতীয় একটা মোহ জীবনকে সুখভোগ্য মনে করে। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, এ মোহ কেটে যাবে,—এ প্রভাত-স্বপ্ন মিলিয়ে যাবে। বয়সের সঙ্গে সঙ্গে যতই জ্ঞানবৃদ্ধি হবে, ততই বুঝ্‌বে যে জীবন দুঃখময়; আমি,—তোমার বড় ভাই—আমিই এ সত্যের একটী চমৎকার দৃষ্টান্ত।"

"তোমার বয়স এমন কিছু বেশী নয়"—ফেরাজ বলিয়া উঠিল—"তবে তুমি যে সর্ব্বদাই বিষণ্ণ তা' ঠিক। তুমি পরিশ্রম কর বড্ড বেশী। কাল রাত্রে বোধ হয় একটুও ঘুমোওনি? এখন একটু ঘুমুলে হ'ত না?

"না—এখন কিছু খেতে চাই"—প্রফুল্লতার ভাণ করিয়া এল র্যামি বলিলেন—"এক পিয়ালা 'সুবর্ণ-সুরভি' চা হ'চ্চে জীবনের পক্ষে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আশীর্ব্বাদ,—আর এ চা, তোমার চেয়ে ভাল করে' তৈরি করতেও কেউ পারে না। যাও ভাই, এখন তারই ব্যবস্থা কর; তা' হ'লেই আমি সম্পূর্ণ সুস্থ হ'য়ে উঠ্‌বো।"

ঈপ্সিত 'আশীর্ব্বাদের' ব্যবস্থা করিবার জন্য ফেরাজ অবিলম্বেই কক্ষত্যাগ করিল; এবং এল র্যামি গভীর চিন্তামগ্ন অবস্থায় কিয়ৎকাল স্থিরভাবে বসিয়া রহিলেন। গতরাত্রের সেই অলৌকিক মূর্ত্তিখানি কি সহসা তাঁহার পার্শ্বে কোথাও দাঁড়াইয়া আছে? এল র্যামি উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং ঐ কাল্পনিক সংস্কারটাকে সজোরে ঝাড়িয়া ফেলিয়া কক্ষমধ্যে পাদ-চারণা আরম্ভ করিলেন।

"কি নির্ব্বোধ আমি!" অর্দ্ধস্বগতস্বরে তিনি বলিতে লাগিলেন—"সর্ব্বসাধারণের চক্ষু যখন প্রতারিত হয়, তখন আমার চক্ষু কি একটীবারের জন্যও প্রতারিত হ'তে পারে না! স্বীকার করি, সেরূপ অপূর্ব্ব, অলৌকিক, স্বর্গীয়; কিন্তু এ 'তাঁরই' সৃষ্টি—সন্ন্যাসী নিজেই হয়তো ইন্দ্রজাল-রচনায় স্বয়ং 'মোজেসের' মতই পারদর্শী,—ইচ্ছা করলে, তিনিও হয়তো আর একটা 'সিনাই' পর্ব্বতকে বজ্রদীর্ণ করে ফেল্‌তে পারেন। বাস্তবিকই—মানুষ যে কি না কর্ত্তে পারে তা' তো বুঝিনে! তবে বিস্ময়ের বিষয় এই যে, আমার মত একজন শক্তিশালীও তাঁর প্রভাবে হতবল হ'য়ে পড়েছিল। দ্বিতীয় বিস্ময়-কারণ—(অবশ্য যদি যথার্থ হয়) যে, লিলিথের সূক্ষ্মশরীর তিনি দেখ্‌তে পেয়েছিলেন।"

সহসা তিনি দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং শূন্য-নিবদ্ধ-দৃষ্টিতে আপনাআপনিই বলিতে লাগিলেন—"লিলিথের আত্মা" তিনি 'দেখ্‌তে' পেয়েছিলেন?... ..তা' যদি হয়,—তা' যদি সম্ভব হয়,—তবে আমিও অবশ্যই তা' দেখ্‌বো; সে-চেষ্টায় যদি মর্‌তে হয়, তা'তেও স্বীকার। আত্মাকে দেখা,—তা'র আকৃতি নিরীক্ষণ করা,—তা'র গঠন-প্রণালী পর্য্যবেক্ষণ করা—এই-ই তো 'প্রমাণ'। দৃষ্টি ভ্রান্ত হ'তে পারে, জানি,—আমরা যখন কোনো নক্ষত্রকে দেখি (অথবা দেখ্‌ছি বলে' মনে করি) তখন এমনও হ'তে পারে যে, সেই নক্ষত্র প্রকৃতপক্ষে ত্রিশহাজার বছর আগে অদৃশ্য হয়েই গিয়েছে; কারণ আমাদের কাছে তা'র রশ্মি পৌঁছিতেই

ত্রিশহাজার বছর আগে ;—সমস্তই ঠিক, স্বীকার করি—কিন্তু যাতে সে রকম প্রতারিত হ'তে না হয়, তারও তো উপায় আছে।"

সহসা তাঁহার চিন্তাস্রোত এক নূতনতর পথে প্রবাহিত হইল : এমন কতকগুলি দুঃসাহসিক কল্পনা তাঁহার মস্তিষ্কের মধ্যে জাগিয়া উঠিল যাহা পূর্ব্বে কখনও তিনি ভাবেন নাই ; প্রাতরাশ লইয়া ফেরাজ প্রবেশ করিবামাত্র তিনি সেগুলির সদ্ব্যবহার আরম্ভ করিলেন এবং চায়ের পিয়ালায় চুমুক দিতে দিতে বলিলেন—"তোমার কথাই ঠিক ফেরাজ ; জীবনকে অবশ্যই উপভোগ্য করে' তোলা যায়। তবে এর মধ্যে থেকে আনন্দ পাবার একমাত্র উপায় হচ্ছে সদাসর্ব্বদা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকা।"

ফেরাজ উত্তর করিল না। এল র‍্যামি সপ্রশ্নদৃষ্টিতে তাহার দিকে চাহিয়া বলিলেন—"কথা কইছ না যে! মতটা পছন্দ হ'ল না ?"

"না ঠিক নয়"—ললাট ও কপোল হইতে কেশগুচ্ছগুলি অপসারিত করিয়া ঈষৎ ক্ষুব্ধ ভঙ্গীতে ফেরাজ উত্তর করিল—"সব জিনিষেরই মত কাজও ক্রমাগত করলে একঘেয়ে হ'য়ে পড়ে, বিরক্তিকর হ'য়ে দাঁড়ায়। সেক্ষেত্রে কাজের সহায় না হ'য়ে অনেক সময় আমরা কাজের বিঘ্ন হয়েই দাঁড়াই। অধিকন্তু, প্রকৃতির দিক থেকে নূতন নূতন ভাব গ্রহণ করবার অবসরও সেক্ষেত্রে পাওয়া যায় না, কাজেই আমাদের শক্তি সীমাবদ্ধ হ'য়ে আসে। আমার মনে হয় যে, মস্তিষ্ককে যদি শুধু স্থির আর আলোক শোষণের উপযোগী রাখা যায় তা'হ'লেই অনেক শিখ্‌তে পারা যায়।"

"আলোক-শোষণ ?" বিস্মিত-কৌতূহলে এল র‍্যামি জিজ্ঞাসা করিলেন—"তার মানে কি ?"

"মানেটা ঠিক বোঝানো শক্ত"—ইতস্ততঃ করিয়া ফেরাজ বলিল—"তবে যা' বল্‌তে চেষ্টা করছি তা'র মধ্যে যে সত্য আছে একথা ঠিক। দেখ্‌তে পাওয়া যায় যে প্রত্যেক জিনিষই কিছু না কিছু শোষণ করে ; তুমিও অবশ্য স্বীকার করবে যে মস্তিষ্কও 'ধারণা' বলে একটা কিছু শোষণ করে ?"

"অবশ্যই তা' করি,—কিন্তু 'ধারণা' আলোক নয়।"

"সত্যিই কি নয়? আলোকের ফলও কি নয়? ফটোগ্রাফি জিনিষটা কি তা' হ'লে? যাই হোক্, দৃশ্যমান পারিপার্শ্বিক থেকে যে 'ধারণা' আসে তা'দের কথাই আমি বলছিনে। জ্ঞানানুশীলন থেকে মস্তিষ্ককে যদি মুক্তি দেওয়া যায়,—বহির্জাগতিক চিন্তার প্রভাব ঝেড়ে ফেলে দিয়ে ব্যক্তিগত চিন্তার বিরুদ্ধে মনকে যদি দৃঢ় করা যায়—তা হ'লে মস্তিষ্কে এমন সমস্ত ধারণা সঞ্চিত হবে যা' কিয়ৎ পরিমাণে নতুন এবং যার সঙ্গে তোমার সম্পর্ক খুবই অল্প। এটা আশ্চর্য, কিন্তু এই রকমই হয়। স্বভাবতই তুমি সে-ক্ষেত্রে ঐ সব ধারণা-অনুগত হয়ে পড়্‌বে এবং হয় তো ঠিকই কর্‌তে পারবো না যে, কোথা থেকে সে সব ধারণা আসে। এখন আমি বল্‌তে চাই যে, সেটা আলোকের ক্রিয়া। দূরতম তারকা থেকে আমাদের স্বপ্ন-সীমায় আস্‌বার আগে, আলোক কত যুগ-যুগান্তর কাটিয়ে দেয়, কিন্তু তা' সত্ত্বেও অবশেষে আমরা তা' দেখ্‌তে পাই; তা' যদি হয়, তবে ভগবৎ-প্রেরণা কি নক্ষত্র-রাশির চেয়ে আরও দ্রুততর-বেগে, ঠিক ঐ রকমই নিশব্দে, মানব-মস্তিষ্কে এসে পৌঁছয় না? বস্তুতঃ এই চিন্তাটা প্রায়ই আমাকে চকিত করে' তোলে। মানুষে যখন মানুষের মধ্যে ধারণা-সঞ্চারিত কর্‌তে পারে, এমন কি সেগুলোকে মনের সঙ্গে মিশিয়ে দিয়ে তা' থেকে কার্য্য পর্য্যন্ত সৃষ্টি কর্‌তে পারে—তা' হ'লে কেমন করে' অস্বীকার করি যে ভগবানেরও এ-শক্তি থাকতে পারে? তবেই ধর,—সঙ্গীতের সর্ব্বপ্রথম ঝঙ্কার যে স্বর্গের বীণা থেকেই উঠেছিল, তারপর অনন্ত ব্যাপ্তি-পথে অজস্র-ধারায় গড়িয়ে গিয়ে পার্থিব গায়কের মস্তিষ্কে দূরাগত প্রতিধ্বনিতে বেজে উঠেছে এবং তা'রই ফলে সে তা'কে আকার বা ভাষা দিয়েছে—এমনও তো হ'তে পারে! হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তাই,—অন্ততঃ এই রকম করে' ভাব্‌তেই আমি ভালবাসি!—এই চিন্তাই আমার আনন্দ যে কিছুই প্রকৃতপক্ষে আমাদের গড়া নয়; কি কবিতা, কি সঙ্গীত, কি চিত্রকলা;—তা'দের সমস্ত বর্ণ, সৌন্দর্য্য, ও গরিমাই সেই চিরন্তন গৌরবের সুদূর প্রেরণার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি, যে গৌরব আমাদের ভবিষ্যৎ জ্যোতির্ম্ময় করে রেখেছে!"

ভাবোন্মত্ত কবির মত দীপ্তচক্ষে, ফেরাজ উঠিয়া দাঁড়াইল এবং উত্তেজিতভাবে কক্ষমধ্যে পাদচারণা আরম্ভ করিল। এল র‍্যামি নিঃশব্দে তাহার গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিলেন।

"এল রামি, তোমার কোনো ধারণাই নেই যে, যে-দেশকে আমি আমার জন্মনক্ষত্র বলে' পরিচয় দেই, সে দেশ কি আশ্চর্য্য, কি আনন্দময়! তোমার বিশ্বাসে যে ওটা স্বপ্ন, এবং সে-স্বপ্ন তোমার মন্ত্রশক্তির প্রভাবেই জন্মেছে; জানি, কতকপরিমাণে তা' সত্যি,—কিন্তু যখন আমি একলাটী থাকি, সম্পূর্ণ একলা, তুমি যখন আমার কাছে থাক না, তোমার প্রভাব পর্য্যন্ত যখন আমাকে স্পর্শ করে না,—সেই সময়ই সে দেশের ছবি আমার চোখে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, সেই সময়ই আমি সেখানকার গান শুন্‌তে পাই! তখন মস্তিষ্ককে যথাসম্ভব স্থির রাখি,—সমস্ত চিন্তাকে দূরে ঠেলে ফেলি,—সহসা আমার মন দেখ্‌তে দেখ্‌তে আনন্দে ভরে' ওঠে,—মেঘের মত সমস্ত পৃথিবীটা কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে যায়,—দেখি, যে একেবারেই জন্মভূমির কোলে গিয়ে পড়েছি। আহা, কি সুন্দর সে দেশ!—সুপ্রসারিত কানন-ভূমি, শ্যামছায়াময়, রজত-নির্ঝর-ধারায় চির-গীতি-মুখর,—যতক্ষণ থাকি, ঐখানটীতেই ঘুরে ঘুরে বেড়াই। ঘুর্‌তে, ঘুর্‌তে, ঘুর্‌তে, ঘুর্‌তে, কত তৃণভূমি কত কুসুমিত কুঞ্জবীথি পার হ'য়ে যাই। এ সমস্তই আমার পরিচিত মনে হয়,—মনে মনে অনুভব করি যে এই দেশই আমার চিরদিনের,—বুঝি যে এইখানেই আমার ঘর আছে,—কিন্তু সে ঘরে পৌঁছুতে পারিনে। কারণ কি তা' বল্‌তে পারিনে, কিন্তু কোনোমতেই সে আবাসে প্রবেশ কর্‌তে পারিনে। সেদিন যখন ঐ রকম ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম ছুটী পুষ্পবিভূষিতা কুমারীর সঙ্গে দেখা হল—আমাকে দেখে তারা থম্‌কে দাঁড়ালো; পরে স্নিগ্ধ অথচ সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে একজন অপরকে বল্‌লে—"দেখ্ দেখ্, আমাদের প্রিয়তম ফিরে এসেছে!" ...অপর কুমারীটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে উত্তর কর্‌লে—"হোক্, আজও তাঁর নির্ব্বাসন-কাল শেষ হয় নি, কাজেই আমাদের সঙ্গে থাক্‌তে পার্‌বেন না'। এই কথা বলেই তারা নত মুখে আমাকে পাশ কাটিয়ে গেল; ফিরে আস্‌বার জন্যে যেই ডাক্‌তে যাচ্ছি, অমনি আমার ঘুম ভেঙে গেল,—দেখলাম, এই নিরানন্দ জগতখানার এককোণে আবদ্ধ হয়ে পড়ে আছি।"

এল রামি আগ্রহের সহিত ভ্রাতার কাহিনী শুনিতেছিলেন; এক্ষণে ধীরকণ্ঠে বলিলেন, "তোমার ধারণা যে খুবই বিচিত্র, একথা আমি অস্বীকার করিনে ফেরাজ,—"

"খুবই বিচিত্র ?......হ্যাঁ !" ফেরাজ বলিল—"কিন্তু খুবই সত্যি !"

একটু থামিয়া সহসা সে ভ্রাতার সন্নিকটে অগ্রসর হইয়া আসিল ; পরে তাঁহার স্কন্ধে হস্তার্পণ করিয়া জিজ্ঞাসা করিল—"তুমি কি বল্‌তে চাও যে এত বেশী পড়াশুনা করে, এত জ্ঞানলাভ করে, তবুও আমার বর্ণনানুরূপ ধারণা সমূহের পরিচয় লাভ করনি ?"

একটা ক্ষীণতম লজ্জা-রক্তিমা এল র‍্যামির গণ্ডযুগলে তরঙ্গ তুলিয়া গেল।

"কতকগুলো অনুভূতি অবশ্য সময়ে সময়ে আমার মধ্যে সাড়া দেয়"----অন্যমনস্কভাবে এল র‍্যামি বলিলেন---"তা' ছাড়া, এমন দিনও আমার জীবনে এসেছিল যে সময় অসম্ভবের স্বপ্নও দেখা দিয়েছিল ; কিন্তু আমার মেজাজ খুবই ঠাণ্ডা ফেরাজ,---সে সমস্ত চিন্তাকে যুক্তিবলে উড়িয়ে দেওয়া আমার পক্ষে শক্ত হয়নি।"

"তা' যদি বল, তবে সমস্ত পৃথিবীটাকেই তো যুক্তিবলে উড়িয়ে দেওয়া যায়,"—ফেরাজ উত্তর করিল—"কারণ, মূলতঃ এটা উল্কা-ভস্ম ছাড়া আর কিছুই নয়।"

"যুক্তিবলে যা' উড়িয়ে দিতে পারি তা'র আর অস্তিত্বই থাকে না,"—শুষ্ককণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"কিন্তু যুক্তিবল যদি, তোমার কথামত, পৃথিবীকে উল্কা-ভস্ম বলেই বোঝে, তা' হলেও ঐ উল্কা-ভস্ম থেকে যায়—অস্তিত্ব-লোপ ঘটে না।"

"কেউ কেউ এ বিষয়েও আবার সন্দেহ-প্রকাশ করেন !" হাসিতে হাসিতে ফেরাজ উত্তর করিল।

"যাক্, সব জিনিষই অপ্রমাণ করা যায়"—ভ্রাতা বলিলেন—"এমন কি ন্যায়শাস্ত্রটা পর্যন্ত। ইচ্ছে করলে, আমরা যুক্তিবলে নিজেদের উন্মাদও ক'রে তুল্‌তে পারি। বিজ্ঞান-মাত্রেরই এমন একটা সীমারেখা আছে যা'কে উল্লঙ্ঘন করতে মানব-বুদ্ধি সাহসই করে না।"

"কিন্তু তোমার সীমা-রেখা যে কি, বা কোথায়, তা' তো আমি ভেবেই পাইনে !"—ঈষৎ হাসিয়া ফেরাজ বলিল—"নিজের জন্য কি এ-রকম সীমারেখা এ-পর্যান্ত কিছু ঠিক করেছ ? নিশ্চয়ই তা' করনি !—কারণ তুমি অতিরিক্ত উচ্চাভিলাষী।"

এ সকল প্রশ্নের উত্তর দেওয়া অনাবশ্যক বিবেচনায়, এল র‍্যামি আপন কাগজপত্র ও গ্রন্থাদি লইয়া বসিলেন এবং ফেরাজ ঘরের আসবাবপত্র যথাস্থানে রক্ষা করিয়া ভুক্তাবশিষ্ট সমূহ পরিস্কার করিয়া ফেলিল, —পরে, কর্তব্যশেষে, ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল।

কক্ষ নির্জ্জন হইবামাত্র এল র‍্যামি টেবিলের ভিতর হইতে একখানি হস্ত লিখিত কেতাব বাহির করিলেন এবং বিশেষ মনোযোগের সহিত মুখপত্রের অক্ষরকয়টী দেখিতে লাগিলেন। গ্রন্থশীর্ষে এই কয়টী কথা লিখিত—

অভিনব ধর্ম্ম।

চিরন্তন ও অপরিবর্ত্তনীয়, প্রাকৃতিক-নিয়ম-সমূহের সম্পূর্ণ অনুযায়ী
প্রণালীতে, সুযুক্তি-পূর্ণ ও সঙ্গত উপাসনার কথা।

"নাম-নির্ব্বাচন তেমন স্পষ্ট হয়েছে বলে' বোধ হ'চ্ছে না।"—পড়িতে পড়িতে তিনি আপন মনে বলিলেন—"কিন্তু আর কি-নামই বা দেব? বিষয়টা যেরকম গুরুতর, অথবা যেরকম বৈচিত্র্যপূর্ণ, তা'তে মনে হয় যে এত পরিশ্রম, এত গবেষণা-সত্বেও, এভাবের একটা চেষ্টায় অনর্থক শুধু সময় নষ্ট করাই হয়েছে। সম্ভবতঃ তা' হ'য়েছে,—কিন্তু এমন কোনো জীবিত বৈজ্ঞানিকই জগতে নেই যে এ-সমস্ত সিদ্ধান্ত সাদরে গ্রহণ কর্ব্বে না। এখন প্রশ্ন হ'চ্ছে,—এটা কি শেষ কর্ত্তে পারবো?—কখনও কি সংশয়-লেশশূন্য হ'য়ে জানতে পারবো যে, এমন-কিছু বা এমন-কেহ নিশ্চয়ই আছে, যে মরণান্তে কোনো অস্তিত্বে একেবারেই প্রবেশ-লাভকরে' থাকে? যাক্—এই নূতন পরীক্ষা থেকেই সমস্ত মীমাংসা হ'য়ে যাবে—যদি লিলিথের আত্মাকে দেখতে পাই, তা' হ'লে দ্বিধার আর অবকাশই থাকবে না,—আজ যা' অনিশ্চিত বলে মনে হচ্ছে, তখন সে-সবই নিশ্চিত হয়ে উঠবে। তার পরই জয়লাভ—জয়-গৌরব!"

উত্তেজনায় তাঁহার নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল,—কালি ও কলম লইয়া তিনি লিখিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন,—কিন্তু লিখিবার পূর্ব্বেই সন্ন্যাসীকর্ত্তৃক পরিত্যক্ত সেই কথাকয়টী সহসা তাঁহার স্মৃতি-মূলে কাঁপিয়া উঠিল:—

"সাবধান, পরিণাম আসন্নপ্রায়! প্রেমের মধ্যে দিয়ে অবিলম্বেই লিলিথের মুক্তি আসছে।"

ভীতি-বিহ্বলচিত্তে কয়েক মুহূর্ত্ত কথাকয়টী সম্বন্ধে চিন্তা করিয়া এল র‍্যামি মুখ তুলিলেন; পরে গর্ব্ব-হাস্য সহকারে আপনমনে বলিতে লাগিলেন—"জ্ঞানমার্গে কতকটা অগ্রসর হ'লেও,

এক্ষেত্রে তাঁর ধারণা একেবারেই ভ্রমাত্মক; কারণ, যদিই বা লিলিথের মধ্যে কোনো প্রেম-স্বপ্ন থাকে, তবে সে প্রেম বা সে স্বপ্ন আমারই সম্পত্তি! তা' যদি হয়, তবে কার সাধ্য যে অধিকার দাবী করে; কা'র সাধ্য, তা'কে আমার কাছ থেকে কেড়ে নেয়? কেউ না, কেউ না,—ঈশ্বর পর্য্যন্ত ন'ন—কারণ তিনিও নিয়মাধীন, তিনিও প্রাকৃতিক নিয়ম লঙ্ঘন কর্‌তে পারেন না। এই নিয়মবলেই লিলিথকে আমি ধরে রেখেছি,—এই নিয়মবলেই পরেও তা'কে ধরে রাখবো।"

আপন উপসংহারে পরিতুষ্ট হইয়া তিনি লিখিতে আরম্ভ করিলেন। স্বচ্ছ ও সুস্পষ্ট লিখনভঙ্গীর অধিকারী হওয়ায় অবিলম্বেই এল্ র্যামি প্রাচ্য-বিশ্বাস মূলক বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে, পরিস্কার প্রাঞ্জল ভাষায়, বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যার ভিতর দিয়া প্রবন্ধগুলিকে অগ্রসর করিয়া চলিলেন। বলা বাহুল্য যে, আধুনিক পাশ্চাত্য-বিজ্ঞান-বিচারের তুলনায় সেই প্রাচীন বিচার পদ্ধতি যথেষ্টপরিমাণে শ্রেষ্ঠ,—কারণ প্রথমোক্ত পদ্ধতি ঐশীশক্তিকে কেবলমাত্র এই জগতটাতেই আবদ্ধ করিয়া দেখে, এবং অন্যান্য দৃশ্যমান নক্ষত্রজগত, যাহারা বহুগুণে এ-জগত হইতে শ্রেষ্ঠ, তাহাদিগের কথা গ্রাহ্যের মধ্যেই আনে না।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

কাব্যের 'তুমি'।
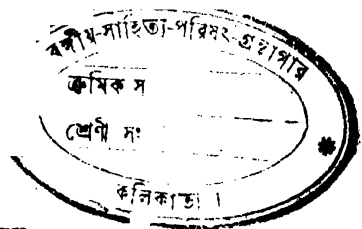
কাব্যের এই 'তুমি'টার আজো
পেলাম না খুঁজে অন্ত;
কবির মুখে ত' ফুরায় না তার
বর্ণনা অফুরন্ত!—

জীবন-দেবতা জীবন-বেদীতে
অক্ষয় জ্যোতিঃ জ্বল্‌ছে,
কবির মুখের ভাষা কেড়ে ল'য়ে
আপনার কথা বল্‌ছে।
মনের বনে যে লুকিয়ে ছিল গো
কে জানে তাহার তত্ত্ব,
'শরৎ-আলোর কমল-বনে' সে
বিলাস-বিহার-মত্ত।

পুরুষ-নারী বুঝিতে না পারি
বুঝি দুইই তার মূর্ত্তি,
পুরুষ রূপের বিকাশ কখনো,
কভু নারী-রূপ স্ফূর্ত্তি।
'ঘোম্‌টা খসিতে' কবি যে তাহার
দেখেছে জোছনা-রাত্রে,
চাঁদের মধুও করা'য়েছে পান
রজনী-গন্ধা-পাত্রে।

ফাল্গুনে তার দেখা নাকি যায়
কনকাঞ্চল-প্রান্ত,
বর্ষা-গগনে ফোটে রূপ তার
ভীমভৈরব---কান্ত।
সোনার তরণী বাহি সে তরুণী
অকূল সাগরে যাত্রী,
কবি সে সঙ্গে কাতর পরাণ
সমুখে বিজন রাত্রি।

পাঠশালা হ'তে বালক-কবিরে
　　ভুলায়ে বালিকা রঙ্গে
উপবনে নাকি শেফালি কুড়াতে
　　নে' গেছিল তার সঙ্গে।
তাহারেই কবি ভাল বাসিয়াছে
　　শতরূপে শতবার গো
জনমে জনমে যুগে যুগে, ধরি'
　　Evolution মার্গ।

পূর্ব্ব জন্মে যা গিয়াছে দোঁহে
　　এই মৃত্তিকা-গর্ত্তে,
তারার আলোয় কাঁপিয়াছে কত
　　সুদূর তারকা-বর্ত্মে।
মাঝে মাঝে নাকি এ মানব-দেহে
　　পাওয়া যায় তার স্পর্শ,
গন্ধ তাহার বাতসে ভাসিয়া
　　সঞ্চারে মনে হর্ষ।
কেমন ক'রে সে গান করে গুণী
　　শুনিবারে পায় কর্ণ,
নব নব রূপে পরাণে আসে সে
　　দেখা যায় তারো বর্ণ।

আমরা ত' ভাই সে মূরতি কভু
　　দেখিনি চর্ম্ম-চক্ষে ;
তোমাদেরি সেটা ভাগ্য পাঠক,
　　না হ'লে কি ছিল রক্ষে ?

Intuition হ'তে ঘন ঘন
বুঝিতে ঝঙ্কার মর্ম্ম
বড় বড় যত পণ্ডিত জনা
হইতে গলদ্ঘর্ম্ম।

কাব্যের 'তুমি'—পাওয়া এ সাধনা
বড় ভাই সে দুরন্ত,
স্বর্ণ-মৃগের জন্য গো শুধু
পথ ছোটা অফুরন্ত।
স্বর্ণ-মৃগের মতই এ নেশা
ছুটাইয়া করে ক্লান্ত,
জীবনের পথ হারাইয়া প্রাণ
অবশেষে উদ্‌ভ্রান্ত।

বাংলা দেশের ক্ষুদ্র কবিরা
না বুঝি আপন সত্ত্বা
মোহের দুয়ারে এরূপে নিত্য
করিছে আত্মহত্যা।
তাই বলি ভাই উড়ো না আকাশে,
সঞ্চর মর মর্ত্ত্যে,
সাবধানে চ'লো, দেখো প'ড়োনাক,
আধ্যাত্মিক গর্ত্তে।

* * *

নব্য কবির মধ্যে তিনটি—
জেনেছিল এই তত্ত্ব,
যাকিছু দিচ্ছে এরাই—(যদিও
কাঁটালের আমসত্ত্ব)

ভিন্ন দেশের 'তীর্থ-সলিল'
আহরি আনিয়া বঙ্গে
ছিটায়ে কে কবি শীতল করিল
বঙ্গবাসীর অঙ্গে।
'সকল দেশের চাইতে শ্যামল'
কোন্ দেশ—কেবা গায় গো,
নিখিলের গান তোলে কে বঙ্গে
'বঙ্গের বন-ছায়' গো।

কার হাতে ফোটে বর্ণ-বিলাস
বর্ণনা সুবিচিত্র,
'দুল্কি চালেতে পাল্কি চলে' সে
মধুর শব্দ-চিত্র।

রসের গোল্লা 'দূরের পাল্লা'—
মাল্লার সে আনন্দ,—
নাচিয়া চলেছে চটুল মুখর
নৃত্য-দোদুল ছন্দ।

কখনো আবার গোপনে থাকিয়া
পরিয়া ছদ্ম-বর্ম্ম
ব্যঙ্গ-সায়কে বিঁধেছে খণ্ড
সঙস্কারের চর্ম্ম।

প্রবীণে নবীনে দ্বন্দ্ব কোথাও,
বড় সে যে উপভোগ্য,
(মাত্রার অতিরিক্ত চলায়
যদিও নয় তা যোগ্য।)

'তুমি'র গন্ধ পাবে না খুঁজিয়া
ইঁহার কবিতা-অঙ্গে ;
শুধু 'লাল-নীল-জরদা-পরী'রা
ফরদা ওড়ান্ রঙ্গে !

আর একজন প্রথম বয়সে
'তুমি'র এ চোরাগর্ত্তে
দিয়েছিল পদ, ভাগ্য ভালই
বেঁচে গেছে কোন্ সর্ত্তে !

'মনের বনের উর্ব্বশী' যে গো
কাননে ধরিত মূর্ত্তি,
জোগায় না আর প্রাণের খাদ্য,
দেয় না কাব্যে ফূর্ত্তি।

মনেও নয় সে, বনেও নয় সে,
বিরাজে সে গৃহকর্ম্মে,
কবিতা-রসের ফোয়ারা ছোটায়
নিত্য কবির মর্ম্মে।

সংস্কৃতের পন্থা ধরিয়া
ললিত মধুর ছন্দে
করিছে যে গান, বঙ্গ-বাসীরা
শুনিছে পরমানন্দে।

—'নন্দপুরের চন্দ্র বিনা' যে
গোকুল আঁধারে মগ্ন,
অসহ বিরহ-যাতনায় হায়
রাধিকার প্রাণ ভগ্ন।—

কৃষির ব্যাপার, হাঘরের সুখে
　　সাড়া দেয় গো সে চিত্ত,
'ভগ্নী-ভ্রাতার সম্প্রীতি' সে যে
　　তার কাছে মহা বিত্ত।
কে বলেছে ডেকে—'মঙ্গল দিনে
　　বঙ্গের ভাই ভগ্নি,
মন্থন কর অন্তর ভরা
　　পঞ্চ-যাগের অগ্নি।'
'তুমি' এ কথাটি আজকাল এঁর
　　মিলিবে না কোন ছন্দে,
দু' একটি ফস্‌কিয়ে আসে
　　সনেটে মাসিক পত্রে।

অজয়ের কূলে বসিয়া বিরলে
　　ক্ষুদ্র বীণাটি অঙ্কে
সরল রাগিণী বাজাইল কবি,
　　পদ্ম ফোটাল পঙ্কে।
ছোট সুখ-দুখ হাসি ও অশ্রু
　　দেখা'ল রঙীন বর্ণে,
পল্লী গ্রামের নগ্ন ছবিটি
　　আঁকিল মানস-পর্ণে।
দয়িতা-হারার বেদনা বক্ষে,
　　শ্মশানের উপকণ্ঠে
'ভিড়িয়োনা মাঝি, চলুক্ তরণী'—
　　গাহিল করুণ কণ্ঠে।

'সহর' ও 'গ্রামে' ফোটাল কেমন
মোহন তুলিকা-স্পর্শে,
অনুপ্রাসে ও উপমায় যার
অজস্র সুধা বর্ষে।
—বন্ যে কবির মনকে টানেন গো
ছাড়ি সহরের যক্ষ,
'পল্লী-গ্রামের পল্বলে সে যে
বল্লী ভূষণ'—রত্ন।—
'ক্ষুদ্রে'র মাঝে 'রুদ্রে'র লীলা
দেখানো ইহাঁর লক্ষ্য,
ছোট কথাটিরে বলিবারে তাই
উপমা লক্ষ লক্ষ।
'ঘেঁটুফুল' আর 'টুনটুনি পাখী'
এ দিয়ে লেখেন পদ্য,
Idealise ক'রে এ দুয়েরে
স্বর্গে তোলেন সদ্য।
যা' হোক্ তা' হোক্ এঁর কবিতাও
'তুমি'র বালাই শূন্য,
কবিতাই পড়ি, দর্শন নয়,
বুঝিও যে বড় পুণ্য!

* * *

বঙ্গ-ভারতী যার যা শকতি
তাহে রাখ মাগো লিপ্ত,
অকারণ মোহে কেন সন্তানে
ঘুরায়ে করিস্ ক্ষিপ্ত ?

আধ্যাত্মিক মুখস প'রয়া!
　　কেন আর সাজা ভণ্ড?
আকাশ-কুসুম গড়িয়া কেবল
　　জীবনেরে করা পণ্ড!
'জীবন-দেবতা,' 'মানস-প্রতিমা'
　　ডুমুরের ফুল তুলা,
লক্ষ্মী-ছাড়া এ জীবনে তাহার
　　আছে কি কোনও মূল্য?
বড় জ্বালা যদি বিষের মতন
　　অধিকার করে চিত্ত,
ওমরের মত পেয়ালার রসে
　　ডুব দিও মন নিত্য।

শ্রীকমলবিলাসী।

উত্তর বঙ্গের সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে দু'একটী কথা।*

ভূমিকা।

বঙ্গভূমির কর্ম্ম কোলাহলময় রাজধানী হইতে সুদূরবর্ত্তী হইলেও, উত্তর-বঙ্গ সাহিত্যালোচনার জন্য চিরপ্রসিদ্ধ। যাঁহার সুললিত পদবিন্যাস কৌশলে রামায়ণের রমণীয় কাহিনী

---

* ২৩এ শ্রাবণ রঙ্গপুরের সাহিত্য পরিষদের ১৪শ সাম্বৎসরিক অধিবেশনে পঠিত।

এই প্রবন্ধ রচনায় আমি দীনেশবাবুর "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য," ৺রামগতি ন্যায়রত্নের "বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব," শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রেয়, শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত পঞ্চানন সরকার প্রভৃতি মহাশয়গণের বিবিধ প্রবন্ধ, উত্তর-বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলনের অভিভাষণাদি, সম্মিলনে পঠিত (ও পঠিত বলিয়া গৃহীত) প্রবন্ধাদি হইতে বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি এবং বর্ত্তমান প্রবন্ধের স্থানে স্থানে কিছু কিছু উদ্ধৃতও করিয়াছি।
প্রবন্ধ লেখক।

বঙ্গবাসী নরনারীর পক্ষে অনায়াস লভ্য হইয়া রহিয়াছে, বাঙ্গলার সেই মহাকবি উত্তর-বঙ্গে বসিয়াই তাঁহার গ্রন্থরচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগে বঙ্গ সাহিত্য যে ভাবস্রোতে সরস ও শক্তিশালী হইয়া উঠিবার উত্তেজনা লাভ করিয়াছে, সেই স্বদেশ প্রীতি আরাধনা করিয়া আনিবার জন্য ভগীরথের ন্যায় অবিচলিতভাবে মহাত্মা রামমোহন এই উত্তর-বঙ্গে সুদীর্ঘ সাধনায় ব্যাপৃত হইয়াছিলেন। পাল রাজগণের অন্যতম কুমার পালদেবের প্রিয়তম মন্ত্রী বৈদ্যদেব কামরূপের বিদ্রোহী নরপালগণের নিধন সাধন করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ পূর্ব্বক যখন কামরূপের সিংহাসনে আরোহণ করেন, তখন এই উত্তর-বঙ্গের কবি মনোরথ তাঁহার প্রশস্তি রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া ঐ যুগের বিবিধ ঐতিহাসিক তথ্যের উল্লেখ করিয়াছেন এবং সেকালের বাঙ্গালীর বাহুবলের ও শাসন কৌশলের অনেক পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। যার পুণ্যধারায় বর্দ্ধিত হইয়া নব্য ন্যায়ের বিজয় পতাকা ভারতবক্ষে প্রোথিত করিয়া জগতের সমক্ষে বাঙ্গালীর গৌরব বিঘোষিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিতপ্রবর গদাধর ভট্টাচার্য্য এই উত্তর-বঙ্গেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। জয়দেব, উমাপতির লেখনী মৌনাবলম্বন করিলে, শুধু বঙ্গদেশ কেন, সমগ্র ভারতের অন্যত্রও 'পদাঙ্কদূত' 'হংসদূত' ভিন্ন সংস্কৃতে অন্য কাব্যগ্রন্থ তাদৃশ অধিক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায় না। এই 'পদাঙ্কদূত'ও নাটোর রাজপ্রাসাদ হইতে বাহির হইয়াছিল। এই উত্তর-বঙ্গের আর একজন প্রাতঃস্মরণীয় কবি ভূম্যধিকারীর যত্নে উৎসাহে ও পুরস্কার ঘোষণায় বাঙ্গলাভাষার আদি নাটকের জন্ম হয়। এই উত্তর-বঙ্গে কবিচতুর্ভুজ হইতে আরম্ভ করিয়া ভদ্রবাহুস্বামী, রামগুরব মিশ্র, রামচন্দ্র কবিভারতী, কুল্লুকভট্ট, উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, নরোত্তম ঠাকুর প্রভৃতি মহা মহা প্রতিভাশালী লোক জন্মগ্রহণ করিয়া এ দেশকে অলঙ্কৃত করিয়া গিয়াছেন। এই উত্তর-বঙ্গবাসীই রামায়ণ, মহাভারত, গীতা, শ্রীমদ্ভাগবত এবং অষ্টাদশ পুরাণের অধিকাংশ বঙ্গভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া বঙ্গভাষার পরিপুষ্টি ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়াছেন। সংক্ষেপে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে বঙ্গভাষার গঠন ও উন্নতিকল্পে বঙ্গদেশের অন্যান্য অংশ যখন প্রাণপণে চেষ্টা করিতেছিল, এই উত্তর-বঙ্গও তখন নিশ্চেষ্ট ছিল না—তাহাদের সঙ্গে সঙ্গেই উঠিয়া দাঁড়াইয়াছিল।

জ্ঞানবরেণ্য এই উত্তর বঙ্গের সাহিত্যসেবা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা আজ আপনাদিগকে বলিব। যথাযত ক্রমবিকাশ দেখাইয়া উত্তরবঙ্গের সাহিত্যসেবার একটী ধারা বাহিক ইতিহাস বর্ণনা বর্ত্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে; সাহিত্যসেবকগণের জীবনী বা গ্রন্থাদি সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করাও সময়ের সংকীর্ণতা হেতু সম্ভবপর হইবে না। বঙ্গ সাহিত্যের উন্নতিকল্পে উত্তরবঙ্গ কি করিয়াছে এবং কি করিতেছে তৎসম্বন্ধে একটু মোটামুটি পরিচয় দিবার জন্যই এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের অবতারণা।

রামায়ণ।

প্রথমতঃ রামায়ণের কথা। রামায়ণের রচয়িতৃগণের মধ্যে তিন জন প্রাধান। (১) সন্ধ্যাকর নন্দী। (২) অদ্ভুতাচার্য্য। (৩) শঙ্কর দেব।

(১) সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিতম্' নামক কাব্যগ্রন্থ ১৮৯৭ খৃঃ বঙ্গীয় এশিয়াটীক সোসাইটীর পক্ষ হইতে শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এম, এ, সি, আই, ই মহোদয় নেপালের দরবার পুস্তকালয় হইতে কলিকাতায় আনয়ন করেন। আটশত বৎসর পূর্ব্বে যেরূপ বঙ্গলিপি প্রচলিত ছিল, গ্রন্থখানি সেইরূপ পুরাতন অক্ষরে লিখিত। শাস্ত্রী মহাশয় দীর্ঘকালের উদ্যমে ও পরিশ্রমে পুরাতন অক্ষরের পাঠোদ্ধার করায় গ্রন্থখানি উক্ত সোসাইটী কর্ত্তৃক (১৯১০ খৃষ্টাব্দে) মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। কাব্য শেষে কবি নিজের এইরূপ পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন :—

বসুধা শিরো বরেন্দ্রীমণ্ডল চূড়ামণিঃ কুলস্থানম্
শ্রী পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরঃ প্রতিবদ্ধ পুণ্যভূর্ব্বৃহদ্বটুঃ

ইহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, নন্দিকুলের কুলস্থান পৌণ্ড্রবর্দ্ধনপুরের সহিত প্রতিবদ্ধ ছিল। তাহা পুণ্যভূ, বৃহদ্বটু বলিয়া পরিচিত ছিল। বরেন্দ্র মণ্ডলের তাহাই চূড়ামণি ছিল সেই কুলস্থানে সন্ধ্যাকর নন্দী জন্ম গ্রহণ করেন। পাল বংশীয় সপ্তদশ নরপতি মদনপাল দেবের শাসন সময়ে উক্ত 'রামচরিতম্' কাব্য রচিত হয়। সমসাময়িক সুধী সমাজে সন্ধ্যাকরের কবিযশঃ বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। গ্রন্থ শেষে কবি নিজকে

কলিকালের বাল্মীকি এবং তাঁহার রচিত কাব্যকে কলিকালের রামায়ণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন :—

"কলিকালরামায়ণমিহ কবিরপি কলিকাল বাল্মীকিঃ"

সন্ধ্যাকরের কাব্য রচনা গৌরবের আধার। এক পক্ষে রামচন্দ্রের সীতা উদ্ধার কাহিনী এবং অন্য পক্ষে রামপাল দেবের বরেন্দ্রী উদ্ধার কাহিনী বিবৃত করিয়া একই শ্লোকের দুইটী অর্থে দুইটী বিভিন্ন বিষয়ের বর্ণনায় সন্ধ্যাকর পদ বিন্যাস কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় প্রদান করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার ভাষায় তাঁহাকে যথার্থই বলা যাইতে পারে :—

কাব্যকলাকুলনিলয়ো গুণমণি মেরুম নীষিনামীশঃ
সামা সাহিত্যবিদামশেষ ভাষা—বিশারদঃ স কবিঃ

(২) অদ্ভুতাচার্য্য, রামায়ণের অনুবাদকদের অন্যতম। প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে এই উত্তরবঙ্গেই তিনি জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন। পাবনা জেলার সাঁতোল গ্রামের নিকট সোনাবাজু পরগণার বাবরিয়া গ্রামে কবির জন্ম ভূমি ছিল। ইহাঁর রচিত রামায়ণ উত্তরবঙ্গে এত প্রসিদ্ধ লাভ করিয়া ছিল, যে, এই রামায়ণ ব্যতীত উত্তর বঙ্গবাসীগণ অন্য-রামায়ণের নাম খুব কম জানিত। ব্রাহ্মণ বংশের ইহাঁর জন্ম হয় এবং ইহাঁর পূর্ব্ব নাম ছিল নিত্যানন্দ। তিনি নিজে লেখা পড়া জানিতেন না; শুধু দৈব শক্তি বলে রামায়ণের অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই জন্য তাঁহার নাম হইয়াছিল অদ্ভুতাচার্য্য তিনি নিজেই একথা বলিয়াছেন :—

জন্মিনাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ।
যত কিছু কহে বিপ্র রাম উপদেশ ॥

তাঁহার রামায়ণে আর একটী অদ্ভুত কথা আছে। সীতাকে কালীর অবতার কল্পনা করিয়া বাল্মীকির সীতার উপর এক নূতন সীতা দাঁড় করান হইয়াছে। এই গ্রন্থের আদিকাণ্ড রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক মুদ্রিত হইয়া সম্প্রতি প্রকাশিত হইয়াছে।

(৩) প্রসিদ্ধ বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারক শঙ্কর দেব রামায়ণের আর একজন অনুবাদক। ইনি কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের সমসাময়িক ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইনি আবির্ভূত হ'ন এবং উত্তর কাণ্ড রামায়ণ রচনা করেন।

মহাভারত •

দ্বিতীয়তঃ মহাভারত প্রসঙ্গ। মহাভারত অনুবাদকদের মধ্যে অনেকেই খণ্ড খণ্ড পর্ব্বের অনুবাদ করেন। এক মাত্র রাম সরস্বতী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রাজা নরনারায়ণের আজ্ঞায় সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন।

পিতৃ যে মাতৃ যে অনিরুদ্ধ নাম থৈলা।
কবিচন্দ্র নাম গোট দেবানে বুলিলা॥
রাম সরস্বতী নাম নৃপতি দিলন্ত।
ভারতর পদ মোক করা বুলিলন্ত॥

মহারাজ প্রাণ নারায়ণের আজ্ঞায় দ্বিজ রামেশ্বর এবং তৎপুত্র শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ মহাভারতের পদ রচনা করেন। শ্রীনাথ নামে আর একজন ব্রাহ্মণ "আদি পর্ব্বের" রচয়িতা।

রত্ন পৃষ্ঠে মহারাজা প্রাণনারায়ণ।
জঙ্গম জগ্নীশ যাক্ বোলে সর্ব্বজন॥
সেহি দিন মদন দেব ভোগে পুরন্দর।
বিশ্বসিংহ কুল-কুমুদিনী দিবাকর॥
শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ এক উপাসক তার।
আদিপর্ব্ব ভারতের রচিল পয়ার॥

শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রাম সরস্বতী রচিত একখানি "ভীষ্মপর্ব্ব" পাওয়া গিয়াছে। ভাষা দেখিয়া ইহাঁকে কুচবিহারের পূর্ব্ব দেশবাসী বলিয়া মনে হয়। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রচিত একখণ্ড বিরাট পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। এই শ্রীনাথ ব্রাহ্মণ রূপ সন্ততি উপেন্দ্রনারায়ণ মহারাজের সময়ে আবির্ভূত হন। ইহাঁর বাসস্থান কামতা নগর। বিশারদ বিপ্র রচিত আর একখানি বিরাট পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে। ইহাঁর রচনার সময় ১৫৫৪ শক, ১৬৩১ খৃঃ। "বন পর্ব্ব" নামক যে পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে, তাহার রচয়িতা সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। গ্রন্থখানি ঠিক বনপর্ব্ব নহে—বনপর্ব্বের অন্তর্গত অর্জ্জুনের দিব্যাস্ত্রলাভ। ভারবীর 'কিরাতার্জ্জুনীয়মের" অনুরূপ।

কাব্য

কাব্য সাহিত্যে যাঁহারা প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন তন্মধ্যে, কবিবল্লভ দ্বিজ কমললোচন, কবি জীবন মৈত্র, কৃষ্ণজীবন, শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার, রাম বিদ্যালঙ্কার প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক যুগের কবিগণ মধ্যে কবি রজনীকান্ত সেন কবিবর প্রথম চৌধুরী, কবি সম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন, মহারাজা জগদিন্দ্রনাথ এবং উদীয়মান নবীন কবি কৃষ্ণদয়াল বসু ও মহিলা কবি কোচবিহারের রাজকুলবধূ ও পরিচারিকা সম্পাদিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে বগুড়া জেলার মহাস্থানের নিকট করতোয়া তীরবর্ত্তী আড়রা গ্রামে কবি বল্লভ জন্মগ্রহণ করেন। 'রস কদম্ব' এবং 'আদিরস' নামক কাব্য ইনি রচনা করিয়াছেন। "চণ্ডিকা-বিজয়" উত্তর বঙ্গের আর একখানি সুবৃহৎ কাব্য। ইহার রচয়িতা দ্বিজ কমললোচন রঙ্গপুর জেলায় মিঠাপুকুর থানার ঘাঘট নদীর তীরবর্ত্তী চড়কাবাড়া গ্রামে প্রায় আড়াইশত বৎসর পূর্ব্বে জন্মগ্রহণ করেন। চণ্ডিকা বিজয় শক্তি বিষয়ক গ্রন্থ। কমললোচন অতি উচ্চ শ্রেণীর কবি ছিলেন। তাঁহার কাব্যের কোন কোন স্থলে তদীয় পিতা যদুনাথের ভনিতাযুক্ত সুন্দর সুন্দর রচনা দেখা যায়। রঙ্গপুরের প্রসিদ্ধ মুসলমান কবি কাজি হেয়াৎ মামুদের কথা মুসলমান সাহিত্যিক প্রসঙ্গে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করিব। ১৭৪২ খৃঃ উত্তর বঙ্গের আর একজন কবি জীবন মৈত্র "বিষহরি পদ্ম পুরাণে" বা মনসার ভাসান প্রণয়ন করেন। গ্রন্থখানি দ্বাদশ খণ্ডে পূর্ণ। কবির ভাষায়ই তাঁহার পরিচয় দিতেছি।

> শ্রীবংশী বদন মৈত্র জান মহাশয়।
> চৌধুরী অনন্তরাম তাঁহার তনয়॥
> অনন্ত নন্দন কবি শ্রীমৈত্র জীবন।
> লাহিড়ী পাড়ায় বাস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥

বাহারবন্দ পরগনার অন্তর্গত তিস্তানদীর তীরবর্ত্তী বজরাগ্রাম নিবাসী শ্রীকৃষ্ণ জীবন 'অম্বয়া-মঙ্গল' নামক কাব্যের রচয়িতা মহারাজা রামকৃষ্ণের সভায় এই কাব্য রচিত হয়। কাকিনার রাজ কবি শ্রীশ্বর বিদ্যালঙ্কার উত্তর বঙ্গের আর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত কবি। ইহাঁর

বিক্রমিনী কাব্য, দিল্লীমহোৎসব কাব্য, শান্তিশতক হেমোদ্ধা কাব্য প্রভৃতি বিশেষ বিখ্যাত। বগুড়ার শ্রীকৃষ্ণনাথ ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র রাম বিদ্যালঙ্কার মহাশয় "রাম রাজ্যাভিষেক" নামক যে কাব্যগ্রন্থ রচনা করিয়াছেন তাহা মহাকাব্য লক্ষণাক্রান্ত। দিনাজপুরের কবি জগজ্জীবন ঘোষালের "মনসামঙ্গল" এবং কবি পণ্ডিত মহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণির "রস কাদম্বিনী" "ভগবচ্ছতকম" "ধীরানন্দ তরঙ্গিণী" প্রভৃতি গ্রন্থগুলিও এস্থলে উল্লেখযোগ্য।

আধুনিক যুগের কাব্য সম্বন্ধে এইবার কয়েকটী কথা বলিতেছি। পাবনার কবি রজনীকান্ত সেন বর্ত্তমান যুগে, উত্তরবঙ্গের সর্ব্বপ্রধান কবি। বর্ত্তমান প্রবন্ধের সঙ্গীত সাহিত্য প্রসঙ্গে তাঁহার কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করিব বলিয়া এস্থলে শুধু তাঁহার নামোল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত থাকিলাম। কান্ত কবির পরই সবুজ পত্রের প্রমথ চৌধুরীর নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। "সনেট পঞ্চাশৎ" "পদচারণ" প্রভৃতি কাব্যগ্রন্থ ইহাঁর কবিত্ব শক্তির জ্বলন্ত উদাহরণ। গদ্য সাহিত্যেও ইহাঁর যথেষ্ট চিন্তাশক্তি ও ভাবুকতার পরিচয় পাওয়া যায়। সাহিত্যে ইহাঁকে সব্যসাচী বলা যাইতে পারে। "প্রমথনাথ প্রকৃত কবি। ইহাঁর কণ্ঠ নূতন, ভঙ্গীও নূতন। মানসিক দৃষ্টিতেই তাঁহার বিশেষত্ব। সাহিত্যে এই স্বাতন্ত্র্য অমূল্য—বৈচিত্র্যের কারণ এবং ভিন্ন ভিন্ন সৌন্দর্য্যাভিব্যক্তির মূল। স্বাধীনতা ও নির্ভীকতা ইহাঁর বিশেষ গুণ। তাঁহার রচনার আর একটী বিশেষত্ব এই যে তাঁহার কবিতায় এমন অনেক কথা পাওয়া যায় যাহা প্রবাদ বচনের ন্যায় শাণিত, সংক্ষিপ্ত এবং জীবনের অনেক বিষয়ে লাগাইবার উপযোগী; যাহাকে Mathew Arnold, Criticism of life এবং প্রকৃত সাহিত্যের লক্ষণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কল্পনা-সম্পদে, ভাব প্রকাশে, ভাষা ও ভঙ্গী গৌরবে এবং শ্রুতি-মাধুর্য্যে এক রবীন্দ্রনাথ ব্যতীত অন্য কোন কবির রচনা অপেক্ষা প্রমথনাথের রচনা হীনশ্রী নহে।*" পরিচারিকা সম্পাদিকা শ্রীমতী নিরুপমা দেবীর নামও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহার কবিতা উচ্চ শ্রেণীর; ইঁহার 'ধূপ' নামক গ্রন্থে ভাব ভাষা ও ছন্দে ইনি যেরূপ কৃতিত্ব প্রকাশ করিয়াছেন; তাহাতে আশা করা যায় ইনি কালে বঙ্গভাষাকে

* ৺প্রিয়নাথ সেনের 'সাহিত্য' পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধ হইতে উদ্ধৃত।

স্থায়ী সম্পদ দান করিতে পারিবেন। কবিসম্রাট যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের বহুবিষয়িণী প্রতিভার কথা এস্থলে বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা যাইতে পারে। 'চন্দ্রদূত'কাব্য, 'প্রশান্তকুসুম' কাব্য, অশ্রুবিসর্জ্জন" কাব্য, "অশ্রুবিন্দু" "খেদাবলী" "সুভদ্রাহরণ" "ছন্দোব্যাকরণ" প্রভৃতি বহু গ্রন্থ ইনি প্রণয়ন করিয়াছেন। ইনি বর্ত্তমানে উত্তর-বঙ্গের সর্ব্বপ্রধান পণ্ডিত। ইহাঁর পত্নী জগদীশ্বরী দেবীও "দ্রৌপদী" নামক কাব্য রচনা করিয়াছেন। "সন্ধ্যাতারা"র কবি জগদিন্দ্রনাথ উত্তর-বঙ্গের আর একটি গৌরব। "নুরজাহান" নামে একখানি ঐতিহাসিক কাহিনীও তিনি লিখিয়াছেন। সম্প্রতি "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় "শ্রুতিস্মৃতি" নামে আত্মচরিত লিখিতেছেন। অপ্রতিহত গতি সুললিত শব্দ-বিন্যাস জগদিন্দ্রনাথের রচনার বিশেষত্ব। একটু নমুনা দেই—

যেয়ো না নিঠুর ওগো নির্দ্দয়, যেয়ো না পরাণ প্রিয়,
বক্ষে রাখিতে ভার যদি লাগে, চক্ষের দেখা দিয়ো। ইত্যাদি।

পোতাজিয়া হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষক শ্রীযুক্ত বিহারীলাল গোস্বামী 'বিরহানন্দ' ছন্দে 'মেঘদূত' এবং বিবিধ আধুনিক ছন্দে 'কুমার সম্ভবের' অনুবাদ করিয়াছেন। শেষোক্ত কাব্যখানি সম্বন্ধে পূজনীয় রবীন্দ্রনাথ বলেন, "ছন্দ ও ভাষার কারুনৈপুণ্যে পূর্ণ। আপনি যে দুঃসাধ্য কার্য্যে আশ্চর্য্য সফলতা লাভ করিয়াছেন, তাহা আমাদের কাহারো দ্বারা সম্ভব হইতে পারে বলিয়া আমি মনে করি না।" যে নবীন কবি কৃষ্ণদয়াল বসুর নাম পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি রঙ্গপুর জেলার উলিপুরে তাঁহার বাসস্থান। বিদ্যালয়ে পঠদশায়, সাপ্তাহিক, ষাণ্মাসিক প্রভৃতি পরীক্ষায় ইংরাজী কবিতার (কবিতারই) যে সুন্দর বঙ্গানুবাদ করিতেন, তাহা দেখিয়া উক্ত বিদ্যালয়ের তদানীন্তন, হেডমাষ্টার মহাশয় ইহাঁর কবিত্ব শক্তির ভূয়োসী প্রশংসা করিতেন। বর্ত্তমানে ইহাঁর বয়স একবিংশতি বর্ষ মাত্র। ইংরাজী সাহিত্যে পারদর্শিতা লাভ করিয়া বি-এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া এম-এ, পড়িতেছিলেন, স্বাস্থ্যহীনতার জন্য আপাততঃ পড়া বন্ধ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। প্রবাসী, মানসী ও মর্ম্মবাণী, পরিচারিকা প্রভৃতি প্রথম শ্রেণীর মাসিক পত্রিকায় ইহাঁর বহু কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে ১৩২১ সালের বৈশাখের প্রবাসীতে "রেণু" নামক যে গল্প কবিতা প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, বিজ্ঞ সমালোচক ললিতকুমার, 'সাহিত্য' সম্পাদক সুরেশচন্দ্র,

ঔপন্যাসিক চারুচন্দ্র, সুকবি কালিদাস রায় প্রভৃতি ইহাঁর কবিত্ব শক্তির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। "রেণু" কবিতার রচনা-পারিপাট্যে মুগ্ধ হইতে হয়। যেমন ভাষা-বিন্যাস তেমনি নিখুঁত ছন্দোমাধুর্য্য, যেমন অপ্রতিহত প্রবাহ, তেমনি কবিত্বে কৌমুদী উজ্জ্বল চঞ্চল তরঙ্গমালা। ছন্দোবদ্ধ মিল, অলঙ্কার ভাষা চরণের ষোলআনা মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া রচনাকে এমন অনায়াস গতি দান করিতে পারা বহুকালের সাধনা ব্যতীত সম্ভব নহে।* ইহাঁর ভবিষ্যৎ খুব আশাপ্রদ বলিয়া শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণ মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন।

ব্যাকরণ।

ব্যাকরণ প্রসঙ্গে আমরা অতি অল্পই জানিতে পারিয়াছি। তন্মধ্যে কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের সভাপণ্ডিত পুরুষোত্তম বিদ্যাবাগীশ প্রসিদ্ধ 'প্রয়োগরত্নমালা' ব্যাকরণ প্রণেতা রাজসাহীর পুরুষোত্তম দেব তর্কালঙ্কার পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি প্রস্তুত করেন। ঐ বৃত্তি 'ভাষাবৃত্তি' নামে প্রসিদ্ধ। তদ্ব্যতীত বগুড়ার পণ্ডিত আনন্দ তর্কালঙ্কার পাণিনি ব্যাকরণের এবং রামনারায়ণ ভট্টাচার্য্য সারস্বত ব্যাকরণের ভাষ্য রচনা করিয়া প্রসিদ্ধিলাভ করেন। শেষোক্ত ভাষ্য ১৫৭২ শকে রচিত। ইহারও পরবর্ত্তী সময়ে এইবংশের কৃষ্ণনাথ (শ্রীকৃষ্ণ) ভট্টাচার্য্য 'ঋজুদীপিকা' ও 'প্রভাবতী' নামে সারস্বত ব্যাকরণের টীকা প্রণয়ন করেন। ভট্টাচার্য্য মহাশয় শব্দশাস্ত্রে যেরূপ কুশল ছিলেন, কাব্যশাস্ত্রেও তাঁহার সেইরূপ নৈপুণ্য ছিল। দুর-হি ব্যাকরণের জটিল সূত্রাবলী স্থানে স্থানে সুকুমার কবিতা কুসুমে সজ্জিত করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়াছেন। সংস্কৃত ও পালি ভাষায় অভিজ্ঞ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী পালি প্রকাশ নামে একখানি পালি ব্যাকরণ সম্প্রতি রচনা করিয়াছেন।

* উপাসনা, আশ্বিন, ১৩ ৬।

পুরাণ, শ্রীমদ্ভাগবত ও গীতা।

কোচবিহারের রাজা সমর সিংহের সভাপণ্ডিত কবি পীতাম্বর রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও 'শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ' দেখিতে পাওয়া যায়। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ নিজে একজন সুকবি ও গ্রন্থকার ছিলেন। ইনিও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়। ইনি চীন দেশের রাজকন্যার উপাখ্যান পদ্যে রচনা করেন এবং 'বৃহদ্ধর্ম্ম পুরাণের' অনুবাদ করেন। আশী অধ্যায়ে এই অনুবাদ সম্পন্ন হয়। গোবিন্দ দাস কৃত 'গরুড় পুরাণ' একখানি যোগ শাস্ত্র। ইহাতে বৌদ্ধ প্রভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। উক্ত গোবিন্দ দাসের রচিত গীতাসার শ্রীমদ্ভাগবত গীতার প্রতিপাদ্য বিষয় লোককে বুঝাইয়া দিতেছে—আত্মা। গোবিন্দ মিশ্র, শঙ্করী ও ভাস্করীমত, হনুমানের পৈশাচিক ভাষ্য, আনন্দ গিরির টীকা ও শ্রীধর স্বামীর সুবোধিনী টীকা এই পঞ্চটীকা আলোচনা ও সমন্বয় করিয়া গীতার পদ্যরচনা করেন। এরূপ আয়াসসাধ্য কার্য্যে আর কেহ প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন কিনা তাহা জানিতে পারা যায় নাই। এপর্য্যন্ত যতগুলি গীতা সম্পাদিত হইয়াছে তন্মধ্যে এই গীতা খানি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তাহা আমরা দৃঢ়তার সহিত বলিতে পারি। এই গোবিন্দ মিশ্রের গুরু দামোদর দেব শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থের মত ভক্তমণ্ডলী মধ্যে আলোচনা করিতেন এবং সর্ব্বসাধারণের জ্ঞানগম্য করিয়া পদবদ্ধ করিয়া প্রচার করেন। দ্বিজ রামকান্ত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধ এবং পূর্ব্বোক্ত শঙ্কর দেব একাদশ স্কন্ধের অনুবাদ করেন। যে বিহারীলাল গোস্বামীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি তাঁহার তৃতীয় গ্রন্থ গীতাবিন্দু গীতার সচিত্র ও সমূল পদ্যানুবাদ।

ব্রহ্মসূত্র, ন্যায়, স্মৃতি, দর্শন, বেদান্ত প্রভৃতি।

এই প্রসঙ্গে উদয়নাচার্য্য ভাদুড়ী, গদাধর ভট্টাচার্য্য, কুল্লুকভট্ট এবং শ্রীকৃষ্ণ সার্ব্বভৌমের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। দ্বাদশ শতাব্দীতে বগুড়া জিলার অন্তর্গত (নিসিন্দা), গ্রামে উদয়নাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতা বৃহস্পতি আচার্য্য বৌদ্ধাচার্য্য জিষ্ণাণির সহিত বিচারে পরাজিত হওয়ায় লজ্জা বশতঃ প্রাণত্যাগ করেন। এই ঘটনায় ক্রোধান্ধ হইয়া উদয়নাচার্য্য বৌদ্ধদিগের সহিত বিচারে প্রবৃত্ত হন। বিচারে তিনিই জয়লাভ করিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব

প্রকাশ ও আস্তিকতা প্রতিপাদন করেন। বঙ্গের সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত গদাধর ভট্টাচার্য্য বংশে প্রায় তিন শত বৎসর পূর্ব্বে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি অনেকগুলি টীকা, ব্রহ্মনির্ণয় নামে বেদান্ত, কুসুমাঞ্জলির ব্যাখ্যা, মুক্তাবলীর টীকা, তত্ত্বচিন্তামণি দীধিতি এবং "গদাধরী" নামে সুবৃহৎ ব্যাখ্যাগ্রন্থ প্রণয়ন করেন। 'গদাধরী' নব্য ন্যায়ের অপূর্ব্ব গ্রন্থ এবং গদাধরের অক্ষয় কীর্ত্তি। বঙ্গদেশের প্রসিদ্ধ টীকাকার কুল্লুক ভট্ট তাহিরপুর রাজ্যের পূর্ব্ব পুরুষ। "মন্বর্থমুক্তাবলী" নামক টীকা রচনা করিয়া ইনি জগৎ বিখ্যাত হইয়াছেন। Sir William Jones বঙ্গীয় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের কথা প্রসঙ্গে যাহা লিখিয়াছেন, তাহাই উদ্ধৃত করিয়া কুল্লুক ভট্ট সম্বন্ধে পরিচয় প্রদান করিতেছি। At length appeard Kulluk Bhatta, a Brahman of Bengal, who after a painful course of study and the collection of numerous manuscripts, produced a work of which it may perhaps be said very truly that it is the shortest, yet the most luminous, the least unostentatious yet the most learned, the deepest, yet the most aggreable commentary ever composed by any author, ancient or modern European or Asiatic. কোচবিহার রাজ্যের প্রধান সচিব শিবপ্রসাদ বক্সী "আহ্নিকাচার তত্ত্ব" নামক আর একখানি স্মৃতি গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছেন। সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। ন্যায়ের অন্যতম টীকাকার সুবিখ্যাত রুদ্রমঙ্গল ন্যায়ালঙ্কার রঙ্গপুরের সুপ্রসিদ্ধ পল্লী ইটাকুমারীতে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনি ন্যায় শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। কবি শ্রীধরের সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত কোকিলেশ্বর ভট্টাচার্য্য বিদ্যারত্ন এম, এ, প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় ভাষায় পণ্ডিত। "উপনিষদের উপদেশ" নামক দার্শনিক গ্রন্থ ইহাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের নিদর্শন। উত্তরবঙ্গের আর একজন দার্শনিক পণ্ডিত "দেবতত্ত্ব" "তান্ত্রিক অভিধান" "Free Enquiry after Truth" প্রভৃতি গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন।

ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্ব।

ইতিহাস রচনা ও ঐতিহাসিক গবেষণার জন্য উত্তরবঙ্গ চিরপ্রসিদ্ধ। বর্ত্তমান যুগের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগণের মধ্যে অনেকেই এই উত্তরবঙ্গবাসী। তন্মধ্যে অল্প কয়েক জনের

কথা মাত্র এস্থলে উল্লেখ করিতেছি রিয়াজুস সালাতিন প্রণেতা গোলাম হোসেন ও তদীয় শিষ্য ইলাহিবক্সের কথা মুসলমান সাহিত্যিক প্রসঙ্গে উল্লেখ করিব। রাজসাহীর সুপ্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্র সি. আই, ই বঙ্গের শ্রেষ্ঠ ঐতিহাসিকগণের অন্যতম। তিনি যেরূপ অক্লান্ত অধ্যবসায়ে ইতিহাস ও প্রত্নতত্ত্বের সেবা করিতেছেন তাহাতে তাঁহার নাম বাঙ্গলার ইতিহাসে চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে। সিরাজুদ্দৌলা, মীরকাশীম, রাণীভবানী, সীতারাম, গৌড় কাহিনী প্রভৃতি গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন। বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির ইনি অন্যতম কর্ণধার। অধ্যাপক যদুনাথ সরকার ইংরাজী ভাষায় 'ঔরঙ্গজেব' প্রভৃতি কয়েকখানি গ্রন্থ লিখিয়া যথেষ্ট প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। ইঁহার মৌলিক গবেষণা নিত্য নূতন তথ্যের আবিষ্কার করিতেছে। বিবিধ ভাষায় ইনি সুপণ্ডিত। দিঘাপাতিয়ার তৃতীয় রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় বরেন্দ্র ভূমির ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধানের জন্য যথেষ্ট শ্রম ও অর্থব্যয় করিতেছেন। লুপ্তপ্রায় কতগুলি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ নিজব্যয়ে ও সাহিত্য পারিষদের যোগে মুদ্রিত করিতেছেন। মোহনলাল নামে একখানি ঐতিহাসিক উপন্যাস ও আরো কয়েকখানি গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয়ের 'সেরপুরের ইতিহাস' এবং 'পৌণ্ড্রবর্দ্ধন ও করতোয়া', অধ্যাপক বৃন্দাবন ভট্টাচার্য্যের 'সারনাথ', ৺রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তীর গৌড়ের ইতিহাস, নাটোর মহারাজের নুরজাহান, হরিদাস পালিতের বিবিধ গ্রন্থ, বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি হইতে প্রকাশিত গৌড় রাজমালা ও গৌড়লেখ মালা এই বিভাগের বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। এতদ্ব্যতীত রায় সাহেব পঞ্চানন সরকার, শ্রীযুক্ত প্রভাসচন্দ্র সেন, ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ প্রভৃতি মহাশয়গণের গবেষণাপূর্ণ ও সারগর্ভ প্রবন্ধাদির কথাও এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে।

সঙ্গীত সাহিত্য

স্যার প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন "সঙ্গীত সাধনার উপায়, সঙ্গীত ভাবের পরিচায়ক, সঙ্গীত প্রাণের সরল প্রস্রবণ, সঙ্গীত প্রাণের ক্লান্তিক্লেদ অপনয়নকারী।" এই সঙ্গীত সাহিত্যেও উত্তরবঙ্গ বঙ্গের অন্যান্য অংশ অপেক্ষা পশ্চাতে পড়িয়া নাই। উত্তর বঙ্গের জাগের গান, সত্য পীরের গান, গম্ভীররা

গান প্রভৃতি সমগ্র বঙ্গের প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। পদাবলী সঙ্গীত প্রভৃতির রচয়িতা এত অধিক যে তাঁহাদের নামোল্লেখ করাও এ ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সম্ভবপর নহে। রাজসাহীর রাজকিশোর জালিয়া এবং রঙ্গপুরের রতিরামের রচিত জাগেরগান বিশেষ প্রসিদ্ধ। রতিরামের রচনা ইংরাজ আমলের প্রথমে। ইহাঁর উপমাদি সম্পূর্ণ নূতন ধরণের এবং ইহাঁর গানে সমসাময়িক ইতিহাস বর্ণিত হইয়াছে। কৃষ্ণহরি দাস, সত্যপীরের গান, জঙ্গনামা, নবিনামা প্রভৃতি গ্রন্থ হিন্দু মুসলমান ধর্মের সামঞ্জস্য চেষ্টায় রচনা করেন। গম্ভীরার গীত রচয়িত্রীগণের মধ্যে হরিমোহন কুণ্ডু, গোপালচন্দ্র দাস, মৃত্যুঞ্জয় হালদার, গদাধর দাস, পণ্ডিত আব্দুল জব্বর, ডাক্তার ৺ঠাকুরদাস দাস, ৺কৃষ্ণদাস, কিশোরীকান্ত চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। কান্তকবির কথা পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বিবিধ বিষয়ক কবিতা রচনা করিবার ইহাঁর যেমন অদ্ভুত শক্তি ছিল, গান গাহিয়া শ্রোতৃবর্গকে মুগ্ধ করিবারও তেমনি অসাধারণ ক্ষমতা ছিল রজনীকান্ত বাণী কল্যাণী, অমৃত, অভয়া আনন্দময়ী, বিশ্রাম প্রভৃতি সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। ইহাঁর রচিত কয়েকটী সঙ্গীত সমগ্র বঙ্গে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছে। ইনি "যেমন আলাপে তেমনি বিলাপে, তেমনি প্রলাপে" মানুষের, পৃথিবীর ও সমাজের পঙ্কিলতা দূর করিবার জন্য ইনি প্রাণপণে চেষ্টা করিয়াছেন। সংসারে থাকিয়া ধনরত্ন স্পৃহা পরিত্যাগ করিয়া কি প্রকারে শিক্ষা জ্ঞান ও সমাজ সংস্কারে জীবন ঢালিয়া দেওয়া যায় কবি রজনীকান্ত তাহার জলন্ত উদাহরণ।

মুসলমান সাহিত্যিক

মুসলমান সাহিত্যিকগণের মধ্যে মালদহের গোলাম হোসেন ও তদীয় শিষ্য ইলাহী বক্স এবং রঙ্গপুরের কবি কাজি হেয়াৎ মামুদের নাম বিশেষ প্রসিদ্ধ। গোলাম হোসেন 'রিয়াজয়ুস-সালাতিন' নামক বাংলার ইতিহাস পারস্য ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়। ইলাহী বক্স উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে জন্ম গ্রহণ করেন। ইনিও খুরসেদ জাঁহা নামক পৃথিবীর ইতিবৃত্ত সঙ্কলন করেন। হেয়াৎ মামুদের 'জাঙ্গনামা' 'অম্বিয়াবাণী' 'নবিনামা' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। মুসলমান প্রভাবে এদেশে যে ধর্ম্ম সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল, হেয়াৎ মামুদের উক্ত গ্রন্থগুলি এবং

পূর্ব্বোক্ত কৃষ্ণহরি দাসের গ্রন্থগুলিই তাহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন। কবি বরতাণ উল্লা দুইশত বৎসর পূর্ব্বে 'কেরামত নামা' এবং আমিরুদ্দিন বশুনিয়া প্রায় একশত বৎসর পূর্ব্বে 'আম্পারার-তফ্‌সির' গ্রন্থ রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থখানি কোরাণের অধ্যায় বিশেষের অনুবাদ। রঙ্গপুরের মৌলভী তসলীম উদ্দীন খান বাহাদুর অতি নিপুণতার সহিত সমগ্র কোরাণের বঙ্গানুবাদ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাঁর ন্যায় শিক্ষিত ও অমায়িক মুসলমান বিরল। ভূতপূর্ব্ব 'বাসনা' পত্রের সম্পাদক মুন্সী সেখ ফজলল করিম 'ত্রিস্রোতা' 'পরিত্রাণ' প্রভৃতি কাব্যের রচয়িতা। এই প্রসঙ্গে মির্জ্জা মহম্মদ ইয়ুসুফ আলি, দেওয়ান নসীরুদ্দীন আহম্মদ, মৌলভী সেখ রেয়াজুদ্দিন আহম্মদ, মুন্সী ছমিরউদ্দীন আহম্মদ, মৌলভী ডাক্তার ফজলর রহমান খাঁ প্রভৃতি আরো অনেক মুসলমান সাহিত্যিকের নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে।

বিবিধ।

সাধারণ ভাবে এইবার উত্তর-বঙ্গের আর কয়েকজন সাহিত্যিকের সংক্ষিপ্ত পরিচয় প্রদান করিব। সর্ব্বপ্রথম যাঁহার কথা উল্লেখ করিতেছি তিনি পরগণা কুণ্ডীর আদর্শ ভূমাধিকারী ৺রাজমোহন চৌধুরী। ইহাঁদেরই প্রযত্নে উত্তর-বঙ্গে শিক্ষা বিস্তারের সূচনা হয়। ইহাঁরই চেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রঙ্গপুরে প্রথম ইংরাজী বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ২৫৪ সালে "রঙ্গপুর বার্ত্তাবহ নামক মফঃস্বলের সর্ব্বপ্রথম সংবাদপত্রের সূচনা করিয়া ইনি সাহিত্য জগতে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছেন। ইনি বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। রাজমোহনের ভ্রাতুষ্পুত্র কবি কালীচন্দ্র যেমন সুকবি ছিলেন, তেমনি বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। 'প্রেমনাটক', 'স্বভাব দর্পণ' নামক কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়া গদ্য ও পদ্য উভয় রচনায় পথ প্রদর্শক হ'ন। বার্ত্তাবহের জীবন প্রতিষ্ঠা করিয়া রাজমোহন স্বর্গগমন করিলে কবি কালীচন্দ্রই অষ্টবর্ষকাল ইহার পরিচালনা করেন। ইহাঁরই পুরস্কার ঘোষণায় বাঙ্গলা ভাষার আদি নাটক 'কুলীন কুল সর্ব্বস্ব' এবং 'পতিব্রতোপাখ্যান' রচিত হয়। প্রভাকর সম্পাদক স্বয়ং কালীচন্দ্রের কিরূপ সম্মান করিতেন তাহার একটু আভাষ দিতেছি। কালীচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ অভিলাষী হইয়া একদিন ৺ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সুদূর কলিকাতা হইতে পথশ্রম স্বীকার পূর্ব্বক কালীচন্দ্রের গোপালপুরস্থ বাসভবনে আসিয়া উপস্থিত হন। কালীচন্দ্র তখন বহির্ব্বাটীতে ছিলেন না।

সংবাদ পাইয়া বৈঠকখানায় আসিয়া দেখেন প্রভাকর সম্পাদক তাঁহার সাক্ষাতাভিলাষী হইয়া বসিয়া আছেন। তিনি অমনিই বলিয়া উঠিলেন :—

'তুমিই ঈশ্বরগুপ্ত, দেহ আলিঙ্গন।'

ঈশ্বরচন্দ্র বিনয়ের সহিত উত্তর দিলেন—

'আলিঙ্গন যোগ্য নহি, দেহ শ্রীচরণ'

জাতীয় বঙ্গভাষার গঠন কার্য্যে কালীচন্দ্র যে সহায়তা করিয়াছেন তাহাতে ইনি বঙ্গ-সাহিত্য জগতে অমর হইয়া থাকিবেন। নীলকমল লাহিড়ী বিদ্যাসাগর রঙ্গপুর নলডাঙ্গার সুপ্রসিদ্ধ জমিদার বংশোদ্ভব। 'কালার্চ্চন চন্দ্রিকা' 'শক্তি ভক্তি রস কণিকা' নামক বহু গ্রন্থ ইনি রচনা করিয়াছেন। ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত শ্রীযুক্ত ভবানীপ্রসন্ন লাহিড়ী মহাশয় ইহাঁরই সুযোগ্য পুত্র। ইনিও গ্রন্থাদি রচনা করিয়াছেন। 'শিক্ষা বিজ্ঞান' 'নিগ্রোজাতির কর্ম্মবীর' 'বর্ত্তমান জগৎ' প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার মহাশয় উত্তরবঙ্গের আর একটি উজ্জ্বল রত্ন। ইঁহার পাণ্ডিত্য, সারল্য, সদ্ব্যবহার ও ত্যাগ আধুনিক যুগে বিশেষ দুর্লভ। শ্রীযুক্ত শশধর রায় এম্. এ, বি, এল্, বর্ত্তমান যুগের চিন্তাশীল লেখকগণের অন্যতম। বর্ত্তমানে ইনি মানবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছেন। ইনিই 'পরবশতা' নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচয়িতা। 'শান্তিনিকেতনে'র অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত শশধররায় এম. এ. বি. এল বর্ত্তমান যুগের চিন্তাশীল লেখকগণের অন্যতন। বর্ত্তমানে ইনি মানবতত্ত্ব ও সমাজতত্ত্ব লইয়া আলোচনা করিতেছেন। ইনিই 'পরবশতা' নামক বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের রচয়িতা। রাজসাহীর ৺সুরেশচন্দ্র সাহার নাম উল্লেখযোগ্য; ইনি "উৎসাহ" নামক মাসিকের সম্পাদক ও সুলেখক ছিলেন; ২১ বৎসর বয়সে ইঁহার মৃত্যু হয়; তাঁহার অকাল মৃত্যুতে বঙ্গসাহিত্য ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছে 'শান্তিনিকেতনের অন্যতম সম্পাদক শ্রীযুক্ত বিধুশেখর শাস্ত্রী 'মিলিন্দপঞ্হো' নামক পালি বৌদ্ধগ্রন্থের বঙ্গানুবাদ প্রকাশ করিয়াছেন। কুচবিহার হইতে প্রকাশিত, (বর্ত্তমানে) উত্তরবঙ্গের একমাত্র মাসিক পত্রিকা 'পরিচারিকা'র সহকারী সম্পাদক পাবনা জেলার শ্রীযুক্ত জানকীবল্লভ বিশ্বাস মহাশয় 'মনের বিষ' 'শোভা' প্রভৃতি উপন্যাস রচনা করিয়াছেন।

সিরাজগঞ্জের শ্রীযুক্ত দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য মহাশয়, 'জাতিভেদ' 'জলচল ও খাদ্যাখাদ্য বিচার' 'শূদ্রের পূজা ও বেদাধিকার' প্রভৃতি গ্রন্থরচনা করিয়া গবেষণাশক্তি ও অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়াছেন। "প্রকৃত জাতিভেদ জন্মগত নহে, পরন্তু গুণ ও কর্ম্মগত শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তিদ্বারা তিনি এই মত সমর্থন করিয়াছেন"। কুচবিহারের শ্রীযুক্ত ইন্দুভূষণ দে মজুমদার মহাশয় 'মার্কিণ যাত্রা' ও America through Hindu eyes নামক দুইখানি ভ্রমণবৃত্তান্ত লিখিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। পুরাকাহিনী, ইতিহাস বা গবেষণা ব্যতীত সোজা কথায় সহজ ভাষায় কেমন করিয়া একটী দেশ ও সেই দেশের জাতিকে জানিতে পারা যায় ইন্দুবাবুর গ্রন্থদ্বয় তাহার সুন্দর দৃষ্টান্ত। দিনাজপুরের শ্রীযুক্ত দুর্গাচরণ সান্যাল মহাশয়ের 'সামাজিক ইতিহাস' প্রসিদ্ধ যাত্রাদলের অধিনায়ক মতিলাল রায়ের বিবিধ গ্রন্থ, শ্রীযুক্তা প্রসন্নময়ী দেবীর বিবিধ কাব্যগ্রন্থ খোষালচন্দ্রের 'চৈতন্যচরিত', গিরীশচন্দ্র লাহিড়ীর 'ঋতু সংহার' ও 'রাণী শরৎসুন্দরীর জীবনী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ। রাজসাহীর রাজেন্দ্রলাল আচার্য্য ঐতিহাসিক প্রবন্ধ ও শিশুপাঠ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। উদীয়মান নবীন লেখকগণের মধ্যে শ্রীযুক্ত নলিনীমোহন রায় চৌধুরী, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী, শ্রীযুক্ত রাধাচরণ চক্রবর্ত্তী, প্রভৃতির নাম উল্লেখকরা যাইতে পারে।

সাহিত্যবিষয়ক সদনুষ্ঠান

সমগ্র উত্তরবঙ্গের সাহিত্যবিষয়ক সভাসমিতি, চিত্রশালা গ্রন্থাগার প্রভৃতি সাহিত্য বিষয়ক সদনুষ্ঠানের মধ্যে কয়েকটির মাত্র সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়া এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

(১) রঙ্গপুর সাহিত্য-পারিষদ

উত্তরবঙ্গের যে কয়েকটী শাখা পারিষদ স্থাপিত হইয়াছে তন্মধ্যে রঙ্গপুর সাহিত্য পারিষদের কার্য্য অতি সুন্দরভাবে নির্ব্বাহ হইতেছে। বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যাদির উদ্ধার এবং প্রত্নতত্ত্বাদির আলোচনাই এই শাখা পারিষদের কার্য্য। সন ১৩১২ সালের ১১ই বৈশাখ ২৮ জন মাত্র সদস্য লইয়া রঙ্গপুর নগরে বঙ্গীয় সাহিত্য পারিষদের প্রথম শাখা সভা স্থাপিত হয়। ধর্ম্ম, ইতিহাস, সঙ্গীত' কাব্য, ব্যাকরণ, প্রভৃতি বহু গ্রন্থ এই সভা হইতে মুদ্রিত ও

প্রকাশিত হইয়াছে। বহু ইষ্টক শিলালিপি, প্রস্তরমূর্ত্তি, প্রাচীন মুদ্রা, নানাবিধ শিল্পাদর্শ এবং উত্তরবঙ্গ ও আসামের নানা স্থান হইতে আনীত পুরাকীর্ত্তির আলোকচিত্রাদি এই সভার সংস্পৃষ্ট চিত্রশালার জন্য সংগৃহীত হইয়াছে। এই সভা বহু পুরস্কার প্রদান পূর্ব্বক বাঙ্গালা ভাষার প্রবন্ধাদি রচনায় উৎসাহপ্রদান করিতেছেন।

(২) বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি

বাঙ্গলার ইতিহাসের উপাদান সঙ্কলনের আশায় বরেন্দ্রমণ্ডলে ধারাবাহিকরূপে তথ্যানুসন্ধান করিবার জন্য দিঘাপাতিয়ার রাজকুমার শ্রীযুক্ত শরৎকুমার রায় এম, এ, মহাশয় ১৯১০ খৃঃ একটী বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতি গঠিত করিয়া তথ্যানুসন্ধানে ব্যাপৃত হইয়াছেন। অকাতর অর্থব্যয়ে, অক্লান্ত অধ্যবসায়ে, প্রশংসনীয় ইতিহাসানুরাগে অতি অল্প কালের মধ্যেই সমিতিকে তিনি সকলের নিকট পরিচিত করিয়া তুলিয়াছেন। অনুসন্ধানলব্ধ ও পূর্ব্বাবিষ্কৃত ঐতিহাসিক তথ্য একত্র সন্নিবিষ্ট করিয়া "গৌড়বিবরণ" আট ভাগে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত হইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। তন্মধ্যে "গৌড় রাজমালা" ও "গৌড় লেখমালা" প্রকাশিত হইয়াছে এই সম্পর্কে একটী আনন্দ ও শ্লাঘার কথা আমি না বলিয়া পারিতেছি না। কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাস প্রকাশ করিবার যে বিরাট আয়োজন হইয়াছে, বঙ্গদেশের ইতিহাস লিখিয়া সেই আয়োজনে সাহায্য করিবার ভার শ্রীযুক্ত অক্ষয়কুমার মৈত্রের নেতৃত্বে এই সমিতির উপর ন্যস্ত হইয়াছে। ইহা উত্তর বঙ্গের পক্ষে গৌরবের বিষয় সন্দেহ নাই।

(৩) মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতি

মালদহ শিক্ষা সমিতি এক্ষণে ভিন্নাকার ধারণ করিয়া মালদহ জাতীয় শিক্ষা সমিতিতে পরিণত হইয়াছে। ৺রাধেশচন্দ্র শেঠ, কলি গ্রামের নীরব সাহিত্য-সেবক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণচরণ সরকার, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত প্রভৃতি অন্যান্য কর্ম্মী সদস্যগণ, মালদহের পুরাতত্ত্ব ও ভৌগোলিক বিবরণাদি সঙ্কলনে বহুদূর অগ্রসর হইয়াছেন। ইহাঁদের যত্নে তথায় একটী চিত্রশালারও সূচনা হইয়াছে। নানা সংগ্রহ ও শিক্ষার প্রচার দ্বারা এই সমিতি এক্ষণে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এতদ্ব্যতীত কোচবিহার সাহিত্য-সভা, কামরূপ অনুসন্ধান সমিতির কথাও উল্লেখযোগ্য।

(৫) উত্তর বঙ্গ সাহিত্য সম্মিলন

সমগ্র উত্তর বঙ্গে সাহিত্যালোচনার বীজ অঙ্কুরিত করিবার জন্য রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদের নেতৃত্বে এবং শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরীর প্রাণপাত যত্নে বর্ষে বর্ষে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় এই সম্মিলনের অধিবেশন হইতেছে।

শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী

উত্তর বঙ্গের সাহিত্য সেবা প্রসঙ্গে সম্মিলনের স্থায়ী সম্পাদক শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রচন্দ্র রায় চৌধুরী মহাশয়ের সম্বন্ধে বিশেষভাবে কিছু না বলিলে অকৃতজ্ঞতার পরিচয় দেওয়া হইবে। ইনি কুণ্ডীর জমিদার প্রাগুক্ত রাজমোহনের পৌত্র। বংশগত সাহিত্যানুরাগের অধিকারী হইয়া উত্তর বঙ্গের নির্ব্বাণোন্মুখ সাহিত্যালোচনা পুনরুদ্দীপিত করেন। ইহাঁরই যত্নে ১৩১২ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পারিষদের প্রথম শাখা রঙ্গপুরে প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং তাহা হইতে ১৩১৪ সালে উত্তরবঙ্গ সাহিত্য-সম্মিলনের জন্ম হয়। অনেকগুলি দায়ীত্বপূর্ণ কার্য্যের ভার গ্রহণ করিয়াও এই উভয় অনুষ্ঠানের সম্পাদকত্ব নিজে বহন করিয়া অদ্বিতীয় কর্ম্ম-পটুতার পরিচয় দিতেছেন। ইহাঁর প্রবন্ধাদিও মাসিক পত্রে প্রকাশিত হইয়া থাকে। সম্প্রতি ইনি রঙ্গপুরের একখানি সুবৃহৎ ইতিহাস সঙ্কলনে নিযুক্ত আছেন। সংক্ষেপে এইটুকু মাত্র বলিতেছি, তিনি যে পুণ্যব্রত-গ্রহণ করিয়াছেন তাহার তুলনা নাই তাঁহাকে সমুচিত সাধুবাদ করিবার ভাষা আমার নাই। তাঁহার এই সাধু দৃষ্টান্ত সমগ্র উত্তরবঙ্গকে—তথা সমগ্র বঙ্গদেশকে গৌরবান্বিত করিয়া তুলিয়াছে।

উপসংহার

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে শুধু সময়ের সঙ্কীর্ণতার জন্যই আমি বর্ত্তমান প্রবন্ধের পূর্ণতার দিকে দৃষ্টি রাখিতে পারি নাই। এই অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় একটা বিরাট কার্য্যের পরিচয় দেওয়া একরূপ অসম্ভব। "উত্তরবঙ্গের সাহিত্য-সেবা" নামে আমি প্রণয়ন করিতে আরম্ভ করিয়াছি, তাহার সর্ব্বাঙ্গীন সম্পূর্ণতার দিকে লক্ষ্য রাখিতে বিশেষ প্রয়াস পাইতেছি। বলা বাহুল্য যে সমগ্র বঙ্গবাসীর সমবেত সাহায্য ভিন্ন এই আয়াসসাধ্য কার্য্য সম্পাদন অতীব কঠিন। আমি আশা করি আপনারা আমাকে সাহায্য করিবার উপলক্ষে মাতৃভূমির সুসন্তানের কার্য্য এবং প্রকৃতপক্ষে তাঁহারই সেবা করিতে যত্নবান্ হইবেন।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু।

দুঃখ।

(গান)

দুঃখ আমার বাল্য-দোসর
জন্ম-সোদর, সঙ্গী, সাথী।
তারি সাথে বসত আমার
এক-চালাতে দিবস রাতি।
নিদাঘ-দিনে রৌদ্র-তাপে রুদ্র হ'য়ে আসে সে
বর্ষা-আঁধার-ঘন-রাতে ঝঞ্ঝাবাতে হাসে সে
তুহিন-শীতে জর্জ্জরিয়া
জমায় সে মোর বুকের ছাতি।
মিলন ভেঙ্গে গড়ে' চির বিয়োগ ব্যথার কারাগার
হাসি গানের আল্পনাটি মুছিয়ে সে দেয় তিলক তার
ভাগ্যহীনের অগ্নিটীকা
দীপ্ত করি ললাট ভাতি।
রজ্জু আমায় গড়েছে এই রক্ত গোলাপ কাঁটায় ঘিরি,
কয়লা আমার রাঙিয়ে দেছে আগুণ দিয়ে বক্ষ চিরি,
কোরক আমার ফুটিয়ে দেছে
মরণ-মোহন-করাঘাতি।

শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়।

সুপাত্রে দান *

—:*:—

"ন্যাশনাল রিভিউ" (La Revue Nationale) ও "সচিত্র নবযুগের" (Le Nouveau Siecle Illustre) সম্পাদক হর্তো তাঁহার সম্পাদকীয় কামরাটিতে আমাকে অভ্যর্থনা করিয়া তাঁহার সম্পাদকীয় কেদারাতে গাঢ় ভাবে উপবিষ্ট হইয়া আমাকে বলিলেন—

"দেখ মার্স্তো নবযুগের "স্পেশাল" সংখ্যার জন্য তোমাকে একটা গল্প লিখে দিতে হচ্ছে—দেবে বল, লক্ষীটী ! নববর্ষের জন্য সেরেফ্ তিনশো লাইন। গল্পটী বেশ মজাদার হবে, আর তাতে 'সোসাইটী'র লোকদের কথা থাকবে।"

আমি হর্তোকে বলিলাম—"তুমি যে রকমটী চাচ্ছ, সে রকম গল্প লেখা ঠিক আমার আসে না—তবে গল্প তোমাকে একটা আমি লিখে দিতে পারি।"

তিনি বলিলেন—"কিন্তু সে গল্পটীর নাম হবে, ধনীদের গল্প।"

"আমি কিন্তু চাই যে তার নাম হয় গরীবদের গল্প।"

"আমিও তো তাই চাচ্ছি। এমন গল্পটী হবে যাতে গরীবদের জন্যে ধনীদের দয়া ও করুণার উদ্রেক হয়।"

"কিন্তু ঠিক ওইখানটীতেই আমার ঘোরতর আপত্তি। আমি চাই না যে ধনীরা গরীবদের দয়া করে।"

"আশ্চর্য্য !"

"না, আশ্চর্য্য নয়,—এটাই ঠিক, বিজ্ঞান সম্মত। আমার মতে গরীবদের জন্যে ধনীদের দয়া প্রকাশ তাদের কেবল অপমান করা,—তারা যে মানুষ, আর সে হিসেবে মানুষ যে মানুষের ভাই সেই সত্যটাকে অস্বীকার করা। তুমি যদি চাও যে ধনীদিগের আমি কোনও কথা বলি, তবে আমি বল্‌বো, 'অনুগ্রহ করে গরীবদিগে করবেন না,—আপনাদের দয়া থেকে"

---

* আনাতো যে ফ্রাঁস (Anatole France) হইতে অনুবাদিত।

তাদের বাঁচতে দিন, আপনাদের দয়ায় তাদের কোন দরকার নেই। দয়া কেন? ন্যায় কেন নয়? তাদের কাছে আপনাদের একটা হিসাব দেনা আছে। সে দেনা-পাওনা মেটান্ না কেন? এ শুধু 'সেন্টিমেন্টে'র কথা নয়--দস্তুর মত অর্থতন্ত্রের কথা। আপনারা দয়া করে তাদের যা' দান করেন তাতে যদি তাদের দারিদ্র্য আরও বেড়ে চলে, আর আপনাদের ধনের বৃদ্ধি হতে থাকে, তবে সে দান ন্যায়ানুমোদিত নয়—সেই দানের সঙ্গে যে পরিমাণে অশ্রুর সংমিশ্রণ ঘটে তাতে তাকে ন্যায় মত দান বলা যায় না,তাতে বিচার নেই! আপনাদিগে সমস্ত ফিরিয়ে দিতে হবে। কিন্তু তা না করে আপনারা ভিক্ষে দেন--যাতে আর ফিরিয়ে দিতে না হয়। বন্ধুকে রাখবার জন্য আপনারা অল্প দেন, আর তাকে দান আখ্যা দিয়ে বাহবা নেন আর আত্মপ্রসাদ উপভোগ করেন। ঠিক এই জন্যেই সামসের টাইরাণ্ট (Tyrant of Seemos) সমুদ্রে তাঁর অঙ্গুরীয় নিক্ষেপ করেছিলেন, কিন্তু দেবতারা তাঁর সে দান গ্রহণ না করে জেলের হাত দিয়ে মাছের পেটের ভিতরকার আঙটীটা তাঁকে ফেরত দিলেন। আর তাঁর সমস্ত ধন নিঃশেষিত হ'ল।"

"তুমি তামাসা কচ্ছো।"

"না, আমি তামাসা কচ্চিনে মোটেই। আমি ধনীদিগকে বুঝিয়ে দিতে চাই যে তাঁরা সস্তায় দাতা মহানুভব হ'তে চান, তাঁদের মহানুভবতায় তাঁদের খরচ খুব কমই হয়---এতে কেবল উত্তমর্ণের ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত হয় মাত্র—আর এই ধরণে কখনও কাজ চলে না। আমার এই মত হয় তো তাঁদের কাজে আসতে পারে।"

"আর এই সব 'আইডিয়া' তুমি 'নবযুগে' প্রকাশ করে এর কাটতি বাড়াতে চাও? না, বন্ধু, একটুও সুবিধে হবে না, একটুও নয়।"

"আর তোমারই এত কেন জিদ যে ধনীরা অন্য ধনী আর প্রতাপশালী লোকের সঙ্গে যে ভঙ্গীতে ব্যবহার করে, গরীবদের সঙ্গে ব্যবহারে তা'র ব্যতিক্রম হবে? ধনীদের কাছে তাঁর যা দেনা আছে তা' তিনি দেন, আর কিছু দেনা না থাকলে দেবেন না—এই হ'ল সোজা কথা আর সাধু। আর তিনি যদি সাধু হ'ন, তবে গরীবদের সঙ্গে ঠিক সেই ব্যবহারই করুন। শপথ বলো না যে ধনীরা গরীবদের কাছে ঋণী নন। আমি বিশ্বাস করি না যে একজনও ধনী এই রকম ভাবেন। মত ভেদ হচ্ছে কেবল সেই প্রশ্ন নিয়ে যে এই দেনার পরিমাণটা কত?

প্রশ্নটাকে না নেড়েচেড়ে চাপাচুপি দিয়ে রাখতে পারলেই যেন ভাল হয়—আর এই সমস্যা সমাধানে কারুরই বড় একটা তাড়া দেখা যায় না। প্রত্যেকেই কিন্তু বেশ জানেন যে তিনি ঋণী। কিন্তু তাঁর ঋণ কতখানি তা' তিনি জানেন না, আর তাই শোধ দিয়ে হিসেব ঠিক রাখবার জন্যে থেকে থেকে কিছু ক'রে দেওয়া হয়। আবার তাকেই বলা হয় মানবপ্রীতি 'Philanthropoy',—লাভের কারবার বটে!"

"কিন্তু, ভাই হে, তুমি যা বলছো তাতে কোন Common sense নেই। আমি হয় তো তোমার চেয়ে একটু বেশী Socialist, কিন্তু তোমার চেয়ে আমার ব্যবসায় বুদ্ধি কিছু বেশী আছে—তোমার চেয়ে আমি বেশী practical। যন্ত্রণার যদি এতটুকুও উপশম হয়, জীবনের মাত্রা যদি এতটুকুও বাড়ান যায়, সামাজিক অবিচারের যদি এতটুকুও প্রতিবিধান হয়—তা হলেও একটা ফল হ'ল তো। যে সামান্য উপকার একজন করলে,—তা' সামান্য হ'লেও করা হ'ল তো? এটা সবই নয় সত্যি, কতকটা তো বটে। যে গল্পটা তোমাকে লিখতে বলচি, তা' যদি আমার ধনী গ্রাহকদের ভিতর একশো জনেরও হৃদয়স্পর্শ ক'রে তাদের ভিতরে দানের প্রবৃত্তিকে উৎপাটিত ক'রে দেয়, তা হ'লেও মন্দের কতকটা কমবে তো, যন্ত্রণার কতকটা উপশম হ'বে তো। এই রকমে একটু একটু করে গরীবদের দুর্ব্বহ জীবন কতকটা সহনীয় হ'য়ে উঠবে"

"গরীবদের দুর্ভাগ্য এই রকম ক'রে সহনীয় হ'য়ে ওঠাই কি বাঞ্ছনীয়? ধনের পক্ষে দারিদ্র্য ও দারিদ্র্যের পক্ষে ধন অবশ্য থাকতে হ'বে—একের সংস্থিতির জন্য অন্যের সংস্থিতি অবশ্য প্রয়োজনীয়। উভয়ই মন্দ পরস্পর হ'তে পরস্পরের উদ্ভব ও প্রসার। দরিদ্রের অবস্থার উন্নতির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন আছে সেই অবস্থার দমনে। আমি ধনীকে ভিক্ষা দিতে প্ররোচিত কোরব না, কেন না সেই ভিক্ষা, ভিক্ষা নয়,—কেন না সেই ভিক্ষায় দাতার মঙ্গল হয়, গ্রহীতার সর্ব্বনাশ হয়; কেন না—এক কথায়, যে ধন স্বভাবতঃ নিষ্ঠুর, তাকে প্রবঞ্চনাপূর্ণ দয়ার ছদ্মবেশ মাত্র দিতে নেই। তুমি যখন নেহাতই আমাকে ধনীদের জন্য একটা গল্প লিখতে অনুরোধ করছো তখন আমি তাদিগে বলব—আপনাদের গরীব আপনাদের কুকুর—তাদিগে খেতে দিলেই তা'রা আপনাদিগে কামড়াবে। সম্পত্তি যাদের আছে

তাদের পক্ষে ওরা ভাল কুত্তা।—যারা চায়, ধনীরা তাদিগেই দেন। যারা কাজ করে, তা'রা কিছু চায়ও না; তা'রা পায়ও না।"

"কিন্তু যারা দুর্ব্বল, যারা বুড়ো, যারা অনাথ তারা?"...

"হাঁ, তাদের বাঁচবার অধিকার আছে। তাদের জন্যে আমি দয়ার উদ্রেক করাতে চাইনে; আমি চাই—বিচার।"

"দেখ, এ সব খালি 'থিওরি' নিয়ে ক্ষ্যাপামো! ওসব ছেড়েছুড়ে দিয়ে এখন কও কাজের কথা। তুমি আমাকে নববর্ষের জন্য একটা গল্প লিখে দেবে, বুঝ্‌লে? তাতে তুমি সোস্যালিজ্‌মের একটু আধটু আমদানি করতে পার, আজকাল সোস্যালিজ্‌ম্ বেশ ফ্যাশনেবল্ (Fashionable) হয়েছে—ফ্যাশনেবল্‌ই বা কেন, একটু বিশেষত্বের মধ্যেই ওকে ধরা যায়। হাঁ, আর দেখ, তোমার গল্পের ভিতরে দু' একটা কচি মুখ থাকলে ভাল হয়। তার চিত্র দিয়ে দেব'খন; পাঠকেরা চান যেন ছবিগুলি বেশ মিষ্টি মিষ্টি হয়। তোমার প্লটের ভেতরে বালিকার আমদানি কোরো—চিত্ত চমৎকারিনী একটা বালিকার, বুঝেছো তো? আর তা' করা শক্তও হবে না।"

"না, শক্ত হবে না।"

"আর একটা চিমনিঝাড়া ছোঁড়াকে ঢোকাতে পার না তোমার গল্পে? আমার কাছে একটা রঙীন ছবি আছে। সেটা কি জানো? একটা বালিকা একটা সিঁড়ি থেকে সেই চিমণিঝাড়া ছোঁড়াটাকে ভিক্ষে দিচ্চে। সেই ছবিটাকে তা হ'লে বেশ চালিয়ে দিতে পারি, হাঁ। বেশ সুবিধে হবে 'খন,.......খুব কনকনে শীত......বরফ পড়ছে.........সেই সুন্দরী বালিকাটী ছোঁড়াটার হাতে একটা পয়সা ফেলে দিচ্চে—কি, ছবিটা তোমার চোখের সামনে ভেসে উঠছে তো?"

"হাঁ, দেখতে পাচ্ছি।"

"তোমাকে তো মাল মশলা দিয়ে দিলাম, এখন তুমি একে গড়ে তোলো।"

"তা তুলবো বই কি? সেই ছোট ছেলেটী ভিক্ষে পেয়ে কৃতজ্ঞতার আত্মহারা হয়ে বাহুযুগল দিয়ে বালিকাটীর গ্রীবা বেষ্টন করে ফেল্লে। বালিকাটী হচ্চে লিনোতের কাউন্টের

কন্যা। ফুটফুটে সেই মেয়েটীর গালে চুম্বন করে ঝুলের ক্ষুদ্র একটী শূণ্য o মুদ্রিত করে' দিলে; সুন্দর, নিখুঁত, নিভাঁজ গোল ক্ষুদ্র একটী o, যেমন গোল, তেমনি কালো। ছেলেটী মেয়েটীকে ভালবেসে ফেলেছে। মেয়েটীও এত খাঁটি এমন প্রাণভরা আসক্তিকে উপেক্ষা করতে পাল্লে না।.........কেমন, বেশ 'প্যাথেটিক" (Pathetic) হয়ে দাঁড়াচ্চে তো ?"

"হ্যাঁ, বেশ হচ্ছে। তুমি এটাকে কিছু একটা করে তুলতে পারবে।"

"তা হ'লে তুমি আমাকে বলে যেতে উৎসাহিত কোরছো। তারপর মেয়েটী তার প্রকাণ্ড প্রাসাদতুল্য বাড়ীতে ফিরে এসে জীবনে এই প্রথম মুখ ধুয়ে ফেলতে আপত্তি কল্লে; সেই ঠোঁট দুটীর ছাপ সে কিছুতেই মুছে ফেলতে দেবে না। এ ধারে সেই চিমনিঝাড়া ছেলেটী পিছু পিছু তার দরজা পর্য্যন্ত এসেছে। ভালবাসার আনন্দে বিভোর হয়ে তার আরাধনার দেবতা সেই বালিকাটীর জানালার নীচে মুগ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে রয়েছে.........কেমন, হবে এতে ?"

"এঁ্যা, হ্যাঁ—বেশ !"

"তা হ'লে আমি চলি, কি বল ? পরদিন সকাল বেলায় মেয়েটী তার শাদা ধবধবে শুভ্র শয্যাটীতে শুয়ে আছে, এমন সময় দেখতে পেলে, যে ছেলেটা চিমনি বেয়ে নীচে নেমে এল। বিশেষ কোন গৌরচন্দ্রিকা না করেই ছেলেটী ফুটফুটে সেই মেয়েটার উপর পড়েই কালো ঝুলের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গোল o মুদ্রণ করে দিলে। হ্যাঁ, তোমায় বলতে ভুলে গেছি যে ছেলেটী দেখতে বড় সুন্দর। যখন সে এই মনোহর কাজটীতে ব্যস্ত তখন মেয়েটীর মা, কাউণ্টেস এসে পড়ে একেবারে অবাক্—তারপর চীৎকার, সর্ব্বনাশ হ'লো গো, কে কোথায় আছ ? কিন্তু ছেলেটী এতই অভিনিবিষ্ট, যে সে দেখতেও পেলে না, শুনতেও পেলে না।"

"মার্জো, মার্জো,——"

"হাঁ সে এতই অভিনিবিষ্ট যে সে না পেলে দেখতে না পেলে শুনতে। এমন সময়ে তাড়াতাড়ি কাউণ্ট সেই ঘরে প্রবেশ করলেন। খাঁটী অ্যারিষ্টোক্র্যাটের (Aristocrat) হৃদয় তাঁর। পেণ্টুলেন ধরে তিনি ছোঁড়াটাকে তুলে ফেল্লেন.........আর ধপাস্ ক'রে জানালা গলিয়ে ফেলে দিলেন"—

"বলি মার্জো—"

"আরে, শেষই ক'র্ত্তে দাও ..। ন' মাস পরে সেই ছেলেটী উচ্চবংশজাত সেই মেয়েটীকে বিয়ে ক'ল্লে। আর সময় ও ঠিক উপযুক্ত হয়েছিল। সুপাত্রে দান করার ফল ফল্‌ল।"

"দেখ মার্স্তো, আমার ওপর দিয়ে খুব এক চোট তুমি আমোদ ক'রে নিলে যা হোক।"

"একটুকুও নয়। আমাকে শেষ করতে হচ্ছে। এই উঁচু ঘরের মেয়েটীকে বিয়ে ক'রে ছেলেটী কাউন্ট হ'ল তার পরে ঘোড়দৌড়ের বাজি খেলে তার সর্ব্বনাশ হ'ল। আজ সে রু দ্য ল গেএটিতে 'ষ্টোভ' বেচে। তার স্ত্রীই এখন কেনাবেচা করে,—দোকান দেখে; ষ্টোভ পিছু আঠারো ফ্রাঙ্ক দাম নেয়, আট মাসে দিলেই চলে।"

"ভাই মার্স্তো, মোটেই এটা আমোদজনক হ'লনা।"

"সাবধান, মর্স্তো। আমি যা বল্লাম, সে মার্ত্তিন আর পালদ্রো দ্য ভিনি তাই বলে গেছেন তাঁদেরই এ গল্প। আর সব দিক দেখতে গেলে তোমার প্যানপেনে কাঁদুনে গল্পের চেয়ে অনেক ভাল; যে গল্প পড়লে লোকেরা আত্মবঞ্চিত হয়ে ভাবে বুঝি তারা সত্যি সত্যিই বড় দয়ালু যখন তারা এতটুকু ও দয়ার ধার ধারে না; তারা বুঝি একটা মস্ত উপকার করচে যখন তার ধার দিয়েও যায় না; আর যে মহানুভব হওয়া জগতের মধ্যে সকলের চেয়ে কঠিন সেই মহানুভব তা'রা হয়ে প'ড়েছে। বিশেষতঃ আমার গল্পে একটা নীতি পাবে। আর গল্পের চেষ্টাও বেশ সুখের। কেন না, তার দোকানে ব'সে সেই মেয়েটী সুখের আস্বাদন পেয়েছিল—যে সুখের সন্ধানে, কোনও কাউন্ট বা বড় অফিসারকে বিয়ে করে, হাজার ঘুরে বেড়ালেও সে পেত না। কেমন সম্পাদক ম'শায়, 'নবযুগের' জন্য গল্পটা পছন্দ হ'ল তো?"

"সত্যি সত্যিই তুমি seriously বলছো?"

"হাঁ, সত্যিই—seriously। তুমি যদি আমার গল্প না নাও, আমি অন্যত্র ছাপাব।"

"বলি, কোথায়?"

"কোন উচ্চদরের পত্রিকাতে।"

"আচ্ছা দেখা যাবে—আমি challenge করছি।"

"বেশ দেখো।"

তাহার পরে গল্পটী ফিগারো (Figaro) তে ছাপা হইয়াছিল। উহা ঐ পত্রিকার পাঠকগণকে নববর্ষের উপহার স্বরূপ প্রদত্ত হইয়াছিল।

শ্রীকালীপদ মিত্র।

পাপিয়া।

—:*:

ওরে ও অভাগা পাখী ওরে প্রবঞ্চিত,
জন্মে জন্মে যত্ন করি রাখিলি সঞ্চিত
হৃদি-শতদলতলে যেই পরিমল—
প্রেমের অমিয় সেই—ওরে যে চঞ্চল,
ওরে মত্ত, অন্ধ তুই, ক্ষণেকের তরে
দেখিলি যে অজানারে, অচেনা প্রান্তরে,
তারেই সঁপিয়া দিলি, দিলি প্রাণমন,
দিলি সব সাধ আশা জীবন-যৌবন!—
বুঝিলি না, পরক্ষণে কোথা মিলাইল
তোর সে বিদেশী পান্থ!—এ বিশ্ব নিখিল
খুঁজিলি তাহারি লাগি! বিদীর্ণ করিয়া
বক্ষের পঞ্জর তোর দিগন্ত ভরিয়া
ছুটিল নৈরাশ্য-ধ্বনি—কাতর নিস্বন!
আজো থামিল না, আজো বিস্মরণ
হলি না সে বিদেশীরে। হতাশ-হুতাশ
নিভিল না বুকে তোর, তবু তারে চাস্?
মৃত আশা, মৃত্যুঞ্জয় দুঃখ তোর কি যে?
জন্মান্তেও আর কভু পাবি না তো ফিরে!

শ্রীক্ষেত্রলাল সাহা।

স্বাস্থ্যের কথা।

অনিদ্রা।

সমস্ত দিন কাজ কর্ম্ম করিবার পর রাত্রিতে, বিশ্রামের সময়, যিনি নিদ্রাসুখ উপভোগ করিতে পান না, তাঁহার মত দুর্ভাগ্য লোক পৃথিবীতে খুব কমই আছে। যাঁহারা রাত্রিতে কাজ করিতে বাধ্য হ'ন, কাজের জন্য যাঁহারা রাত্রিতে ঘুমাইতে পান না, তাঁহাদের কথা অবশ্য স্বতন্ত্র। কিন্তু যাঁহাদের রাত্রিতে কোন কাজ করিতে হয় না, বিশ্রামের যথেষ্ট সময় থাকে—তাঁহারা যদি সুখ শয্যায় শয়ন করিয়াও ঘুমাইতে না পারেন, তাহা হইলে তাঁহাদের অবস্থা বড়ই খারাপ বলিতে হইবে। বস্তুতঃ এরূপ অনিদ্রা একটা রোগ মাত্র। ইংরেজীতে ইহার নাম Insomnia। ইহার চরম পরিণতি উন্মাদ রোগ। সুতরাং এই অনিদ্রা বা Insomnia রোগের সময় থাকিতে সুচিকিৎসা করা আবশ্যক। নচেৎ তাহার পরিণাম বড়ই ভীষণ হইতে পারে।

অনিদ্রা রোগ দুই প্রকার আছে। এক, স্থায়ী; অপর, অস্থায়ী। এই দ্বিতীয় শ্রেণীর অনিদ্রা রোগ তত মারাত্মক নহে। কিন্তু তাহার প্রতিকারের ব্যবস্থা না করিলে, তাহাই অবশেষে স্থায়ী অনিদ্রা রোগে পরিণত হইতে পারে।

অস্থায়ী অনিদ্রা রোগ সাময়িক উত্তেজনার ফল। ইহার চিকিৎসাও তেমন কঠিন নয়। রোগের কারণ—উত্তেজনা দূর করিতে পারিলেও, রোগও আরাম হইয়া যায়। কিন্তু রোগ ঠিক আরাম হইল কি না, তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। অর্থাৎ, ঠিক কি কারণে অস্থায়ী অনিদ্রা রোগ জন্মে, তাহা সব সময়ে ধরিতে পারা যায় না। কাজেই আন্দাজি একটা কারণ খাড়া করিয়া, তাহার প্রতিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া, অনেকে মনে করিয়া থাকেন, যথেষ্ট করা হইল। তাঁহারা নিদ্রা যান বটে, কিন্তু সুনিদ্রা তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটে না। তাঁহাদের নিদ্রা তন্দ্রার নামান্তর মাত্র—রাত্রিতে অনেক বার ঘুম ভাঙ্গিয়া যায়, কিম্বা সমস্ত নিদ্রার সময়টাতেই তাঁহারা নানারূপ উৎকট স্বপ্ন দেখিয়া থাকেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যাঁহারা এইরূপ অনিদ্রা রোগ হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছেন বলিয়া মনে করেন, তাঁহাদের প্রত্যেকের নিজের নিজের আবিষ্কৃত এক একটী করিয়া নিজস্ব এবং বিশিষ্ট চিকিৎসা প্রণালী আছে; অর্থাৎ, যতগুলি রোগী, ততগুলি চিকিৎসা প্রণালী। এবং প্রত্যেকেরই চিকিৎসা প্রণালী, তাঁহার নিজের মতে একেবারে অব্যর্থ। অপর কাহারও অনিদ্রা রোগ হইয়াছে শুনিলে, তাঁহারা তাঁহাদের নিজস্ব চিকিৎসা প্রণালীটি prescribe করিয়া থাকেন; এবং ভরসা দেন যে, তাঁহার কথা শুনিলে রোগ যে নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে, তাহাতে আর লেশ মাত্র সন্দেহের অবকাশ নাই।

স্থায়ী বা দীর্ঘকাল ব্যাপী অনিদ্রা রোগ যেমন কঠিন, তাহার চিকিৎসাও সেইরূপ কঠিন। স্থায়ী অনিদ্রা রোগ নানা কারণে ঘটিতে পারে। তন্মধ্যে কয়েকটি সাধারণ কারণ এই—যাঁহাদিগকে প্রত্যহ অত্যধিক পরিমাণে মানসিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাঁহারা অনেক সময়ে অনিদ্রা রোগে কষ্ট পাইয়া থাকেন। অলসতা শারীরিক শ্রমবিমুখতা অনিদ্রা রোগের অপর একটী কারণ। দুশ্চিন্তাও যথেষ্ট পরিমাণে সুনিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাইয়া থাকে। গোপনে পাপের অনুষ্ঠান করিলেও লোকে মনে মনে বৃশ্চিক-দংশন-যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে, এবং নিদ্রাসুখ ভোগে বঞ্চিত হয়। দারিদ্র্যজনিত মানসিক উদ্বেগ—স্ত্রীপুত্র পরিবারাদির ভরণ পোষণে অসমর্থতা নিদ্রাহীনতার অন্যতম কারণ। সুচিকিৎসার দ্বারা, এবং ক্ষেত্র বিশেষে রোগের কারণ দূর করিয়া, এই শ্রেণীর অনিদ্রা রোগ নিবারণ করা যাইতে পারে। উঠিলেই কেবল নিদ্রাকারক ঔষধের দ্বারা কৃত্রিম নিদ্রার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

কোন কোন চিকিৎসক পরামর্শ দেন যে, যাঁহারা প্রতি রাত্রিতেই অনিদ্রার কষ্ট ভোগ করেন, তাঁহারা, অন্ততঃ তাঁহাদের মধ্যে কতক লোকে, চেষ্টা করিলে নিজেকে সম্মোহিত hypnotize করিয়া কৃত্রিম নিদ্রা আনয়ন করিতে পারেন; এবং ক্রমে তাহা অভ্যাসে পরিণত হইয়া স্বাভাবিক সুনিদ্রায় পরিণত হইতে পারে। কিন্তু সকলের পক্ষে এই একই নিয়ম খাটে না। অনেকে নিজেকে সম্মোহিত করিবার চেষ্টা করিতে গেলে, উল্টা ফলের উৎপত্তি হইতে পারে—তাঁহারা চিরদিনের জন্য নিদ্রায় বঞ্চিত হইতে বাধ্য হন। অতএব এরূপ অস্বাভাবিক চেষ্টা না করাই ভাল।

অনেকে আবার বলিয়া থাকেন, মনকে একাগ্র করিতে পারিলে নিদ্রা আসিতে পারে। এক্ষেত্রেও কিন্তু hypnotize করিবার চেষ্টার মত উল্টা ফল ফলিতে দেখা যায়। মনকে একাগ্র করিবার চেষ্টা করিতে গিয়া ঘুমের দফায় একেবারে নিশ্চিন্ত হইয়া বসিতে হয়।

চিকিৎসা শাস্ত্রে নিদ্রাকারক অনেক ঔষধ আছে। কিন্তু হিসাব মত ধরিতে গেলে, সেই সকল ঔষধ নিদ্রা আনয়নে সমর্থ নহে। তদ্দ্বারা শারীর যন্ত্রের কার্য্য স্থগিত থাকিয়া নিদ্রার মত একটা অবস্থা হয় মাত্র; তাহা প্রকৃত নিদ্রা নহে। বিশেষ গুরুতর কারণ ব্যতীত এরূপ ভাবে ঔষধের সাহায্যে কৃত্রিম নিদ্রার সৃষ্টি করিবার চেষ্টা করা কর্ত্তব্য নহে। অপর কোন কঠিন রোগের দরুণ রোগীর নিদ্রা না হইলে, এবং রোগীকে নিদ্রিত করা সেই রোগের চিকিৎসার জন্যই বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিলেই কেবল নিদ্রাকর ঔষধের দ্বারা কৃত্রিম নিদ্রার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে কিন্তু কেহ অন্য সকল রকমে সম্পূর্ণ সুস্থ থাকিলে, এবং কেবল অনিদ্রা তাহার একমাত্র পীড়া হইলে, তাহার জন্য স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত করিতে হয়।

অতিরিক্ত মানসিক পরিশ্রম করিলে বেশী পরিমাণে রক্ত মস্তিষ্কে সঞ্চালিত হইয়া নিদ্রার ব্যাঘাত জন্মায়। এ রকম স্থলে রক্তের গতি মস্তিষ্ক হইতে শরীরের অপর অংশে ফিরাইতে পারিলে, মস্তিষ্ক শীতল হইয়া সুনিদ্রা হইতে পারে। স্বাভাবিক উপায়ে রক্তের গতির পরিবর্ত্তন সাধন করিতে পারিলে তাহার ফল অতি শুভ হইয়া থাকে।

সে উপায় কি? উপায়টি অতি সহজ। সকলেই এই উপায় অবলম্বন করিতে পারিবেন। শয়নের পূর্ব্বে সামান্য ভাবে একটু অঙ্গ সঞ্চলন করিয়া (অর্থাৎ ব্যায়াম করিয়া) শয়ন করিলে অচিরে গাঢ় সুখনিদ্রায় আচ্ছন্ন হইতে পারা যায়। ব্যায়ামের পূর্ব্বে কিঞ্চিৎ গরম জলে (সামান্য একটু অডিকোলণ মিশাইয়া লইলে আরও ভাল হয়) মুখ, হাত, পা উত্তম রূপে ধৌত করিয়া লইতে হইবে। এই হাত মুখ ধৌত করিলেই শরীর এমন স্নিগ্ধ হইবে যে, তাহাতে এক ঘণ্টা সুনিদ্রার কাজ হইবে। তার পর মিনিট কুড়ি ধরিয়া চুলগুলি একবার বুরুষে করিয়া আঁচড়াইয়া লইলে, মস্তিষ্কের শ্রান্তি অনেক পরিমাণে দূর হইবে। তারপর ব্যায়াম করিবেন। ব্যায়াম এমন ভাবে করিবেন, যেন সকল অঙ্গই অল্প পরিমাণে সঞ্চালিত

হইতে পারে তাহাতে মস্তিষ্ক হইতে অতিরিক্ত রক্ত সর্ব্বশরীরে সঞ্চালিত হইয়া মস্তিষ্কের উপর রক্তের চাপ কমিয়া আসিবে। ব্যায়ামের পর শরীর উত্তমরূপে আচ্ছাদিত করিয়া এক গ্লাস গরম দুধ—অভাবে অন্ততঃ এক গ্লাস গরম জল পান করিবেন। তৎসহ সামান্য কিছু জলযোগ করিতে পারিলে আরও ভাল।

ইহার সঙ্গে আরও দুই একটী কাজ করিতে হইবে। শয়ন করিবার কিছুক্ষণ (অন্ততঃ ঘণ্টা খানেক) পূর্ব্ব হইতে গৃহমধ্যে বিশুদ্ধ বায়ুর অবাধ সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিতে হইবে সুনিদ্রা আনয়নের পক্ষে ইহা অতীব আবশ্যক—অনিবার্য্য বলিলেও চলে। শয়ন করিবার পরও যেন ঘরের দুইটী, অন্ততঃ একটী জানালা সমস্ত রাত খোলা থাকে। কি শীত, কি গ্রীষ্ম সকল ঋতুতেই জানালা খোলা রাখিয়া শয়ন করা সুনিদ্রার পক্ষে ত বটেই,—সাধারণ স্বাস্থ্যরক্ষার পক্ষেও পরম হিতকর। ইহাতে কোনই অনিষ্টের সম্ভাবনা নাই, বরং সমধিক উপকারই আছে। তবে অভ্যাস বশতঃ, শীতকালে ঘরের জানালা খোলা রাখিয়া শয়ন করিলে, হিম লাগিয়া যাঁহাদের সর্দ্দি হইবার সম্ভাবনা আছে, তাঁহারা নাসিকা, কিম্বা মুখ খালি রাখিয়া, আপদ-মস্তক গরম শীত-বস্ত্রে আবৃত করিয়া নিদ্রা যাইতে পারেন। বর্ষাকালে বৃষ্টির জল ঘরের মধ্যে আসিয়া ঘরদ্বার ভিজাইয়া দিবার সম্ভাবনা থাকিলে, যে দিকে বৃষ্টির ঝাট আসিতে পারিবে না, সেই দিকের জানালা খুলিয়া রাখিবে না। কিন্তু বর্ষা কালের সজল বায়ু যাঁহাদের সহ্য না হইবে, তাঁহারা কেবল মুখের সম্মুখভাগ খোলা রাখিয়া, দেহের অপর সকল অংশ একখানি মোটা চাদরে আবৃত করিয়া রাখিয়া স্বচ্ছন্দে নিদ্রা যাইতে পারেন। মোটের উপর, দিবারাত্রি ঘরের জানালা দরজা খোলা রাখিয়া, ঘরের মধ্যে মুক্ত বিশুদ্ধ বায়ু সঞ্চালনের ব্যবস্থা করিয়া রাখিলে, অপকারের অপেক্ষা উপকারই অনেক বেশী। তবে অভ্যাস বশতঃ অনেকের হিম, বা বর্ষার ঠাণ্ডা জোলো হাওয়া সহ্য হয় না। সে ক্ষেত্রে সর্ব্বাঙ্গ আবৃত করিয়া শয়ন করা যাইতে পারে। তবে নিশ্বাস প্রশ্বাস যেন অব্যাহত থাকে। নচেৎ জানালা খুলিয়া রাখিবার উদ্দেশ্য পণ্ড হইয়া যাইবে।

শয়ন করিবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বা শয়ন করিবার পর ১০।১৫ মিনিট ধরিয়া চেষ্টা করিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ করিলে, অর্দ্ধেক ব্যায়ামের কাজ হইবে। এই দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ একটু চেষ্টা-

সাপেক্ষ। ধীরে ধীরে দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবেন, এবং যতটা পারেন, নাসিকা পথে বায়ু টানিয়া লইবেন। এবং যেটুকু বায়ু শ্বাস কালে ত্যাগ করিবেন। দীর্ঘ নিশ্বাস টানিবার সময় সমস্ত শরীর ঋজু ভাবে রাখা বর্ত্তব্য। শয়নের পূর্ব্বে হইলে, সোজা ভাবে দাঁড়াইয়া মাথা খাড়া রাখিয়া শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ করিবেন। এ সময়ে যেন শরীরের কোন অংশ বাঁকিয়া বা কোঁচকাইয়া না থাকে—পিঠ যেন কুঁজো হইয়া না থাকে। শয়ন করিবার পর হইলে, মাথার বালিশ সরাইয়া রাখিয়া, কেবল বিছানার উপর ঋজু ভাবে পড়িয়া থাকিবেন। ১০।১৫ মিনিট অভ্যাস করিতে বলা গেল বটে, কিছু দিন নিয়মিত ভাবে এই ব্যায়াম করিলে, কতক্ষণ দীর্ঘ শ্বাস গ্রহণ করা উচিত তাহা নিজেই স্থির করিয়া লইতে পারিবেন;—সহজেই বুঝিতে পারিবেন, সমস্ত শরীরে বেশ একটু স্বাচ্ছন্দ্যের ভাব আসিয়াছে—রক্ত সঞ্চালন ক্রিয়া সর্ব্বশরীরে সুন্দর ও সুনিয়মিত ভাবে হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এইটী বুঝিতে পারিলেই জানিবেন, যথেষ্ট ব্যায়াম হইয়াছে।

তারপর, শারীরিক ব্যায়াম কি ভাবে করিতে হইবে, তাহাও এখানে বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া যাইতেছে। যখন বুঝিবেন, দীর্ঘ নিশ্বাস গ্রহণ কার্য্য সম্পূর্ণ হইয়াছে, সর্ব্ব শরীরে যথেষ্ট পরিমাণে অক্সিজেন বা প্রাণবায়ু সরবরাহ করা হইয়াছে, তখন বুঝিবেন, শারীরিক ব্যায়াম করিবার সময় উপস্থিত হইয়াছে। অতঃপর দেহের এক একটী অঙ্গ পৃথক ভাবে সঞ্চালন করিতে আরম্ভ করিবেন, এবং যখন যে অঙ্গের সঞ্চালন করিবেন, তখন সেই অঙ্গের উপরই অখণ্ড মনোযোগ স্থাপন করিবেন।

প্রথমে মস্তক হইতে কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। সমস্ত মাথা, মাথার পিছন দিক, ঘাড়, গলার পিছন দিক দুই হাতে উত্তমরূপে মর্দ্দন করিবেন এবং মস্তক ইতস্ততঃ এমন ভাবে সঞ্চালন করিবেন, যেন গলা, ঘাড় প্রভৃতির মাংসপেশীগুলি উত্তমরূপ নাড়া চাড়া পায়। গাজনের সন্ন্যাসীরা যে ভাবে মাথা চালে, সেই ভাবে মস্তক সঞ্চালনও করিতে হইবে। পঁচিশ বার মস্তক সঞ্চালন করিলেই যথেষ্ট হইবে।

তারপর পিঠের ব্যায়াম। শুইয়া শুইয়া পিঠের ব্যায়াম কিরূপে করিতে হইবে? এই রকম—সাপেরা যে ভাবে আঁকিয়া বাঁকিয়া চলে, কেঁচোর মুখে নুন দিলে সে যেমন ভাবে ছটফট করে, সেই ধরণে পিঠের ব্যায়াম করিতে হইবে। খুব ভারি একটা জিনিস তুলিতে

হইলে গা হাত পা যে ভাবে শক্ত করিতে হয়, সেই ভাবে পিঠের মাংসপেশীগুলিকে কুঁচকাইয়া আবার আলগা দিতে হইবে। এই ব্যায়াম করিবার সময়ে কেবল ইহার দিকেই অখণ্ড মনোযোগ দিতে হইবে—যেন ইহাতে কোনরূপ খুঁত না থাকে। এইরূপে, এক একটী করিয়া সমস্ত অঙ্গ প্রত্যঙ্গের ব্যায়াম করিতে হইবে। এই ভাবে নামিতে নামিতে পা পর্য্যন্ত গিয়া ব্যায়াম শেষ হইবে। ধনী লোকেরা মধ্যে মধ্যে চাকর বাকরকে দিয়া গা হাত পা ইত্যাদি টিপাইয়া লন। ইহা নিছক আয়েস নয়—ইহাতে ব্যায়ামের কাজ হয়। গা টেপানো যাঁহাদের নিত্য অভ্যাস, তাঁহাদের গা টেপাইবার সময় হইলে একটু আলস্য ভাব ধরে—ঠিক সময়ে, অথবা আদৌ, গা টেপান না হইলে অত্যন্ত বিরক্তি বোধ হয়।

পায়ের ব্যায়াম একটু বিশেষ ভাবে করা আবশ্যক। পায়ের আঙ্গুলগুলির উপর ভর দিয়া দাঁড়াইতে গেলে যে ভাবে পা শক্ত করিয়া রাখিতে হয়, সেই ভাবে পা ছড়াইয়া শক্ত করিয়া দিয়া, প্রথমে ডান পা, পরে বাঁ পায়ের আঙ্গুলগুলির দ্বারা, যত বড় ক্ষমতায় কুলায়, ততবড় বৃত্ত শূন্যে অঙ্কিত করিতে থাকুন। প্রত্যেক পায়ের দ্বারা ২৪—২৫ বার এই ভাবে শূন্যে বৃত্ত অঙ্কিত করিলে পায়ের উত্তমরূপ ব্যায়াম হইবে। তারপর প্রথমে এক পা, পরে অপর পা ঊর্দ্ধে তুলুন, এবং নামাইয়া লউন। এই ভাবে বার কতক করিতে হইবে। পরে পা গুটাইয়া এবং ছড়াইয়া আরও বার কতক ব্যায়াম করা চাই।

তারপর হাতের ব্যায়াম। প্রথমে হাত দুইটী দেহের দুই পাশে যথা সম্ভব ছড়াইয়া দিন। পায়ের মত হাতও শক্ত ও নরম করিবেন। ১০।১২ বারের পর হাত তুলিয়া বুকের উপর আনুন, যেন হাত বুককে স্পর্শ না করে। ইহাও সাধারণত ১২ বার হইতে ২৪ বার করা আবশ্যক।

প্রথম প্রথম শুইয়া শুইয়া এরূপ ভাবে ব্যায়াম অভ্যাস করিতে একটু একটু লজ্জা করিবে—হয় ত একটু কষ্টও হইতে পারে। কিন্তু, ঘৃণা, লজ্জা, ভয়—তিন থাকতে নয়। লজ্জা করিতে গেলে কোন ভাল কাজই করা চলে না। তারপর অভ্যাস হইয়া গেলে আর লজ্জা করিবে না; এবং ইহার উপকারিতা বুঝিতে পারিলে, ইহাতে আরও আগ্রহ জন্মিবে।

ব্যায়াম হইয়া গেলে, ডান দিক চাপিয়া শুইয়া পড়িবেন এবং দেখিবেন, চোখের পাতা ফেলিতে না ফেলিতে আপনি নিদ্রিত হইয়া পড়িবেন—অনিদ্রার লেশমাত্র থাকিবে না। আরও দেখিবেন, এই নৈশ ব্যায়াম শুধু অনিদ্রার ঔষধ নয়—ইহার ফলে আপনার স্বাস্থ্যের বিলক্ষণ উন্নতি হইতেছে, ক্ষুধা বৃদ্ধি হইতেছে—গায়ে, বিশেষতঃ মাংসপেশীগুলিতে শক্তির সঞ্চার হইতেছে।

বিনামূল্যে, মাত্র একটু কষ্ট স্বীকার করিয়া, এতগুলা উপকার পাওয়া হইতে আপনি কি নিজেকে বঞ্চিত রাখিবেন ?

ছেলেদের দুষ্টামি।

যে সব ছেলের শারীরিক ও মানসিক অসুস্থ অবস্থা গোড়ায় স্পষ্ট ধরিতে পারা যায় না, তাহাদের দুঃখই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ছেলেটি দেখিতে শুনিতে বেশ,—কোনরূপ রোগ আছে বলিয়া বোধ হয় না, অথচ তাহার স্বভাব দুষ্ট। এ ক্ষেত্রে তাহাকে দুষ্ট মনে করিয়াই তাহার সঙ্গে তদনুরূপ ব্যবহার করা হয়, তাহাকে খুব কঠোর ভাবে শাসন করা হয়। কিন্তু সে শাসনে কোন ফল হয় না ; দুষ্টামি না কমিয়া বরং বাড়িয়াই যায়। কিন্তু বোধ হয় তাহার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করিলে দেখা যাইতে পারে যে, সে সম্পূর্ণ রূপে সুস্থ নয়, তাহার মানসিক অবস্থা ঠিক স্বাভাবিক নয় (abnormal)। তবে তাহাকে পাগলও বলা যায় না। এই কারণে তাহার স্বাস্থ্য উপেক্ষিত হইয়া থাকে। ইহারাই বড় হইয়া ভবিষ্যতে জেলখানায় কয়েদীদের সংখ্যা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। অপরাধীদের দণ্ডদানের উদ্দেশ্য তাহাদের অপরাধ প্রবৃত্তির সংশোধন করা। কিন্তু তাহা এমন অসময়ে প্রযুক্ত হয়, যখন তাহাদের অবস্থা সংশোধনের বাহিরে গিয়া পড়িয়াছে। অপরাধ প্রবৃত্তির সংশোধন করিতে হইলে সেই ছেলেবেলা হইতেই তাহার ব্যবস্থা করিতে হয়। তাহা সাধারণতঃ হয় না বলিয়াই, বেশী বয়সে লোক চোর, ডাকাত, খুনে, বদমায়েস হইয়া থাকে ; অথচ সময়ে সুচিকিৎসা হইলে বোধ হয় অপরাধের পরিমাণ ও অপরাধীর সংখ্যা অনেক কমিয়া যাইতে পারিত ; এবং সুব্যবস্থা হইলে এখনও যাইতে পারে। কিন্তু সকল বালকের মানসিক স্বাস্থ্যের এই

abnormal অবস্থা ধরিতে পারা সোজা কথা নয়। পিতামাতা বা অভিভাবক, যাঁহারা চিকিৎসা শাস্ত্র বা মনস্তত্ত্বের কোন ধার ধারেন না, তাঁহাদের পক্ষে ইহা ধরিতে পারা অসম্ভব। বহুদর্শী বিজ্ঞ চিকিৎসকেরা অনেক দিন ধরিয়া এই সকল বালকের স্বভাব, চালচলন পরীক্ষা করিলে তবে ইহা ধরিতে পারেন। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দুষ্টামি করা ছেলেদের পক্ষে স্বাভাবিক তবে তাহার মাত্রাধিক্য ঘটিলেই বুঝিতে হইবে যে তাহার স্বাস্থ্য ভাল নয়। এই স্বাভাবিক ও অস্বাভাবিক দুষ্টামির মাত্রা নির্ণয় করিয়া তাহদের পার্থক্য সাধনই কঠিন ব্যাপার। মনস্তত্ত্বের বেশী পরিমাণে আলোচনা না হইলে ইহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। মনস্তত্ত্বের আলোচনার সঙ্গে সঙ্গে বুঝিতে পারা যাইবে, এই শ্রেণীর দুষ্ট ছেলেদের কেহ কেহ hysteria, কেহ বা anxiety neurosis, আবার কেহ হয় ত obsessional neurosis রোগে ভুগিতেছে অথচ, বাহিরের লক্ষণ দেখিয়া সাধারণ লোকের সেটুকু বুঝিবার উপায় নাই। প্রকৃত রোগ নির্ণীত হইলে তবে তাহার সুচিকিৎসা হইতে পারিবে; নচেৎ, কেবল শাসনে দুষ্ট ছেলের দুষ্ট স্বভাবের সংশোধন সকল ক্ষেত্রে সম্ভবপর নয়। শাসনের ফলে ঠিক স্বভাব না শোধরাইলেও, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, ছেলেটি আর দুষ্টামি করিতেছে না; কিন্তু তাহার উৎসাহ একেবারে নির্ব্বাপিত, মুখখানি বিষণ্ণ, খাওয়া পরা বা লেখাপড়া কোন কাজেই আর আগ্রহ নাই। এরূপ অবস্থা দেখিলে বুঝিতে হইবে, শাসনের ফল ভাল না হইয়া মন্দই হইতেছে। ইহা শাসন নয়, কুশাসন। ইহাতে ছেলের স্বভাব আরও বিগড়াইয়া যাইতে পারে। শাসনের ভয়ে সে হয়ত প্রকাশ্যে দুষ্টামি করিতে বিরত হইবে; কিন্তু গোপনে দুষ্টামি, অন্যায় কাজ করিতে শিখিবে, এবং ক্রমে সংশোধনের বাহিরে গিয়া পড়িবে। বলা বাহুল্য, এরূপ ভাবের শাসন বরণীয় নহে। তবে দুষ্ট ছেলেদের শোধরাইবার উপায় কি? সে উপায় মনস্তত্ত্ববিদ্‌গণের হাতে। তাঁহারা শিশু চিত্তের গতির পর্য্যালোচনা করিয়া যে উপায় নির্দ্দেশ করিবেন, তদনুসারে কাজ করিতে হইবে।

অনেক ছেলের স্বভাব খিটখিটে, চঞ্চল স্কুলে পড়াশুনায় একটুও মনোযোগ নাই; অলস। ডাক্তার হীলি (Healy) বিবেচনা করেন, যে সকল ছেলের স্বভাব এইরূপ, তাহাদের স্বাস্থ্য নিশ্চয়ই ভাল নয়; খুব সম্ভবতঃ তাহারা স্নায়ুঘটিত পীড়ায় (Nervous disorders) কাতর। ইহারা কোন বিষয়ে গভীর মনোযোগ দিতে পারে না--অল্পেতেই উত্তেজিত হইয়া উঠে।

নিদ্রিত অবস্থায় শয্যায় প্রস্রাব করিয়া ফেলা, ইহাদের শারীরিক অসুস্থতার আর একটা লক্ষণ। পরীক্ষা করিলে হয় ত দেখা যাইবে, ইহাদের টনসিল বড়, কিম্বা ইহারা Adenoid রোগে ভুগিতেছে। বাড়ীর অবস্থা যাহাদের ভাল নয়, অর্থাৎ যাহারা ভালরূপ খাইতে পায় না, রাত্রে ঘুমাইতে পায় না—তাহারা এই রকম স্বভাবের হইয়া থাকে।

কিন্তু তাহাদের দুর্ভাগ্যক্রমে তাহাদের ঘাড়ে এই দোষ চাপানো হয় যে, তাহারা দুষ্ট, বজ্জাত, অলস। ফলে, তাহাদের ভাগ্যে কেবল শাসনই লাভ হইয়া থাকে। যে সকল কারণে তাহাদের অবস্থা এমন অস্বাভাবিক হইয়া পড়ে তাহার প্রতিকারের কোন চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তাহাদের দুষ্টামির যে একটা স্বাস্থ্যঘটিত কারণ থাকিতে পারে, ইহা সচরাচর কাহারও খেয়ালই হয় না। স্কুলেও তাহাদের নিগ্রহের অন্ত নাই। বাড়ীতে পিতা, মাতা, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা অথবা অন্য অভিভাবকের শাসন, আর স্কুলে শিক্ষকগণের তাড়না—এ দুইয়ের পেষণে বেচারীর প্রাণ 'ত্রাহি মধুসূদন' ডাক ছাড়িতে থাকে। কিন্তু যদি ছেলেদের মনস্তত্ত্বের আলোচনা করা হয়, তাহাদের মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্যের অবস্থার সম্বন্ধে অনুসন্ধান করা হয়, তাহা হইলে ভবিষ্যতে অপরাধের মাত্রা অনেক কমিয়া যায়,—অনেক মানবাত্মা মহা মহা পাপের অনুষ্ঠান হইতে রক্ষা পায়।

হীলি আরও বলেন যে, Chorea (স্নায়ু স্পন্দন) রোগে বালকগণের মানসিক বিকার ঘটে—তাহাদের চিত্ত অব্যবস্থিত হইয়া পড়ে, ধারণাশক্তি ক্ষুন্ন হয়। ইহার ফলেও তাহাদের অপরাধ করিবার প্রবৃত্তি প্রবল হয়। ছেলেদের স্কুল পালানো রোগ, মিথ্যা ভাষণ, দুর্নীতি-প্রবণতা এই Chorea রোগের ফল।

শিশু চরিত্রে এই অস্বাভাবিকতা—ইহা যে কি পরিমাণে বংশগত, এবং কতটাই বা পারিপার্শ্বিক পরিবেষ্টনের ফল, সে সম্বন্ধে অনেক মতভেদ আছে। তবে, কোন কোন স্থলে বংশানুক্রম, কোথাও বা পারিপার্শ্বিক অবস্থা, আবার ক্ষেত্র বিশেষে এই উভয়ই ছেলেদের দুঃস্বভাবের কারণ বলিয়া সিদ্ধান্ত করিতে পারা যায়। বরং বংশানুক্রমকে এ বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়া যায়। দৈত্যকুলে প্রহ্লাদের দৃষ্টান্ত অতি বিরল; দৈত্যকুলে দৈত্যের জন্মই স্বাভাবিক। তবে পারিপার্শ্বিক অবস্থা ভাল হইলে বংশগত দুষ্টামির প্রবৃত্তি অনেকটা সংযত থাকিতে পারে। আর যদি পারিপার্শ্বিক অবস্থা খারাপ হয়, তাহা হইলে দুষ্ট বংশের

ছেলেরা ত খারাপ হইবেই। পক্ষান্তরে, সদাচারসম্পন্ন বংশের সন্তান মন্দ পারিপার্শ্বিক অবস্থায় পড়িলেও সহজে খারাপ হয় না—অনেকটা আত্মরক্ষা করিয়া চলিতে পারে, ইহার অনেক দৃষ্টান্ত অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন। তবে ইহারও ব্যতিক্রম যে ঘটে না, তাহাও নহে; কিন্তু সেরূপ দৃষ্টান্ত কম। তাই সদ্বংশের ছেলেদেরও অসৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে ছাড়িয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারা যায় না। বরং 'সাবধানের মার নাই', হিসাবে—কুদৃষ্টান্ত, কুসঙ্গী, কুৎসিত পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে সৎ ও অসৎ উভয় বংশের ছেলেদেরই তফাতে রাখা 'শ্রেয়ঃ;' এবং তাহা অসম্ভব হইলে, অসৎ পারিপার্শ্বিক অবস্থার সংশোধনের চেষ্টা করা উচিত; তাহাতেও যথেষ্ঠ সুফল দর্শে।

স্বভাব-দুষ্ট ছেলেদের প্রকৃতি বড় বিপরীত-ধর্ম্মী ভাল কাজের বেলায় তাহারা বোকার একশেষ; কিন্তু কুকর্ম্মের অনুষ্ঠানে তাহাদের মাথা বেশ খেলিয়া থাকে। সৎ বালক যে সকল দুষ্ট বুদ্ধির কল্পনা করিতে পারে না, ইহারা অতি সহজেই তাহার পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে। ছেলেরা যখন দল বাঁধিয়া কোন অন্যায় কাজে প্রবৃত্ত হয়, তখন ইহারা তাহাদের দলপতির কার্য্য করে; এবং নানা দুষ্ট মতলব খাটাইয়া দলের অন্যান্য বালকগণকে পরিচালিত করিয়া থাকে। বাল্যকালে ইহাদিগকে সংযত রাখা অসম্ভব নয়; ইহাদের চাল চলনের উপর নজর রাখিলে অনেক সময়ে ইহারা ঠাণ্ডা থাকে; কিন্তু, ন্যায়ান্যায়ের পার্থক্য বুঝিবার ক্ষমতা ইহাদের কম। কাজেই, ইহারা একবার ছাড়া পাইলে, ইহাদিগকে সামলানো কঠিন।

"পাগলা সাঁকো নাড়িস নি" বলিয়া পাগলকে সাঁকো নাড়িতে নিষেধ করিলে যেমন তাহাকে ঐ কাজটির কথা স্মরণ করাইয়া দিয়া উহা করিতে তাহাকে প্রবৃত্তি দেওয়া হয়,—সেইরূপ অনেক সময়ে দেখা যায়, ছেলেদের কোন কাজ করিতে নিষেধ করিলে সে সেই কাজটি আগে করিয়া বসিবে। অন্ততঃ, অভিভাবকের বা শিক্ষকের সাক্ষাতে সে কাজ করিতে যদি সাহস না হয়, তবে অসাক্ষাতে প্রথম সুবিধাতেই সেই নিষিদ্ধ কাজটি করিয়া বসিবে। দুষ্ট ছেলের ত কথাই নাই—অনেক সময়ে সৎ-স্বভাব ছেলেদেরও উপর কোন কর্ম্ম-বিশেষের অনুষ্ঠানে নিষেধাজ্ঞা প্রচার করিলে, যেন তাহাদিগকে প্রকারান্তরে সেই কাজ করিতেই উপদেশ দেওয়া হয়। এরূপ ক্ষেত্রে একটু Diplomacy অবলম্বন করিলে ভাল

হয়। অর্থাৎ, সেই অন্যায় কাজটি করিতে সোজাসুজি নিষেধ না করিয়া, যাহাতে সে, সে কাজ না করে অথবা করিতে না পারে অর্থাৎ সেই কাজ করিবার দিকে প্রবৃত্তি না যায়, এমন ব্যবস্থা করাই ভাল। কেবল বালক নয়—বয়স্ক ব্যক্তিদেরও এই দৌর্ব্বল্যটুকু বিলক্ষণ আছে। আবার সমাজের ব্যবস্থাও ইহার খুব পরিপোষক। যথা, মদ খাইয়া মাতলামি করিলে জরিমানা বা শাস্তির ব্যবস্থা; অথচ, সহরের রাজপথের মোড়ে মোড়ে মদের দোকান। আবার যোল বৎসরের কম বয়সের ছেলেদের ধুমপান আইন নমুসারে নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু ঠিক যে উপায়টি অবলম্বন করিলে আইনের উদ্দেশ্য নিশ্চিত সফল হইতে পারিত, সেই উপায়টি, অবহেলা করিয়া, অবলম্বন করা হয় নাই। ধুমপান নিবারণ করা যদি যথার্থই উদ্দেশ্য হয়, তাহা হইলে তাহার উপকরণ সংগ্রহ করিবার পথগুলির সঙ্কোচ সাধনই সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য ছিল। দণ্ডের ভয় দেখাইয়া যদি দোকানদারদের নিষেধ করা হইত যে, তাহারা যোল বৎসরের কম বয়সের ছেলেদের সিগারেট, বিঁড়ি প্রভৃতি বিক্রয় করিবে না, তাহা হইলে সিগারেট সংগ্রহ করিতে না পারিয়া ছেলেরা ধূমপানের অভ্যাস পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইত। কিন্তু, উপকরণ সংগ্রহের পথ যখন খোলা রহিল, তখন তাহাদিগকে ধূমপানে নিবারণ করা কাহার সাধ্য। সিগারেট বিঁড়ি বিক্রয়ের পথ খোলা রাখিয়া, পুলিশ কিম্বা স্কুলের শিক্ষকদের উপর ছেলেদের হাত হইতে সিগারেট বিঁড়ি কাড়িয়া লইবার ভার দেওয়া, আর গোড়া কাটিয়া আগায় জল ঢালা সমান কথা। সেইজন্য, আইন রচিত হইবার পরও পথে ঘাটে মানবগণকে সিগারেট বিঁড়ি ফুঁকিতে ফুঁকিতে পথ চলিতে দেখা যাইতেছে। উহাদের হাত হইতে সিগারেট বিঁড়ি কাড়িয়া লইবার ভার প্রাপ্ত পুলিশই বা কোথায়, আর স্কুলের হেডমাষ্টারই বা কোথায়? এরূপ যোগাযোগ ঘটিবার সম্ভাবনা খুবই কম। তার চাইতে যদি দোকানদার-দিগকে নিষেধ করা হইত, তাহা হইলে বরং অধিকতর সুফল ফলিতে পারিত। কারণ সিগারেট বিঁড়ি কিনিবার জন্য ছেলেদের দোকানে আসিতেই হইবে—এরূপ যোগাযোগের সম্ভাবনাই খুব বেশী। ছেলেরা যদি গাঁটের পয়সা খরচ করিয়া সিগারেট কিনিবার সুবিধাই পায়, তাহা হইলে তাহার সদ্ব্যবহারও করিবার সুবিধা তাহারা নিশ্চয়ই করিয়া লইতে পারিবে, এবং লইতেছেও। স্বাস্থ্য-সমাচার।

বাসন্তিকা।

—ঃ*ঃ—

গলায় পরে' তোমারি ঐ ফুলের মালাটি
গরব করে বসন্তের এই সকাল বেলাটি !
তোমারি রঙ গায়ে এঁকে
তোমারি সুগন্ধ মেখে
মধুর করে' তুল্‌লো সে আনন্দ-মেলাটি।

অধরে তা'র ছড়িয়ে গেচে মন-মাতানো হাসি,
এই আলো এই পাগল হাওয়া তাইতো ভালবাসি !
এই ধরিত্রী মায়ের কোলে
যে দুরন্ত শিশু দোলে
হিয়ায় হাজার ঢেউ তুলে তা'র হেলা ফেলাটি !

শ্রীকৃষ্ণদয়াল বসু।

মণিপুরে বিধবা বিবাহ

বিধবা বিবাহের সমস্যা আজও বঙ্গে বর্ত্তমান। ৺ঈশ্বর বিদ্যাসাগর মরিয়া পুড়িয়া গেছেন কিন্তু সেই বহ্নি এখনও জ্বলিতেছে। তুষানলের ন্যায় ইহা বঙ্গদেশে রহিয়াছে। কখন এবং কে নির্ব্বাপিত করে ইহা কেহ জানেন না। কারণ যে কম্পন—
"অদ্যাপি কাঁপিয়া উঠে থাকিয়া থাকিয়া"

দেশীয় রাজ্যে অনেক স্থলে বিধবা বিবাহ প্রকাশ্যভাবে চলিতেছে এবং আমি এমনও জ্ঞাত আছি অনেক রাজ্যে রাজ্যের উত্তরাধিকারে বিধবা-সন্তান রাজত্ব পাইয়াছেন। বঙ্গদেশে অথবা আধুনিক আসামদেশে মণিপুর হিন্দুরাজা বলিয়া গর্ব্ব করিতেছেন। অথচ ইহারা অন্য কোন জাতির পৃষ্ট জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করেন না। তাঁহারা এত গোঁড়া হিন্দু যে রাজপুতনা অঞ্চলে এই মদ্য মাংস ব্যবহার বিমুখ মণিপুর রাজাকে দেখিতে পাইয়া তাঁহারা অবাক হইয়াছিলেন। নানাবিধ অশ্বারোহিত খেলায় (Sport) মণিপুর নরপতির সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু আজমীরের কূপোদক পান করিতেন না। কারণ কূপ জলে চামড়ার মোষক ডুবান হয়। শুনিতে পাই অনেক ক্ষত্রিয় রাজপুত কন্যার বিবাহপ্রস্তাব মণিপুর মহারাজা প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন। একথা জনশ্রুত। কিন্তু আমি মণিপুর গিয়াছিলাম এবং এই জনশ্রুতির সত্যতা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়াছিলাম। মণিপুরীগণ চাপাজাতি, সহজে মনের কথা কাহাকেও বলে না, এবং ইহা লইয়া বাহ্যাড়ম্বর করে না, তথাপি যতদূর জানিলাম তাহাতে এই বুঝিয়াছি যে মদ্যমাংসপ্রিয় জাতির সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ স্থাপন করা সন্দেহের বিষয়। সন্দেহ ভঞ্জন হইল না, কাজেই সম্বন্ধ স্থাপন হইল না।

ত্রিপুরার রাজদরবারে একজন মণিপুরী পণ্ডিতছিলেন ৺মীনেশ্বর সার্ব্বভৌম। তিনি বিচক্ষণ পণ্ডিতছিলেন, আদিবাস ছিল মণিপুরে, বৃদ্ধাবস্থা পর্য্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে ছিলেন, আমার সহিত তাঁহার একটী গ্রাম্যসম্বন্ধ ছিল। তিনি আমাকে পুত্রবৎ বাৎসল্য করিতেন। ইদানীং শ্রীবৃন্দাবন বাস করিয়া তথায় তাঁহার মানবলীলা সংবরণ হয়। স্বর্গীয় মহারাজ রাধাকিশোর মাণিক্যের সময় আমি তাঁহার সহিত মণিপুরী সমাজ সম্বন্ধে অনেক কথা আলাপ করিতাম। তখন তাঁহার নিকট যেরূপ পণ্ডিতোচিত উত্তর পাইতাম এবং সুযুক্তি সহ প্রশ্নের মীমাংসা করিতেন তাহাতে আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তি মাত্রেই সন্তুষ্ট হইবেন আমার বিশ্বাস।

মণিপুর আমাদের কুটুম্ব রাজ্য, ইদানীং আমরা অন্যান্য দেশ হইতে নবকুটুম্ব সংগ্রহ করিয়াছি ও করিতেছি। এবং ভবিষ্যতে করিতে হইবে। তাঁহাদের মধ্যে আচার আছে ত বিচার নাই এবং বিচার আছে ত আচার নাই, কাজেই ঘরকন্না করিবার সময় নানা সমস্যা

উঠিয়া থাকে। ইহা স্বাভাবিক বটে, ঘটনাধীন আমি সর্ব্বভৌম মহাশয়কে একটী প্রশ্ন করিয়াছিলাম।

মণিপুরে বিধবা বিবাহ সুপ্রচলিত. হিন্দু হইয়া এই বিবাহ প্রথা মণিপুর কি প্রকারে অনুকূল মত পোষণ করে? তখন বৃদ্ধ পণ্ডিতজি, উত্তর দিয়াছিলেন। মহাভারত গ্রন্থ নামোল্লেখ করিয়া "বহুস্থানে বহু উপায়ে বিবাহ সিদ্ধ হইয়া থাকে। ইহা রাজনৈতিক ব্যবস্থা, এবং হিন্দুরাজার ব্যবস্থা. ৺ঈশ্বর বিদ্যাসাগর যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন তাঁহার দস্তখত ছিল, সেই ব্যবস্থাপত্রখানা তিনি উদ্ঘাটন না করিয়া বলিয়াছিলেন "ইহা দলাদলির ব্যবস্থা, এই দলাদলি দলবিশেষের পুষ্টিতে ব্যর্থ হইয়াছে, আবার যখন নির্য্যাতিত দল পুষ্ট হইবে তখন সুদ কষিয়া আসল সহিত আদায় হইবে। বাঙ্গালী দলাদলি প্রিয়, এবং গ্রাম্য দলাদলি প্রিয়। এই দলাদলির কোন অর্থ নাই। আমি ৺ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের নিকট গিয়াছিলাম, তাঁহার পদধূলি লইয়া ধন্য হইয়াছিলাম। তিনি আমার যুক্তিপূর্ণ বাক্য শুনিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন তখন আমি তাঁহাকে বলিয়াছিলাম বঙ্গদেশের মহাপ্রভু এখনও সমগ্র বঙ্গদেশ গ্রহণ করেন নাই। যেদিন গ্রহণ করিবেন সে দিন ঈশ্বর বিদ্যাসাগরের ব্যবস্থা নিশ্চয় গ্রহণ করিবে।"

আমি একথা শুনিয়া যাহা বুঝিয়াছি এখন পর্য্যন্ত সে দিন উপস্থিত হয় নাই। "যেখানে বাঙ্গালী সেখানে দলাদলি' এই ঘৃণ্য অপবাদ যেদিন দূর হইবে। তখন বঙ্গদেশ শীর্ষস্থানে বসিবে এবং জয়মাল্য পাইবে। আর "অদ্যাপি থাকিয়া থাকিয়া" কম্পিত হইবে না। প্রবাসী শ্রাবনের সংখ্যায় হিন্দু বিধবার বিবাহ সম্বন্ধে নানা জনের নানা উক্তিপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে। 'জাতিভেদ সমস্যা ও আর্য্যঅনার্য্যের বিবাহ সম্বন্ধে কষ্টি পাথরে' শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দেব বলিতেছেন "প্রাচীন ভারতে আর্য্য অনার্য্যের বিবাহ যে নিষিদ্ধ ছিল না, পরন্তু প্রচলিত ছিল, মহাভারতে বন পর্ব্বের ৮০ অধ্যায়ের ৩১।৩২ শ্লোকেই তাহার প্রমাণ রহিয়াছে।" সেই প্রবন্ধে একস্থানে বলিতেছেন "অর্জ্জুন বিধবা বিবাহ করিয়াছিলেন" ইহাও বোধ হয় মহাভারত-উক্ত। কিন্তু মহাভারতের মণিপুর রাজবংশ উৎপন্ন হইয়াছিল অর্জ্জুনতনয় বভ্রুবাহন হইতে। বিধবা বিবাহ এই জন্যই মণিপুরে সু-প্রচলিত আছে। কিন্তু অদ্য মণিপুরের অস্তিত্ব লইয়া নানা জনের নানা মত। নানা ঐতিহাসিকের অন-ঐতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের মধ্যে পর্য্যবসিত

হইয়াছে। কেহ কেহ বলিতেছেন মণিপুর অনার্য্য জাতি এবং ইংরেজগণ বলিতেছেন মাপের ফিতা ধরিয়া কইলে মণিপুর Indo Chinese জাতি। এই বাদানুবাদের মীমাংসা করিবে কে? প্রবাসী শ্রাবণের সংখ্যায় ৪০৪ পৃষ্ঠায় হিন্দু বিবাহ প্রবন্ধে লিখিত হইয়াছে—"বঙ্গে বিধবা বিবাহ চলিতেছে না, গুজরাট, পাঞ্জাব, আগ্রা, অযোধ্যা, অন্ধ্র প্রভৃতি দেশে তদপেক্ষা অধিক চলিতেছে। ইহার কারণ সম্ভবতঃ এই, যে, বাংলা দেশে কুতার্কিক, ভণ্ড, দেশাচারের দাস বেশী; ন্যায়নিষ্ঠ হৃদয়বান্ লোকের সংখ্যা কম। আমি বলি বঙ্গে বীর্য্যবান্ লোকের অভাব। সাহস কম—পরমুখাপেক্ষী—অভাবে স্বভাব নষ্ট হইয়া যাইতেছে। বীর্য্যবান্ লোক যখন উপস্থিত হইবেন তখন বিধবা বিবাহের সমস্যা পূর্ণ হইবে। মণিপুর তখন শীর্ষস্থানে থাকিবে।

শ্রীমহিমচন্দ্র ঠাকুর।

উন্নতির দিনে বাঙ্গলার বারো আনা।

কৃষিই বাঙ্গলার প্রাণ, বাঙ্গলার বারো আনা অধিবাসী কৃষক,—চাষা; রৌদ্র বৃষ্টি মাথায় করিয়া আকাশের দেবতা আর মাটীর উর্ব্বরতার উপর নির্ভর করিয়া তাহারা কোন মতে দিন কাটায়। তাহারা চলে সংজাত সংস্কার বলে; বাপ দাদা যা করিয়াছে; ছোট বেলায় তাহাদিগকে যেটা যেভাবে করিতে দেখিয়াছে সেইভাবে চলিতে পারিলেই তাহারা ধন্য; সস্তার দিনে যেভাবে কায়ক্লেশে জীবন কাটিত সে দিনটা ফিরিয়া আসিত যদি, তাহাতেই ইহারা সন্তুষ্ট! অন্য কিছু বড় সাধ ইহাদের নাই; উচ্চ অভিলাষ উদ্ভূত হইবার মত শিক্ষা বাঙ্গলার বারো আনা পায় নাই,—তাহাদের চরম বিলাসের আদর্শ উক্তি—"আমি যদি বাদসা হতেম, সমস্ত ভাতে গুড় দিয়ে খেতাম।" পোলাও কালিয়া তাহাদের স্বপ্নেরও অতীত; দুবেলা পেট ভরিয়া শাক ভাত, ডা'ল বা মাছ হইলেই আহারের মত আহার সেদিন, আর মাঠে পান্তাভাত পেঁয়াজ, একটু নুন—হুঁকায় কড়া তামাক, পরণে একখানা মোটা ৬।৭ হাতি কাপড়, কাঁধে গামছা

তাহাদের আহারবিহারের মোটামুটি প্রার্থিত উপকরণ! সহর ঘেঁষা কৃষকের নিত্য-ব্যবহার্য্য বস্তুর তালিকা হয় ত ইহা অপেক্ষা একটু দীর্ঘ. তাহা দেখিয়াই কৃষক 'বাবু' হইতেছে এরূপ মন্তব্য কখন কখন শোনা যায় কিন্তু সত্য বলিতে গেলে,—এ দেশের বারো আনার জীবন ধারণের আসবাব উপকরণ এমনই সামান্য, কত সাদাসিধা ধরণের, তাহারা কত অল্পে সন্তুষ্ট ভদ্রলোকে তাহা কল্পনা করিতে পারিবেন না। প্রায় পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বে, সেই সাচ্ছল্যের দিনে, বৈশাখের রৌদ্রে পথশ্রমে ক্লান্ত হইয়া একদিন এক বর্দ্ধিষ্ণু কৃষকের গোশালায় আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলাম ; বেলা প্রায় ১টায় সাত, আট জন কৃষক মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিল—গা বহিয়া দর দর করিয়া ঘাম ঝরিতেছে ; কাঁধের কাল নামাইতে না নামাইতেই সাজা তামাক রাখাল বালক হাজির করিল ; দুইটা হুঁকা—বেশ কসিয়া তামাকে দোম দিয়াই নামমাত্র তেল মাথায় ছোঁয়াইয়া তাহারা স্নান সারিয়া আসিল। আহারীয় প্রস্তুত! পুরা সানকি মোটা ভাত,—শাক আর একটা ঝোলহীন শুকনা তরকারী! তাহা দিয়াই উঠিয়া গেল সেই অন্নপূর্ণার অন্ন! ব্যঞ্জন একবার সানকীর এদিকে, আবার ওদিকে রাখিয়া, যেন তাহার অংশ না লইয়া কেবল স্পর্শ করিয়াই সেই স্বল্প শুষ্ক ব্যঞ্জনে তাহাদের আহার শেষ হইল! লোকগুলির শরীরও বেশ সবল—দস্তুরমত পুরা জোয়ান, তাহাদের আহার দর্শনে যেরূপ তৃপ্ত হইলাম, আশ্চর্য্য হইলাম নাও কম ; ভাবিতে হইল, এঁ! এই আমাদের দেশের অবস্থাপন্ন কৃষকের আহারীয়,—নতুবা যে দেশে গড়ে আয় নয় পয়সা সে দেশে লোক বাঁচিয়া আছে কি করিয়া! এ চিত্রও আজ বাঙ্গলার বারো আনার স্বপ্ন.—এ আহারও এখন সকলের ভাগ্যে প্রতিদিন জুটে না,—এরূপ স্বল্পে সন্তুষ্ট ব্যক্তিদের অনেকেরই দুই বেলায় এক বেলা খাইতে হয়! অতিরঞ্জিত নহে ইহার একবর্ণও।

বাঙ্গলা জাগিয়াছে,—শিক্ষিত আত্মশক্তির পরিচয় দিতেছেন,—নিম্নশ্রেণীর মধ্যেও চাঞ্চল্যের লক্ষণ স্পষ্ট দেখা দিয়াছে ; কিন্তু শিক্ষিতের চাঞ্চল্য আর চাষার চাঞ্চল্য এক নহে, চাষা চঞ্চল অসনবসনের অভাবে! প্রাণ আর রক্ষা হয় না,—মরিয়া হইয়া কৃষক উন্মত্ত হইয়া যাহা পূর্ব্বে করিতে সাহস করে নাই, এখন সে দুঃসাহসিক কার্য্যে তাহারা মাথা দিতেছে! জমিদার, দারোগা, মহাজন, কুসীদজীবি এতদিন তাহাদের চক্ষে ছিল দণ্ডমুণ্ডের বিধাতা,—ইহাদের প্রতাপে তাহারা কাঁপিয়া আসিয়াছে এতদিন। ঐ ত আয়, তাহাতেই পূজা দিতে হয়, এই সকল

দেবতাদের,--শরীর দিয়া যাহা হইয়াছে তাহার ত লেখাজোঁকা নাইই। উৎপন্ন করিয়াছে কৃষক,--ফলভোগ করিয়াছে অন্য দশজন,--বাঙ্গলায় পাটই তাহার প্রমাণ। বাঙ্গলায় এমনটা নিজস্ব উৎপন্ন সম্ভারও বাঙ্গলার কৃষকের অবস্থার উন্নত করিতে পারে নাই, পাটের আশায়আশায় দাদন লইয়া তাহাদিগকে ঋণগ্রস্ত করিয়াছে আরও! আজও করিতেছে! দিনের ব্যয় সঙ্কুলন করা যাহার পক্ষে সুকঠিন, সঞ্চয় হইবে তাহার কোথা হইতে; সঞ্চয় করিবার প্রবৃত্তিও এই শ্রেণীর লোকের নাই; ভবিষ্যতের জন্য ভাবিবার বুদ্ধি ইহাদের মধ্যে জাগ্রত হয় নাই। কেবল মাত্র বীজ সঞ্চিত রাখিবার চেষ্টা ইহাদের দেখা যায়। সময়ে ইহারা দু, দশ টাকা হাতে পায় সত্য,—পাটের সময়, জমী হইতে নূতন শস্য উঠে যখন, বাজারের ভাল মাছ তখন ইহারাই কেনে,—বাবুরা তখন বলেন, চাষার দৌরাত্ম্যে ভাল মন্দ কিছু কিনিবার উপায় নাই, পাটের পয়সায় এক আনার জিনিষ এরা চার আনায় কেনে। সত্য কথা। কিন্তু তাহাদের সে ব্যবহার অর্থ-প্রাচুর্য্যের লক্ষণ নহে,—ভবিষ্যত জ্ঞানহীন অমিতব্যয়ীর হাতের সমস্ত ব্যয় করিবার প্রবৃত্তি! হয়ত অনেকেই মহাজনের দাবী প্রথমে পূরণ না করিয়াই মৎস্য আস্বাদনের জন্য আকুল হয়, অর্থ তাহাদের হাতে আসিয়া বিপদগ্রস্ত করে আরও, ১২ বৎসর পূর্ব্বের একটা ঘটনা, আজও মনে আছে। পল্লীর ডাকঘরে বসিয়া সন্ধ্যার পরে আড্ডা দিতেছি। ডাকঘরের পাশেই একঘর হাড়ীর বাস। হঠাৎ হাড়ী গিন্নির চীৎকার,—তুমুল কলহ! ব্যাপার কি? হাড়ী প্রবরের অদৃষ্ট! সে বড় সাধ করিয়া একটা ইলিস মাছ আনিয়াছে; আর কিনা এই তাণ্ডব! কোথায় আমন্দের আশা—না এই বিষম বিভ্রাট। হাড়ীর অবস্থা দিন ভিক্ষা তনু-রক্ষার, গৃহে তণ্ডুলকণা নাস্তি. গৃহিণী হাট হইতে চাল কিনিতে দিয়াছিলেন চারিগণ্ডা,—হাড়ি হাঁড়ীর খবর মনে না তুলিয়াই কিনিয়া আনিয়াছেন—পল্লীর দুর্ল্লভ ইলিশ, গৃহিণী গর্জ্জিতেছেন,—'তোমার কি এ আক্কেলটাও নাই মাছ খাবে কি দিয়া।' বিপদগ্রস্ত হাড়ীর উত্তর—"চাল ধার করে আন না আজ।" "রোজ রোজ—এত ধার দেবে কে?" উত্তর নাই।

এ চিত্র বাঙ্গলার নতুন নহে, বাঙ্গলার অবস্থায় অস্বাভাবিকও নহে। বাঙ্গলার বারো আনাকে রক্ষা করিয়া আত্মরক্ষা করিতে হইলে ইহার নিরাকরণ সর্ব্বপ্রথমে কর্ত্তব্য। যাহাতে কৃষকের রক্ত-জল-করা অর্থ সে নিজের অভাব মোচনে ব্যয় করিবার সুযোগ পায়,

ভবিষ্যতের জন্য যাহাতে ইহারা কিছু কিছু সঞ্চয় করে তাহার ব্যবস্থা হউক। ধার ইহাদের করিতেই হইবে, শস্য ক্ষেত্রে—বপন করিবার সঙ্গে সঙ্গে সস্তাদরে ভবিষ্যৎ শস্যের দাদন ইহাদিগের যে অবস্থা তাহাতে না লইয়া উপায় নাই। এখন উত্তমর্ণ যাহারা তাহারা রক্ত শোষণকারী,—ইহাদের স্থলে. আমাদের আশাস্থল শিক্ষিত যুবকবর্গ এ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করুন। উন্নতিকামী ধনী এই সকল সৎস্বভাব স্বদেশসেবকদলের হস্তে অর্থ দিন, উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের ব্যবস্থা হক, ঋণ দান জুলুম না হইয়া কৃষকের অভাব মোচনের পথ হ'ক, এ অর্থ পড়িবে না,—কৃষক শ্রমবিমুখ নয়,—তাহাদের শ্রমজ শস্য হইতে টাকা উঠিবেই,—ন্যায্য মতে আদায় হইলে, তাহারাও ঋণ শোধ করিয়া সংসার যাত্রার মত অর্থ হাতে রাখিতে পারিবে। এই সকল প্রতিষ্ঠানের সহিত,—বীমার ব্যবস্থা হইলে. তাহাদের ভবিষ্যতের উপায় হইতে পারে। এই সকল মঙ্গলজনক প্রতিষ্ঠানের উপকারিতা হৃদয়ঙ্গম করিতে তাহাদের দেরী হইবে না।

এ পথে অন্তরায় আছে অনেক। গ্রামের জমিদারের. বক্তিক্ষু মহাজনের সহায়তা লাভের আশা অল্প। তাহার মুখে যাহাই বলুন, চাষাকে 'চাষাক' করিতে নারাজ! যুবকগণকে একার্য্যে অনেক উপদ্রব সহ্য করিতে হইবে। কোন্ ভাল কাজ বিনা উপদ্রবে হইয়াছে!

অক্ষর পরিচয় করাইয়া কৃষককে উন্নত করিবার চেষ্টা বর্ত্তমান অবস্থায় বৃথা; বরং মৌখিক উপদেশ সহানুভূতিতে কার্য্য হইবে। অল্প বিদ্যার ফল অনেক স্থলেই লক্ষ্য করিয়াছি, রীতিমত শিক্ষার ব্যবস্থা সম্ভব হইলে সে অন্য কথা। এখন চাই তাহাদিগকে আশু অন্ন বস্ত্র দিয়া, বন্ধুরূপী শত্রুর মুখে ছাই দিয়া রক্ষা করা! উন্নত প্রণালীর কৃষির চেষ্টাও এখন নয়। যাহা আছে তাহারই যাহাতে সুব্যবস্থা হয় এখন হ'ক সেই চেষ্টা! যাহাতে তাহারা বৃষ্টির উপর নির্ভর না করিয়া অন্য উপায়ে ক্ষেত্র উর্ব্বর করিতে পারে সে পন্থা, তাহার উপকারিতা, শিক্ষিত নিজে কৃষক হইয়া হাতে হাতিয়ারে দেখাইয়া দিন। বহু ব্যয়সাধ্য কার্য্য কৃষকের এ অবস্থায় উপকারে আসিবে না। ইহা আমরা কোচবিহারে রাজকীয় তামাকের আদর্শ-ক্ষেত্রে লক্ষ্য করিয়াছি। বহু অর্থ ব্যয় করিয়া উপযুক্ত শিক্ষিত বহুদর্শী বিশেষজ্ঞের তত্ত্বাবধানে এই আদর্শ-ক্ষেত্রে পরিগণিত হইয়াছিল। বিভিন্ন দেশের তামাক বীজ হইতে তামাক উৎপন্ন করা হইয়াছিল; তামাক হইয়াছিলও উৎকৃষ্ট, ৪০৲ টাকা

মণ বিক্রয় হইয়াছিল, কিন্তু ইহাতে এত ব্যয় এত হাঙ্গামা অত উচ্চদরে তামাক বিক্রয় হইলেও ব্যয়ের পরিমাণে সে চেষ্টা সফল হয় নাই। কোচবিহার তামাকের জন্য প্রসিদ্ধ, বর্ম্মায় পর্য্যন্ত এ দেশের তামাক নীত হয়। বর্ত্তমানে কৃষকগণ যে উপায়ে তামাক উৎপন্ন করে, সেই দিক হইতেই ইহার উন্নতির চেষ্টা হইলে সাফল্য লাভের আশা ছিল মনে হয়। তামাকের পোকা, শিলাবৃষ্টি প্রভৃতির হাত হইতে তামাক রক্ষার উপায় কৃষক জানে না, বৈজ্ঞানিক উপায়ে স্বল্পব্যয়ে তাহার কি ব্যবস্থা হইতে পারে না ?

পাট সম্বন্ধেও এই কথা। পাটের উন্নতির পূর্ব্বে কৃষককে মাড়য়ারী মহাজনের হাত হইতে রক্ষা করুন। পাটের এই মন্দা বাজারেও মাড়য়ারী লাভের অঙ্ক কমে নাই ; মিলের লাভের ত কথাই নাই, কোন কোন মিলের অংশীদারগণকে শতকরা ১২৩৲ টাকা ১৯২০ সনে লাভ বণ্টন করা হইয়াছে, চটের কলের অংশীদার শতকরা ৩৭৫৲ টাকা লাভ পাইয়াছেন, এইরূপ লাভের হার অতি অল্প ব্যবসাতেই হয়। চা বাগানের লাভও হার মানিয়াছে। অথচ কৃষকেরা কোন মতে খরচামাত্র পাইয়াছে ; যাহার ভাগ্য ভাল সে এ পাট বিক্রয় করিতে পারিয়াছে—১০৲—১২৲ টাকা ; গড়ে পাটের মণ ছিল ৫।।০ টাকা ; উৎপন্নের খরচ মণপ্রতি ৬৲ টাকা ধরিলেও ক্ষতি ।।০ আনা ! এই ত বঙ্গায় কৃষকের অবস্থা ! যেখানে সাধারণ উপায়ে পণ্য উৎপন্ন করিয়াই খরচ পোষাইতেছে না সেখানে পুঁথিদস্তুর বৈজ্ঞানিক প্রণালী প্রয়োগ করিলে কেবল খরচই বৃদ্ধি পাইবে। পাটের উন্নতির পূর্ব্বে পাট উৎপন্নকারীরা যাহাতে তাহাদের ন্যায্য অংশ ভোগ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থাই শ্রেয়। সস্তা বাজারে অনেক পাট মজুত। আবশ্যকীয়ের অতিরিক্ত পাট উৎপন্ন হওয়াই ইহার অন্যতম কারণ। পাটের চাষ কমাইয়া অন্য ফসলে মন দিলে কৃষকের বর্ত্তমান অবস্থার উন্নতির কথা, একথা অশিক্ষিত কৃষককে বুঝান সহজ নহে, তথাপি সে চেষ্টা, যে সময়ে যে ভাবে চলিলে তাহাদের উপকারের সম্ভাবনা, অবস্থা বুঝিয়া ব্যবস্থা তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করা হউক। যত বিপদ আমাদের দেশে (raw material) কাঁচা মাল লইয়া, উৎপন্ন ব্যতীত তাহা হইতে ব্যবহার উপযোগী পণ্যে পরিণত করিবার সুযোগ নাই বলিয়া ! পাটের দর এখন নির্ভর করে, বিদেশে ইহার রপ্তানীর উপর ! দেশে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিল্পের অস্তিত্ব ও উন্নতি করিতে সমর্থ হইলে, ইহার কতক নিরাকরণ সম্ভব। এক যাহাতে আবশ্যকের অতিরিক্ত বা কম পণ্য উৎপন্ন না হয় তাহার

দিকে বিশেষজ্ঞদিগের দৃষ্টি রাখিবেন ও সাধারণকে তাঁহাদের উপদেশ মত চলিতে হইবে। চটের কলের মালেকদের এ কয় বৎসরের আচরণ লক্ষ্য করিলে বেশ বুঝা যাইবে, তাহারা কিরূপে চটের বাজারে সমতা রক্ষা করিয়া চটের দাম বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছে ও অসম্ভব রকমের লাভ করিয়াছে। দেশের যে পরিমাণের মাল আবশ্যক তাহার বেশী মাল তাহারা উৎপন্ন করে নাই। এইদিকে লক্ষ্য রাখিয়া তাহারা চটের কল সপ্তাহের প্রতিদিন চালায় নাই; উৎপন্ন দ্রব্য কম করিয়া তাহারা পাট সুলভ হইলেও চটের মূল্য পূর্ব্বের মত রাখিয়াছে বরং বৃদ্ধিই করিয়াছে। এদিকে পূর্ব্বে অনেক স্থলেই হাতে চট বুনা হইত, এখন সে ব্যবসা লোপ পাইয়াছে বলিলে হয়। এখন কলের চট ও ছালা (গানি ব্যাগ) ব্যতীত অন্য উপায় নাই। কোচবিহারের একটি মহকুমার নাম, মেখলীগঞ্জ। মেখলী নামক অতি সুন্দর সতরঞ্চ (দড়ির) ন্যায় চট হইতেই এই নগরের নামকরণ হইয়াছে—কিন্তু মেখলীর অস্তিত্ব এখন আর নামে। মেখলীর অন্তর্দ্ধানের কারণ মালমসলা ও মজুরীর তুলনায় দামে পোষায় না বলিলে ঠিক হইবে না। ঠিক ক্রেতার অভাবও নহে। বাজারে তুল্য কার্য্যে ব্যবহার উপযোগী সস্তা মালের আমদানী ও গৃহ শিল্পজাত দ্রব্যের দেশবিদেশের রপ্তানীর সুযোগের অভাবই এ সকল দ্রব্যের অন্তর্দ্ধানের কারণ। দরিদ্র দেশ; স্থায়ীত্বের তুলনায় কোন বস্তু সস্তা হইলেও, গরীবে আশু যেটা সস্তা তাহা লইতে বাধ্য হয়। তাহার প্রমাণ কাঁসা পিতলের বাসনের স্থলে এনামেলের বাসনের অত্যধিক প্রচলন। দ্বিতীয়তঃ ক্রেতার ইচ্ছা থাকিলেও সে দ্রব্য যদি হাতের কাছে না পাওয়া যায়, তাহা সংগ্রহের হাঙ্গামায় তাহা কিনিবার ইচ্ছা ক্রেতার থাকে না; পক্ষান্তরে হাতের কাছের জিনিষ অপেক্ষাকৃত নিকৃষ্ট হইলেও তাহাই লোকে ক্রয় করে। নতুবা, উদাহরণস্বরূপ বলা যাইতে পারে, মেখলী এত বেশী উৎপন্ন হইত না যে স্থানে স্থানে উহার আমদানী করিতে পারিলে ক্রেতার অভাব হইত। এইরূপে দেশের অনেক শিল্পেরই অবনতি ঘটিয়াছে। দেশের বারো আনাকে সাহায্য করিতে, তাহাদের অন্নের সংস্থান করিতে ইচ্ছুক যাঁহারা, তাঁহারা এই সকল গৃহজাত পণ্য যাহাতে সর্ব্বস্থানে সহজ লভ্য হয় ও যথাসম্ভব অল্পমূল্যে সরবরাহ হইতে পারে তাহার ব্যবস্থা করুন। তাহা হইলে অনেক মৃত বা অর্দ্ধমৃত শিল্প আপনি মাথা তুলিতে পারিবে। দেশের অনেক কাঁচা মাল কার্য্যে লাগিয়া অর্থাগমের পথ করিয়া দিবে।

আয়াস চায় সকলেই; বিশেষতঃ যাহারা ভবিষ্যত জ্ঞানহীন, দুপয়সা বেশী খরচ করিয়াও যদি বিনা আয়াসে দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা হইলে কেহ ঝঞ্ঝাটে মাথা দিতে চায় না। এই হেতুই হাতের কাছের জিনিষের কাটতি অধিক; তাঁত চড়কাও এই জন্যই তিরোহিত; বারো আনার আট হাতি কাপড় যেখানে তৈয়ারী পাওয়া যায়, সেখানে সূতা কাটা, কাপড় বুনা হাঙ্গামা করে কে? নতুবা, তাঁতের জোলাকে মোটা কাপড় যে বাজারের বিলাতী পাতলা ধুতি হইতে কম টেঁকসই তাহা কৃষকেরা না জানে তাহা নহে; প্রথমে আয়াস হিসাবেই মিলের কাপড়ের পক্ষপাতী হইয়াছিল তাহারা; ক্রমে পাতলা কাপড় পরিতে অভ্যস্ত হইয়া আরও বিপদে পড়িয়াছে! এই আয়াসের কুফলে বহু শিল্প নষ্ট হইয়াছে। বেশী দিনের কথা নয়। দশ বৎসরের পূর্ব্বেও দেখিয়াছি, গৃহে গৃহে পাটের সুতলী টেঁতে কাটিতে, ঘরের কাজে ইহার ব্যবহার ছিল এক চেটিয়া, সুতলী কাটাও হইত এমন সুন্দর যে কলের সুতলী হইতে কোন মতে নিকৃষ্ট ছিল না; তথাপি কলের পাকান দড়ির যেখানে সেখানে আমদানী ফলে ও পাক দেওয়ার হাঙ্গামা না থাকায়, ইহার কাটতি এত অধিক দাঁড়াইয়াছে যে হাতের সুতলীর ব্যবহার নাই বলিলেই হয়। অথচ এখনও হাতে কাটা সুতলীর (বাটীর) সের ।৵০, ।৶০ আর কলে পাকান সুতার সের ৸৵০ হইতে ১৲। পূর্ব্বে জেলেরা জাল ছোপাইত গাবের নির্য্যাসে, এখন ছোপায় আলকাতরায়। তাহারাই বলে আলকাতরা গাবের রসের মত জালকে টেঁকসই করে না; তবুও গাবের অভাব না থাকিলেও ও সস্তা হইলেও আলকাতরার প্রচলনই হইয়া পড়িয়াছে, কারণ গাবে জাল ছোপান ব্যাপারে হাঙ্গামা অধিক। আয়াসের প্রয়াস যে এইরূপে শত শত সুলভ ও অতি আবশ্যকীয় গৃহ-শিল্পের মাথায় বজ্রাঘাত করিয়াছে, তাহা কুড়ি বৎসরের ও আজকার বঙ্গপল্লীর তুলনা করিলেই বুঝা যায়। আবার যাহাতে এই সকল স্বদেশজাত সহজলভ্য দ্রব্যে দেশের সকলে বিশেষতঃ বাঙ্গলার বারো আনা নিজ নিজ অভাবমোচন করিতে চেষ্টিত হয়, নিজ নিজ ব্যবসায় সরঞ্জাম প্রস্তুত করে, তাহা যাহাতে যে শিক্ষা, যে উপদেশে, যে প্রকারেই হউক ইহাদের মত ফেরে শিক্ষিত উৎসাহী তাহার ব্যবস্থা করুন। উদাহরণ স্বরূপ বলি—দেশী ক্ষুর; কলিকাতার বাজারের বিলাতির অনুকরণে দেশী ক্ষুর নয়—পূর্ব্বে দেশের কামার, বাঁশের বাঁটে ক্ষুর প্রস্তুত করিত, এখনও অনেক পশ্চিম দেশবাসী নাপিতের নিকট তাহা দেখা যায়,—সেগুলি কার্য্যে সাধারণ

কোন বিদেশী ক্ষুর ইহা নিকৃষ্ট নয়, হাল্কা, দাম দশ বারো আনা; এই সকল দ্রব্যের প্রচলন হক; ফিনিশের দিকে না দেখিয়া ধারের দিকে দেখিতে আমরা অভ্যস্ত হইলে এ সকল মালের দস্তুর মত কাট্‌তি হইবে নিশ্চয়। বাবুরা এ সকল ক্ষুরে কামাইতে রাজী নন—কাজেই ইহার অপ্রচলন।

উপদেশের অপেক্ষা উদাহরণ বড়। শিক্ষিত জাগিয়াছেন,—তাঁহারা আত্মধর্ম্ম, আত্মশক্তিতে আজ আহ্বান। আপনাকে সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করিতে গিয়া তাঁহারা বুঝিয়াছেন,—কেবল আপনাকে লইয়া আত্ম নয়; নিজেকে বাঁচাইয়া চলিলে কেহই বাঁচিবে না,—তাঁহাদের দৃষ্টি পড়িয়াছে দেশের সমস্ত ভ্রাতা ভগিনীর উপর। যে চিত্র তাঁহাদের সমক্ষে তাহা কি ভয়ঙ্কর, শিক্ষায় দীক্ষায় হীন, এমন কি আত্মরক্ষায় অক্ষম—বারো আনার বেশী ভ্রাতা ভগিনী,—সকলেই দারিদ্র্যের পীড়নে মৃত প্রায়। এই দেশে শক্তির প্রতিষ্ঠা কম সমস্যার কথা নহে। মঙ্গলের কথা,—এ দেশের শত করা ৫টী শিক্ষিত হউক নিরাশ হইবার কিছু নাই, অভাব অত্যাচারে নানা প্রকার দুর্দ্দশায় আজ আপন বলে বাঁচিবার চেষ্টা, ফিরিয়া আসিয়াছে—নেতা সত্বর হউন দেশের বারো আনাকে সুপথ দেখাইয়া, কাজ দিয়া অন্নবস্ত্র লাভের সন্ধান বলিয়া দিয়া রক্ষা করুন! তাহাদের উন্নতিকেই আর চারি আনার উন্নতি। জাগরণ সফল হইবে যদ্যপি এই উন্নতির দিনে জাগে দেশের বারো আনা।

বৃদ্ধ।

পরিচারিকা

(নব পর্য্যায়)
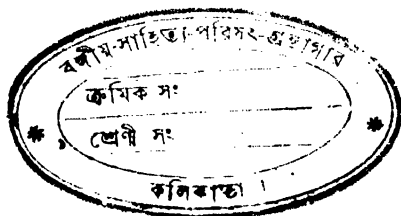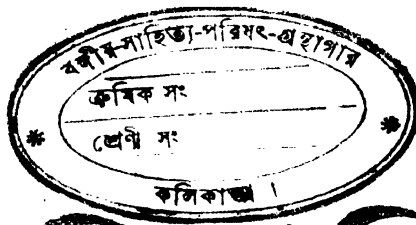
'তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ।'

৫ম বর্ষ। } বৈশাখ, ১৩২৮ সাল। { ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

সুরহারা।

—:*:—

ওগো, কোন্ কথা যে বল্‌ব তোমায়
তাই ভাবি আজ মনে
শিউরে ওঠে মনের বাণী
নীরব সঞ্চরণে

কান্নাহাসির মাঝে
শুনি তোমারি গান বাজে
গান যে আমার লুকিয়ে জাগে
তোমার বাঁশীর সনে।

আকুল হয়ে চাই
আজ কেমন করে গাই
গানের কুঁড়ি পড়্‌ল ঝরে
শুক্‌নো ফাগুন-বনে

সুরহারা মোর বাণী
তাই রইল সরম মানি'
পায়ে তোমার মুক্তা হয়ে
অশ্রু-বরষণে!

শ্রীপরিমলকুমার ঘোষ।

চিররহস্য সন্ধানে।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ।

সন্ন্যাসীর আবির্ভাবের পর, কয়েক দিন উল্লেখযোগ্য ঘটনা কিছুই ঘটে নাই;—একদিকে এল র‍্যামি আপন রচনাদি লইয়া ব্যপৃত এবং অপর দিকে ফেরাজ তাহার সঙ্গীত ও কবিতার আলোচনায় অভিনিবিষ্ট,—এইভাবেই দিনগুলি কাটিয়া যাইতেছিল।

অবশেষে সেই বিশেষ 'সম্মিলনী-দিবসটী', যাহাতে উপস্থিত হইবার জন্য লর্ড মেলথর্প এই ভ্রাতৃযুগলকে নিমন্ত্রণ করিয়া গিয়াছিলেন, আসিয়া পড়িল। যুবরাজের অভ্যর্থনার জন্যই বিশেষভাবে আহুত হওয়ায়, মেলথর্প-গৃহিণীর এই সম্মিলনীটীতে কেবল বাছা বাছা ব্যক্তির্গই নিমন্ত্রিত হইয়াছিলেন। সত্য,—রাত্রি দ্বিপ্রহরের পর কেবলমাত্র দশ মিনিটের জন্যই যুবরাজের উপস্থিতি নির্দ্ধারিত ছিল, কিন্তু তাহাতে কি যায় আসে—সামাজিকতা হিসাবে সম্মিলনীকে নিখুঁত করিয়া তুলিবার জন্য রাজ-পরিবারের একটু গন্ধ থাকা লইয়াই কথা।

সকল কক্ষেই অতিরিক্ত জনতা,—এত অতিরিক্ত যে বিশেষ কোনো লোকের প্রতি মনোযোগী হওয়াই দুঃসাধ্য। তথাপি, এল র‍্যামি যখন কনিষ্ঠ ভ্রাতাটীকে সঙ্গে লইয়া ঘটনা-স্থলে উপস্থিত হইলেন, তখন চারিদিক হইতেই বেশ একটু আগ্রহ ও প্রশংসার সাড়া পড়িয়া গেল। কারণ ছিল; এই ভ্রাতৃযুগলের আকৃতি ও চাল-চলন এতই বিশিষ্ট যে সাধারণের দৃষ্টি স্বভাবতঃই সেঁদিকে আকৃষ্ট হইবার কথা। তাঁহাদের উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ, স্থিরায়ত উদাস নয়ন, ক্ষীণ অথচ তেজঃপুঞ্জ কলেবর, বহুমূল্য প্রাচ্য-পরিচ্ছদের পারিপাট্য, এবং সর্ব্বোপরি গম্ভীর ও সংযত ভাবভঙ্গী, সেই সকল অসংযতবাক্ ও লঘুচিত্ত সম্ভ্রান্তবর্গের তুলনায় বিশেষ লক্ষ্যণীয় হইয়া উঠিল। অতি সৌখীন একটী গাউনে সুসজ্জিতা এবং হীরক মুকুট-বিভূষণা লেডি মেলথর্প স্বয়ং ভ্রাতৃদ্বয়কে সমাগত দেখিয়া অত্যন্ত পুলকিত হইয়া উঠিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন যে, ঐ সুন্দর চেহারা দু'খানি বাস্তবিকই কক্ষের অলঙ্কার স্বরূপ হইয়া উঠিয়াছে। হাস্য-বিকশিত আননে একেবারেই এল র‍্যামির নিকটে উপস্থিত হইয়া তিনি আপনার হীরক-বলয়িত হস্তখানি প্রসারিত করিয়া দিলেন এবং প্রফুল্লকণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন,—

"বড় খুসী হয়েছি এল র‍্যামি,—তুমি আসাতে বড় খুসী হয়েছি;—উঃ, কতদিন পরে যে আজ পথ ভুলে এসে পড়েছো। এই যে তোমার ছোট ভাইকেও এনেছো! বাঃ, বড় খুসী! কেন এত দিন আমাকে বল নি যে তোমার ভাই আছে? বড় দুষ্টু তুমি! কি নাম তোমার ভায়ের? ফেরাজ? বাঃ, অতি সুন্দর!—শুনলে তোমাদের দেশের সেই হাফেজ কি সাদীর কথা মনে পড়ে। রোসো, তোমাদের সঙ্গে এক জনের পরিচয় করিয়ে দেই,—একটু রোসো উঃ, ঘরের মাঝখানটায় যে বিষম ভিড়—হয় তো ওদিকে যেতেই পারবো না—নাঃ, এইখানেই দাঁড়াও, আমি চট্ করে' ডেকে নিয়ে আসছি—ব্যারণেস্‌কে তুমি চেন না বোধ হয়? বড় মজার লোক সে,—এমন সুন্দর হাত গুনতে পারে যে আর কি বলবো! হাঁ, এইখানেই দাঁড়াও, একটুও নড়ো' না,—আমি এলেম ব'লে!"

ক্ষিপ্রগতিতে মেলথর্প-গৃহিণী ভিড়ের মধ্যে মিশাইয়া পড়িলেন এবং ফেরাজ বিশেষ কৌতুক অনুভব করিয়া সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে ভ্রাতার দিকে চাহিল।

"উনিই লেডী মেলথর্প?"

"উনিই লেডী মেলথর্প"--এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"আমাদের অদ্যকার আশ্রয়-দাত্রী,--লর্ড মেলথর্পের পত্নী; অর্থাৎ তাঁর 'সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, পীড়ায় স্বাস্থ্যে এবং শয়নে ভোজনে একমাত্র অবলম্বন; যতদিন মৃত্যু উভয়কে ভিন্ন না করে ততদিন পর্য্যন্ত পরস্পরের প্রেম, শ্রদ্ধা, ও প্রীতির অদ্বিতীয় সামগ্রী'—" ব্যঙ্গ হাস্যে এল র‍্যামি বলিলেন—"বিশেষ সুশ্রাব্য নয়, কেমন? তাই বোধ হ'চ্ছে না কি?—অর্থাৎ আমি বল্‌তে চাই যে, এরকম গুরুতর অঙ্গীকার সর্ব্বত্র বেশ বিময়োপযোগী হয় না। কেমন লাগ্‌লো ওঁকে?"

"কথাবার্ত্তাগুলো বেশ সরল বলে' বোধ হ'ল না"—ক্ষুব্ধ স্বরে ফেরাজ উত্তর করিল।

এল র‍্যামি হাসিয়া উঠিলেন।

"হা অদৃষ্ট, ভদ্রসমাজের মধ্যেও 'সরলতার' আশা কর!—অন্যায়—বড় অন্যায়। তুমি 'জীবন' দেখ্‌তে চেয়েছিলে না? কিন্তু গোড়াতেই সরলতার দাবী করে' বস্‌লে 'জীবন' দেখ্‌বে কি করে'?"—এই সময় সমাগত জনসংঘের দিকে একটী অর্থপূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া তিনি বলিলেন—"এই ভদ্র-সম্মিলনীতে সরলতার সংস্পর্শ ঘট্‌লে কি আর রক্ষে আছে! তা' হ'লে কি হ'বে জানো? বারুদের কারখানায় দেশালাইয়ের কাঠি জ্বেলে দিলে যেমন হয়, ঠিক তেমনিই এ-সব উড়ে পুড়ে ভেঙ্গে চুরে একেবারে ত্রিশূন্যে মিশিয়ে যাবে,—খানিকটা দুর্গন্ধ ছাড়া আর কিছুই বাকী থাক্‌বে না।"

"সেও ভাল,"--ফেরাজ উত্তর করিল—"তবু কুটীল হৃদয়কে সরল বলে' ভুল হওয়া কিছু নয়!"

স্নিগ্ধ নয়নে এল র‍্যামি ভ্রাতার দিকে চাহিলেন;—কি সুন্দর তাহার যৌবন-লাবণ্য-মণ্ডিত মুখখানি,—কি মহৎ ভাব-গরিমা তাহার শান্তোজ্জ্বল নয়ন-দুখানিতে! এই ঐশ্বর্য্যমদ গর্ব্বিত, উচ্ছৃল, উদ্দাম, ব্যাভিচার-কলুষিত লোকারণ্যের মধ্যে কি শোভা ঐ স্থল-পদ্মটীর! এল র‍্যামি মুগ্ধ নয়নে ভ্রাতাকে দেখিতে লাগিলেন।

লর্ড মেলথর্প এই অবকাশে স্মিতাননে অগ্রসর হইয়া আসিয়া, এল র‍্যামির হস্ত ধারণ করিলেন এবং দু'এক কথার পর সমভিব্যাহারী কোনো একটী ভদ্রলোকের পরিচয় প্রদানার্থ বলিলেন—"রায় এনস্‌ওয়ার্থ, বিখ্যাত চিত্রশিল্পী, নাম শুনে থাক্‌বে!"

"না, না, কি বলেন,—বিখ্যাত একেবারেই নয়"—ভ্রাতৃদ্বয়ের দিকে ভাব-বিভোর চক্ষে চাহিয়া উদ্দিষ্ট ভদ্রলোকটী সৌজন্য প্রকাশ করিলেন—"অন্ততঃ আজও বিখ্যাত হয়নি ; তবে হ'বার চেষ্টা করছি। আজকালকার দিনে 'বিখ্যাত' হ'তে গেলে অনেক বাহ্যাড়ম্বর, দরকার হয়, অনেক ভোজের ব্যবস্থা করতে হয়,—বড় বাড়ী রাখতে হয়, গাড়ী ঘোড়ার ব্যবস্থা করতে হয়,—তবে তো! বিখ্যাত কি এমনি হ'লেই হ'ল ? কালটী কি রকম !"

এল র‍্যামি গম্ভীরভাবে একটু হাস্য করিলেন ; পরে বলিয়া উঠিলেন—"নিভে যাবার আগে দীপশিখার অস্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য আর কি।"

"ঠিক্! আপনিও তাই মনে করেন নাকি ? বাঃ, আমারও ঠিক ঐ ধারণা। বাস্তবিকই, পৃথিবীর প্রলয়-কাল যে কি তাড়াতাড়ি এগিয়ে আসছে, তা' ভাবলে আশ্চর্য্য হ'তে হয়। রোগীদের যেমন বায়ু পরিবর্ত্তন দরকার, আমাদেরও তেমনি শিগ্‌গিরই কোনো গ্রহ-পরিবর্ত্তনের দরকার হয়েছে। আপনার ভ্রাতাটীকে দেখে কিন্তু বোধ হ'চ্ছে"—এইখানে ফেরাজের দিকে একটা চকিত-দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া ভদ্রলোকটী বলিলেন—"যে উনি আগে থেকেই যেন অন্য জগতের মানুষ।"

শুনিবামাত্র ফেরাজ, প্রীত হইলেও যেন চমকিয়া উঠিল ; বলিল—"ঠিক, কিন্তু আপনি জানলেন কেমন করে' ?"

এইবার চিত্রশিল্পী মহাশয় বিপন্ন হইয়া পড়িলেন। বাক্যালঙ্কার-হিসাবেই তিনি 'অন্য-জগত' কথাটা ব্যবহার করিয়াছিলেন, বিশেষ-কিছু ভাবিয়া নহে ; অপরপক্ষে ফেরাজ তাহা অন্য অর্থেই বুঝিয়াছে। মহা বিপদ,—ভদ্রলোক কি যে উত্তর দিবেন তাহা স্থির করিতেই পারিলেন না ; এল র‍্যামিই অবশেষে তাঁহাকে বিপন্মুক্ত করিলেন :—

"মিঃ এনস্‌ওয়ার্থ এইমাত্র বলতে চান ফেরাজ, যে, তুমি অন্য দশজনের মত দেখতে নয়, একটু ভিন্ন রকম। কবি কি গায়ক যারা, তাদের প্রায়ই একটা নিজস্ব বিশেষত্ব থাকে।"

"ইনি কবি নাকি ?" লর্ড মেলথর্প সোৎসাহে জিজ্ঞাসা করিলেন—"কোনো বইটই ছাপিয়েছেন ?"

এল র‍্যামি উচ্চহাস্য-সহ উত্তর করিলেন—"না, উনি ছাপান নি ! আমাদের সকলকেই যে পৃথিবীর জন্যে, প্রাণের রস শিরার শোনিত ঢেলে দিতে হবে, এমন কোনো কথা নেই,

মেলথর্প! কেউ কেউ উচ্চতর জগতের জন্যে তাঁদের শক্তি সঞ্চয় করে' রাখ্‌তে চায়। নরসমাজের এই দুর্ভিক্ষের আগুনে একটা আত্মার সমস্ত সঞ্চয় আহুতি দেওয়া, খরচের হিসাবে খুবই অতিরিক্ত বল্‌তে হবে।"

নিশ্চয়ই, আমি একথার সম্পূর্ণ সমর্থন করি,"—পার্শ্ব হইতে একটী সরু অথচ সুমিষ্ট কণ্ঠে উত্তর আসিল—"দধিচি বলে' কোন্ একজন মুনি নাকি ঐ রকম নির্বোধ ছিল; সেরকম নির্বোধ-দৃষ্টান্ত অনুসরণ করা আমাদের পক্ষে একেবারেই অনুচিত।"

লর্ড মেলথর্প ও মিঃ এনস্‌ওয়ার্থ একেবারেই স্বর-লক্ষ্যে ফিরিয়া দাঁড়াইলেন এবং সসম্ভ্রমে বক্তার জন্য প্রবেশ-পথ ছাড়িয়া দিলেন। পরমুহূর্ত্তেই এক সুন্দরী তাঁহাদের সম্মুখীন হইলেন,—তাঁহার আকৃতি ও আয়তন বেশ মানানসই, মুখখানি লাবণ্যময় ও চিন্তাশীলতার পরিচায়ক, নয়নে প্রচ্ছন্ন প্রতিভার দীপ্তি, ওষ্ঠযুগলে ব্যঙ্গহাস্য এবং পরিহিত পরিচ্ছেদের চারিদিক হইতে উজ্জ্বল-হীরক-প্রভা বিকীর্ণ হইতেছে। এল র‍্যামি ও ফেরাজ উভয়েই সে দিকে চাহিলেন,—অন্যান্য মহিলাবৃন্দের মধ্যে ইঁহার স্বাতন্ত্র্য যেন বিশেষ করিয়াই চোখে পড়িবার মত।

"আপনি আসায় বিশেষ-সম্মানিত বোধ করছি"—যথাযোগ্য অভ্যর্থনার পর লর্ড মেলথর্প বলিলেন—"কারণ, ক্কচিৎ এ সৌভাগ্য আমাদের ভাগ্যে ঘটে!" এনস্‌ওয়ার্থকে তো আপনি জানেনই,—আসুন, আমার প্রাচ্য-বন্ধুদের সঙ্গে পরিচিত করে দেই; এল র‍্যামি জ্যারানোস্—তাঁর কনিষ্ঠ সহোদর ফেরাজ—মাডাম আইরিণ ভ্যাসিলিয়াস, বিখ্যাত লেখিকা।"

এল র‍্যামি অবশ্যই তাঁহার নাম শুনিয়াছিলেন; তাঁহার মূর্খ-সমালোচক-ত্রাস লেখনীর শাণিত বিদ্রূপ-বজ্র এবং সাধারণের উপর প্রভাব বা শাসন-দক্ষতা প্রভৃতির কথাও কিছু কিছু শুনিয়াছিলেন,—সুতরাং এই অসামান্যা নারীটীকে কতকটা সম্ভ্রম ও কৌতূহলের চক্ষেই দেখিলেন এবং প্রথম পরিচয়সূচক অভিবাদনও করিলেন।

প্রতি নমস্কার করিয়া মহিলাটী অনুসন্ধিৎসু দৃষ্টিতে এল র‍্যামির দিকে চাহিলেন এবং ভাবস্তিমিত স্নিগ্ধ নয়ন দু'খানি তাঁহার উপর নিবদ্ধ রাখিয়া বলিলেন—"আপনিই বল্‌ছিলেন না, যে, নরসমাজের আকাঙ্ক্ষার দুর্ভিক্ষে সমস্ত আহুতি দিয়ে ফেলা আমাদের উচিত নয়?"

"হ্যাঁ, মাডাম, আমিই বল্‌ছিলাম"—এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"কারণ সে চেষ্টায় জীবন অপব্যয়িতই হয়,—অথচ মানবসমাজও চিরকাল কৃতঘ্ন।"

"আপনি কি এটা প্রমাণ করেছেন? হ'তে পারে, আপনি মানব-সমাজের কৃতজ্ঞতা-লাভের যোগ্য হ'বার চেষ্টাই করেন নি।"

একেবারে আঁতে ঘা দিয়া কথা! এল র‍্যামি বিস্মিত এবং উহার অন্তর্নিহিত সত্যে মনে মনে ঈষৎ বিরক্তও হইলেন। আইরিণ তখনও প্রশান্ত দৃষ্টিতে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিলেন,—এক্ষণে এন্সওয়ার্থের দিকে ফিরিলেন।

ঐ দেখ তোমার ছবির আদর্শ"—ফেরাজের উদ্দেশে ইঙ্গিত করিয়া তিনি বলিলেন—"তোমার প্রাইনের হাত ধরে' ঐ ছেলেটীকে দাঁড় করালে, চমৎকার একটী চিত্রের বিষয় হ'তে পারবে, অপ্সরীদেরও মন গলে যাবে।"

"তোমার মন যদি গলাতে পারতাম, তা' হ'লেও না হয় চেষ্টা করে' দেখা যেত,"—চিত্রকরের ভাব-বিভোর চক্ষে অনুরাগ-লক্ষণ স্পষ্ট হইয়া উঠিল—"কিন্তু হায়, তুষারের নাহি হাস্য নাহি অশ্রুজল,—বিদুষী নারীদের প্রাণেও প্রেমের রেখাপাত দুর্ঘট।"

"ভুল বিশ্বাস,—এও মানব-সাধারণের সঙ্কীর্ণ ধারণাগুলির অন্যতম"—অলস ভাবে হাত-পাখাখানি ঘুরাইতে ঘুরাইতে লেখিকা উত্তর করিলেন।

"আমার ধারণা কিন্তু এ রকম নয়"—মেলথর্প বলিলেন—"আমার মতে স্ত্রীলোকেরা পুরুষদের চেয়ে বেশী চালাক।"

"আহা, আপনি তো আর সমালোচক নন,"—হাসিয়া আইরিণ উত্তর করিলেন—"কাজেই উদারতা জিনিসটাকে বরদাস্ত করতে পারেন! তবু মোটের ওপর, বুদ্ধিমতী স্ত্রীলোকদের পুরুষেরা দেখ্‌তে পারেন না, কারণ সে বেচারীদের বুদ্ধি পুরুষেরা ঈর্ষার চক্ষে দেখেন।"

"কৃতকার্য্য হওয়া খুবই সোজা,"—আইরিণ ঔদাস্যভরে উত্তর করিলেন—"প্রথমে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হও, তারপর সেই প্রতিজ্ঞাকে কর্ম্মপথে চালিয়ে দাও।"

এল র‍্যামি নবীভূত আগ্রহে মহিলাটীর দিকে চাহিয়া বলিলেন—"আপনার মনের জোর খুবই বেশী দেখ্‌ছি; কিন্তু মাফ করবেন, আমি বলতে বাধ্য হচ্ছি যে আপনার মত একাধারে

সৌন্দর্য্য, প্রতিভা, আর সেই সঙ্গে এতখানি চিত্তদৃঢ়তা স্ত্রীজাতির সর্ব্বত্র নেই। অধিকাংশ স্ত্রীলোকই নির্ব্বোধ, এমন কি আলাপেরও অযোগ্য।"

"অধিকাংশ পুরুষও আমার চোখে ঠিক এই রকম দেখায়!"—মিষ্ট হাসি হাসিয়া আইরিণ উত্তর করিলেন—"আবার মজা এম্নি, যে, ঐ নির্ব্বোধ বা আলাপেরও অযোগ্য স্ত্রীলোক-দলকেই পুরুষ বিশেষভাবে পরিণয়ের জন্যে নির্ব্বাচন করে' থাকেন, তাহাদেরই জাতির জননী করে তুল্‌তে চান। এত সূক্ষ্ম হিসাব, এত ভবিষ্যদৃষ্টি, এত পাণ্ডিত্য,—তবু এইত তাঁদের বিবেচনার দৌড়!"—আর এক বার পূর্ব্ববৎ হাসিয়া আইরিণ বলিতে লাগিলেন—"লর্ড মেলথর্পের মুখে শুনেছি, আপনি একজন পরম জ্ঞানী পুরুষ, আধুনিক দুর্দ্দিনে প্রাচ্য জ্ঞান-সম্পদ নিয়ে দেখা দিয়েছেন; এখন আপনাকে আমার একটী জিজ্ঞাস্য আছে। নিজে এ সমস্যার কিনারা পাইনি, তাই আপনাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছি,—বলে দিতে পারেন, আমি কে, কি জন্যে এসেছি?"

সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া এল র‍্যামি জানাইলেন—"মার্জ্জনা কর্‌বেন, এক মুহূর্ত্তে এত বড় একটা জটিল সমস্যার মীমাংসা করা আমার সাধ্যাতীত।"

মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া আইরিণ হাস্য করিলেন এবং উত্তরদাতার তীক্ষ্ণোজ্জ্বল কৃষ্ণাপাঙ্গ নয়নদ্বয়ে আপনার অকম্পিত দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া দাঁড়াইলেন। পরে আপন বাহুখানি তাঁহার দিকে প্রসারিত করিয়া বলিলেন—"পরীক্ষা করুন; চিন্তা-তরঙ্গের মধ্যে যদি সত্য থাকে, তবে আমার অঙ্গুলি-স্পর্শ অবশ্যই আপনার মস্তিষ্কে বৈদ্যুতিক অর্থ প্রেরণ করবে।"

এল র‍্যামি তাঁহার করতলখানি আপন করতলে দৃঢ় আবদ্ধ করিয়া ক্ষণকাল নিবিষ্টচিত্তে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। মিনিট দুয়েক পরেই তাঁহার মুখভাবে একটা দারুণ বিস্ময়-লক্ষণ ব্যক্ত হইল।

"এ কি সম্ভব?" আপন মনে তিনি বলিয়া উঠিলেন—"এ কি বিশ্বাসযোগ্য?"

উপস্থিত সকলেই সমস্বরে বলিয়া উঠিল—"ব্যাপার কি মহাশয়? আমাদের কি দয়া করে জানাবেন না?"

সসম্ভ্রমে আইরিণের দিকে নত হইয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"তবে, এখন বিবৃত কর্‌তে পারি কি?"

স্মিত মুখে মহিলা সম্মতি জ্ঞাপন করিলেন।

"যদিই বা আমি একটু বিস্মৃত হ'য়ে থাকি, তাতে আশ্চর্য্য হবেন না"—শান্ত সংযতকণ্ঠে এল র‍্যামি বলিতে লাগিলেন—"কারণ জীবনে এই প্রথম আমি এক স্ত্রীলোকের হাত দেখ্‌ছি যাঁর জীবনকে আদর্শ জীবন বল্‌তে পারি। মাডাম! আপনাকে আমি হ্যামলেটের ভাষাতেই সম্ভাষণ কর্‌বো—'Pure as ice, chaste as snow, thou shalt not escape calumny'. আপনার মত জীবন, অকলঙ্ক, উদার, কর্ম্মময়, আশাময়, ধৈর্য্যভরা, স্বাবলম্ব,—এ রকম জীবন পুরুষজাতির পক্ষে তিরস্কার-স্বরূপ; এতখানি শ্রেষ্ঠতাকে কাচিৎ তা'রা ভাল বাস্‌বে। যদিও বা কেউ ভালবাসে, তবে সম্ভবতঃ তা' নিরাশ-প্রণয়ই, থেকে যাবে,—কারণ, আপনার জীবনের চরিতার্থ এ-লোকে নয়, অন্য কোথাও।"

আইরিণের স্নিগ্ধ নয়ন দু'খানি বিস্ময়-বিস্ফারিত হইল,—উপস্থিত জনসাধারণ মুগ্ধ বিস্ময়ে বারংবার এল র‍্যামির দিকে চাহিতে লাগিল।

"তবে কি আমরণ এম্‌নি একাই আমাকে থাকৃতে হবে?"—আইরিণ নতমুখে প্রশ্ন করিলেন।

"বাস্তবিকই কি আপনি একা আছেন?" গম্ভীর-হাস্যসহ এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"এই নরনারীর হাটের ভিড় থেকে, কবির নির্জ্জন-বাসেই কি অধিক সঙ্গী মেলে না?"

এল র‍্যামির আবেগ-দীপ্ত দৃষ্টির সহিত আইরিণের দৃষ্টি মিলিল; একটী কমনীয় মাধুর্য্যে তাঁহার নিটোল-সুন্দর আননখানি উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল।

"ঠিক বলেছেন,"—মহিলা সংক্ষেপে বলিলেন—"দেখ্‌ছি, আপনি বহুদর্শী।"

শ্রদ্ধাভরে অভিবাদন করিয়া আইরিণ গমনোদ্যতা হইলেন এবং এল্‌ওয়ার্থ তাঁহার পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইলেন।

"নিজের অদৃষ্টে বেশ খুসী হয়েছো বোধ হয়?"

"অবশ্যই হ'য়েছি; না হব কেন?"

"নিঃসঙ্গতাই যখন ও-অদৃষ্টের একটা অঙ্গ, তখন বোধ হয়, তুমি কখনও বিবাহ কর্‌বে না?"

"সম্ভবতঃ নয়,"—মৃদুহাস্য সহ আইরিণ উত্তর করিলেন—"আশঙ্কা হয়, কোন পুরুষকে

কখনই হয়তো আমি শ্রেষ্ঠ মনে করতে পারবো না।"

আইরিণ চলিয়া গেলেন এবং এন্সওয়ার্থ বিরক্তভাবে কয়েক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া পুনরায় এল র‍্যামির নিকট চলিয়া আসিলেন।

এল র‍্যামি ইতোমধ্যে পাঠকের পূর্ব্বপরিচিত ড্যাগানের সহিত আলাপে ব্যাপৃত ছিলেন। এই ভদ্রলোকটীকে দেখিয়াই বোধ হইতেছিল যেন তাহার ভিতরে কোথায় একটা কিসের গোলমাল চলিতেছে, যেন কিছু একটা প্রকাশ করিয়া বলিবার জন্য সে বিশেষ উৎকণ্ঠিত, কিন্তু তাহা কোনোমতেই না পারিয়া একবার ফেরাঙ্কের দিকে চাহিতেছে, একবার আপন দাড়ী লইয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িতেছে, এবং এমন সমস্ত কথাবার্ত্তা কহিতেছে যাহা যথেষ্ট সুসংলগ্ন নহে। কৌতূহলের সহিত এল র‍্যামি তাহার চাঞ্চল্য উপভোগ করিতেছিলেন।

"যেদিন নতুন হ্যামলেট্ দেখ্‌তে যাই, সে রাত্তিরের কথা তোমার মনে আছে এল র‍্যামি ?" অবশেষে সে বলিয়া উঠিল—"তারপর তোমার সঙ্গে দেখা হয় নি, আজ প্রায়—"

"খুব মনে আছে", —সংযত স্বরে এল র‍্যামি বলিলেন—"সেদিন হ্যামলেটের আর তোমার দুজনেরই অদৃষ্টে এক প্রশ্ন ভাস্‌ছিল—'হবে কি হবে না'; কিন্তু আশা করি, এতদিনে তোমার পক্ষে সেটা সুখকর মীমাংসায় দাঁড়িয়ে গিয়েছে, অর্থাৎ 'হবে' বলেই ঠিক হ'য়েছে।"

"কি হবে বলে' ঠিক হ'য়েছে ?" ড্যাগান জিজ্ঞাসা করিল।

"বলি, তোমার বিয়ের দিনটা কি বারে পড়লো ?" এল র‍্যামি প্রশ্ন করিলেন।

ড্যাগান প্রায় লাফাইয়া উঠিল।

"কি আপদ !......তুমি ভারী দুষ্টু ! যাই হোক, মোটের ওপর তোমার কথাই ঠিক। মিস্ চেষ্টারের সঙ্গে আমার কথাবার্ত্তা চল্‌ছে।"

"চল্‌বে বৈ কি,"—হাসিয়া এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"যাক্, শুভকার্য্যে তুমি কালবিলম্ব করনি দেখে খুসী হলাম। থিয়েটারে উভয়ের শুভ-সাক্ষাতের পর থেকে আজ পর্য্যন্ত এক পক্ষও অতীত হয় নি বোধ হয় ? হুঁ......তা' হ'লে স্বীকার কর যে, আমি একজন ভাল দৈবজ্ঞ !"

ড্যাগান মনে মনে অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করিতে লাগিল; তাহার ইচ্ছা হইল যে, ঐ গণনার সত্যাসত্য লইয়া একটা তর্ক জুড়িয়া দেয়, কিন্তু তাহা করিবার পূর্ব্বেই লেডী মেলথর্প ভিড়ের

ভিতর হইতে ব্যস্তসমস্তভাবে বাহির হইয়া আসিয়া সোৎসাহে বলিলেন —

"নাঃ, ব্যারণেস্‌কে খুঁজে পাওয়া গেল না! পাবো কি, তাঁকে দরকার যে কত লোকের তা'র কি ঠিক আছে! তুমি জান না এল র‍্যামি, সে ঠিক তোমারই মতন আশ্চর্য্য লোক! না, ঠিক অতটা হবে না,—তবে প্রায় কাছাকাছি! হাতের রেখা দেখে, বুঝ্‌লে কিনা,—শুধু হাতের রেখা দেখে সে তোমার ভূত ভবিষ্যৎ একেবারে হুবহু বলে দেবে! তুমিও তা' পারো বোধ হয়?"

এল র‍্যামি হাসিয়া উঠিলেন।

"বেদেদের জোচ্চুরি আর কি! চাকর চাকরাণীদের মন ভোলাবার জন্যে বেদেরা রাস্তায় রাস্তায় এই রকম ভাগ্য গণনা করে' বেড়ায়; এই অপরাধে পুলিশ সে বেদেনীদের গ্রেপ্তারও করে' থাকে। কিন্তু লণ্ডনের এই 'মজলিস'-বেদেরা দিব্য নির্ব্বিবাদেই ব্যবসা জমিয়ে চলেছে।"

"আঃ, এল র‍্যামি,—না, বড় অন্যায় তোমার, বড় অন্যায়!" ক্ষুব্ধকণ্ঠে মেলথর্প-গৃহিণী বলিয়া উঠিলেন—"তুমি অত্যন্ত অবিচার কর্‌ছ! আমাদের এই ছোটখাট আমোদ-প্রমোদ-গুলোকে ও রকম অবজ্ঞার চোখে দেখো না,—বর্ত্তমান যুগে, অতিমানুষিক ব্যাপার যে আমাদের কাছে কতখানি প্রিয় তা' তোমার জানা উচিৎ।"

এল র‍্যামির মুখ বিবর্ণ হইল,—তিনি শিহরিয়া উঠিলেন। অতিমানুষিক ব্যাপার! সেই ভয়ঙ্কর কিছু, যাহা কায়াহীন ছায়ার মত মরণ সেতু পারে অপেক্ষা করিতেছে, যাহা সংশয়-সত্বেও এল র‍্যামির নিকট আপন অস্তিত্ব সপ্রমাণ করিয়াছে, যাহার আভাষ এই অল্পক্ষণ পূর্ব্বেই আইরিণের ক্ষণিক স্পর্শের ভিতর দিয়া এল র‍্যামির শিরায় শিরায় স্পন্দন প্রেরণ করিয়াছে—সেই অতিমানুষিক ব্যাপার, কত অনায়াসেই না এই সকল অজ্ঞ জনসাধারণ ওষ্ঠাগ্রে উচ্চারণ করিয়া থাকে!

চিত্রশিল্পী এন্সওয়ার্থ এতক্ষণ এল র‍্যামির চিন্তা-বিষণ্ন মুখভঙ্গী অবলোকন করিতেছিলেন। এক্ষণে ফেরাজের দিকে দৃষ্টি পড়ায়, উভয়ের পার্থক্য-দর্শনে তিনি চমৎকৃত হইলেন। সেই সরল, উদার, সুন্দর মুখশ্রীটী একেবারেই যেন তাঁহার চিত্ত আকর্ষণ করিয়া লইল, এবং আইরিণের প্রস্তাবটার স্মরণ হওয়ায়, ফেরাজের নিকট সরিয়া আসিয়া তিনি বলিলেন—

"আমার ইচ্ছা যে আপনি আমার সঙ্গে বসেন।"

"আপনার সঙ্গে? ছবির জন্যে বোধ হয়?" প্রফুল্ল অথচ বিহ্বলকণ্ঠে ফেরাজ জিজ্ঞাসা করিল।

"হ্যাঁ। ঠিক আপনার মত মুখই আমি চাই। আপনি কি সহরে থাকেন?—সময় হবে না কি?"

"সর্ব্বক্ষণই আমি আমার ভাইএর সঙ্গে থাকি"—একটু ইতস্ততঃ করিয়া ফেরাজ বলিল।

এল র‍্যামি শুনিলেন, একটু মলিন হাসি হাসিলেন, পরে নম্রকণ্ঠে জানাইলেন—"ফেরাজ স্বেচ্ছাধীন, তাঁ'র সময় সে আপন ইচ্ছামতই খরচ কর্‌তে পারে।"

"তবে আর কি, আসুন, আমরা এ বিষয়ে একটা পরামর্শ করি"—ফেরাজের হাত ধরিয়া এন্সওয়ার্থ বলিলেন—"ভিড়ের ভেতর থেকে, চলুন, বাইরে যাওয়া যাক্; কোনো নির্জ্জন কোণ বেছে নিয়ে সেইখানে বসা যাবে 'খন। আসুন!"

অনুমতির জন্য ফেরাজ যথারীতি ভ্রাতার দিকে চাহিল, কিন্তু এল র‍্যামি তখন অন্যদিকে ফিরিয়া লর্ড মেলথর্পের সহিত কথা কহিতেছিলেন। অগত্যা, অর্দ্ধ আগ্রহে, অর্দ্ধ অনিচ্ছায়, সেই সকল বিচিত্র-বেশ নরনারীর মণ্ডলীর ভিতর দিয়া ফেরাজ অগ্রসর হইল; চতুর্দ্দিক হইতে তাহার উপর কৌতূহলী দৃষ্টি বর্ষিত হইতে লাগিল এবং তাহার বড় বড় চক্ষু দুটী বারংবার, চকিত-মৃগ-নয়নের মত, অদৃষ্টপূর্ব্ব দৃশ্যাবলী দেখিয়া নিরীহ-বিস্ময়ে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে লাগিল।

প্রতিমুহূর্ত্তেই ফেরাজ অনুভব করিতেছিল যে, এই সমস্ত ঔজ্জ্বল্য এই সমস্ত পারিপাট্য, যেন যথেষ্ট সরল নয়,—যেন একটা কৃত্রিমতার মরণ মায়া চতুর্দ্দিকের চাঞ্চল্যের মাঝখানে লুকাইয়া রহিয়াছে; তাহার কবি-চিত্ত বারংবার সঙ্কুচিত হইয়া এই সকলের সংস্পর্শ হইতে দূরে সরিয়া যাইতেছিল,—কিন্তু তথাপি, কেমন একটা সাময়িক মোহে সে আবিষ্ট হইয়াও পড়িতেছিল

তথাকথিত 'সমাজের' সহিত ফেরাজের প্রথম পরিচয় এইরূপেই ঘটিতে চলিল।

চতুর্বিংশ পরিচ্ছেদ।

রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় যুবরাজ আগমন করিলেন এবং কর্ত্তাগৃহিণীকে করকম্পনে ধন্য করিয়া, একটু কেতাদুরস্ত হাসি হাসিয়া, বড় জোর দু'পাঁচজন পরিচিত অভ্যাগতের সহিত দণ্ড দুই কথা কহিয়া, চলিয়া যাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। এ সমস্ত গোলযোগ অপেক্ষা শয়নে পদ্মনাভের জন্যই তাঁহাকে অধিকতর আগ্রহান্বিত দেখা গেল।

যুবরাজের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের জনতাও অনেক পাতলা হইয়া গেল;—অনেক অভ্যাগত সরিয়া পড়াতে ঘরগুলিও বেশ খালি হইয়া আসিল। এখন অনেকেই দলে দলে এদিকে-সেদিকে বসিয়া নানা প্রকার গল্পগুজবের অবসর পাইল।

এক ঘরে একটী সুন্দর পিয়ানো খোলা পড়িয়াছিল। শ্রীমতী আইরিণ তাহার দন্তীদন্ত-রচিত চাবীগুলির উপর অলসভাবে অঙ্গুলি-সঞ্চালন করিতেছিলেন। তাঁহার পার্শ্বেই এক-খানি গোল কেদারায় একস্থূলকায়া প্রৌঢ়া রমণী উপবিষ্টা। এত স্থূল তাঁহার দেহ যে প্রতি-মুহূর্ত্তেই ভয় হইতেছিল, বুঝিবা তাঁহার পরিহিত রেশমী-গাউনটা এখনই ফাঁসিয়া যায়! বস্তুতঃ বালিশের খোলের মত, পরিচ্ছদটা বেচারাকে বিষম জোরে আঁটিয়া ধরিয়াছিল। ইনি অনর্গল হাসিতেছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে পুরুষোচিত ভঙ্গীতে আপন চিবুকে হাত বুলাইতে ছিলেন। লেডী মেলথর্প এতক্ষণ যাঁহাকে গরুখোঁজা করিয়া বেড়াইয়াছেন, ইনিই সেই ব্যক্তি, হস্ত-গণনা-নৈপুণ্যের জন্য বিখ্যাত সেই ব্যারণেস।

"উঃ! কি ভীষণ গরম!"—সহসা এইরূপ মন্তব্য প্রকাশ করিয়া তিনি আইরিণের দিকে ফিরিলেন এবং মুহূর্ত্তেক কাল তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিয়া বলিলেন—"স্ত্রীলোকের মধ্যে দেখ্‌ছি শুধু তোমাকেই দেখতে ভাল।"

আইরিণ হাসিয়া মুখ নত করিলেন; কোনো কথা কহিলেন না।

ব্যারণেস্ আবার তাঁহার দিকে চাহিলেন এবং ঘন ঘন পাখা নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "সময়ে সময়ে তোমাকে বড় বিষণ্ণ দেখায় যেন! ভাবনাটা কিসের? সেই পূবে গণৎকারটা বুঝি মন্দ কিছু বলেছে? সে-সব কথা কিছু শুনো না; আমাকে বিশ্বাস কর,—আমি তোমার হাত যা' দেখিছি,—উঃ, বড় লক্ষ্মীমন্ত হাত—যেমন টাকা, তেম্‌নি যশ, তেম্‌নি খেতাব, আর বিয়ে? উঃ, খুব বড় ঘরে—"

পিয়ানো হইতে হাত তুলিয়া আইরিণ কৌতুহল-ভরে আপনার করতল-রেখাগুলি দেখিলেন; পরে নম্রকণ্ঠে বলিলেন—"আপনি ভুল করেছেন ব্যারণেস্! আমি একাই আছি,—কেউ কেউ বলেন যে, চিরদিন এইরকম একাই থাক্‌বো। বিবাহ কোন কালেই আমি কর্‌বো না,—শেষ দিন পর্য্যন্ত এইভাবেই কাটিয়ে যাব।"

"শেষদিন পর্য্যন্ত? কখ্‌খনো না—ভুল!" প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া ব্যারণেস বলিলেন—"আমি বল্‌ছি, তুমি বিয়ে কর্‌বে; হাতে স্পষ্ট লেখা রয়েছে,—অমনি কি বল্লেই হবে!"

আইরিণ হাসিতে লাগিলেন; পরে এল র‍্যামির সেই "অন্য কোথাও" কথাটী স্মরণ হওয়ায়, সহসা গম্ভীর হইলেন। তাঁহার বেশ মনে পড়িল যে, এল র‍্যামি যে কথাগুলি বলিয়াছিলেন, তাহা আপনা-হইতেই বলা,—অধিকন্তু, ঐ "অন্য কোথাও" কথাটা বলিবার পূর্ব্বে তাঁহার ইতস্ততঃ ভাবটীও বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল। আইরিণের ইচ্ছা হইল যে, এ সম্বন্ধে এল র‍্যামিকে আরও দু'একটী প্রশ্ন করেন।

ঠিক সেই মুহূর্ত্তেই দেখা গেল, লর্ড মেলথর্পের সহিত এল র‍্যামি ঐ কক্ষেই প্রবেশ করিতেছেন—পার্শ্বে ড্যাগান ও সুসজ্জিতা মিস্ চেষ্টার।

এল র‍্যামিকে সম্বোধন করিয়া মিস্ চেষ্টার বলিতেছিল—"খুবই সুখবর বল্‌তে হবে! 'ভাবপ্রবণ নই—অনিষ্টকারী নই—নিতান্ত নিরীহ-স্বভাব'—কেমন, এই বল্‌ছিলেন না? যাক্—এই যথেষ্ট! আমার তো একটা ভাবনাই হয়েছিল, পাছে আমার স্বভাবের মধ্যে থেকে এমন-কিছু আবিষ্কার করে' বসেন যা' অসহ্য; কিন্তু যাক্—অনিষ্টকারী যে নই, এ'তে আমি বড় খুসী! আচ্ছা, আপনি নিশ্চয় জানেন যে—"

"নিশ্চয় জানি!" ঈষৎ হাসিয়া এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"অনেক স্ত্রীলোকের চেয়ে এ বিষয়ে আপনি শ্রেষ্ঠ।"

এইখানে লেডী মেলথর্পের ইঙ্গিত অনুসারে ব্যারণেসের সহিত পরিচিত হইবার জন্য এল র‍্যামিকে অগ্রসর হইয়া যাইতে হইল।

যথাবিহিত পরিচয়াদির পর, ক্ষুদ্র চক্ষে কৌতুহল বিকীর্ণ করিতে করিতে ব্যারণেস জিজ্ঞাসা করিলেন—"হাত-গোণায় আপনার বিশ্বাস আছে?"

সবিনয়ে এল র‍্যামি উত্তর করিলেন—"আজ্ঞে না ; প্রণালীটার সঙ্গে অবশ্যই আমি পরিচিত,—তা' ছাড়া, দু'একটা ঘটনা মিলে'ও যায়, জানি—তবু এ ব্যাপারে বিশ্বাস আমার নেই। বেশীর ভাগই এটা খাটে না ; দৃষ্টান্ত-স্বরূপ আমার হাতই দেখুন,—আমি নিশ্চয় বল্‌তে পারি, এ-হাত দেখে আপনি কিছুই বল্‌তে পার্‌বেন না।"

ব্যারণেস এল র‍্যামির প্রসারিত হাতখানার দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন, কিন্তু পরক্ষণেই মহাবিস্ময়ে অস্ফুট শব্দ করিয়া উঠিলেন। কোনো রেখা চিহ্নই নাই ! বাম হইতে দক্ষিণে লম্বিত দুইটী মাত্র দাগ এবং নিম্ন হইতে উর্দ্ধদিকে প্রসারিত আর একটী রেখা—বাস্‌, বাকী সমস্তই শাদা !

"কি অস্বাভাবিক ! এ রকম হাত তো দেখা যায় না বাপু !"

"সম্ভবতঃ নয়," সংযত কণ্ঠে এল র‍্যামি বলিলেন—"কিন্তু দেখ্‌তে পেলেন আশা করি যে এ থেকে কিছুই জানবার উপায় নেই। অথচ, আমার জীবন ঘটনাশূন্য একেবারেই নয়। এখন, করতল-গণনাকে প্রামাণ্য বলে' ধরে নেবার বিপক্ষে এই হাতই আমার প্রধান অন্তরায় "

"সব জিনিষেরই কি আপনি 'প্রমাণ' চান ?" সহসা আইরিণ প্রশ্ন করিল।

"নিশ্চয়ই, মাডাম !"

"তা' হ'লে আমাকে যে 'অন্য-কোথাও' বলে' একটা অনিশ্চিত জায়গা নির্দ্দেশ কর্‌ছিলেন, তারও প্রমাণ অবশ্যই পেয়েছেন ?"

এল র‍্যামির মুখমণ্ডল রক্ত-বেগ-তরঙ্গিত হইয়া, পরক্ষণেই পাণ্ডুর হইয়া গেল।

"মাডাম, আপনার অন্তরাত্মা আমার মস্তিষ্কে যে সংবাদ বহন করে' এনেছিল, এ-অনিশ্চিতের আকাঙ্ক্ষা তা'রই অংশ জড়িত। আমি নিজে হয়তো বর্ত্তমান অস্তিত্বটা ছাড়া অপর কোনো আত্মিক-অবস্থার সঙ্গে পরিচিত না হ'তেও পারি,—কিন্তু আপনার আত্মার আকাঙ্ক্ষাই ঐ অনিশ্চিতের দিকে,—সুতরাং, তা'র সংবাদও, সে-ই ভাল বল্‌তে পারে। আমি বুঝ্‌বো কি না, বা গ্রহণ কর্‌তে পার্‌বো কি না সে কথা চেতনা-বিশেষের চিন্তনীয়ই নয় —সে তা'র আপন ধারণা বা জ্ঞানের খবরই এক্ষেত্রে প্রেরণ করেছে। আমি তা'রই প্রদত্ত সংবাদ ব্যক্ত করেছি মাত্র।"

সমাগত সকলেই বিস্মিত-কৌতূহলে এল র‍্যামির বক্তব্য শুনিতেছিল। এক্ষণে উহা শেষ হইবামাত্র লেডী মেলথর্প বলিয়া উঠিলেন—"বাঃ, এ তো বড় আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমরা জানতাম্ যে আইরিণ অবিশ্বাসী স্বভাবের লোক,"—এই সময় আইরিণ বক্তার মুখের দিকে চাহিবামাত্র তিনি বলিলেন—"অর্থাৎ, আমি পরলোকে বিশ্বাসের কথাই বল্‌ছি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, কোনো কোনো কেতাবে তিনি ধর্ম্মযাজক-বেচারাদের পৃষ্ঠে দারুণ কশাঘাত করেছেন।"

"তা'দের মধ্যে অনেকে, যতটা কশাঘাত-লাভের যোগ্য, তা'র বেশী অবশ্যই কিছু করেন নি,"—উত্তেজিত-স্বরে এল র‍্যামি বলিলেন —"আমার বিশ্বাস, কোনো ধর্ম্মগুরুরই এমন অভিপ্রায় ছিল না যে, তাঁদের অনুচরেরা মদ খেয়ে শীকার খুঁজে খুঁজে বেড়াবে, কিম্বা পাড়া-প্রতিবেশীর ঝি বউএর সঙ্গে প্রেমালাপ কর্ত্তে থাক্‌বে! কিন্তু বেশীর ভাগ ধর্ম্মযাজকই আজকাল এই জাতীয়,—ক্বচিৎ দু'দশটা ভাল লোক পাওয়া যায়।"

লেডী মেলথর্প বিষম-রকম কাশিতে আরম্ভ করিলেন। এতটা স্পষ্টবাদ তাঁহার ভাল লাগিতেছিল না,—কারণ, সত্য কথা বলিতে কি, নিজেরই একটী ঐ জাতীয় ধর্ম্মযাজক উপসর্গ রূপে থাকায়, এ বিষয়ে তাঁহার মতামত অনেকটা উদার হইয়া আসিয়াছিল।

কাশির প্রাবল্যে বিন্দুমাত্রও না দমিয়া এল র‍্যামি বলিয়া চলিলেন—"আপনি যাঁদের অবিশ্বাসী বল্‌ছেন, তাঁরাই প্রকৃত পক্ষে স্বাধীন-চিন্তা-নিপুণ সুতরাং সত্যানুসন্ধিৎসু। সকলেই যদি গড্ডালিকা-প্রবাহের মত, চোখ বুজে 'মহাজনের পথে' চল্‌তে আরম্ভ করে, তা' হ'লে পৃথিবীর অবস্থাটা কি ভয়ঙ্করই হ'য়ে দাঁড়ায়! কিন্তু না, স্বাধীন ভাবুক আমরা চাই,—তা' সে যত কমই হোক্—নইলে, আসল-মেকি চিনে নেওয়া দুষ্কর হ'য়ে পড়বে। আমরা 'কাল্পনিক' থেকে 'বাস্তবিক'গুলিকে পৃথক্ কর্‌তে চাই : কিন্তু 'কাল্পনিকের' প্রসার এত বেশী, যে 'বাস্তবিক'কে তার ভেতর থেকে বেছে নেওয়াই দায়।"

"কেন, এর মধ্যে আর শক্তটা কোন্‌খানে?"—ব্যারণেস উঠিলেন—"বস্তু নিয়ে তো একেবারেই ভুল হবার জো নেই,—কেননা, তার প্রমাণ আছে। দেখ"—টেবিল হইতে তিনি একটী রূপার লেখনী তুলিয়া লইলেন—"এটা হ'চ্ছে কলম, কালিতে ডুবিয়ে এ দিয়ে

দেখা যায় ; বেশ সোজা কথা, —এ তথ্য একেবারে নির্ভুল !" ……এল র‍্যামি হাসিয়া উঠিলেন।

"বিশ্বাস করুন, মাডাম, যতক্ষণ কলম বলে' মনে করছেন ততক্ষণই এটা কলম; অন্যথা,—আচ্ছা দাঁড়ান"—লেখনীটী গ্রহণ করিয়া ক্ষণকাল তিনি ব্যারণেসের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিলেন; পরে বলিলেন—"আপনার বাঁ হাতের আঙুলগুলো আমার এই কাজের ওপর রাখুন দেখি; হাঁ, ঠিক হয়েছে;"—ব্যারণেসের হাস্যপ্রফুল্ল মুখের দিকে চাহিয়া গম্ভীরমুখে এল র‍্যামি লেখনীটী তাঁহার হস্তে তুলিয়া দিতে দিতে বলিলেন—"এই নিন, আপনাকে কতকগুলি পদ্মফুল উপহার দিচ্ছি; কেমন, ফুলগুলি বেশ সুগন্ধ, না ?"

"আহা, চমৎকার! বড় সুন্দর গন্ধ !" বারংবার লেখনীটীর আঘ্রাণ লইয়া ব্যারণেস পরম পরিতোষ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। উপস্থিত সকলেই হাসিয়া উঠায় এল র‍্যামি তাঁহাদিগকে ইঙ্গিতে নিরস্ত করিলেন; পরে বলিলেন—

"আপনি ভুল করছেন মাডাম; আপনার হাতে পদ্মফুল একেবারেই নেই,—ওটা একটা কলম।"

"ইস্ আপনি ভারী চালাক্ !"—ব্যারণেস উত্তর করিলেন—"আমি কিন্তু ঠকবার মেয়ে নই,—পদ্মগুলো আমি ফেলছিনে।"

কলমটাকে তিনি বুকে গুঁজিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; এল র‍্যামিও এই সময় আপন হাতখানি সহসা সরাইয়া লইলেন।

ব্যারণেসের মুখে চোখে একটা চকিত ভাব ফুটিয়া উঠিল, কিন্তু মুহূর্ত্তের মধ্যেই তাহা সামলাইয়া লইয়া, লেখনীটাকে ঘুরাইতে ঘুরাইতে তিনি পূর্ব্ব বক্তব্যের অনুসরণ করিতে লাগিলেন :—

"এই,—একেই বলে বস্তু; কলম চিরদিনই কলম, —তা'র আর অন্যথা নেই।"

কিন্তু সমাগত সকলেই উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল, এবং কেমন করিয়া যে, তিনি ওটাকে পদ্ম-ভ্রমে বুকে গুঁজিতে গিয়াছিলেন, তাহার বিস্তারিত বিবরণ দিতেও ছাড়িল না। প্রৌঢ়া কিছুতেই এ কথা বিশ্বাস করিলেন না, উপরন্তু বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন।

"না, আপনাদের কথায় বিশ্বাস কর্ত্তে পারিনে,—এ রকম হ'তেই পারে না। আপনাদের সব ঠাট্টা! কেমন, আইরিণ, তুমি বল তো,—মিছে কথা নয়?" অনুনয়-ভরা চক্ষে তিনি আইরিণের দিকে চাহিলেন।

"না, ব্যারণেস, মিছে কথা নয়—সমস্তই সত্যি," সান্ত্বনাপূর্ণ স্বরে আইরিণ বলিলেন—"কিন্তু তা'তে লজ্জিত হবার কিছুই নেই। কিছুক্ষণের জন্যে আপনার দৃষ্টিবিভ্রম ঘটেছিল মাত্র; কত সহজে যে আমাদের চক্ষু প্রতারিত হয়, এল র‍্যামি তা'রই বৈজ্ঞানিক দৃষ্টান্ত দেখাচ্ছিলেন। তিনি আপনার মস্তিষ্কে পদ্মফুলের ধারণা জাগিয়ে দেওয়াতেই আপনি কলমটাকে পদ্ম ভেবেছিলেন। বেশ বুঝ্‌তে পারা যাচ্ছে যে মস্তিষ্কের সাহায্যেই আমাদের দৃশ্যানুভূতি ঘটে। ব্যাপারটা খুবই সহজ-বোধ্য,—যদিও আশ্চর্য্য বলেই মনে হয়।"

রাগে আগুন হইয়া ব্যারণেস উঠিয়া দাঁড়াইলেন এবং পরিচ্ছেদ ঝাড়িতে ঝাড়িতে বলিলেন—"আশ্চর্য্যি না হাতী! ও-সব শয়তানী কাণ্ড!"

"না, মাডাম"—স্নিগ্ধচক্ষে ব্যারণেসের দিকে চাহিয়া এল র‍্যামি বলিলেন—"এটা বিজ্ঞান ছাড়া আর কিছুই নয়; প্রথম প্রথম বিজ্ঞানকে লোকে শয়তানী ভাব্‌তো বটে, কিন্তু আধুনিক যুগে আমাদের ধারণা আর ততখানি সঙ্কীর্ণ নেই।"

"কিন্তু এ বিজ্ঞান নিয়ে কি হবে, আমার মাথা আর মুণ্ডু!"—বিরক্তির সহিত ব্যারণেস বলিয়া উঠিলেন—"এর তো কোনো দরকারই আমি খুঁজে পাইনে! যে-বিদ্যে এত সহজে চোখ-কানা করে' দিতে পারে, মানুষকে রাগিয়ে দেওয়া ছাড়া আর তো তা'র কোনো গুণই নেই!"

"যাক্, যেতে দিন ও-সব কথা"—লর্ড মেলথর্প, এল র‍্যামির দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"মিস্ চেষ্টার আপনার ভাইয়ের খোঁজ কর্‌ছেন; বল্‌ছেন, তাঁর সঙ্গে আলাপ হ'ল না।"

"ফেরাজ এজ্‌ওয়ার্থের সঙ্গে গিয়েছে বোধ হয়"—এল র‍্যামি উত্তর করিলেন।

"হাঁ—হাঁ, ঐদিকে দু'জনকে কথা কইতে দেখেছিলাম বটে; তা' আমিই না হয় ডেকে আন্‌ছি"—বলিয়া লেডী মেলথর্প বাহির হইয়া গেলেন এবং অনতিবিলম্বেই উভয়কে লইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

প্রবেশমাত্র এল র‍্যামিকে সম্বোধন করিয়া এন্সওয়ার্থ বলিলেন—"আপনার ভাইকে কাল ছবি তোলবার জন্যে নিমন্ত্রণ করেছি, তিনিও যেতে স্বীকৃত আছেন,—আশা করি, আপনার আপত্তি নেই ?"

"বিন্দুমাত্রও না"—দ্বিধামাত্র না করিয়া এল র‍্যামি উত্তর করিলেন। যদি কাহারও তীক্ষ্ণ অনুভূতি থাকিত, তাহা হইলে বুঝিত যে তাঁহার উত্তর যথেষ্ট আন্তরিক নয়—অন্ততঃ উহার মধ্যে একটু অভিমান ও বিরক্তির সুর বাজিয়াছে।

"ইনি বড়ই আশ্চর্য্য ধরণের মানুষ"—মিস চেষ্টারের নিকট পরিচয়-প্রদান-প্রসঙ্গে এন্সওয়ার্থ বলিলেন—"জীবনের কিছুই জানেন না বল্লেই হয়।"

"কা'কে আপনি জীবন' বলেন ?" এল র‍্যামি গর্জ্জিয়া উঠিলেন।

"কেন ? জন-সাধারণে যে-ভাবে জীবন-ধারণ করে' থাকে, তা'কেই"—এন্সওয়ার্থ উত্তর করিলেন।

"জন-সাধারণে যে-ভাবে জীবন-ধারণ করে' থাকে !"—এল র‍্যামি পুনর্ব্বার গর্জ্জিয়া উঠিলেন—"ধিক ! সে-ভাবে জীবন-যাপনের চেয়ে কিছুই নিকৃষ্টতর নেই ! পশুগুলোর ব্যবহারেও একটা ভদ্রতা একটা আত্মসম্মান-বোধের লক্ষণ দেখা যায়,—একটা কুকুরের মধ্যে যেটুকু সহৃদয়তা আছে, তার তুলনায় একজন সাধারণ সহুরে লোকের জীবন অতি নীচ, অতি জঘন্য !"

এন্সওয়ার্থ মহাবিস্ময়ে অবাক্ হইয়া বক্তার মুখের দিকে চাহিলেন এবং আইরিণ সানন্দ-হাস্যে বলিয়া উঠিলেন—"ঠিক তাই ; এ-বিষয়ে আমিও একমত।"

"হতেই হবে !"—ব্যঙ্গভরে এন্সওয়ার্থ বলিলেন—"মানুষ যে একটা অপদার্থ জীব, এ-মত যেখানেই পাওয়া যাক্ না কেন, ম্যাডাম আইরিণ সর্ব্বাগ্রে তা'তে যোগ দেবেন !"

লেখিকার নয়নদ্বয় উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

উত্তেজিত স্বরে তিনি বলিলেন—"মানুষের ওপর শ্রদ্ধা বজায় রাখ্‌বার জন্যে আমি আমার সর্ব্বস্ব দিতে প্রস্তুত,—বস্তুতঃ, এমনও লোক দু'দশজন আছেন, যাঁদের আমি সর্ব্বান্তঃকরণে শ্রদ্ধা করে থাকি,—কিন্তু সত্য কথা বলতে কি, বেশীর ভাগ লোকই আমার মনে ঘৃণা ছাড়া

অন্য কোনো বৃত্তিই জাগাতে পারেন না। আমার দুর্ভাগ্য সন্দেহ নেই, কিন্তু কি করবো—নাচার!”

“তুমি চাও যে মনুষগুলো সব দেবতা হ'য়ে উঠুক,”—ব্যঙ্গহাস্যসহ এক্সওয়ার্থ উত্তর করিলেন—“কিন্তু স্বভাবতঃই এটা বেচরীদের পক্ষে সম্ভব হয় না; কাজেই তোমারও মন ভার হ'তে থাকে। তুমিই না হয় বিধাতার হাত ফস্‌কে স্বর্গ থেকে খসে পড়েছো, কিন্তু সকলেই তো আর সে সুযোগ পায়নি।”

আইরিণ গণ্ডযুগলে একটা রক্তাভা তরঙ্গিত হইয়া গেল, কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়া তিনি রমণী-মণ্ডলী-পরিবেষ্টিত ফেরাজের দিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। দেখা গেল, বেচারী বিশেষ বিপন্ন হইয়া পড়িয়াছে—কারণ চারিদিক হইতেই তাহার উপর গানের জন্য পেড়াপীড়ি চলিতেছিল।

গাহিতে যে ফেরাজ লজ্জিত হইতেছিল তাহা নয়,—তবে এত লোকের মাঝখানে, এত গোলমালের ভিতর, কেমন করিয়া যে স্বর্গীয় আনন্দধারাকে উৎসারিত করা যাইতে পারে তাহা সে ভাবিয়াই পাইতেছিল না। একবার বিপন্নভাবে সে ভ্রাতার দিকে চাহিল, কিন্তু এল র‍্যামি যে তাহাকে উদ্ধার করিবেন, এমন লক্ষণ দেখা গেল না। ভ্রাতার এই নিরপেক্ষ-ভাবে ফেরাজ একটু আহত হইল,—তাহার প্রচ্ছন্ন গর্ব্বে বুঝিবা সে আঘাত বেশ জোরেই লাগিল,—তাই, কি ভাবিয়া, সহসা সে নারী-বেষ্টনী হইতে একেবারেই পিয়ানোর দিকে অগ্রসর হইয়া আসিল।

“আচ্ছা, একটা সুর বাজাই”—সে বলিল—“যদি ভাল লাগে, তা' হ'লে পরে আরও শোনাবো।”

মুহূর্ত্তেই কলরব-মুখর কক্ষ নিস্তব্ধ হইয়া গেল। আইরিণ পিয়োনোর নিকট হইতে একটু সরিয়া আসলেন,—লর্ড মেলথর্প, এল র‍্যামি ও এক্সওয়র্থ তাঁহার পশ্চাতেই দাঁড়াইয়া রহিলেন,—ভাবী-দম্পতি চেষ্টার ও ড্যাগানের যুগলরূপ একখানি চেয়ারে বিরাজ করিতে লাগিল, এবং অপরাপর কক্ষ হইতেও অনেকে গান শুনিবার আশায় বর্ত্তমান কক্ষে সমবেত হইল।

ফেরাজের অঙ্গুলি তাড়নায় পিয়োনোর স্বর-সমুদ্রে একবার ঢেউ খেলিয়া গেল। তারপর ?

তারপর আর কিছুই না—শুধু সুর-সঙ্গীত ! পবিত্র; মধুর, স্বর্গীয় স্বর-লহরী-লীলা ! একি জ্যোৎস্না-সাগর-বিহারী চাকোরের গান, না নন্দন-নিবাসিনী-বর্গের আনন্দাশ্রুধারা ? বিকচোন্মুখ গোলাপের প্রীতি, না সবুজ-পাতার-ছায়ায়-ঢাকা পদ্ম-কোরকের নিদাঘ-স্বপ্ন ? কে কহিবে, উহা কি ? সকলেই শুনিতে লাগিল, সকলেই বুঝিতে পারিল যে, সে-সুর আশ্চর্য্য, অশ্রুতপূর্ব্ব, অপার্থিব !

দেখিতে দেখিতে শ্রোতৃবর্গের মনের ওপর দিয়া, তন্দ্রা-মধুর সুরের প্লাবন যেন কোন্ মহা-বিস্মৃতির রেখা টানিয়া টানিয়া ছুটিয়া গেল,—তাহারা কিছুই বুঝিল না, সুদূরাগত সেই অলৌকিক সুর-লীলার কোনো অর্থই হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না,—কেবল এইটুকুই বুঝিল যে উহা অপার্থিব ! কোথায় গেল রৌপ্য-লিপ্সা, কোথায় গেল যশের তৃষ্ণা, কোথায় গেল ভোগের আকাঙ্ক্ষা,—সমস্ত ছাপাইয়া, সমস্ত ডুবাইয়া এ সুর আজ মানবচিত্তকে কোন্ আনন্দ-নন্দন-অভিমুখে তুলিয়া ধরিল ? এ কি গান—ওরে, এ কি সুর !

ধীরে ধীরে সঙ্গীত মিলাইয়া আসিল ; কয়েক মুহূর্ত্ত কাহারও মুখ দিয়া একটীও কথা বাহির হইল না ; ফেরাজ তখনও বুঝি স্বপ্নলোকে !

সহসা চতুর্দ্দিক হইতে অজস্র প্রশংসা-বর্ষণে ফেরাজ যেন চমকিত হইয়া উঠিল এবং প্রসন্ন-দৃষ্টিও তাহার উপর নিবদ্ধ দেখা গেল।

আরও দু'একটী সুর বাজাইয়া, ভাব-মগ্ন ফেরাজ আপন-মনেই বলিয়া উঠিল :—

"পৃথিবীর ইতিহাসে এমন কতকগুলি উপকথা আছে, যা'দের গদ্য বা পদ্য যা'তেই বিবৃত করা যাক্ না কেন, তা'রা গানের মতই শোনায়। যদি শুনতে ইচ্ছে করেন, তা' হ'লে ঐ রকম একটী কাহিনী—এক পুরুতের গল্প—আমি শোনাতে পারি।"

চতুর্দ্দিক হইতে সাগ্রহ আনন্দ ধ্বনি উত্থিত হইল এবং পরক্ষণেই কক্ষ-অভ্যন্তর পূর্ব্ববৎ নিস্তব্ধ হইয়া আসিল।

ফেরাজ পুলকোচ্ছ্বল দৃষ্টিতে একবার চারিদিকে চাহিল,—পিয়ানোর চাবীগুলির ভিতর হইতে প্রাভাতিক সাম-গানের মত একটা স্বর-গুঞ্জন ধ্বনিত করিয়া তুলিল,—পরে, সুস্পষ্ট সুমধুর, ও কোমল-কণ্ঠে আরম্ভ করিল—।

ক্রমশঃ—

শ্রীবিজয়কৃষ্ণ ঘোষ।

সমাজ।

—:*:—

ঐখানেতে ছিল তাদের বাসা
নিত্য ছিল যাওয়া আসা
এ বাড়ী আর ঐ বাড়ীতে
আমাদের ঐ খিড়কি দুয়ার তাহার চারিভিতে
আমকাঁঠালের পাতার ছায়া
দুলে দুলে বুনত শুধু নিবিড় ঘন মায়া।
মৌমাছিদের গুঞ্জরোগে তন্দ্রাঘন সুর
পাখীর ডাকে করত আরো নিদ্রাভারাতুর!
অবিশ্রান্ত পিকের স্বরে
আমের মুকুল ঝরত ধীরে, আলপনা সে আঁকত স্তরে স্তরে
বনপথের পরে!
ভাঙা বাঁশের বেড়ার ধারে ঝুম্‌কো লতা উঠত মুঞ্জরিয়া
ঝাওড়া গাছের ঝোঁপের মাঝে নাচ্‌ত শালিক টিয়া!
ও বাড়ীর ঐ তরুণী মেয়ে লতা
সে ছিল এই বনভূমির মূর্ত্ত পবিত্রতা

মূর্ত্ত হাসি
যখন তখন আসি
লঘু চপল চরণ ফেলে, হাসির কলগীতে
পুলক-মুকুল ফুটিয়ে যেত মোদের দাওয়াটিতে !
তাহার প্রতি চরণক্ষেপে
মাটির ধরা হর্ষবেগে উঠ্‌ত দুলে কেঁপে
তৃণের রূপে রোমাঞ্চিয়া
বনতরুর শাখা হতে পুষ্প বরষিয়া
করত পূজা তারে
তারে দেখে আয়োজনের সাড়া যেন পড়্‌ত চারিধারে
লতা ছিল বাবামায়ের কোলপোঁছা ঐ মেয়ে
ধনী ঘরের আদর ছিল ছেয়ে
হাতের কাঁকণ পায়ের নূপুর তার
শিঞ্জিনীতে বল্‌ত পরিষ্কার !

আমি ছিলাম গরীব মায়ের ছেলে
পিতা গেছেন ফেলে
পরলোকে, যখন আমি শিশু অতি
সকল জ্বালা সকল দারুণ ক্ষতি
মা সহেছেন নীরব হয়ে মনে
স্বল্পভাষী সর্ব্বসহা তাঁহার এ জীবনে !
ভাবি যে বার বার
মায়ের জাতি অপূর্ব্ব কি সৃষ্টি বিধাতার !

তবু কেন লতার কণ্ঠস্বরে
আমার বইয়ের পাতার 'পরে অক্ষরে অক্ষরে

এমন করে বাধ্‌ত গণ্ডগোল
লতার হাসি উচ্চ কলরোল
মনের মাঝে ছল্‌কে দিত তপ্ত শোণিতধারা
ভাবনাগুলো আবল-তাবল বল্‌ত পাগলপারা!
আঁখি শুধু থাক্‌ত বনপথে
কোনমতে
দেখা যদি পায় সে এতটুক্
মিট্‌বে যেন দারুণ তৃষা বাসনা উন্মুখ।
যদি দেখা না পায় কোন মতে
তবু যেন এমন সুধা নাই গো ত্রিজগতে!

তোমরা এরে বল্‌বে কি ভাই—ভালবাসা?
প্রেম? কি প্রণয়? আমি জানি নাইক এমন ভাষা
অভিধানে
প্রকাশ যাহা কর্‌তে পারে সফল্ অর্থ দানে!
যেই চেনেছে সেই বুঝেছে কি যে
যেজন নাহি বুঝ্‌ল এরে ঠক্‌ল শুধু নিজে!
মাতা বুঝি ছেলের অন্তর্যামী
তাইত আমি
কি চোখ দিয়ে দেখি তারে
আমায় দেখে বুঝেছিলেন এমন করে একেবারে!
লতার মায়ের কাছে শেয়ে যবে
গেলেন তিনি তবে
সেদিন নগ্ন আকাশ আপন লজ্জা ঢাকিবারে
সর্ব্ব তনু ঢেকেছে তাঁর মেঘের অবগুণ্ঠনেরি ভারে!

দুঃখে লাজে মুখটি করে ম্লান
মাতা যখন এলেন ফিরে আমার সারা প্রাণ
রইল অধোমুখে
মায়ের অপমানের লজ্জা বিঁধ্‌ল বড় বুকে !
মাতা যখন অশ্রু-ভেজা স্বভাব-কোমল স্বরে
বল্লেন "ওরে
আমারি ভুল—আমারি ভুল এই
টাকা যাহার নেই
লতার পিতা আপন মেয়ে তাহার হাতে দিবে কেন
নয় সে বাতুল হেন !
তোর সাথে যে লতার বিয়ে ভাঙ্‌ল সে দুরাশা
মাটির মানুষ কেনই তবু মনগড়া এই স্বর্গে করে বাসা !
তবে সে কি জানিস্ বাছা কারণটুকু এর
নিয়ম জগতের
আপন ছেলে সবার কাছে প্রিয়
বিধাতার এই সৃষ্টিমাঝে মায়ের চোখে অনির্বচনীয় !"
তখন যেন গলার মাঝে
অশ্রু আমার চেপার [illegible] বাধ্‌ল গিয়ে দুঃখে তাপে লাজে !
কোন মতে গোপন রেখে অশ্রুধারা
আপন মনের অতল মাঝে হলেন আমি হারা !
তারপরেতে নিশীথ রাতে উঠি
গেলাম ছুটি
মায়ের ঠাকুর ঘরে
হাস্য মুখে কৃষ্ণ যেথা নিত্য বিরাজ করে !
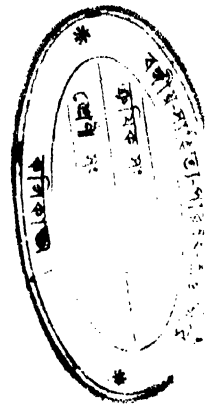
সেদিন কেঁদে বলেছিলাম "স্বামী
দুর্ভাগা যে আমি
তাইত বলি প্রেমহরণ রূপে
দেখা তুমি দাও গো চুপে চুপে !
আজ্‌কে হতে জানি যেন লতা আমার আর ত কেহ নয় !
তাহার লাগি যে প্রেম ছিল ছড়াক্ বিশ্বময় !
বোনের মত দেখ্‌ব তারে এই রঙিল পণ
সাক্ষী তুমি রইলে নারায়ণ !"

তার পরে যা একে একে ঘট্‌লো আরো কত
শুন্‌তে তাহা উপন্যাসের মত !
আমি গেলেম উপার্জ্জনের আশে
সুদূর বিদেশ বাসে
মাতা দেশে থাকেন একা
ছুটির অবকাশের কালে মায়ে পোয়ে হয় আমাদের দেখা !
মাতা বলেন "সংসারী হ' এবার বিয়ে করি"
আমি বলি "ঐ কথাটি বলো না মা তোমার পায়ে ধরি,
জীবনের এই পারে
তোমার কোলের ভাগ দিতে যে পার্‌ব না মা কারে !"

হেথায় লতা পড়্‌ল কোন্ এক দ্বিপত্নীকের হাতে
দুখের অশ্রু পাতে
দারুণ মনস্তাপের তলে
কাট্‌ল তাহার বছর দশেক ঝাপ্‌সা হয়ে নয়ন জলে !
তারপরে দুর্দ্দিনের হাহাকারে
হাতের নোয়া মাথার সিঁদুর ঘুচ্‌ল একেবারে !

কোন্ নিরদয় এমন কঠিন প্রাণ
স্বর্ণ প্রতিমারে দিল সন্ন্যাসিনীর থান ?
স্বামীর দানের পত্র লিখে নিজের নামে চুরি করে
সতীন গেল বাপের ঘরে !
মূর্ত্তিমতী শোকের ছায়া ফির্‌ল দেশে লতা
দুঃখে অবনতা !
সকল অশ্রু রেখেছে তার বুকের মাঝে ঠেলে
একটি মাত্র কচি দুধের ছেলে !
দশ বছরের আবর্ত্ত সে রচেছিল আর এক নব শোক
লতার পিতা লতার মাতা গেছেন পরলোক !
লতার দাদা যিনি
ব্যবসা মাঝে বিষম ঋণী
মহাজনের কাছে রেখে দেশের ভিটে বেঁধে
রেঙ্গুনেতে গেছেন ,আর এক নূতন ব্যবসা ফেঁদে !
মিথ্যা সে নয় গল্পে যাহা শুনি
কাল যে রাণী আজ সে ভিখারিণী !

আমি সেবার পূজার বন্ধে দেশে ছিলাম যবে
কে জান্‌ত যে দেখ্‌তে হবে
এমন দারুণ দেখা
চিন্তা করি একা একা
উপায় যদি থাকে ;
—বলি শেষে মাকে
"লতা এখন অনায়াসে থাক্‌তে পারে তোমার কাছে আমি
আমি ত মা চির বিদেশবাসী

মায়ে ঝিয়ে তোমরা থাক ঘরে
একা তুমি নাই যে মাগো স্বস্তি রবে আমারো অন্তরে !”
মায়ের চোখে অশ্রু বুঝি হ’ল বা উন্মুখ
কোনমতে গোপন তাহা করে নিলেন ফিরিয়ে নিয়ে মুখ !

মায়ের ইচ্ছা রাষ্ট্র হ’ল পাড়ায়
চিরকালের শত্রু যে সে লতার কাছে আত্মীয়তা বাড়ায়
বলে সবাই “তোমার পরে চারুবাবুর দৃষ্টি ভাল নয়
ওমা ওমা তাও কি কভু হয় ?
করো না মা অমন কাজটি ভুলে
ধর্ম্ম গেলে হিন্দুসমাজ কেমন করে নেবে তোমায় তুলে ?
আমরা তোমার দাদী পিসি আছি ত সবাই
ভয় ত কিছুই নাই !”

হায় রে ধর্ম্ম হায় রে সমাজনীতি
শাস্ত্রকারের হায় রে শাসনরীতি !
ধিক্কারে প্রাণ বাহির হতে চায়
এমন ধর্ম্ম এমন করে অধঃপাতে যায় !

* * * *

শেষে লতার শিশুটিকে লুকিয়ে এনে খুঁজে
হাতে দিলাম গুঁজে
এতদিনের চাকরীতে যা জমেছে—সঞ্চয়
পাঁচটি হাজার টাকার নোটের একটী বেশী নয় !
অকাতরে দিতাম যারে
আমার সুখ দুঃখ সুধা নিঃশেষিয়া একেবারে

আমার জীবন মন
কেমন করে আজ্‌কে তারে করছি সমর্পণ
পাঁচটি মাত্র হাজার টাকা !
আর কি কভু ভরবে আমার এই জীবনে প্রাণের শূন্য ফাঁকা

সাহিত্যে সজ্জনতা ও সত্যনিষ্ঠা।

অন্যের লিখিত পুস্তক বা সেই পুস্তকের কোন অংশ নিজের বলিয়া প্রকাশ করাকে ইংরেজীতে Plagiarism বলে। বাঙ্গলা ও সংস্কৃতে এইরূপ সজ্জনতার অভাবের কোন বিশেষ নাম আছে কিনা জানি না। সাহিত্যিক সজ্জনতার অভাবের আরও প্রকার ভেদ আছে। কোন পুস্তক ভাষান্তরিত করিয়া প্রকাশ করিবার সময়ে যদি মূল গ্রন্থকারের নাম গোপন করা হয় তাহা হইলে সেরূপ কার্য্যকেও সাহিত্যে সজ্জনতার অভাব বলা যাইতে পারে। জয়সিংহ রাজার আদেশে একজন পণ্ডিত ইউক্লিডের জ্যামিতি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করিয়া লিখিলেন—

শিল্পশাস্ত্র মিদং প্রোক্তং ব্রহ্মণা বিশ্বকর্ম্মণে।
পারম্পর্য্য বশাদেতদাগতং ধরণীতলে ॥
তল্লোচ্ছেদে মহারাজ জয়সিংহাজ্ঞয়া পুনঃ।
প্রকাশিতং ময়া সম্যগ্ গণকানন্দ হেতবে ॥

অর্থাৎ "এই শিল্পশাস্ত্র প্রথমে ব্রহ্মা বিশ্বকর্ম্মাকে বলিয়াছিলেন ; পারম্পর্য্য বশে ইহা পৃথিবীতে আসিয়াছিল। তাহার লোপ হইলে আমি মহারাজ জয়সিংহের আজ্ঞায় গণকদের আনন্দের জন্য পুনঃ প্রকাশ করিলাম।"

ইহাতে দেখা যায় যে অনুবাদক ইউক্লিডের নামটারও উল্লেখ করা উচিত বোধ করেন নাই। এরূপ কার্য্য নিশ্চয়ই অকৃতজ্ঞতা ও অসাধুতা রূপে অভিহিত হইতে পারে।

সাহিত্যে আর একরূপ সজ্জনতার অভাব আছে তাহাকে ইংরেজীতে interpolation এবং বাঙ্গলায় প্রক্ষেপ বলে। অন্যের লেখার মধ্যে নিজের লিখিত কিছু প্রবেশ করাইয়া সেই অন্যের লেখা বলিয়া প্রকাশ করিলেই প্রক্ষেপ হয়। অনেক সময়ে প্রক্ষেপ নিঃস্বার্থ ভাবেই করা হয়। যেমন মহাভারতের প্রক্ষিপ্ত অংশ। মহাভারত প্রথমে ২৫০০০ শ্লোকাত্মক ছিল। কালিদাসের সময়ে উহাতে পাঁচ সহস্র শ্লোক প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল। এজন্য কালিদাস বলিয়াছেন যে "যদি মহাভারতের কলেবর এইরূপেই বর্দ্ধিত হয় তাহা হইলে সময়ে উহা এক উটের বোঝা হইবে।" বর্ত্তমান সময়ে মহাভারতে ১৬০০০০ শ্লোক পাওয়া যায়। ইহা হইতে ২৫০০০ বাদ দিলে মহাভারতের অবশিষ্ট ১৩৫০০০ শ্লোককে প্রক্ষিপ্ত বলিতে হইবে। কিন্তু প্রক্ষেপকারীগণ যে কোন অসদভিপ্রায়ে এই প্রক্ষেপ করিয়াছেন তাহা জানা যায় না। হয় ত তাঁহারা যাহা সত্য বলিয়া ভাবিয়া তাহা তাঁহাদের নামে প্রকাশিত হইলে লোকে মানিবে না এই ভাবিয়া জেসুইট (Jesuit) নীতি অনুসারে মহাভারতকারের নামে তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। মহাদার্শনিক ও মহাকবি পদ্মনাভ যদি কৃষ্ণার্জ্জুনের উক্তি এবং মহাভারতের অংশ বলিয়া ভগবদ্গীতা প্রচার না করিতেন তাহা হইলে হয়ত তাঁহার সেই অপূর্ব্ব সৃষ্টি লুপ্ত হইয়া যাইত। কিন্তু যখন কেহ অসত্য মত সমর্থন করিবার অভিপ্রায়ে প্রক্ষেপ রচনা করেন তখন তাঁহার কার্য্যকে সজ্জনতা বলা যাইতে পারে না। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন যখন গৌরাঙ্গবাবুকে সমর্থন করিবার জন্য Times এর লেখার মধ্যে নিজের দুইটা শব্দ বসাইয়াছিলেন তখন তাঁহার কার্য্যটাও সাধু হয় নাই।

কখন কখন সমস্ত গ্রন্থই একজনে লিখিয়া আর একজনের নামে প্রকাশ করিয়াছেন। ইহার দৃষ্টান্ত স্বরূপ শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লেখ করা যাইতে পারে। এতৎ সম্বন্ধে সুন্দর একটী গল্প প্রচলিত আছে। দক্ষিণাপথের কাশীনাথ শূর নামে রাজা একজন উৎকট শৈব ছিলেন ও বৈষ্ণব ধর্ম্মের ঘোর বিরোধী ছিলেন। বৈষ্ণব ধর্ম্মের মূল নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে একদিন তিনি প্রচার করিয়াছিলেন যে বৈষ্ণব হইয়া শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থ পূজা করিবার জন্য তিনি স্বপ্নাদেশ পাইয়াছেন অতএব যাঁহাদের গৃহে সেই গ্রন্থ আছে তাঁহারা যেন সকলেই তাঁহাদের পুস্তক পাঠাইয়া দেন। এই সংবাদ পাইয়া দেশের সকল বৈষ্ণবই আহ্লাদ সহকারে নিজের নিজের পুস্তক পাঠাইয়া দিলেন। কাশীরাজ যখন অনুসন্ধান করিয়া করিয়া জানিলেন যে

দেশ মধ্যে আর কাহারও গৃহে ভাগবত নাই তখন সেই সমাহৃত ভাগবতগুলি পোড়াইয়া ফেলিলেন। তাহার পর আর একটা স্বপ্নাদেশের পালা আসিল। এবার বোপদেব গোস্বামী স্বপ্নে দেখিলেন যে একখানা ভাগবত নর্ম্মদা নদীগর্ভে আছে এবং তিনি ডুব দিয়া তাহা উদ্ধার করিতে পারিবেন। তাহার পর তিনি ডুব দিতে লাগিলেন এবং প্রত্যেক ডুবেই ভাগবতের এক অংশ স্কন্ধে করিয়া তুলিতে লাগিলেন। এই গল্পের সর্ব্ব নিম্নস্তরস্থ সত্য বলিয়া বোধ হয় যে অধুনা প্রচলিত ভাগবত বোপদেব গোস্বামীর রচিত এবং মূল ভাগবতের লোপ হইয়াছে। ভাগবত যে ঋষি প্রণীত নহে এতৎ সম্বন্ধে বহুদিনের পুরাতন শ্লোক আছে। ইহা আমি আমার বন্ধু মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয়ের মুখে শুনিয়াছি। শ্লোকটী এই—

ভূয়ঃ কর্কশশব্দাঢ্যা নৈষা রীতি মহাত্মনাম্।
কৃতং বঙ্গদেশীয়েন ব্যাস তুল্যেন কেনচিৎ ॥

অর্থাৎ ভাগবতের রীতি (style) ঋষিদিগের রীতির মতন নহে। ইহা বহু কর্কশ শব্দে পূর্ণ। ব্যাস তুল্য কোন বাঙ্গালী ইহা লিখিয়াছেন।

এখানে অবান্তর ভাবে (parenthetically) উল্লেখ করা যাইতে পারে যে বোপদেব জাতিতে বৈদ্য ছিলেন এবং উত্তর বঙ্গের বগুড়া তাঁহার জন্মস্থান ছিল। মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত যাদবেশ্বর তর্করত্ন মহাশয় প্রবল যুক্তি ও প্রমাণ দ্বারা ইহা প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

সে যাহাই হউক বোপদেব যে তাঁহার এই অসাধারণ কৃতির প্রাপ্য যশের আশা ত্যাগ করিয়া বেদব্যাসের নামে ভাগবত প্রচার করিয়াছিলেন ইহাতে তাঁহার সাহিত্যিক সজ্জনতার অভাব বা সত্যগোপনের পাপস্পর্শ হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি না বরং ত্যাগ স্বীকারের জন্য ভক্তিই করি।

• বেকনের লিখিত এবং শেক্স্পিয়ারের নামে প্রচারিত নাটকগুলি আমি এই শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া মনে করি না। কেন না ওডানেলি (O' Donnelly) এবং আরও অনেক মহাপণ্ডিত গবেষকগণ দেখাইয়াছেন যে বেকন একটা বিশেষ অভিপ্রায়েই আত্মগোপন করিয়া শেক্স্পিয়ারের নামে নাটকগুলি প্রচার করিয়াছেন বটে কিন্তু সেই গ্রন্থগুলির মধ্যেই এমন ই অদ্ভুত কৌশল রচনা করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন যে তাঁহার কর্তৃত্ব বহুকাল গোপন

থাকিতে পারে না। তাঁহার Advancement of Learning নামক পুস্তকের একস্থলে বেকন লিখিয়াছেন যে যতরূপ রচনা কৌশল আছে তাহার মধ্যে একটা আখ্যানের মধ্যে আর একটা আখ্যান গুপ্তভাবে সংস্থান করাই শ্রেষ্ঠ রচনা কৌশল। ওডনেলির আবিষ্কৃত একটী সঙ্কেত অনুসরণ করিয়া সমস্ত নাটকগুলির মধ্যে অনুসন্ধান করিলে এই আখ্যানটী পাওয়া যায়, Henry v. নাটক অভিনীত হইবার কয়েকদিন পরে রাজদ্বার হইতে শেক্‌স্‌পিয়ারে নামে এক ওয়ারেণ্ট বহির হইল। শেক্‌স্‌পিয়ার তখন বেকনের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন "আপনি লেখেন আর আমার নামে বাহির হয় ওয়ারেণ্ট—আমি রাজদ্বারে গিয়া সমস্ত প্রকৃত কথা বলিয়া দিব।" বেকন বলিলেন "আমি প্রধান মন্ত্রী থাকিতে তোমার ভয় নাই। তুমি কিছুদিন প্রচ্ছন্নভাবে থাক।" এই বলিয়া বেকন তাঁহাকে এক তোড়া টাকা দিয়া বিদায় দিলেন।

বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের অভিপ্রায়ে কিছুদিনের জন্য এরূপ মিথ্যাচরণে যদি পাপস্পর্শ হয় তাহা হইলে পুলীসের লোক যখন চোর বা হত্যাকারীকে ধরিবার জন্য নিজকে সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুক অথবা বাজীকর বলিয়া পরিচয় দেয় তখন তাহারাও পাপাচরণ করে।

পুত্র উৎকৃষ্ট আহার পাইবে, সুরম্য স্বাস্থ্যকর গৃহে বাস করিবে, বিদ্যা উপার্জ্জনের সর্ব্ব-প্রকার সুযোগ লাভ করিবে, পরে সুশিক্ষিত হইয়া সংসারের দশজনের একজন হইয়া যশো-লাভ করিবে, বহু লোকের উপকার করিবে ইত্যাদি ভাবিয়া যদি কোন দরিদ্র ব্যক্তি পুত্রকে একজন ধনীর দত্তক পুত্র করিয়া দিয়া নিজে দরিদ্রভাবেই থাকেন তাহা হইলে তিনি যে কেবল অসাধারণ নিঃস্বার্থতাই প্রদর্শন করেন তাহা নহে ইহাতে তাঁহার অসাধারণ পুত্রপ্রেমও প্রকাশ পায়। কোন ভাল গ্রন্থ লিখিয়া অপরের নামে প্রচার করাও সেইরূপ।

অনেক সময়ে অনেক গ্রন্থকার অপর লেখকের লিখিত বিবরণ আত্মসাৎ করিয়া কোন স্থলে তাহা স্বীকার করেন নাই অথচ তাঁহাদিগকে কেহই দোষ দেয় না। বেকন অথবা শেক্সপিয়ার স্বপ্রণীত নাটকে প্লুটার্ক্ এবং অন্যান্য লেখকের বিবরণ স্বীকার না করিয়া উদ্ধৃত করিয়াছেন। মিল্‌টন্ ও রবীন্দ্রনাথও সেইরূপ করিয়াছেন কিন্তু তাঁহারা সমালোচনাভাজন হন নাই। বোধ হয় প্রতি পদেই ফুটনোটে প্রমাণের উল্লেখ করিলে তাঁহাদের কাব্যনাটকের

রসভঙ্গ হইবে বলিয়াই তাঁহারা তাহা করেন নাই। কিন্তু যুক্তিতর্ক সংবলিত ঐতিহাসিক গবেষণায় পাঠকেরা বিরক্ত হইয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীযুক্ত গৌরাঙ্গনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় স্বীয় Hellenism in Indiaতে অনেক স্থলে প্রমাণের উল্লেখ না করিয়া সুবিবেচনার কার্য্য করেন নাই। তাঁহার গ্রন্থের যে সমালোচনা প্রবাসীতে বাহির হইয়াছে তাহার মত পাণ্ডিত্যপূর্ণ ও উপভোগ্য সমালোচনা বঙ্গ-সাহিত্যে আর দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। সমালোচনা কিরূপে করিতে হয় এবং তাহাতে কত বিদ্যাবত্তার প্রয়োজন তাহা একবার বিদ্যাসাগর মহাশয় তাঁহার বহুবিবাহ পুস্তকে দেখাইয়াছিলেন আর পঞ্চাশ বৎসর পরে প্রবাসী সম্পাদক দেখাইলেন।

কখন কখন দেখা যায় কোন কোন সমালোচক সমালোচিত লেখকের নামোল্লেখ না করিয়া তাঁহার লিখিত বিষয়ের সমালোচনা করেন। এটাও সম্পূর্ণ সরলতার কার্য্য বলিয়া বোধ হয় না। ইহাতে যেন এইরূপ প্রতীয়মান হয় যে সমালোচিত ব্যক্তিকে সমালোচক এমনই নগণ্য বা হীন ব্যক্তি মনে করেন যে তাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে সমালোচকের যুগপৎ লজ্জা ও ঘৃণা হয়। শ্রীযুক্ত রমাপ্রসাদ চন্দ একজন সত্যপ্রিয় সাহিত্যিক হইয়াও সরল-ভাবে প্রবাসীর নামোল্লেখ না করিয়া তল্লিখিত বিষয়ের দুইএকটা কথার সমালোচনা করিয়াছেন। প্রবাসী ইহা দেখাইয়া দিয়াছেন।

মাসিক পত্রিকার কোন কোন সম্পাদক প্রাপ্ত প্রবন্ধ সময়ে সময়ে এমন পরিবর্ত্তিত করিয়া প্রকাশ করেন যে তাহাতে প্রবন্ধ লেখকের উদ্দিষ্ট অভিপ্রায়ের বিপরীত বুঝায়। আমি এইরূপ দুইজন সম্পাদককে জানি কিন্তু তাহাদের নাম প্রকাশ করিব না। তাঁহাদের সহিত লেখকদের অতিমাত্রায় মনোমালিন্য ঘটিয়াছে তাহা অবগত আছি।

প্রায় দুই শ্রেণীর অন্তর্গত আর একটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। কিন্তু এই বিবরণেও ব্যক্তি, স্থান ও পত্রিকার নাম করিব না। অল্পদিন হইল ভারতবর্ষের এক শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি কলিকাতার এক প্রসিদ্ধ স্থানে একটা বক্তৃতা করিয়াছিলেন। লোকে তাঁহার বিদ্যাবত্তা, বুদ্ধিসত্তা ও ধর্ম্মজ্ঞানে এমনই আস্থাবান্ যে তিনি যদি কোন যুক্তির উল্লেখ না করিয়াও একটা মত প্রকাশ করেন তাহা হইলেও সেই মতের প্রতি বহুলোকের আস্থা হয়। কিন্তু সেই বক্তৃতায় তিনি নানারূপ প্রবল ও সুন্দর যুক্তির অবতারণা করিয়াছিলেন। নন্‌কোঅপরেশন যাহাদের অভিমত নহে

তাঁহারা সেই বক্তৃতা শেষ হইলে অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বক্তাকে অবিলম্বে তাহা মুদ্রিত করিয়া প্রচারিত করিতে অনুরোধ করিলেন। সঞ্জীবনীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিও উহা স্বীয় কাগজে মুদ্রিত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। বক্তা বলিলেন ইহা অমুক পত্রিকায় বাহির হইবে। সেই অমুক পত্রিকায় তাহা সম্প্রতি বাহির হইয়াছে। কিন্তু তাহাতে বক্তার প্রবল যুক্তিগুলি প্রায় বর্জ্জিত হইয়াছে। এই পরিবর্জ্জন বক্তার মত পরিবর্ত্তনের ফল কি সম্পাদকীয় কাঁচি কাটনার ফল তাহা বুঝা গেল না। অন্ততঃ বক্তৃতাটি শুনিয়া যেরূপ বোধ হইয়াছিল যে উহার অভিপ্রায় ছিল লোককে নন্‌কোঅপরেশন হইতে সম্পূর্ণভাবে সতর্ক করা, পড়িয়া তেমন বোধ হইল না।

বঙ্গ-সাহিত্যে আর একটা অসজ্জনতা এই দেখা গিয়া থাকে যে কোন বিখ্যাত ইংরেজী পুস্তকের অনুবাদ করিতে গিয়া অনুবাদক ঠিক্ অনুবাদের পরিবর্ত্তে স্থানে স্থানে নিজের মত যোজনা করিয়াছেন এবং এই বলিয়া তাহার হেতুবাদ বা কৈফিয়ৎ দেন যে বাঙ্গালী পাঠক মূলগ্রন্থের বর্ণনা পছন্দ করিবেন না বলিয়া অন্যরূপ করিতে দেওয়া গেল।

আর একরূপ সাহিত্যিক অসাধুতা এই যে কাহারও জীবনের সর্ব্বপ্রধান কার্য্য যদি লেখকের মতের বিরুদ্ধ হয় তাহা হইলে সেই ব্যক্তির জীবনচরিত লিখিতে গিয়া লেখক সেই কার্য্যের কথাটা একেবারে চাপিয়া যান। বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ছুই একখানা জীবনী পুস্তকে তিনি বিধবা বিবাহের জন্য যে চেষ্টা করিয়াছিলেন সে কথাটার মোটেই উল্লেখ নাই। আবার সেদিন প্রচার নামক একখানি কাগজে পড়িলাম যে বাঙ্গলায় জেনরাল বুথের যে জীবন চরিত বাহির হইয়াছে তাহাতে খ্রীষ্টের নাম নাই। বুথ কিন্তু তাঁহার জীবনের সমস্ত কার্য্যই খ্রীষ্ট দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া করিয়াছেন বলিয়া জানাইতেন।

আবার একজন কয়েক পৃষ্ঠাতেই খ্রীষ্টের জীবনী লিখিয়া রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিত ভূমিকা যুক্ত করিয়া পুস্তকাকারে ছাপাইয়াছেন। যে জীবনচরিত লিখিতে ফারার, রেনা প্রভৃতি মনীষীগণ প্রাণপাত পরিশ্রম করিয়াছেন সেই জীবন চরিত ছুই কথায় লিখিয়া উড়াইয়া দিতে যাহারা উদ্যত তাঁহারা বিষয়ের গুরুত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না। এরূপ তাড়াতাড়ি কাজ দ্বারায় সাহিত্যিক কর্ত্তব্যপরায়ণতা প্রকাশ পায় না।

শ্রীবীরেশ্বর সেন।

দুঃসহ অপেক্ষা।

সময় আমার ফুরিয়ে আসে অই
তোমার কখন সময় হবে বলো।
তোমার অবসরের আশে আশে
তারুণ্য মোর ক্রমেই গত হলো।
ফুল পরেছি দুল্ মাকড়ী ছাড়ি
পরি না আর চওড়া পেড়ে শাড়ী
দেখ কোণের বউটি নহি আর
অটল ঠাকুর একবারটি টলো।
বেঁধে এ চুল নানান রকম করে'
পান খেয়ে আর কাচপোকা টিপ পরে'
ঘুরে বেড়াই তোমার সোহাগ পেতে
প্রাণের তিয়াষ ছট্‌ফটিয়ে মলো।
কথার জবাব দাও না কভু হেসে
কইলে কথা তপ বুঝি যায় ভেসে?
দেবেন্দ্র পদ হারাবে হায় শেষে
তাই রোষে কি আগুন হয়ে জ্বলো।
মরেছে যে হাজার বছর আগে
তারো লাগি অশ্রু তোমার জাগে।
বিরহিণীর জন্য ফাটে হিয়া
প্রিয়ার বুকেই পাষাণ শুধু ডলো।

খাতা পুঁথি-পত্র কেড়ে নিয়ে
ইচ্ছা করে পোড়াই আগুন দিয়ে
দেখি আমি কি নিয়ে বা থাকো
কেমন করে' হেলা করেই চলো।

শ্রীকালিদাস রায়।

মহাসমাধি।

—:*:—

বাদশা মেয়ের কাজ করে করে বুড়োর স্বভাবটাও তেমনি নবাবী ছাঁচে গড়ে উঠেছিল। থাকৃত কিন্তু সে সেই দিল্লীর একটা চৌমাথায় ছোট্ট একখানা ঘরে তার সেলাইয়ের কলটার পাশে বসে। পোকায় কাঁটা গরীবের জীর্ণ পোষাকটা যেমন শতছিদ্র, তেমনি বুড়োর ঘরটিরও কোন স্থানেই অভাব ও দারিদ্র্যের চিহ্নের মোটেই কম্‌তি ছিল না। একটু দম্‌কা হাওয়া লেগেছে ত, সেই ঘরটি পড়ে আর কি। তবু ত এই ছোট জীর্ণ ঘরখানাতে থেকেই বুড়োর চালটা যেন তার অবস্থাকে অতিমাত্রায় অতিক্রম করে গিয়েছিল। দেখে এমন, তার প্রতিবেশী হাস্‌ত, তার খরিদ্দার ভ্রুকুটী কর্‌ত, যুবকদল তার মস্তিষ্ক নিয়ে পরীক্ষা করতে ব্যগ্র হয়ে উঠ্‌ত, আর দুষ্ট বালকেরা তাকে সময়-অসময়েই শেলাম ঠুকৃত। কিন্তু বুড়োর এদিক তেমন নজর ছিল না, সে এ সব গ্রাহ্যই করত খুব কম। শুধু হাসত, বত্রিশ পাঠি দাঁতের একটাও তখন দেখা যেত কি না সন্দেহ। মধ্যবিত্ত লোকের ফরমাস্ সে খাটতেই পারত না, মোটেই না কখনই না। হয় ত কেউ এসে বল্‌ল, দেখ হে বুড়ো এ পোষাকটা তৈয়ের করে দিও দেখি। মাপটা নিয়ে নাও। তখন সে এমন মজুরী হেঁকে বস্‌ত যে ভদ্রলোকটী চোখ দুটি কপালে তুলে বুড়োর দোকান থেকে পালিয়ে নিষ্কৃতি পেত। দ্বিতীয় বার আর সে পথও মাড়াত না। বুড়োর যত খদ্দের ছিল সব উঁচুদরের, কেউ বা নবাব, কেউ বা বাদসাহ, কেউ বা ওমরাহ এমন আরও কত।

এজন্যই নবাব বাদ্‌সার সে খুব সুনজরে পড়েছিল, তাকে তারা খুবই ভাল বাস্‌তেন। বল্‌তে কি সে তাদের এমন প্রিয় হয়ে পড়েছিল যে মাঝে মাঝে তাকে নবাব বাদসাহের অন্দর-মহলেও যেতে হ'ত বেগম, বেগমকন্যার ফরমাশ শুন্‌তে। তাকে তারা বিশ্বাসও এত করতেন যে তার দাবীর উপর তারা আর দ্বিতীয় কথাটি বলাও প্রয়োজনের বাইরে বলেই মনে কর্‌তেন। সে তাদের ফরমাস্‌ নিয়ে যাই তৈয়ের করে দিক্‌ না তাই অন্দর-মহলে পছন্দ হতে মোটেই দেরী হ'ত না। বুড়োর তৈয়েরী জিনিষ তাদের কখনও এমন মনে লেগে যেত যে তারা বুড়োর চাওয়া মজুরীর উপরেও অনেক সময় তার হাতে পুরস্কার স্বরূপ আসরফি গুঁজে দিতে চাইতেন, কিন্তু বুড়ো হেসেই হাতটা সরিয়ে নত হয়ে তাদের সেলাম দিয়ে সরাসর বেড়িয়ে যেত। ক্রমে ক্রমে এমন দাঁড়াল যে দেশ বিদেশে বুড়োর নাম ছড়িয়ে পড়্‌ল, রাজা বাদ্‌সাহের অন্দরমহলেও এই বুড়োর নাম ঢুকে গেল। এই ছিল বুড়োর জীবনটার বৈচিত্র্য ও বিশেষত্ব, তবে আর চালচলনটাই বা কেন নবাবী হবে না? ঘরের দীনতার সঙ্গে তার বোধ হয় সম্বন্ধ খুবই কম। জীবন তুফানের যে কত দম্‌কা হাওয়া বুড়োর দেহটার উপর দিয়ে বয়ে গিয়েছিল তার গণনা হওয়া অসম্ভব, সে হাওয়ার দাপটে বুড়োর জীবনটা হয়তো কর্পূরের মত উড়ে উড়ে ক্রমেই নিঃশেষের পথে চলেছিল সত্য, তবু কিন্তু সৌখীনতা স্পৃহা তেমনি তাকে চেপে বসেছিল, কণামাত্রও তা উড়ে গিয়েছে কি না সন্দেহ। একটা অনির্দ্দিষ্ট তীরের দিকে এই বুড়ো যতই অগ্রসর হচ্ছিল ততই যেন তার বিলাসীতার মাত্রাটা বেড়েই চলেছিল। আশে পাশের সবাই হাস্‌ত—বল্‌ত এসব বুড়োর পাগলামী। পাগলামীই হউক আর যাই হউক বুড়ো ত আর তা বুঝে কর্‌ত না, তাই সে তার নিজের খেয়াল নিয়েই বেশ চলেছিল। আচ্ছা, বুঝবেই যদি তবে কেন এমন ন্যাকা সেজে বুড়ো অন্যের চোখের বিদ্রূপ-দৃষ্টি বহন করে ফিরবে? বুড়োর আরেকটা দোষ ছিল, সে বড় পরের সেলাম ভালবাস্‌ত। যেই তাকে সেলাম কর্‌ত তাকেই সে যথেষ্ট আদর-যত্ন কর্‌ত। দুষ্টু ছেলেরা যে তাকে পথে ঘাটেই দেখা হ'লে সেলাম ঠুকে ঠাট্টা কর্‌ত, তাতেও বুড়ো খুব সন্তুষ্ট হয়ে তার সঙ্গে দুটা কথা বলার জন্য পথে দাঁড়াত। ঠাট্টা বিদ্রূপ কি বুড়ো ঠিক্‌ বুঝতে পার্‌ত? ভাব্‌ত না জানি ওরা তাকে কত উচু ভক্তেরই যোগ্য মনে করে। হয় ত বুড়ো তার জীর্ণ ঘরে এক-খানা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসে সেলাইয়ের কাজ কর্‌ছে। মেহেদী রঞ্জিত দাড়ী তার বুক

ছাড়িয়ে নাভীদেশ পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেচে, চোখে তার সেই বাপপিতামহের আমলের দুখানা কাঁচ লেগে আছে, মাঝে মাঝে তার কাঁচি সশব্দে চলেছে—বুড়ো একেবারে কাজে তন্ময় হয়ে গেছে, বাহ্যজ্ঞান আছে কি না তাও বুঝা শক্ত।—ঠিক এমন সময়ে যদি কেউ এসে বুড়োকে মস্ত একটা সেলাম ঠুকে তার সামনে দাঁড়ায় তবেই বুড়ো তার কাজ ফেলে শশব্যস্ত হয়ে উঠে তার দিকে একখানা নষ্টপ্রায় কেদারা এগিয়ে দিয়ে খুব গম্ভীর স্বরে বলে উঠ্‌বে—"বইঠে বাবুজী বইঠে।" কেদারার জীর্ণতার পরিমাণে তার ভারিক্কী চালের ওজন যে কতটা মানানসই হয় তা বুড়োর চোখে কখনও পড়ে না। তার একটী শব্দ 'বইঠে' উচ্চারণের মধ্যেই যে কতটা আত্মমর্য্যাদার ভাব পরিস্ফুট হয়ে বেড়িয়ে পড়ে তা বুঝে শুধু সে যার উদ্দেশে তা বলা হয়। গরীব লোকে ত পাগল বলবেই, কিন্তু নিজের কাছে নিজের বুদ্ধি-বিবেচনার কাছে ত আর সে তার জন্যে পাগল হয়ে যায় না।

বুড়োর জীবন-স্রোত যেমন চলিতেছিল, তেমন আর চলল না। একটা বাধা এসে দৈবাৎ বুড়োর জীবনের প্রবাহটাকে কেমন একটা মস্ত ঘুরপাক খাইয়ে দিল। বাধা যখন আসেই তখন কি আর তাকে প্রতিরোধ করে ঠেকিয়ে রাখা সম্ভব হয়? বুঝাও শক্ত হয়ে উঠে কেমন করে কোথা থেকে এ প্রতিবন্ধক এসে পথ আগলে দাঁড়াল! সেবার দিল্লী সহরে মস্ত একটা চকমিলান বাড়ীতে লক্ষ্ণৌ থেকে কোন একজন নবাব এসে দিন কতক থেকে গিয়েছিলেন। বায়ু পরিবর্ত্তনই হ'ক্ কিম্বা শুধু রাজরাজরার আমলের দিল্লী সহরটাকে ঘুরে ফিরে দেখতে হ'ক্—যে-কোন একটা কারণেই হ'ক্ তিনি দিল্লী নগরীতে এসে কতক দিন ছিলেন। তখন প্রায়ই বুড়োকে তাঁর ফরমাস্ খাটিতে হ'ত। বুড়োকে তাঁর অনেক পোষাক-পরিচ্ছদ প্রস্তুত করে দিতে হয়েছিল। তারপর এমন হ'ল যে কার্য্যসূত্রে বুড়োর সঙ্গে তাঁর বিলক্ষণ আলাপ জমে গেল। এমন আলাপই জমে গেল যে তার ফলে বুড়ো চোখে-মুখে পথ দেখ্‌তেই পেত না। লক্ষ্ণৌর নবাবের ফরমাসী কাজ এত এসে তার উপর পড়্‌তে লাগ্‌ল যে বুড়ো আল্লার কাছে আরও কয়েকখানা হাতের জন্যও প্রার্থনা করতে কসুর করে নাই। বাইরের লোকে তখন বলাবলি কাণাকাণি করত, এবার বুড়ো তার কুটীর ভঙ্গে এমন এক বিচিত্র সৌধ প্রস্তুত করাবে যে দেখে সর্ব্বদাই বিস্ময়ে তার দিকে নিষ্পলক হয়ে তাকিয়ে রইবেই। তাদের কল্পনার গতি এতই দ্রুত ছিল যে অনেকে আবার

ভাবত বুড়ো হয় ত তাহার বিচিত্র সৌধের ভিত্তি গড়ে তুলতে এতদিনেই উঠেপড়ে লেগে গেছে। কিন্তু তারা ত জানত না যে সৌধের প্রত্যেকটী ইঁটের গাঁথুনীর সঙ্গে সঙ্গে যে বুড়োর জীর্ণ ঘরের বেড়ার প্রত্যেক অংশ খসে খসে পড়বে। বেড়ার প্রত্যেকটী কঞ্চি যে তার বক্ষ-পঞ্জরের অস্থির প্রত্যেকটীর সাথে সাথে জোড়া জোড়া সংশ্লিষ্ট। কঞ্চি একটী ভেঙ্গেছে ত তার বক্ষের একটী অস্থি চূর্ণ হয়ে গিয়েছে! ঘরটীর সাথে যে বৃদ্ধের কত মায়া, কত প্রীতি মিশ্রিত রয়েছে। অতীতের কত স্মৃতি যে এই ক্ষুদ্র কুটীর ক্রোড়ে সঞ্জীবিত হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে! কত ব্যথা ও বেদনার কাহিনী যে এই ঘরের প্রত্যেকটী বায়ু-শ্বাসের মধ্যে লিপ্ত হয়ে রয়েছে;—তরুণ জীবনের কত উদার তরুণ প্রেরণা যে এই ঘরখানির ভিতরে এসে পড়েছে, সে ঘর ছেড়ে সে কেমন করে গিয়ে কারুকার্য্য খচিত একটি সৌধে প্রবেশ করবে। তার হৃদয় ত তা কখনও চাইবে না। তা হ'লে মর্ম্ম হ'তে তার যে ক্রন্দন ধ্বনি বাহির হবে। চারিদিকে ছড়িয়ে পড়তে প্রয়াস পাবে, তা ত সে কিছুতেই চেপে রাখতে পারবে না। স্মৃতি তবে তাকে প্রতি মুহূর্ত্তেই আঘাত দিবে, তার অন্তর তবে একটা অশান্তির জ্বালায় পুড়ে যেতে থাকবে। তাই বুড়ো যেমন কুড়েতে ছিল, তাতেই রয়ে গেল। এদিকে কিন্তু লক্ষ্ণৌর নবাব প্রায়ই তাকে ডেকে তার কাজের বোঝা বাড়িয়েই দিতে লাগলেন। বুড়োও সস্মিত বদনে খুব আগ্রহের সহিত কাজের ফরমাস্ নিয়ে আসতে লাগল। কোন দিনও সে কাজ নিতে অস্বীকার করে নাই, করলে যে তার আত্মমর্য্যাদার বিশেষ হানি হবে। তার নামের যে গৌরব হারিয়ে যাবে। তাই সাগ্রহে নীরবে বৃদ্ধ নবাবের আদেশ মত তার প্রত্যেকটী কাজ সুসম্পন্ন করে দিত। সাধুতাই ছিল তার প্রধান সহায়, আর দ্বিতীয় সহায় ছিল তার অক্লান্ত কর্ম্মশীলতা। একদিন ভোর না হতেই নবাব-বাড়ীতে বুড়োর ডাক পড়ল। চোখ মুখ ধুয়ে দাড়াতে বেশ সুন্দর রকম মেহেদী মেখে আর গোঁফ জোড়াটিতে সুগন্ধি আতর দিয়ে, চোখে সেই বহু পুরাতন চশমা জোড়াটি লাগিয়ে গায়ে একখানা ছিদ্র-বহুল জীর্ণ আংরাখা পরিধান করে, আর পায়ে সেই মান্ধাতার আমলের নাগরা জুতা জোড়া ঢুকিয়ে এসে হাসতে হাসতে বুড়ো নবাবকে একটা লম্বা সেলাম ঠুকে তাঁর সম্মুখে দাঁড়াল। হেসে নবাব বললেন—"দেখ হে ওস্তাদজী আজ তোমাকে অন্দর মহলের কয়েকটা ফরমাস্ শুনতে হ'বে। তাই তোমাকে ডেকেছি।" বৃদ্ধ দর্জ্জী তখন দন্তবর্জ্জিত সেই মুখে

হেসে বল্‌ল—"গরীবের প্রতি যেমন অনুগ্রহ। আদেশ যেমন করবেন পালন করতে ত্রুটি করব না। এই বলে সে অন্দর মহলে প্রবেশ করল। নবাব স্বয়ং তাকে প্রবীণা বেগমের প্রকোষ্ঠে নিয়ে গেলেন। সেখান থেকে ফরমাস্ নিয়ে বুড়ে বেগম-দুহিতার প্রকোষ্ঠে ঢুকল, থম্‌কে গেল, নিজেকে বুড়ো যেন সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেল্‌ল। ভুলেই যেন গেল সে কোথায় দাঁড়িয়ে, আস্‌মানে কি জমিনে! আত্মহারা হয়ে বুড়ো নিজেকে সাম্‌লিয়ে উঠ্‌তে পারল না। সম্মুখে দেখ্‌ল যেন একটী ডানা কাটা পরী, তা না হ'লে এমন সুন্দর, এমন ধী ও শ্রী, এমন দেহের কমনীয়তা, মুখের এমন লাবণ্য ত সে আর এই তিন কুড়ি বয়সে দেখেছে বলে মনে হ'ল না। তাড়াতাড়ি তার ফরমাস্ শুনে বুড়া পাগলের মত কতকগুলি অসম্বদ্ধ ত্বরিত পাদক্ষেপে এসে একেবারে রাস্তায় দাঁড়াল। কারও দিকে তাকাল না কারও কথায়ও কান দিল না। একেবারে রাস্তায়—এবং তার পরেই তার জীবনের পরিবর্ত্তন সুরু হয়ে গেল।

(গ)

ক'দিন ধরেই বুড়োকে আর তার ঘরের বাইরে মুহূর্ত্তের জন্যও দেখা যায় না। নবাব-বাড়ী হ'তে সেই যে সেদিন বৃদ্ধ এসে তার ঘরে ঢুকল তার পরে দিনকতেকের জন্য তাকে আর কেউ দেখ্‌তেই পায় নাই। ঘরের ভিতর বসে যেন বুড়ো চব্বিশ ঘণ্টাই গুণে গুণে কাজ করে, কি যে করে বাইরের কেউ তা জান্‌তেই পারে না। শুধু শুন্‌তে পায় সর্ব্বদাই ঘরর্‌ঘরর্ সেই যে কল চলছে তার যেন আর বিরাম নেই। রাত নাই দিন নাই, আঁধার নাই আলো নাই—বুড়ো সারাটি দিন বসে বসে করে কি। পূর্ব্বে ত বুড়োকে এমন পরিশ্রমে কাজ করতে দেখা যায় নাই। কেউ দেখা করতে এলে, তার দেখা পায় না, শুনে যায় সে এখন বড় কাজে ব্যস্ত, মোটেই ফুরসুৎ নেই। দিল্লীর আর কোন বাদ্‌সাহের বাড়ী থেকে কেউ তাকে কোন কাজের ফরমাস্ দিতে এলে সে বলে পাঠায় হাতে অনেক কাজ, এ ফরমাস্ নিতে পারবে না। তাকে যেন এমন করে বার বার বিরক্ত না করে। সকলেই যেন এমন একটু অসন্তোষের ভাব নিয়ে ফিরে যায়। বুড়ো কিন্তু কারও বিরক্তি কিংবা অসন্তোষের কোন তোয়াক্কাই রাখে না। সে কাজ করেই যাচ্ছে ঘরর্‌ঘরর্। বুড়োর দরজার

বাইরে লোকে বলাবলি সুরু করে দিল এইবার এত পরিশ্রমে কাজ করে বুড়ো কিছুতেই তার মাথা ঠিক রাখতে পারবে না। বুড়োর এমন কাজ করাকে তারা পাগ্‌লামী ছাড়া আর কিছুই বল্‌তে রাজী হ'ল না। এমন পাগ্‌লামি করে করে শেষটায় বুড়ো ঠিক আস্ত পাগল হয়ে পড়্‌বে। এ বিষয়ে কারও সন্দেহ থাক্‌তে পারে তা যেন তাদের কথায় বুঝ্‌তে পারা গেল না। রাত নাই দিন নাই বুড়ো কাজ করছে, এত পরিশ্রমে কি কেহ শরীরটা টিকে থাক্‌বে? থাক্‌বে ত নাই, নিশ্চয়ই ভেঙ্গে পড়বে। তবে ইচ্ছা করে এত শীঘ্র মৃত্যু ডেকে আনবার কি দরকার ছিল, লোকে তাই বুঝ্‌তো না। কি কঠোর পরিশ্রম, কি আশাভরা উদ্যম, কি চোখের দীপ্তি কিছুই যেন বৃদ্ধের ক্ষয় পাচ্ছে না। রাত্রিবেলা সেই যে ম্লানপ্রভ একটা বর্ত্তিকা জ্বালিয়ে বুড়ো তার কাজ করতে থাকে—একেবারে তন্ময় হয়ে যায়—তখন কি বাইরের জগৎস্পন্দন তাকে একটু মাত্রও নাড়া দিতে পারে! সে তখন যে জগৎটার মধ্যে বিচরণ করতে থাকে, তাতে শুধু আশার স্পন্দন জেগে উঠে। এই স্পন্দনে যেন তার আশাভরা জীর্ণ বক্ষখানা স্পন্দিত হ'তে থাকে। বুড়োর বার্দ্ধক্যের সাথে ত তার সেই নিরলস কার্য্য-স্পৃহা চলে যায় নাই, তার বয়সটা যদিও লাফিয়ে চলেছে যেন তার যৌবনটা এখনও যায় নাই। দেহপাত করছে বুড়ো পরিশ্রম করে, তবু যেন সে আরও কাজ করতে চাচ্ছে। শক্তিতে কুলোলে যেন সে আরও কাজ করত একদিন ভোর বেলা লক্ষ্ণৌর নবাববাড়ী হ'তে বুড়োর কাছে লোক এল। প্রথমেত বুড়ো তার সঙ্গে দেখা করবে না বলেই ফিরিয়ে দিয়েছিল। কারণ দেখা করার অবসর ত আর তার নেই। কিন্তু যখন শুন্‌তে পেল লক্ষ্ণৌর নবাব বাড়ী হ'তে সে এসেছে, তখন আর দেখা না করে সে থাক্‌তে পারল না। যখন সেই লোকের মুখে শুনল যে নবাব কন্যা এমন রোগে পড়েছে যে তার জীবনের আশা করাটাই একটা মস্ত দুরাশা আর মুহূর্ত্তের মধ্যেই হয়ত তার প্রাণটা খাঁচা হ'তে ছাড়া পাওয়া পাখীর মত উধাও হয়ে পালিয়ে যেতে পারে, তখন আর বুড়োর সহ্য হ'ল না। বুকটা খুব চেপে ধরে সে ঘরে ঢুকে গেল। বলে গেল সে তার পোষাকটি নিয়েই এখন যাচ্ছে। ঘরে ঢুকে সে অনেকক্ষণ সেই অসম্পূর্ণ পোষাকটীর দিকে তাকিয়ে রইল। আজ যেন তার সমস্ত উদ্যম আশা ভরসা এক নিমেষের মধ্যে টুটে গেল। শরীর যেন কেমন

দুর্ব্বল হয়ে পড়্‌ল। চোখ হ'তে টস্ টস্ ক'রে কয়েক ফোটা জল মাটীর উপর পরে শুকিয়ে গেল। দুঃখে ও বেদনায় যেন তার বুকটা একেবারে হাহাকার করে কেঁদে উঠ্‌তে চাইল বুকের প্রত্যেকটী স্পন্দন যেন আজ সশব্দে তার কাণে বেজে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। এক একটা সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস যেন আজ তার বুকটাকে একেবারে নিঃশোষিত করে বাইরের বাতাসের সাথে মিশে যেতে লাগ্‌ল। তার তাপস্পর্শও যেন আজ বুড়ো সম্যক্ অনুভব করতে পারছিল। হঠাৎ বুড়ো তার অসমাপ্ত পোষাকটী নিয়েই একেবারে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, বরাবর নবাব বাড়ী অভিমুখে ধেয়ে চল্‌ল। আজ যেন বুড়োর আর দিক্ বিদিক্ বিচার শক্তি জাগ্রত নেই —তা যেন লুপ্ত প্রায়। পাগলের মতন বেশে সে যখন নবাব বাড়ীতে ঢুকে গেল—দেখ্‌তে পেল সম্মুখে পালঙ্কোপরি শায়িতা নবাব দুহিতা। চিরসুপ্তি সাদরে তাকে ক্রোড়ে নিয়েছে—সংসারের জ্বালাযন্ত্রণার অবসান হয়েছে। চারিদিকে তার আত্মীয়বর্গ। বিষাদে তাদের মুখে এমন একটা ছাপ মেড়েছে যে তাদের নিভৃত মর্ম্ম প্রদেশে যে গোপন ক্রন্দন চাপা রয়েছে, বাহির হ'তে চেষ্টা করে এক একবার যে বক্ষটাকে একটা স্পন্দন-বাত্যা দিয়ে আন্দোলিত করে তুল্‌ছে তা ঐ বদন-মণ্ডলের দিকে দৃষ্টিপাত করলেই বুঝতে পারা যায়। বৃদ্ধ সেখানে নির্ব্বাক অবস্থায় দাঁড়াল, পাগলের মত কতক্ষণ উদাস দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইল! বুঝতে পারল বড় দেরী হয়ে গেছে—ফুল ত ঝরেই ম্লান হয়ে গিয়েছে। নবাব এসে স্বয়ং বুড়োর পাশে ধীরে ধীরে দাঁড়িয়ে অতি মৃদু স্বরে বল্‌লেন—"ওস্তাদ্‌জী, তোমার পোষাক তৈয়ের হয়ে গিয়েছে কি? কিন্তু যার জন্য এত পরিশ্রম করে এটা করলে সে ত আজ চিরনিদ্রায় অচেতন। যাক্, তোমার মজুরী নিয়ে যাও।" ওস্তাদ্‌জী প্রথম শুন্‌তেই পেল না, দ্বিতীয়বারও নবাব আবার বুড়োকে সেই কয়টি কথাই বল্‌লেন। বুড়ো সসম্ভ্রমে তাঁকে এবার একটা অভিবাদন করে তাঁর কথার উত্তর কর্‌ল—"ঠিক শেষ হয় নাই। একটু বাকী ছিল। বিশ্বাস হয় না আমার শাহাজাদী মরেছে—সে কেন মরবে। মৃত্যু কি এমনি নিষ্ঠুর যে শাহাজাদীকে এত শীঘ্রই নিষ্পেষিত করবে। আমি আর কিছু চাই না—চাই শুধু শাহাজাদীর দেহ স্পর্শ করে তার জীবনী শক্তির কণামাত্রও এখনো আছে কিনা সে সম্বন্ধে সম্পূর্ণ নিঃসন্দেহ হ'তে। তা না হ'লে আমার প্রত্যয় হচ্ছে না।" নবাব বৃদ্ধের মনের অবস্থা সম্পূর্ণ বুঝতে পারলেন আর মাথাটি নেড়ে সম্মতি জানালেন। পরে বৃদ্ধের ঐ অসম্পূর্ণ

পোষাকটী দেখ্‌লেন। শুধু আশ্চর্য্য হ'লেন। কারণ তার জীবনে তিনি এমন নিখুঁত শিল্পের পরিচয় পেয়েছেন কিনা স্মরণ করতে পারলেন না। দু চোখ বেয়ে কয়েক ফোঁটা অশ্রু ঝরে পড়্‌ল—আজ এখন তাহার দুহিতা কোথায়। বুড়ো আর দেরী কর্‌ল না অতি সন্তর্পণে পা ফেলে সে গিয়ে মৃতার পালঙ্কের পার্শ্বে দাঁড়াল। কতক্ষণ একদৃষ্টে মৃতার মুখের দিকে তার দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রইল। তারপর ধীরে ধীরে অতি সংকোচের সহিত নবাব পুত্রীর অচেতন দেহকে স্পর্শ কর্‌ল, উঃ কি ঠাণ্ডা! ধাঁ করে সহসা বৃদ্ধ তাহার হাত সরিয়ে লয়ে গেল। হঠাৎ যেন একটা কান্নার সুর বৃদ্ধের বুকটার মাঝ থেকে বেরিয়ে গেল, কিছুতেই বৃদ্ধ তা চেপে রাখ্‌তে পারল না। চোখ হ'তে কয়েক ফোঁটা জল মৃতের শরীরের উপর পড়ে গেল। সকলে বৃদ্ধের এই অবস্থা দেখে আর স্থির থাক্‌তে পার্‌ল না—চোখ ফিরিয়ে নিল। হা হা করে কাঁদ্‌তে কাঁদ্‌তে বৃদ্ধ আবার তার সেই অসমাপ্ত পোষাকটী নিয়েই পাগলের মত বেরিয়ে গেল। নিয়ে গেল শুধু বক্ষের মর্ম্মস্থলে একটা তীব্র বেদনা, আর একটা প্রচণ্ড ঝঞ্ঝা।

(ঘ)

আবার এসে বৃদ্ধ তার জীর্ণ ঘরখানাতে প্রবেশ কর্‌ল. আবার খুব কসে দরজা এঁটে দিল। এবার কিন্তু সে আর আগের মত রইল না—যেন কেমন একটু বদ্‌লিয়ে গেল। আগের চেয়েও অধিক উদ্যমে আগের চেয়েও বেশী আশা নিয়ে বৃদ্ধ তার কাজ করে যেতে লাগ্‌ল। কেন উদ্যম, কিসের আশা তা বোধ হয় বৃদ্ধ নিজেও ঠিক বুঝ্‌তে পারত না। তবে সে শুধু বুঝেছিল তাকে কাজ করতেই হবে, যাহা অসম্পূর্ণ পড়ে রয়েছে তা সম্পূর্ণ করতেই হ'বে। স্যাঁত স্যেঁতে আঁধার ঘরটাতে একটা ছেঁড়া মাদুরের উপর বসে বৃদ্ধ শুধু বিগতপ্রাণা নবাব-নন্দিনীর পরিচ্ছদটাকেই মনের মত করে সম্পূর্ণ করতে লাগল। রাত নাই দিন নাই বৃদ্ধ আবার শরীর নষ্ট করে কাজ করতে লাগল। আবার কল চলতে সুরু করল ঘরর্ ঘরর্। কল অবিশ্রাম চল্‌তে লাগল, বাইরে চল্‌ল তার সেলাইয়ের কল আর বুকের মাঝে অস্থি নিষ্পেষণের জন্য চল্‌ল একটা যাঁতা কল। বৃদ্ধ কিন্তু তবু তেমনি সৌম্য শান্ত নিরলসই রয়ে গেল। এবার তার নূতন আরেক উপসর্গ জুট্‌ল—সেতারবাদন। কাজের একঘেয়েমি একটু দূর করবার জন্য সে একটা সেতার কিনে অবসর মত বাজাতে আরম্ভ কর্‌ল। বাজাতে

বাজাতে সে হয়ত উদাস নয়নে একদিকে তাকিয়ে থাকৃত সেতার থেমে যেত, শুধু তার বুকটা দীর্ঘশ্বাসের স্পন্দনসহ কেঁপে কেঁপে উঠ্‌ত। হয় ত কখনো বা সুরের তালে তালে তার কণ্ঠ থেকে করুণ বিলাপধ্বনি বেরিয়ে আস্‌ত, কখনো বা কাদলের সময় তার দুচোখ বেয়ে অশ্রুবন্যা তার বক্ষকে ভাসিয়ে দিতে চাইত। যখনই সে সেতার নিয়ে বস্‌ত তখনই হৃদয়-প্রদেশে যে একখানা চিত্র দুল্‌ত সে হচ্ছে অতীত-জীবনা নবাব-দুহিতা। ঘরের দেয়ালেও তখন সম্মুখে ঝুল্‌ত—মৃত্যু-ক্রোড়-শায়িনী নবাব-পুত্রী। এমন করিয়াই যেন সেতারের তারের সাথে এবং সেলাইয়ের কাঁটার সাথে বুড়োর জীবন গ্রন্থি বদ্ধ হতেছিল। হয় ত কখনো সে কাজে তন্ময় হয়ে নিজকে হারিয়ে ফেল্‌ত, আবার হয় ত কখনো সেতারের সাথে গভীর আলাপ জুড়ে দিত। এ দুয়ের মধ্যে বৃদ্ধের জীবনটা চলেছিল একরকম। বহির্জগৎ যেন বৃদ্ধের কাছ থেকে ক্রমেই সরে যাচ্ছিল। প্রাণের আদানপ্রদান চলত তার সেই জীর্ণ ঘরের চারটি প্রাচীরের মধ্যেই।

বৃদ্ধ তার পোষাকটিকেই শুধু সম্পূর্ণ কর্‌তে লাগ্‌ল। কবে শেষ হবে তা বোধ হয় বুড়ো নিজেও বল্‌তে পারে না। শুধু সে কাজ করেই যেতে লাগ্‌ল। যত কাজ এগোতে লাগল বৃদ্ধের অন্তরেও যেন কেমন একটা পুলক জেগে উঠ্‌তে লাগ্‌ল। ওদিকে চোখের দীপ্তি ক্রমেই কমে কমে বৃদ্ধকে আঁধার রাজ্যে নিয়ে চল্‌ল। হঠাৎ একদিন বৃদ্ধ বুঝ্‌তে পার্‌ল তার কাজ শেষ হয়েছে—অসম্পূর্ণ আজ সম্পূর্ণ হয়েছে। কিন্তু সেদিন ত আর সে আঁধার ছাড়া আর কিছুই চোখে দেখ্‌তে পার্‌ল না। এতদিনে বৃদ্ধ বুঝ্‌তে পার্‌ল তার নয়নের দীপ্তি একেবারে চলে গিয়েছে বুঝে সে একবার প্রাণ খুলে হেসে নিল। সারাটা ঘর যেন তার হাসির শব্দে একেবারে মুখরিত হয়ে উঠেছে। ধীরে ধীরে তখন বৃদ্ধ তার সেতারখানা নিয়ে গৎ বাজাতে সুরু করে দিল। গানের প্রতিটি মুর্চ্ছনা ক্রমেই উচু হ'তে আরও উঁচুতে উঠ্‌তে লাগ্‌ল, বৃদ্ধের বুকের স্পন্দন ও যেন মৃদু হ'তে মৃদুতর হ'তে লাগ্‌ল। হঠাৎ সেতারের গৎটা একেবারে উঁচুতে চরে গেল, ধাঁ করে বৃদ্ধের বুকের স্পন্দন একেবারে থেমে গেল। বসে রইল তখন পক্ক কেশ—স্থাণুবৎ নীরব নিথর। জীর্ণ ঘরখানা একটা দম্‌কা হাওয়া একবার কেঁপে উঠ্‌ল তারপরেই সশব্দে তাও এলিয়ে পড়্‌ল। পরের দিন সকলে দেখ্‌ল বৃদ্ধ সেতারা হাতে পাষাণ প্রতিমার ন্যায় নিস্তব্ধ নির্জীব, আর তার সাম্‌নেই

গতপ্রাণা নবাব দুহিতার আলোক চিত্র ভগ্ন, চুরমার। সকলে দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলে গেল—দিল্লীর চৌমাথার সে বাড়ীখানাও গেল, সে দর্জ্জীও কালের প্রভাবে মিলিয়ে গেল। রেখে গেল শুধু একটা নিদারুণ স্মৃতি—আর কিছু নয়। আরও যদি কিছু রেখে থাকে, তবে তা বক্ষের সঘন স্পন্দন ও সুদীর্ঘ নিঃশ্বাস।

শ্রীসুরেশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়।

নববর্ষের গান

-ঃ*ঃ-

রামপ্রসাদী।

আজ খাতা খুলি মায়ের নামে।
দিয়ে জমা ষোল আনা বিশ্বাস মার কৃপার বিধানে॥
জীবন কারবারের হিসাব নিকাশ করি বছর দিনে,
দেখি "আমি" বখরাদার জুটে লুটেছে সব মূলধনে।
সে বখরাদার রাখ্‌বো না আর সার ভেবেছি এবার মনে,
শুধ্‌বো মহাজনের ঋণ চাকরি ক'রে মার দোকানে।
কড়ায় গণ্ডায় হিসাব দেবো এবার আমি দিনে দিনে,
দোহাই মা, মোহের ছলে আর যেন লোকসান করিনে!

শ্রীব্রহ্মানন্দ দাস।

দত্তা

শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের 'দত্তা' উপন্যাসখানি পড়িতে পড়িতে যে নেশা ধরে বইখানা শেষ করিবার পরেও তাহা ছুটিতে চায় না—আরো অনেক কাল পর্য্যন্ত গাঢ় গোলাপী মাদকতায় সারাটা অনুভব জুড়িয়া ঝিম ঝিম করিতে থাকে। বইখানার এই মদের মধ্যে কি কি উপাদান কিরূপ মাত্রায় আছে তাই বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার জন্যই এই আলোচনা।

দত্তা—শরৎচন্দ্রের পাকা হাতের খাঁটি সম্প্রদান। সবস্ত্রা সে সালঙ্কারা সুন্দরী। আরো আরো অনেক—সে কথা পরে বলিব। তার আগে লিখিয়া রাখি যে দত্তা—সে শৈশবেই কিন্তু আমরা তাহাকে প্রথমেই পাইতেছি তরুণী, সারা অঙ্গে তার পূর্ণ যৌবন তখন রঙ্গে তরঙ্গ তুলিয়া দোল খাইয়া উঠিয়াছে সুতরাং মামুলী উপন্যাস জমিয়া উঠিবার প্রথম দানাটা গোড়াতেই বাঁধিয়াছে দেখিতে পাই। কিন্তু তার পাশেই নিপুণ কারিকরের হাতের সৃষ্টি বৈশিষ্ট স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে—শিক্ষা ও সহবতে পাওয়া একটা শ্রী ও হ্রী, শক্ত বাঁধ গড়িয়া তুলিয়া রূপের কানায় কানায় ছাপাইয়া উঠা প্রবৃত্তির জোর জোয়ারটাকে উদ্দাম বেগে কুল ভাঙিয়া ছুটিতে দেয় নাই—কিন্তু ভিতরে ভিতরে সে ফোয়ারার মত ফাঁপিয়া ফোঁপাইয়া বাড়িয়া, বড় হইয়া আবেগের বহিঃপ্রকাশটা দিয়াছে নির্ঝর-মুখে স্নিগ্ধতার ধারায়, তাই দত্তা মিঠা "বহুৎ" কিন্তু মোটা একেবারেই নয়। গৃহদাহের অচলাকে লইয়া রুচির প্রশ্নে গোলে পড়িলেও দত্তার বিজয়াকে লইয়া সে বিষয়ে পাঠক সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। অবশ্য এটুকু বাদ দিলে অচলার সৃষ্টিতেও বৈচিত্রের সন্ধান পাওয়া যায় এবং একদিক দিয়া সাহিত্যের ঘরে অচলারও দরকার আছে, সে কথা যাক কারণ এখানে উহা অবান্তর।

তারপর—শরৎচন্দ্র শিল্পী। রূপে আকারে চিত্র দাগিয়া তুলিয়াই শরৎচন্দ্র নিশ্চিন্ত নন্—তাঁর প্রতিভা সেই অস্থি ও মাংস পিণ্ডের শিরায় শিরায় তাজা, তক্‌তকে রক্ত প্রবাহ সঞ্চালিত করিয়া দেওয়ায়—ছবিখানিকে প্রাণবন্ত, জীবন্ত করিয়া তোলায়। এই প্রাণের প্রকাশকে

স্পষ্ট করিয়া ফুটাইবার জন্য—ইহাকেই একান্ত বলিয়া অনুভূতির বস্তু করিয়া গড়িয়া তুলিতে শিল্পীর তুলিকা একটু বেশী দূর বিস্তারে রেখাটাকে টানিয়া দেয়, বর্ণটা চূড়ান্ত করিয়া ফলায়—পাঠকের কাছে—অত গরিমা অনেক সময়েই অসহনীয় মনে হয়—সীমাবদ্ধ অনুভূতির মধ্যে সেটা লাগে অশোভন কিন্তু তার অন্তরালে যে একটা বিরাট প্রাণ স্বাস্থ্যে, শক্তিতে স্পন্দিত হইতেছে তাহাকেই নিয়া যে শিল্পী অতিমাত্রায় ব্যস্ত; ওস্তাদ তার সকল প্রতিভা, সব-শেষ তার কলা নৈপুণ্য নিঃশেষ করিয়া দিয়াছে ঐ প্রাণটাকে তরতরে টন্‌ টনে রাখিতে তা তো পড়িয়া যাইবার একঘেয়ে ঝোঁকে আমরা ভাবিয়া দেখিবার অবসর পাই না—ইচ্ছাও আসে না। তাই প্লট বা বস্তুর অভাবটাই চোখে পড়ে বড় করিয়া, ঘটনার পর ঘটনা পাকে পাকে জটিল হইয়া নানা রঙিন জাল বুনানিটা চলিয়াছে কিনা তর্কটা তুলি সেই বাহিরের ভুয়া ব্যাপারের উপর—আর একেবারেই ভুলিয়া যাই—আসল সত্যটাকে। অন্তরের গভীরতম প্রদেশের সত্ত্বা বৃত্তিকে ঈষৎ একটু, অমনি রিশ টুকুতে মোটে ছুঁইয়া যে আঘাত আনন্দে, জ্ঞানে ঘন হইয়া নিবিড় হইয়া জাগিয়া উঠে—আর্টের সেই সূক্ষ্ম বিচিত্র লীলা দ্যোতনাকে বিচারে বা গোচরে না লইয়া ফানুসের মত হাওয়ায় ভর দেওয়া আবেগে,—শুধু বৈচিত্রের লক্ষ্যহীন পথে উধাও উড়িয়া যাইতে চাই। শরৎচন্দ্রের উপন্যাসে এই জিনিষটা নাই তিনি প্রজাপতির পাখার মত তাঁর চিত্রতে সাতমিশালি বর্ণের জৌলুস জাগাইয়া দেন নাই এক এক খানার এক একটা একটানা রঙই চমকাইয়া তুলিয়াছেন। তবে রঙ একটু জেয়াদা জেল্লা দিয়া উঠিয়াছে প্রাণটা একটু বেশী চড়িয়াছে। কিন্তু তাই বলিয়া কোনো ছবিখানিই তাঁর জবরজঙ বা জড়দগব হয় নাই—প্রত্যেকটী মানুষ একটা সোজা, দৃঢ় মেরুদণ্ডের উপর সতেজ সবোধ প্রাণ লইয়া তোড়ে ও জোরে খাড়া থাকিয়া সটান একটা ব্যক্তিত্বকে—এ হিসাবে তার স্বাভাবিক অস্তিত্বকে সমানে টানিয়া চলিয়াছে। এই বিশেষ সৃষ্টিটাই হইল শরৎচন্দ্রের প্রতিভার দান—এইখানেই আমরা পাই ঔপন্যাসিক হিসাবে তাঁর স্বাতন্ত্র্য এবং সেই স্বাতন্ত্র্যের উপরেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব। দত্তায়ও এ শ্রেষ্ঠত্বের হানি ত হয়-ই নাই বরং আরো বিশিষ্ট দীপ লইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

শরৎচন্দ্র বলিতে জানেন। এবং যখন বলেন তখন একেবারেই চরম করিয়া বলার সব শেষ এক চোটে শেষ করিয়া ছাড়েন—তাই দত্তা। বাগদত্তা বা অমনি একটা কিছু

নয় একেবারে দত্তা—মানে দেওয়ার কথা শুধু হইয়াছে নয়—পুরাপুরি দেওয়া হইয়া গিয়াছে। এই দেওয়া-নেওয়ার ছোট সূত্রটার উপরেই কিন্তু অমন মহিয়সী বিজয়ার প্রাণ-প্রতিষ্ঠা হইল আবার সে প্রাণও নানা বিরোধ দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়া বিভিন্ন রসে সিক্ত-সরস হইয়া আসল পুষ্টিটা তার সন্ধান করিয়া বাড়িয়া উঠিল—ঐ দেওয়াটার উপর। ঘটনাটা একটা অতীত জীবনের; ক্ষুদ্র একটা খণ্ডিত ভাগের নিতান্ত করিয়াই তাচ্ছিল্যে ভুলিয়া যাইবার মত একটা ব্যাপার—কিন্তু শরৎচন্দ্র তাঁর শিল্পীর হাতের মুন্সীয়ানায় উহারই উপর উন্নত করিয়া গড়িয়া তুলিলেন আর একটা জীবন। শরৎচন্দ্রের প্রতিভার এও একটা দিক। খণ্ডকে টুক্‌রা টুক্‌রা করিয়া,—শতধা সেইগুলিরই হয়ত কত দূরে ছিটকাইয়া পড়া একটা অণু, ক্ষুদ্রতম একটা অংশ—জীবন-পুঁথির ছেঁড়া পৃষ্ঠাখানার এক প্রান্তের একটা ছত্র কুড়াইয়া আনিয়া, বাছিয়া লইয়া তাহারই গায়—আস্তে আস্তে অস্থি মজ্জা বসা-বস্তু স্তরে স্তরে সাজাইতে লাগিলেন—সেইখানেই একটা খণ্ডিত শ্রী, মণ্ডিত-গৌরব হইয়া ফুটিয়া উঠিল—পরিপূর্ণতারই আকার লইয়া—অন্ততঃ খণ্ডের মধ্যে অখণ্ডের সহজ সম একতন্ত্রতাটা পরিস্ফুট রকম ফলাইয়া তুলিয়া। ছোট খাটো বস্তু হইয়া শরৎচন্দ্র প্রথম কারবার পাতেন কিন্তু শেষ কালে তাকে কল কুঠীর উঁচু লম্বা গণ্ডা পাঁচ সাত চিমনীর চূড়ায় আকাশ ছোঁয়াইয়া তুলিয়া ধরিয়া। সেখানে যেন পরিণতি—সমাপ্তি যেটা সেটা বুঝি গোনের বিরাট ব্যবসায়-লব্ধ-ধন। পুঁজির উপর কি হারে সে বেশী তার অঙ্কে বা দণ্ডে মাপ চলে না। সেইখানেই তাঁর দান এবং আমাদের পাওয়া প্রজ্ঞা-পরিমিত।

কাঠাম যেটা কঙ্কাল সেটা বরং ছোট গল্প গড়িয়া তুলিবার যৎকিঞ্চিৎ উপলক্ষ্য—বড় উপন্যাস লিখিবার মোটা ভারি প্রসারিত বস্তু নয়; কিন্তু তবু উপন্যাস তৈ'র হইয়াছে সকল পাঠকেরই মনোমত হইয়া—ছোট গল্পের আঁটা-সাটা বাঁধ-ঘাট ধরিয়া আবার বড় গল্পের ফেনায়, উচ্ছ্বাসে ফেনিল রঙিন জমিন বুনিয়া। এইজন্য আপাততঃ দেখিতে মনে হয় মালা-গাছির সূত্রটা এক কিন্তু ফুলগুলি সব একটীর পর একটী কাপে কাপে খাপ খাইয়া বসে নাই পরস্পরের মধ্যে যেন একটা ব্যবধান ছাড়িয়া দেওয়া আছে। কিন্তু সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে এক একটার আপন অস্তিত্ব অবশ্য খণ্ডের মধ্যে শোভন ও সম্পূর্ণভাবেই ধরা দেয়। এটা শরৎচন্দ্রের—

মোটা হিসাবে বিচার করিলে দোষই বলিতে হয় কিন্তু এই দুর্বলতার ফাঁকে তাঁর একটা বিরাট পরিচয় আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

সৃষ্টি করিবার, জন্ম দিবার একটা অমানুষিক শক্তি, একনিষ্ঠ প্রেরণা শরৎচন্দ্রের প্রাণে ঘূর্ণী সৃষ্টি করিয়া চলিয়াছে। সে শক্তি নিশ্চেষ্ট থাকিতে পারে না অবসর পাইলেই "কর্ণী" ও মস্‌লা লইয়া গম্বুজ গড়িতে লাগিয়া যায়। সে গম্বুজ আসল ইমারত হইতে বিচ্ছিন্ন ত নয়ই—তাহাকে আরও প্রসাদ দিয়া মহীয়সী একটা প্রতিষ্ঠার মধ্যে উঁচু করিয়া ধরে। এই সৃষ্টির নেশা ও একাগ্র বৃত্তি যেই মাত্র প্রবল হইয়া উঠে অমনি বাহিরের কথা—যা ছোট নীচ কার্ণিসের ধারি ধরিয়া কারিগরি অর্থাৎ বলিয়া যাওয়ার—গল্প করিবার সহজ সরল কর্ত্তব্যকে একেবারে ভুলিয়া ফেলিয়া সে আরম্ভ করে "গড়িতের" কাজ "নকাশী"র ঝোঁক কাটাইয়া তাঁর কলম তখন সাবধান স্বতন্ত্র মৌলিকতায় আসল পাথরের উপর গোটা রূপের ভঙ্গী কাটিতে আরম্ভ করে। বড় উপন্যাসেই এটা খুব স্পষ্ট। ছোট গল্পে বলিবার বাহাদুরী কিন্তু আমরা পাই প্রচুর। চরিত্রহীনে তাই যেন চরিত্রগুলি একটু অসংলগ্ন অসম্বদ্ধ, কিন্তু বিন্দুর ছেলে, রামের সুমতি, গুণীদার গল্পে একটানা গল্পই মিঠা করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। কিন্তু না—আমরা যে দত্তার কথা বলিব চরিত্রহীন ইত্যাদি যে আমাদের কথার বাহিরের সামগ্রী। দত্তা একটা খণ্ডিত মানে মূল হইতে কাটিয়া লওয়া একটা সমাজের অংশ আর তারই মানুষ মানুষীর তার রীতি প্রকৃতির একটা গোটা চিত্র—মোটামুটি সবটা ধারণা। শরৎচন্দ্র লিখিবার বস্তু সংগ্রহ করিয়া লইবার অফুরন্ত ভাণ্ডার পাইয়াছেন সমাজের সীমানার মধ্যে আমাদেরই ঘরকন্নার ফাঁকে। উপন্যাস কল্পনার কলা-লীলা। সে কল্পনা অবশ্য যন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রহিত হইবে না। ভারতীয় প্রতিভার পরিপূর্ণ অধিকারী শরৎচন্দ্র তাই জাতিরই জীবন ও কর্ম্ম লইয়া স্বাভাবিক, সচরাচর মনোবৃত্তির "মসামে" মোলায়েম করিয়া জাতীয় উপন্যাস সৃষ্টি করিয়াছেন। দত্তাও তাঁর সেই রকমেরই একখানা উপন্যাস। এখানে প্রাচীন সমাজের উপরকার দৃষ্টিটা তাঁর সরাইয়া আনিয়া নূতন সমাজের উপর একান্ত করিয়া দিয়াছেন। হইতে পারে ইহা টুকরা একটা "স্পেসিস্‌" কিন্তু সেটাও তাঁরই জাতীয় বিত্ত—যেটা তাঁর বা তাঁদের নিতান্ত করিয়া নিজস্ব—মোটা গোটা "জেনাস" তারই অংশ। সমাজের ছবি দাগিয়া কাটিয়া তুলিতে একটাকে রাখিয়া আর একটাকে ধরিয়া চলা—খাঁটি শিল্পীর ব্যবসায়ও নয়—

কর্ত্তব্যও নয়। তিনি হইবেন সার্ব্বজনীন, একটা নির্দ্দিষ্ট-স্বাতন্ত্র্যের মধ্যে ব্যক্তিগত ভাবে একেরই—একমাত্র হইয়া থাকিতে তিনি পারেন না। অ্যাম্লকুইথের মতে যেমন সমালোচক হইবেন—"ক্যাথলিক"—তেমনি লেখককেও সঙ্গে সঙ্গে ক্যাথলিক হইতেই ত হইবে নতুবা তাঁর লেখা—তাঁর তুলিকার চিত্র সুন্দর স্বচ্ছ এবং Impersonal হইবার আশা করা তো বিড়ম্বনা। শরৎচন্দ্র সেই রকমের লেখক—আপনার জীবন-যাত্রার প্রতিটা তরঙ্গ-ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া-পড়িয়া দোল খাইয়া ধাক্কা খাইয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা আর তার অস্তিত্ব অর্থাৎ তার টিঁকিয়া ও বাঁচিয়া থাকিবার পথে যেমন যেমন বিপত্তি—বিরোধ—এক দিকে—আর এক দিকে তার আত্মরক্ষার জন্য সংঘাতের বিরুদ্ধে দ্বন্দ্ব—দ্বন্দ্বের প্রাতিকূল্যে—আপনার অফুরন্ত ধৈর্য্য ও ধীর খেলা খেলাইতে হইয়াছে—ঐ বিরোধের সঙ্গে অন্ততঃ সন্ধিবদ্ধ হইতে তাঁহাকে যে পরিমাণ দৃঢ়, যতটা ত্যাগী হইতে হইয়াছে—সেই সকলেরই বহু প্রকাশ আমরা তাঁর শিল্পের মধ্যে দেখিতে পাই।

এই "ক্যাথলিসিটির" ধর্ম্মে ও টানেই শরৎচন্দ্র ব্রাহ্ম সমাজকে বাদ দিয়া তাহাকে ঠেলিয়া দূরে রাখিয়া চলিতে পারেন নাই। দত্তা এই ব্রাহ্ম সমাজেরই চিত্র। নায়িকা সহরের সহবতে বাড়িয়া ওঠা—বড় ঘরের সুন্দরী মেয়ে শিক্ষিতা। মেয়েটীর ছবিখানি শরৎচন্দ্রের নিপুণ হাতের স্পর্শ পাইয়া নিখুঁত হইয়া ফুটিয়াছে। যদিবা কোনো কারণ কিম্বা একটু কিছু ত্রুটি তাতে ধরা পড়ে সেটাও অস্বাভাবিক নয় শরৎচন্দ্রের ক্রূর বুদ্ধি বা কুটিল হিংসার ফল তাহা নয়। স্বভাবের, নিয়মেরই সে ব্যভিচার। প্রত্যেকটা লোকের সঙ্গে প্রত্যেকটা লোকের যে পার্থক্য একজনের নিজের সঙ্গেই নিজের যে অন্তর্দ্বন্দ্ব নিত্যের সঙ্গে পরিবর্ত্তনের যে বিরোধ এ তাই—শরৎচন্দ্রে গোঁড়ামি নাই। শরৎচন্দ্র ব্রাহ্ম নয় বলিয়াই রাসবিহারী আঁকিয়াছেন তাই কি? শরৎবাবু হিন্দু বলিয়া কি "গোবিন্দ" (পল্লীসমাজ) প্রভৃতি আঁকেন নাই, শরৎচন্দ্র বিলাসবিহারী আঁকিয়াছেন কিন্তু বেণী কি তার চেয়ে ভাল? রমেশ ভাল আর নরেন কি আমাদের শ্রদ্ধার উপর আঠার আনা দাবী দিয়া দাঁড়ায় না, তবে কথা উঠিতে পারে নরেন ব্রাহ্ম নয় কিন্তু নরেন হিন্দুও নয়। প্রমাণ দত্তা—৭৩পৃঃ "তাতে কি আপনারও জাত যাবে না কি," মানে বিজয়ার বাড়ী আহার করিয়া গেলে। প্রত্যুত্তরে নরেন কহিল "সে ভয় আমার আর দুনিয়ায় নাই"—অর্থাৎ হিন্দু ওজনে জাত যাওয়া যাকে

বলে তা নরেনের অনেক আগেই গিয়াছে—কারণ সে বিলাত ফেরৎ। তার পর সামাজিক রীতি ব্যবহার প্রভৃতির কথায়—অর্থাৎ অসবর্ণ বিবাহের গুরু প্রশ্নটা নরেন ইচ্ছা করিয়াই এড়াইয়া যাইতে চাহিলেও শেষকালে তাকে বলিতে হইল—"আপনার কাছেও কি কোনো ব্রাহ্ম কুমারী বিবাহ যোগ্য নয় মনে করেন!.........এই যদি সত্যিকার মত" এই কথার উত্তরে "আমাকে পরীক্ষা করলে টের পেতেন এ আমার সত্যিকার কেন,—মিথ্যেকারও মত নয়।"—তার পরেও আনুষ্ঠানিক ব্রাহ্ম কুমারীকেই সে বিবাহ করিল সে হউক হিন্দুমতে—কিন্তু তাতে কি আর বিজয়ার "ব্রাহ্মিকাত্ব" ঘুচিয়া গেল, এখন যদি ধর্ম্ম মতের অতবড় প্রশ্নটা উঠিয়া পড়ে তবে তার মীমাংসা করা অতিশয় কঠিন আর এ সে স্থান ও নয়।

তবে খাঁটি ঈশ্বর বিশ্বাসকে শরৎচন্দ্র সকলের উপরে স্থান দেন এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে সঙ্কীর্ণতা, সাম্প্রদায়িকতার তিনি মোটেই পক্ষপাতী নন। বনমালী শরৎচন্দ্রের ভক্তির মূর্ত্তি—তিনি পিতা প্রকৃত গুরু তাই "পিতার কাছে বিজয় নিষ্ফল শিক্ষা পায় নাই" কিন্তু পিতার কাছে বিলাস কোনোই শিক্ষা পায় নাই সে একটা পুরাদস্তুর সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে একটা উত্তেজনা-পূর্ণ মন লইয়া এক রোখা হইয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল কারণ তার পিতা ব্রাহ্ম নয় ব্রাহ্মের ছদ্মবেশী; ছদ্মবেশকে শরৎচন্দ্র ঘৃণা করেন। যথার্থ ঈশ্বর-পরায়ণ ব্যক্তির উপর শরৎচন্দ্রের শ্রদ্ধা আছে ছবি আঁকিবার। এ সত্য প্রমাণ করিতেও তিনি ভুল করেন নাই। তাঁহার বৃদ্ধ প্রচারক দয়ালচন্দ্র যদিও ধাড়া তথাপি ধাড়ি নন তিনি সাদাসিদে কারণ ধর্ম্মপরায়ণ তোমার আমার মতই সাধারণ মানুষ। সকল ধর্মের খাঁটি কথাটা তিনি স্বীকার করেন—নিজেকে তুচ্ছ সামান্য জীব বলিয়া মুখে নয় কাজে প্রমাণ করাতে তাঁর প্রকাণ্ড একটা মহত্ব ধরা পড়িয়াছে। বিলাতের খেতাবী বড় ডাক্তার পায় হাঁটিয়া তাঁহাকে দেখিতে আসিয়াছেন বৃদ্ধের ভাব-প্রবণ হৃদয় সে গৌরবের অনুভবজনিত আনন্দের ভার চট্‌ করিয়া সহিয়া লইতে পারিল না—এতই বড় বৃদ্ধের Sentiment আর এতখানি Sentimental বলিয়াই তিনি যথার্থ সহৃদয়। দয়াল কিন্তু তাই বলিয়া সত্য করিয়াই ক্ষুদ্র নয় মহৎ একটা মনুষ্যত্ব তাঁর অন্তরে অন্তরে বাড়িয়া উঠিয়াছিল। সেখানে ছিল একটা গোটা বিশ্বাস—আর সেই বিশ্বাসের উপর ভর দিয়াছিল বলিয়া জন্ম

নিয়াছিল একটা অনন্ত প্রবল শক্তি। বিনাসের সম্মুখে কাঁপিয়া গেলেও বৃদ্ধ শেষের ছেদ চিহ্ন তাঁর কন্যাসম বিজয়া'র ব্যথিত জীবনের শেষ দাঁড়িটা মোটা করিয়া টানিয়া দিবার সময় একটুও টলেন নাই সেখানে তিনি ভবিষ্যতের কথা একবারও ভাবেন নাই, ভয়ও কিছু করেন নাই তবে বিজয়ার ইহাতে সম্মতির আভাস ছিল স্পষ্ট মত কিন্তু তিনি পাইয়াছিলেন না শুধু মন্তব্যের আভাসের উপরেই এতখানি ঝুঁকি স্বীকার করিয়া লইতে একটা শক্ত পুষ্ট ঘাড় একটা নির্ভীক দৃঢ় প্রাণ চাই। দয়ালের তাই ছিল। কিন্তু তিনি ব্রাহ্ম প্রচারক। দয়ালকে আঁকিতে শরৎচন্দ্র তাঁর প্রতিভা অকৃপণ ভাবে বিলাইয়া দিয়াছেন—বিষয়ের ভিতরের বস্তুর সারত্ব যাহা সত্য সুন্দর এবং শাশ্বত গ্রাহ্য ও স্বীকার্য্য তাহাকে বড় করিয়া ধরিয়া দেওয়াই ছিল এক্ষেত্রে তাঁহার উদ্দেশ্য।

ফলতঃ শরৎচন্দ্র সমাজকে বিশেষ করিয়া মানেন এবং তাকে টিঁকাইয়া রাখিবার জন্য সর্ব্বদাই সযত্ন। এদিক দিয়া শরৎচন্দ্র Conservative রক্ষণশীল। কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের মন্দ একঘেয়ে অনাবশ্যক মতগুলি তিনি বিশ্বাস করেন না আর এই কথাটা শুধু তাঁর নিজের সমাজের পক্ষে নয়—প্রয়োগ করেন ব্যবহার করেন তাহা সকল সমাজের সম্বন্ধেই। এদিক দিয়া কিন্তু তিনি—বিশ্ব প্রেমিক—Cosmopolitan সমাজের অঙ্গে যেখানে ক্ষত ফোঁড়াটা যেখানে ফুলিয়া ব্যথায় টন টন করিয়া উঠিয়াছে সেইখানে তিনি ঔষধ ও অমৃতের মলম ও প্রলেপ লেপিয়া দিবার জন্য উপস্থিত হন। প্রয়োজন হইলে নাক্ষেহাল—বেপরোয়া ছুরী চালাইয়া সে অঙ্গটাকেই ছিন্ন করিয়া ফেলিতে একটুও ইতস্ততঃ করেন না কারণ দুষ্ট ব্রণের মত ঐ ঐ প্রত্যঙ্গের উপরকার ঐ অস্বাস্থ্য একদিন সমস্ত সমাজটাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে। আমূল তন্ত্রটাই একদিন ঐ তুচ্ছ খুঁটিনাটী হইতে ক্ষয়ের বীজ গ্রহণ করিয়া ক্রমশঃ ঢসিয়া পড়িবে। যে সকল কারণ বা উপলক্ষ্যের উপর এই সকল দৌর্ব্বল্যের জন্ম হয়, শরৎচন্দ্র চান সেগুলিকে ভ্রূণেই হত্যা করিয়া ফেলিতে। তাই ঐ পীড়া সংক্রমণ বীজাণু (bacilie) দেখিয়াছেন না তিনি হাতের যন্ত্রণা তোলা উদ্যত কশা সবেগে কশিয়া দিয়াছেন ঐ মানুষটার গায় সমাজের সঙ্গে পাওনা দেনা সম্পর্কে অসতর্ক যে রোগ বীজ বহিয়া সেখানে আপনার খেয়ালে আনাগোনা করে। তিনি মন্দটা চোখে আঙ্গুল দিয়া দেখাইয়া দিয়া তার সংস্কার ও সংশোধন করিতে বলিয়াছেন—ভালকে কখনো এড়াইয়া যান নাই ভালকে মানিয়া

লইতে তার কাছে ছোট হইয়া যাইতে তাঁর এতটুকু দ্বিধা, সঙ্কোচ বা কুণ্ঠা কোথায়ও দেখিতে পাই না।

এখন বলিবার আছে চরিত্রের কথা। এই বইএ বড় চরিত্র—দয়ালকে বাদ দিলে মোট চারটী। পিতা পুত্র রাস ও বিলাসবিহারী, নরেন্দ্র এবং বিজয়া। রাসবিহারী বিজয়ার বিষয়ের উপর শ্যেন দৃষ্টি রাখিয়া গভীর political চাল দিয়া চলিয়াছেন—বিলাসবিহারী দৃষ্টি দিতেছেন বিষয় ও বিজয়া দুইএরই উপর—আর নরেন্দ্র কিছুরই উপর দৃষ্টি দিতেছেন না বরং তাঁরই উপর বিজয়া, বিলাস ও রাস তিন জনেরই ভিন্ন ভিন্ন স্বার্থে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে দৃষ্টি আছে। এটা সত্যই মধুর। বিজয়া—নায়িকা তাকে কেন্দ্র করিয়া ঘটনার লাটিম বন্‌বন্‌ শব্দে ঘুরিতেছে—সূতায় পাকদিয়া লাটিম জড়াইয়া দিতেছেন রাস শরীরের সমস্ত শক্তি দিয়া প্রাণপণে সেটাকে ছুঁড়িয়া মারিতেছেন বিলাস আর নরেন্দ্র কোথা হইতে অনর্থক, অনাহূত আসিয়া ঘোরার পথে হাত তালি দিয়া, হৈচৈ গোলমালে সব ঘোলাইয়া দিতেছে।

চরিত্র চারটী পরস্পর সোজাসুজি উল্টা না হইলেও ছাঁচটা তাদের আলাদা। এক একটা মানুষ এক এক রকম। একই সমাজের তিনজন—আর সেই সমাজে তাহাদের ঠিক ঘরের মধ্যে না হইলেও অন্তঃপুর প্রাঙ্গণেরই অতিথি—নরেন্দ্রনাথ একজন মোট চার ধাতুর চারটী প্রাণী চার রকমে চলিয়া চালাইয়া সমাজের ভিতরের যেখানটা ভাঙনধরা তাহাকেই প্রকাশ করিয়া দিতেছে। একের সঙ্গে অপরের আছে ধর্ম্ম ও মর্ম্মগত বিরোধ। সেই বিরোধই হইয়াছে এই চার চরিত্র স্থিতির বনিয়াদ। চারটী চরিত্রই চরম। কোনোটীর মধ্যেই একটা সুগভীর সাম্যের সন্ধান পাওয়া যায় না। সন্ধান পাওয়া যায় একটা উত্তেজনার মধ্যে চিত্তবেগের খেলার, স্পন্দনের পর স্পন্দনে স্নায়ু সকলের একটা দ্রুত চল বেপথুর। যে সুরে চরিত্রগুলির মূল তারটা বাঁধা হইয়াছে—তার মধ্যে যেন একটা আরম্ভ ও সমাপ্তির ক্রমোচ্চ ধারাবাহিকতা নাই প্রথমে স্বর উঠিয়া মীড়ে মূর্চ্ছনায় তাহা নামিয়া বাড়িয়া সমাপ্তিতে যে শান্ত গম্ভীর সমিল সঙ্গত Browning যাহাকে বলিয়াছেন—Consummating Seventh সেই চূড়ান্ত লয়নিলীন সপ্তমের সঙ্গে মিশিয়া মরিয়া হারাইয়া যায় নাই। গোড়াতেই তাহা বাঁধা হইয়াছে-একেবারে চড়া নিষাদের উঁচু "নি"তে—প্রমাণ দত্তা চরিত্রে ৬পৃঃ তাদের ঋণ শোধের প্রশ্নে তার বাবার কথার উত্তরে নরেন্দ্রের কথা বিজয়া বলিতেছে, "যে না পারে, সে কুসন্তান

বাবা, তাকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়।" আর এই সুর উপসংহার পর্য্যন্ত একটানা বাজিয়াছে ঐ কড়া তারেই একান্ত এই চড়া গ্রামে আর তিনটী চরিত্রেরও গোটা পরিচয়ের সুর এই ঘাটেই চড়ানো।

এখন প্রশ্ন হইতেছে ইহাদের মধ্যে—তবে মনোরাজ্যের একটা ক্রম-বিবর্ত্তন—Psycological evolution কোথায়? মানস-বৃত্তিগুলির ক্রমশঃ পুষ্ট হইয়া মোলায়েম, ছন্দোবদ্ধ সঙ্গত হইয়া আসিল কই? Mental developement যাকে বড় করিয়া দেখানই কথা-শিল্পীর শ্রেষ্ঠ-সাধনা-তা তো শরৎচন্দ্র দেখাইলেন না। এখানে শরৎচন্দ্র পূর্ণ পুষ্ট চরিত্র গোড়াতেই পুরোপূরি সবল, সংগঠিত প্রাণ লইয়াছেন। তাহাকে আর নামাইলে তাঁর সৃষ্টি হইয়া যাইবে ব্যর্থ এবং চড়াইলে এমন চারু—রচনা ভগ্ন চূর্ণ ছিন্ন হইয়া গুঁড়াইয়া চুরমার হইয়া যাইবে। তাই এক্ষেত্রে তাঁর বিবর্ত্তন চলিয়াছে এই চরিত্রের একটা মোটে স্নায়ু লইয়া, বিকাশে বর্দ্ধমান হইয়া উঠিয়াছে—বাঁধা চরিত্রের এক একটা বিশেষ বৃত্তি। বিজয়ার চরিত্রে এই evolution বা developement চলিয়াছে প্রেমের রাসবিহারীর চরিত্রে লোভ ও লাভের বিলাসবিহারীর একটা উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল সাম্প্রদায়িক আড়ম্বর প্রকাশের মধ্য দিয়া আপনার মর্য্যাদা বাড়ানো ও সঙ্গে সঙ্গে আর একটা কৌলীন্য দান পাওয়ার যথেষ্ট অবসর করিয়া লওয়ায়। নরেন্দ্রর চরিত্রে খেলিয়া বাড়িয়া উঠিয়াছে একটা সহজ শুভ সারল্য আর প্রাণের-একটা স্নিগ্ধ, কান্ত, গতি। নরেন্দ্রের প্রতি বিজয়ার প্রেম ক্রমে ক্রমে উপরে উঠিয়াছে ধাপের পর ধাপ অতিক্রম করিয়া। প্রত্যেকটা পদক্ষেপেই মাঝ পথে সে ব্যাহত হইয়াছে বিলাসের রূঢ় পরুষ দৈত্য-দাপটে আর চতুর অভিনেতা রাসবিহারীর দমবাজীতে বিজয়ার অন্তর তলে ফল্গুর মত তলেতলে চলিবার পর প্রেম যখনই এই বিভিন্ন অবয়বের কিন্তু একমুখীন বাধার সঙ্ঘর্ষে আসিয়া থামিয়া পড়িয়াছে সেই বিরোধ ব্যাঘাতের সংঘাতের ফলে সেইখানেই অমনি জন্ম নিয়াছে ত্বরিত একটা তড়িৎগতি সেই বিদ্যুৎ-বেগে পথ করিয়া লইয়া আবার তাহা-ছুটিয়াছে-আপনার ইঙ্গিতের অনুসন্ধানে আপন মনের একলক্ষ্যে।

বিলাসকে বিজয়া একেবারেই বোধ হয় ভালবাসে নাই—তবে যা করিয়াছে সেটা অনুকম্পা। রাসবিহারীকে বিজয়া ভক্তি করিয়াছে যতখানি সন্দেহ করিয়াছে তার চেয়ে অনেক বেশী এবং সকলের উপরে স্থান দিয়াছে লেনা দেনা, বাধ্য বাধকতার সংশ্রবে সে যে

ঋণের জনা পিতাপুত্রের কাছে দায়ী সেই দেনার। এই সূত্রে বিজয়ার চরিত্রে আমরা পাই তীক্ষ্ণ একটা সংযম —তীব্র একটা সহিষ্ণুতা কিন্তু অন্তরালে তার কেমন যেন ব্যথাহত আর্তনাদ আকণ্ঠ উদ্গত হইয়া আসিয়াছে, দাঁতের উপর দাঁত চাপিয়া ধরিয়া নারী তাহাকে কণ্ঠের নিম্নেই অব্যক্ত রাখিয়াছে—আপনার বুকে আপনি আঘাত করিয়া আত্মহত্যার প্রস্তুতি প্রণয়ন করিতেছে কিন্তু বাহিরে সে অবাক-অটল। বিজয়াকে কোথায়ও আমরা সে ভাবে উচ্ছৃঙ্খল পাইনা বিলাসকে পাইয়াছি যে পরিমাণ উদ্দাম ভাবে আত্মহারা। বিজয়া আঘাতে আঘাতে গুমরিয়া উঠিয়াছে কিন্তু কঠিন কেমন যেন প্রাণপণ দমে তাহাকে সহিয়া লইয়াছে মর্ম্ম গ্রন্থির সে পীড়ার কত বেদনা বাহিরে উচ্ছ্বসিত হইয়া পড়িতে দেয় নাই। তার কারণ কঠিন মেয়ে সংহত জীবন-যাত্রার পক্ষে কঠোর আত্মরক্ষার দীক্ষা লইয়াছিল নির্ম্মম আত্মত্যাগের শিক্ষায়।

রাসবিহারী কুটিল চিন্তাশীল কোথায়ও ধীরতাকে অবহেলা করিয়া চলে নাই। একটী ভাড়া করা অভিনেতা—ঠিক ঠিক তার অংশটী ইঙ্গিতে ভঙ্গিমায় বাগোবা অভিনয় করিয়া গিয়াছে। তবে অভিনয় জিনিষটাই—মেকী আসলের নকল—স্বভাবের ন্যায্য জমাবন্দী মাপিয়াটানা ক্লিপের রেখাটাকে সে স্থানে স্থানে একটু ডিঙাইয়া ত যাইবেই।

বিজয়া রাসবিহারীর নির্দ্দেশকে বরাবর মানিয়া চলিয়াছে কখনো বিদ্রোহ করে নাই যদিও বিদ্রোহের রিরি উত্তেজনা ও লেলিহান জ্বালা তার অন্তরের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা লঙ্কাকাণ্ড ঘটাইবার জন্য সশস্ত্র হইয়া উঠিয়াছিল। তবে ইহার বিরুদ্ধে একটা প্রকাশ নিমেষের প্রমাদে ঘটিয়া গেল—বিলাসের ব্যবহারে। তার অভিমানে অপমানে আহত আবেগ উচ্ছ্বাসে ক্ষোভে দুর্নিবার দুর্দ্দম হইয়া ফাটিয়া পড়িল। এখানে মনোরাজ্যের সূক্ষ্ম খেলার সাফাই চতুর চাল—চট করিয়া গোলমাল হইয়া গিয়াছে—বিজয়ার অনিচ্ছায় তার দৃঢ় প্রতিরোধ সত্ত্বেও। উপন্যাসের সহজ সিধা ভঙ্গিমা যেন কিছু আড়ম্বরের ঘটায় ফুটিয়া উঠিয়া নাটকের গণ্ডীরেখা ছোঁ-ছোঁ হইয়া গিয়াছে—অনুভবের বস্তু—প্রকাশের মধ্যে স্পষ্ট রূপ লইয়া দ্রষ্টব্য হইয়া উঠিয়াছে। বিজয়ার ইহাকে তাহাদের মধ্যেই শুধু গোপন করিয়া রাখিবার বস্তু এই ভাবটা না দেখাইলে মনে করিতাম হয় ত এ নাটক। কিন্তু ঐটুকু আছে বলিয়াই উহাকে আমরা খেলো, সাধারণ, বটতলার বলিয়া উপেক্ষা করিতে পারি না। তার আরো কারণ মূল সুরের সহিত এখানকার এই দীর্ণ-বিদীর্ণ ভাব, টুটিয়া ফাটিয়া যাওয়ার (rapture) অতিশোভন সঙ্গতই আছে। তার

প্রাণের সুর যে সেই আদিতেই মানে সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গেই অতি উঁচু পর্দ্দায় নিষাদের চড়া মাত্রায় আঁটিয়া বাঁধা হইয়াছিল। এখানে আঘাতটা একটু শুরু হইয়া লাগিয়াছে অমনি সে 'নি'রই শেষ মাত্রায় গিয়া চড়িয়াছে—আর চড়িয়াছে যেমন—অমনি ছিঁড়িয়াছে। এজন্য বিলাসের প্রগল্‌ভ পাশব ব্যবহার যতটা দায়ী বিজয়ার নারীর অভিমান, কর্ত্রীত্বের দাবী ততটা নয়। আর বিলাসের মত লোকের পক্ষেও এ ব্যবহার অন্যায় অনুচিত হয় ত কিন্তু অস্বাভাবিক নয় কারণ বিলাস কাট খোট্টা চেঁরড়ী ভোজপুরী জুয়ান—"বেঁটে মোটা"। কিন্তু বিলাস লোকটা রাসবিহারীর মত নিন্দনীয় নয়—তার জীবনের ট্র্যাজিডিও পাঠকের প্রাণেও শেষে আঘাত দেয় আর রাসবিহারীর হায় হায় হতাশা পাঠকের মনা আনন্দ লইয়া আসে। ইহাই শরৎচন্দ্র আঁকিতে চাহিয়াছিলেন। বিলাসের স্নায়ুমণ্ডলীতে রক্তের স্রোত যে বেগে বহিতেছিল তাহা আর একটু দ্রুত হইলেই হইত উন্মাদ। তার জীবন হইতে উন্মাদনাটা ছিল একটা ধাপ মাত্র উপরে—শরৎচন্দ্র অতি নিপুণ ও সতর্ক বিচারে এই চরিত্র ও তাঁর কথিত গল্পের আঁটঘাটের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখিয়া বই শেষ করিয়াছেন। এইখানেই শিল্পীর সেরা বাহাদুরী।

এইবার আমরা নরেনের কথা বলিয়া উপসংহার করিব শরৎচন্দ্রের নরেন্দ্র একটা অপূর্ব্ব মানুষ। পাগল নয় কিন্তু একটুখানি পাগলাটে। সরল এমন যে বিজয়ার সাড়ীর দোদুল আভাসটা, তার ঈষৎ রুক্ষ এলোচুলের গোছা আর সর্ব্বাঙ্গ নিয়া তাকে আঁকিয়া তুলিবার প্রবল ইচ্ছাটা বিজয়ার সম্মুখে অনায়াসে প্রকাশ করিয়া বলিল। অন্য কথা যাই হ'ক সাধারণ ভদ্রতা যাকে বলি আমরা "এটিকেট" সেটারও ধার এ ডাক্তার সাহেব একটুও ধারেন না। রমেশের পরিচয় শরৎচন্দ্র শুধু আঁকিয়া দেখান নাই বলিয়াছেনও বিস্তারিত করিয়া পরিষ্কার ভাবে। তার আর বিস্তৃত আলোচনা অধিকন্তু।

মোটের উপর শরৎচন্দ্রের এ একখানা নেশা জমাইবার উপন্যাস—একেবারে মস্তিষ্কে গিয়া ধরে—প্রাণের বৃত্তিগুলিকেও শিল্পীর সৃষ্ট চরিত্রগুলির সঙ্গে সঙ্গে ঘুরপাক খাওয়াইতে হয়। পড়িতে পড়িতে মনে হয়—দূর হ'ক রাস ও বিলাস—বিজয়ার সিঁথিতে সিঁদুরের লাল কল্যাণ-চিহ্ন ফুটিয়া উঠুক—নরেন "মায় মানবটী"ই দাবী করুক—আর আগাগোড়াই যেখানে নরেনকে পাই—মনে হয়—তার সঙ্গে প্রেমে পড়ি। কি করিয়া সে অশ্রু-সজল বিজয়ার মুখ-

খানি চটু করিয়া গিয়া তুলিয়া ধরিল—তাজ্জব বটে—কিন্তু এ মেয়েও শরৎচন্দ্রের আর ছেলেও তাঁরি যাদুদণ্ডের স্পর্শে তাঁরি মোহন-মন্ত্রে সৃষ্ট। এই ইহাদের পরিচয়।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

নীরব নিশীথ রাতে

—:*:—

আজ　নীরব নিশীথ রাতে
শুধু　জল ভরে আঁখি-পাতে !
কেন,　কি কথা স্মরণে রাজে ?
বুকে　কা'র হতাদর বাজে ?
কোন্　ক্রন্দন হিয়া মাঝে
ওঠে　গুমরি' ব্যর্থতাতে,—
আর　জল আসে আঁখি-পাতে !
মম　ব্যর্থ জীবন-বেদনা এই নিশীথে লুকাতে নারি,
তাই　গোপনে একাকী শয়নে শুধু নয়নে উথলে বারি !
হায়　সে দিনো এমনি নিশা,
বুকে　জেগেছিল কত তৃষা !—
তারি　ব্যর্থ নিশাস মিশা
আজো　শিথিল শেফালিকাতে;
আর　পূরবীর বেদনাতে ! !

হাবিল্‌দার্ কাজী নজ্‌রুল্ ইস্‌লাম্।

সুর ও স্বরলিপি—শ্রীমতী মোহিনী সেনগুপ্তা

বেহাগ—মধ্য ত্রিতালী।

আস্থায়ী।

নর্সা II { না র্সা না র্সা | না -া পা -হ্মা I গহ্মা -পা -হ্মাগা -মা |
আজ না র ব নি শী ০ থ ০ রা০ ০ ০০ ০

| গা -া পা হ্মা | পা পা না না | পা -হ্মা পা -া I
তে ০ শু ধু জ ল ভ রে আঁ ০ খি- ০

I গমা -পা -হ্মাগা -মা | গা -ন্া -সা নর্সা }II
পা০ ০ ০০ ০ তে ০ ০ "আজ"

অন্তরা।

II { পা -পা না -া | পা -া না -া I র্সর্সা র্সা র্গা -া |
কে ম কি ০ ক ০ থা ০ স্ম র ণে ০

| না -র্সা র্সা -া | না না র্সনা র্সা | না -া পা -হ্মা I
রা ০ জে ০ বু কে কা০ র হ ০ তা ০

I পা -া র্সা -না | পা -হ্মা গা -া } | র্সর্সা না -গা -া |
দ ০ র ০, বা ০ জে ০ কোন্ ক্র ০ ০

| -র্মর্গা -র্মা র্গা -র্সা I না -া র্সা -না | পা -হ্মা গা -া |
ন্দ ০ ন ০ হি ০ য়া ০ মা ০ ঝে ০

| গা মা পা না | না -া -া পপা I না র্সা -নর্সা -না |
ও ঠে শু ম রি ০ ০ বা য্ থ তা

| না -র্সা না -া | র্সা র্সা না পা | গা -ক্ষা -পা মা I
তে ॰ আ র্ জ ল আ সে আঁ ॰ ॰ খি

২´ ৩
I গমা -পা -ক্ষা -গমা | গা -ন্া -সা নসা II
পা॰ ॰ তে "আজ"

সঞ্চারী।

II{ সা ন্া সা -সসা | না প্া ন্া -া I সা -ন্া গা -া |
ম ম ব্য র্থ জী ব ন ॰ বে ॰ দ ॰

৩ ১
| পা -ক্ষগা মা গা | পা না পা -া | না না না -া I
না ॰॰ এ ই নি শী থে ॰ লু কা তে ॰

২´ ৩
I ক্ষা -পনা -ক্ষা -পা | গা -মা -গা মগা | পা পা না -া |
না ॰॰ ॰ ॰ রি ॰ ॰ তাই গো প নে ॰

১ ২´ ৩
| না র্সা র্সা -া | না র্সা র্সা -া | -না পা -ক্ষা পা |
এ কা কী ॰ শ য় নে ॰ ॰ শু ॰ ধু

১ ২´
| না -া না পা | মা মা গা -মা I গা -ক্ষা -গা -মা |
ন ॰ য় নে উ থ লে ॰ বা ॰ ॰ ॰

৩
| গা -া -সা -া } |
রি ॰ ॰ ॰

আভোগ।

I{ পা -া পা -া | না -া না -া I গা পা না -র্সা |
হা য় সে ০ দি ০ নো ০ এ ম নি ০

| র্সা -া র্সা -া | না না র্সা র্সা | না -া ক্ষা -পা I
নি ০ শা ০ বু কে জে গে ছি ০ ল ০

I পা -া না -র্সা | না -পা -ক্ষা গা | পা -া না -র্সা |
ক ০ ত ০ তৃ ০ ০ ষা তা ০ রি ০

| র্গা -র্মা র্গা -র্মা I র্গা -া র্সা না | পা -ক্ষা গা -া |
ব্য ৱ্ থ ০ নি ০ শ্বা স মি ০ শা ০

| গা মা পা না | না র্সা না -র্সা I র্সা -া র্সা -না |
আ জ শি থি ল শে ফা ০ লি ০ কা ০

| না -র্সা না -র্সা | না পা ক্ষা পা | গা -া মা -া I
তে ০ আ র্ পূ র বী র বে ০ দ ০

I গমা -পা -ক্ষাগা -মা | গা -ন্া -সা নর্সা II II
না০ ০ ০ ০ তে ০ ০ "আ৯"

স্বাস্থ্যের কথা।

স্বাস্থ্যবিধি-পঞ্চাশৎ।

ব্যক্তিগত স্বাস্থ্যরক্ষার জন্য কোন রকম ভয়ানক কাণ্ড করিতে হয় না; কোনরূপ বিরাট উদ্যোগ আয়োজনও করিবার দরকার নাই। কেবল কতকগুলি অতি সরল ও সহজসাধ্য নিয়ম পালন করিয়া গেলেই শরীর চিরকাল সুস্থ থাকিতে পারে। এই সকল নিয়ম পালনে কিছু মাত্র ব্যয় নাই, কোন কষ্টও নাই। কিরূপ সামান্য চেষ্টায় আপনি চিরসুস্থ থাকিতে পারেন তা' দেখুন।

১। আপনার নিত্য অভ্যাসগুলি স্বাস্থ্য-সাধনোপযোগী ভাবে সংশোধন ও সংযত করিতে হইবে। সে কাজ এখনই আরম্ভ করিয়া দিন।

২। সকল বিষয়ে মিতাচারী হইতে হইবে।

৩। সর্ব্বদা সুস্থকায় লোকের সঙ্গ করিবেন। পীড়া যেমন সংক্রামক, স্বাস্থ্যও সেইরূপ সংক্রামক।

৪। প্রত্যহ ভোর বেলা শয্যাত্যাগ করিয়া শীতকালের ঈষদুষ্ণ জলে এবং অন্যান্য ঋতুতে শীতল জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিয়া ফেলিবেন। প্রতি সপ্তাহে দুই তিন দিন রাত্রে ঈষদুষ্ণ জলে গামছা ভিজাইয়া গা মুছিয়া ফেলিয়া শয়ন করিতে যাইবেন। গাত্রচর্ম্মের অদৃশ্য সূক্ষ্ম ছিদ্রগুলি পরিষ্কার রাখা দরকার, যাহাতে ঐ সকল সূক্ষ্ম ছিদ্রপথে বায়ু দেহের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে এবং চামড়ার নিম্নে যে সকল ময়লা ও আবর্জ্জনা আসিয়া জমে সেগুলি বাহির হইয়া যাইতে পারে। নচেৎ, চর্ম্মের ছিদ্রগুলি বুজিয়া গিয়া দেহের মধ্যে ক্লেদ জমিয়া নানা পীড়ার সৃষ্টি করিতে পারিবে।

৫। আপনার স্নায়ুমণ্ডলী যদি অত্যধিক তেজস্বী ও চঞ্চল হয়, যদি সহজেই উত্তেজিত হইয়া উঠে, তাহা হইলে তাহাদিগকে বশে রাখিতে অভ্যাস করুন; আত্মসংযম অভ্যাস করুন।

৬। ঠিক সোজা এবং খাড়া ভাবে বসিয়া থাকিবার অভ্যাস করিবেন। চেয়ারে বা ফরাসে বসিয়া থাকিবার সময় কদাচ সামনের দিকে ঝুঁকিয়া বা চেয়ারের পিছনে অথবা দেওয়ালে হেলান দিয়া বসিবেন না। তাকিয়া হেলান দিয়া বসা কেবল অলসতার লক্ষণ নয়—উহাতে আয়ু ক্ষয় হয়। ঠিক খাড়া ভাবে বসিলে মেরুদণ্ড সোজা থাকে; পেটেও চাপ পড়ে না।

৭। সর্ব্বদা, অর্থাৎ যখনই মনে পড়িবে,—দীর্ঘনিশ্বাস লইতে অভ্যাস করিবেন। এক একবারে ধীরে ধীরে যতখানি পারেন, শ্বাস-বায়ু টানিয়া লইয়া ফুসফুসকে পূর্ণ করিবেন। সাধারণতঃ লোকের অতি সামান্য মাত্র বায়ু শ্বাসরূপে লওয়া অভ্যাস। এ অভ্যাস যতদূর সম্ভব ত্যাগ করিতে হইবে। প্রত্যহ শয্যা হইতে উঠিয়া গাত্র মার্জ্জনার পর অন্ততঃ দশ মিনিট একটু চেষ্টা করিয়া, ব্যায়ামের হিসাবে দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিতে হইবে। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বেও একবার এই ব্যায়ামটি করা চাই। তারপর দিনের মধ্যে যখনই মনে পড়িবে, তখনই দীর্ঘশ্বাস গ্রহণ করিলে ভাল হয়। এই শ্বাস গ্রহণ ও প্রশ্বাস ত্যাগ যতটা ধীরে ধীরে করিতে পারা যায় ততই ভাল। এ সময়ে যদি ঘরের ভিতরে থাকেন, তাহা হইলে জানালাগুলি যেন খোলা থাকে। অন্য সময়ে সম্ভব হইলে ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে এই ব্যায়াম করা সঙ্গত। দিনের মধ্যে যতক্ষণ পারেন, ঘরের বাহিরে কাটাইবেন। রাত্রে সমস্ত রাতই যেন শয়ন গৃহের অন্ততঃ একটা জানালা, যতটা সুবিধা হয়, খোলা রাখিতে হইবে।

৮। প্রত্যহ একটু একটু করিয়া শারীরিক ব্যায়াম করা চাইই চাই। যদি কাহারও পেশা এমন হয় যে, সমস্ত দিন এক জায়গায় বসিয়া কাজ করিতে হয়, তাহা হইলে প্রত্যহ নিয়ম করিয়া অবসর সময়ে অন্ততঃ এক ঘণ্টা ঘরের বাহিরে মুক্ত বায়ুতে অবস্থান করিতে হইবে। এই সময়টা বেড়াইতে পারিলেই ভাল। ঘরের ভিতর বদ্ধ বায়ুতে সমস্ত দিন কাজ করিতে হইলে বিলক্ষণ ক্লান্তি বোধ হয়। অবসর কালে প্রবহমান খোলা হাওয়ায় এক আধ ঘণ্টা দ্রুত ভ্রমণ করিলে, সমস্ত ক্লান্তি ও শারীরিক গ্লানি দূর হইয়া বেশ প্রফুল্ল বোধ হয়। মানসিক শ্রমের পর শারীরিক পরিশ্রম বেশ বিশ্রামের কাজ করে। ঘরের ভিতর তাকিয়া হেলান দিয়া তামাক খাওয়া কিম্বা শয্যায় গা-হাত-পা এলাইয়া দেওয়া অপেক্ষা দ্রুত ভ্রমণ বহু গুণে উৎকৃষ্ট বিশ্রাম।

৯। আহারের পূর্ব্বে হাত-পা ধুইয়া লইতে কখনও ভুলিবেন না। আমাদের আচমন প্রথা খুব স্বাস্থ্যসঙ্গত বিধি। উহা কেবল ধর্ম্ম সংক্রান্ত কুসংস্কার নহে। হাত না ধুইয়া খাইতে বসিলে, হাতের ময়লার সঙ্গে নানা রোগের বীজাণু খাদ্য দ্রব্যে মিশ্রিত হইয়া উদরস্থ হইয়া পীড়া জন্মাইতে পারে। হাতে বিশেষতঃ নখে অনেক রকম বিষাক্ত পদার্থও লাগিয়া থাকিতে পারে। তদ্দ্বারা শরীরের মধ্যে বিষক্রিয়া উপস্থিত হওয়া বিচিত্র নহে।

১০। প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে খাওয়ার অভ্যাস থাকা খুব দরকার। দুইবার খাওয়ার নির্দ্ধারিত সময়ের মধ্যে কখনও কিছু খাওয়া উচিত নহে। আহারের নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে ক্ষুধার উদ্রেক হইলেও, তাহা সহ্য করিয়া থাকা ভাল। তাহাতে কোন অনিষ্ট নাই; পক্ষান্তরে, পরিপাক শক্তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

১১। প্রত্যহ দেড় সের হইতে দুই সের পরিমাণ জল পান কর্ত্তব্য।

১২। পেট ঠাসিয়া খাওয়া ভাল নয়। বরং ক্ষুধার সম্পূর্ণ নিবৃত্তি হইবার পূর্ব্বে আহারে বিরত হওয়া ভাল। তা' বলিয়া যতটুকু খাওয়া আবশ্যক, তদপেক্ষা কম খাওয়া উচিত নহে। আহার শেষ করিয়া উঠিবার সময়, "উঃ! বড় খাওয়া হয়েছে" এ রকম মনের ভাব হওয়ার অপেক্ষা, মনের ভাব "এখনও একটু ক্ষিদে আছে, আরও কিছু খেতে পার্ত্তুম" এ রকম হওয়া আরও ভাল।

১৩। খাদ্য দ্রব্যে অতিরিক্ত লবণ ব্যবহার করিবেন না। নুনখর তরকারী খাইতে মুখরোচক হইলেও শরীরের পক্ষে অহিতকর।

১৪। সর্ব্বপ্রকার মাদক দ্রব্য সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

১৫। চা, কফি প্রভৃতি পানীয় শরীরের কোন উপকার করে না, বরং যথেষ্ট অপকার করে। উহা মাদকতা আনয়ন না করিলেও নেশার প্রায় কাছাকাছি। এই শ্রেণীর পানীয় সেবনের অভ্যাসের অধীন না হওয়াই শ্রেয়ঃ।

১৬। খাদ্য যত সাদাসিধা অথচ পুষ্টিকর হইবে ততই ভাল। খুব ঝালমসলা দেওয়া অন্ন ব্যঞ্জন তৃপ্তিকর হইলেও তাহাতে শরীরের বিশেষ উপকার হয় না। আমাদের গরম দেশে মাংস স্বাভাবিক খাদ্য নয়। উহা না খাইলেই ভাল। যাঁহাদের মাংস না হইলে চলে না, তাঁহারা যথাসম্ভব অল্প পরিমাণে খাইবেন। উহা খাইলেও শরীরের বিশেষ কোন

উপকার হয় না, না খাইলেও কোন অনিষ্ট হয় না। সে জন্য, মাংস ভিন্ন যাঁহাদের মুখে অন্ন রুচে না, তাঁহারা উহা যত কম পারেন খাইবেন।

১৭। ধীরে ধীরে উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিয়া খাইবেন। খাদ্য জীর্ণ হওয়ার কার্য্য মুখ হইতে আরম্ভ হয়। প্রত্যেক গ্রাস অন্ন উত্তমরূপে চর্ব্বণ করিবার পর তবে তাহা গলাধঃকরণ করিবেন। চর্ব্বণের ফলে খাদ্য সহজে জীর্ণ হয় এবং চর্ব্বণে খাদ্যের সম্পূর্ণ স্বাদ পাওয়া যায়।

১৮। অতিরিক্ত লবণের ন্যায় অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্যও শরীরের পক্ষে অহিতকর। তরকারীতে বেশী নুন দিলে যেমন তাহা "নূনে পোড়া" তরকারী হইয়া যায়—তাহা যেমন মুখে করিতে পারা যায় না, অতিরিক্ত মিষ্ট দ্রব্যও সেইরূপ মুখরোচক হয় না। সন্দেশ রসগোল্লা এবং অন্যান্য মিষ্ট দ্রব্যে চিনির আধিক্য হইলে তাহা খাইতে ভাল লাগে না। অথচ পরিমিত মিষ্ট ব্যবহার করিলে খাদ্য কেমন সুস্বাদু হইয়া থাকে।

১৯। এক দিনে একই সময়ে অনেক রকম খাদ্য একসঙ্গে খাওয়া ভাল নয়। শরীর পোষণার্থই খাদ্য গ্রহণ করিতে হয়; পঞ্চাশ ব্যঞ্জন একসঙ্গে না খাইলে শরীর পোষণের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হয় না। ৪৫ রকম ব্যঞ্জন হইলেই বৈচিত্র্যের পক্ষে যথেষ্ট হয়, মুখরোচকও কম হয় না। তবে প্রত্যেক দিন একই রকম খাদ্য খাইতে হইলে অরুচি হইতে পারে; সেই জন্য মধ্যে মধ্যে খাদ্যের উপকরণ বদলানো উচিত।

২০। মাথা ঠাণ্ডা, পা গরম ও উদর পরিষ্কার রাখা চাই। প্রত্যহ সকালে ও বিকালে এই দুইবার কোষ্ঠ সাফ করিবার অভ্যাস থাকা ভাল।

"হয় না হয় দু'বার যায়;
খায় না খায় সকালে নায়—
তার কড়ি কি বৈদ্যে পায়?"

২১। প্রত্যহ প্রাতে উঠিয়া একবার, এবং প্রত্যেকবার আহারের পর একবার করিয়া দাঁত মাজিয়া ফেলা আবশ্যক। রন্ধন ও আহারাদির পর সকড়ি এবং এঁটো বাসন না মাজিয়া লইলে তাহাতে গৃহস্থের কোন কাজই হয় না। দাঁতেও সেইরূপ সকড়ি হয়। আহার ও

আচমনের পর উহাতে যে সব খাদ্য-কণা লাগিয়া থাকে তাহা মাজিয়া পরিষ্কার না করিলে উহা পচিয়া দাঁত নষ্ট হয়, শরীর বিষাক্ত হইতে পারে, খাদ্য হজম হয় না, এবং দেহ পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। দাঁতন করা, খড়কে লওয়া ভাল অভ্যাস। তবে খড়কে লওয়ার সময়ে প্রায় মাত্রাধিক্য ঘটে; তাহাতে দুইটী দন্তের মধ্যস্থ ফাঁকগুলি বড় হইয়া যায় ও বিশ্রী দেখায় এবং অন্য অসুবিধাও হয়। খড়কে লওয়ার সময় একটু সাবধান হওয়া উচিত—দাঁতের গোড়ায় খোঁচা দিয়া দিয়া রক্তপাত করা কর্ত্তব্য নয়।

২২। ঘরের দরজা জানালা দিবারাত্রি এমনভাবে খুলিয়া রাখিতে হইবে যেন দিনের বেলা ঘরে রোদ আসিতে পারে এবং রাত্রে বায়ু প্রবাহিত হয়।

২৩। হাওয়াকে কখনও ভয় করিবেন না। ঋতু ভেদে উপযুক্ত গাত্রবস্ত্র ব্যবহার করিলেই যথেষ্ট,—ঠাণ্ডা হাওয়া লাগিয়া অসুখ করিবার কোন ভয় নাই। সহরে দিনের হাওয়া অপেক্ষা রাত্রের হাওয়া অধিকতর বিশুদ্ধ।

২৪। সকালে শয্যাত্যাগ করিয়া গায়ে একবার কিছুক্ষণ হাওয়া লাগিতে দিলে বিলক্ষণ স্ফূর্ত্তির সঞ্চার হয়। রাত্রে শয়নের পূর্ব্বে একবার গা হাত পা ঘর্ষণ করিলে রক্ত চলাচল অব্যাহত থাকে।

২৫। গাত্রবস্ত্র ঋতু অনুযায়ী পরিমিত হাওয়া আবশ্যক। শীতকালে অতিরিক্ত গরম বস্ত্র ব্যবহার নিষ্ফল; বরং তাহাতে রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটে আর অনাবশ্যক ভার বহনের ক্লেশ সহ্য করিতে হয়। আর গ্রীষ্ম বা বর্ষা কালেও চব্বিশ ঘণ্টা আদুড় গায়ে থাকাও কর্ত্তব্য নয়। একটা হালকা কিছু—চাদর বা জামা গায়ে থাকা ভাল।

২৬। যাহাদিগকে কেবলমাত্র মানসিক পরিশ্রম করিতে হয় তাহাদের পক্ষে যেমন নিত্যনিয়মিতভাবে একটু শারীরিক পরিশ্রম অত্যাবশ্যক,—যাহাদিগকে কেবল কায়িক শ্রম করিতে হয়, তাহাদের পক্ষে তেমনি প্রত্যহ ১০।১৫ মিনিট বা আধ ঘণ্টা কিম্বা এক ঘণ্টা মানসিক পরিশ্রম হিতকর। গল্পের বই কি অন্য কোন লঘু সাহিত্য পাঠ করিলে মন প্রফুল্ল থাকে। লেখাপড়া না জানিলে অপরের কাছে রামায়ণ মহাভারত পাঠ শোনাও মন্দ নয়। এই শ্রম-বৈচিত্র্য শরীর ও মন উভয়ের পক্ষে ক্রমান্বয়ে শ্রম ও বিশ্রামের কাজ করে।

২৭। একাধিক যোড়া জুতা ব্যবহার করা আবশ্যক। একই যোড়া জুতা রোজই পরা অপেক্ষা, আজ এক যোড়া, কাল অপর যোড়া এমনই ভাবে বদলাইয়া পরিতে পারিলেই ভাল। ভিজা জুতা পরিয়া থাকা অত্যন্ত অনিষ্টকর। বরং খালি পায়ে থাকা অনেক ভাল।

২৮। স্নায়ু ঘটিত মাথাধরা ধীরে ধীরে খানিকক্ষণ চুল আঁচড়াইলে ভাল হইয়া যায়।

২৯। বাতব্যাধিগ্রস্ত রোগীরা কিছুক্ষণ রৌদ্র উপভোগ করিলে অনেকটা আরাম পায়; এমন কি, সূর্য্য কিরণ লাগাইলে বাত ভাল হইয়া যাইতেও পারে।

৩০। শরীরে বেদনা বা যন্ত্রণা বোধ হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার কারণ অনুসন্ধান করিয়া প্রতিকার করা উচিত; কারণ, ইহা রোগের পূর্ব্ব লক্ষণ। আলস্য বশতঃ অবহেলা করিলে রোগে ভুগিতে হইবে।

৩১। সর্ব্বদা নিজেকে সুস্থ মনে করিবার চেষ্টা করিবেন। পাছে অসুখ করে—এই ভয়ে কখনও ভীত থাকা কর্ত্তব্য নয়। ইচ্ছাশক্তির ক্ষমতার সীমা নাই। প্রবল ইচ্ছাশক্তির দ্বারা অনেক রোগের আক্রমণ নিবারণ করিয়া আত্মরক্ষা করা যায়। ইহা খুব শক্তিশালী রোগ-প্রতিষেধক। যে সর্ব্বদা নিজেকে অসুস্থ মনে করে, রোগও তাহাকে সর্ব্বদা পাইয়া বসে।

৩২। বিদ্যা উপার্জ্জন করিবার জন্য যদি স্বাস্থ্যকে বিসর্জ্জন দিতে হয়, তা' হইলে সে বিদ্যা নিষ্ফল। আগে স্বাস্থ্য তারপর বিদ্যা।

৩৩। শিক্ষকেরা এই কথাটি সর্ব্বদা মনে রাখিবেন যে, ছাত্রদের মানসিক উন্নতি সাধনই তাঁহাদের একমাত্র কাজ নহে—ছাত্রগণের শরীর সুস্থ রাখা এবং বলবীর্য্য বৃদ্ধির জন্যও তাঁহারা দায়ী।

৩৪। অনেকে চলিবার সময় সামনের দিকে ঝুঁকিয়া চলেন; তাহাতে তাঁহাদের পিঠ কুব্জাকার, এবং স্কন্ধদ্বয় গোল হইয়া আসে। ইহা অস্বাস্থ্যের লক্ষণ, অথবা ইহার পরিণাম অস্বাস্থ্য। এই বদভ্যাস পরিত্যাগ করিবার জন্য সামনের দিকে চক্ষুর সমতল অপেক্ষা উচ্চ

জিনিসের প্রতি নজর রাখিয়া চলিতে পারিলে কুব্জ ভাব দূর হয়। যদি কোন রাস্তার ধারে ঘড়িওয়ালা গির্জা কিম্বা উচ্চ মন্দির থাকে, তবে ঐ ঘড়ি কিম্বা মন্দিরের চূড়ার দিকে দৃষ্টি রাখিয়া চলিতে হইবে। গির্জা বা মন্দির না থাকিলে, ঐ রকম কোন উঁচু জিনিসের দিকে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তবে অবশ্য, গাড়ী ঘোড়া মোটর প্রভৃতি হইতেও নিজেকে সাবধান রাখিতে হইবে, সে কথা বলা বাহুল্য মাত্র।

৩৫। দিবসের শেষ আহার অর্থাৎ নৈশ আহারের পর কোন শ্রমসাধ্য কর্ম্ম—কি মানসিক, কি শারীরিক—করা উচিত নহে। আহারের পর এবং নিদ্রা যাইবার পূর্বে কোন লঘু সাহিত্য পাঠ বা একটু আধটু আমোদপ্রমোদ করিতে পারিলে ভাল হয়।

৩৬। একই সময়ে একসঙ্গে ফল ও শাকসব্জি আনাজ-তরকারি না খাইলেই ভাল।

৩৭। প্রত্যহ প্রাতরাশের খাদ্য তালিকায় ফল মূলের সংখ্যাধিক্য হিতকর।

৩৮। সপ্তাহের মধ্যে একদিন কেবল ফল খাইয়া কাটাইয়া দিতে পারিলে উত্তম হয়। এই অভ্যাসের সুফল অতি শীঘ্র প্রত্যক্ষ করা যায়।

৩৯। যেটুকু খাদ্য সহজে হজম করিতে পারিবেন বলিয়া বুঝিবেন, সেই পর্য্যন্ত খাইয়াই নিরস্ত হইবেন,—তাহার অধিক আর কিছুই খাইবেন না।

৪০। যে ব্যক্তি নিজের স্বাস্থ্যরক্ষায় যত্নপর তাহাকে কখনও অপরের গলগ্রহ হইতে হয় না।

৪১। খুব তাড়াতাড়ি খাওয়া, গুরু ভোজন, উত্তমরূপে খাদ্যদ্রব্য চর্ব্বণ না করিয়া খাওয়া—এইগুলির ফলে অধিকাংশ পীড়ার উৎপত্তি হইয়া থাকে।

৪২। চক্ষের চারিদিকে কৃষ্ণ বর্ণ রেখা দেখা গেলে বুঝিতে হইবে, স্বাস্থ্য খারাপ হইবার উপক্রম হইয়াছে, তখনই ইহার প্রতিকারের ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৪৩। যেখানে বায়ু চলাচল করিতে পারে না, সে রকম কক্ষে থাকা উচিত নয়। বাধ্য হইয়া থাকিতে হইলে, যত অল্প সময় সে ঘরে থাকিতে হয় ততই ভাল। জনতাপূর্ণ স্থানে বায়ুও স্বাস্থ্যকর নহে।

৪৪। ছেলে যদি কাঁদে তবে তাহাকে শাসন না করিয়া, কান্নার কারণ অনুসন্ধান পূর্ব্বক তাহা দূর করিবার চেষ্টা করা উচিত। ছেলে কাঁদিলেই তাহাকে মাই দেওয়া, কি মিছরী দেওয়া কি লবেঞ্জুস দিয়া ভুলাইবার চেষ্টা করা সঙ্গত নহে। ইহাতে ছেলে তখনকার মত ঠাণ্ডা হইলেও, কান্নার প্রকৃত কারণ দূর না হওয়ায় তাহার ফল ভাল হয় না।

৪৫। যাহাতে আপনার শরীরের অনিষ্ট হইবে বলিয়া বুঝিবেন, তাহা যতই সুখাদ্য হউক না কেন, তাহা কখনই খাইবে না,—লোভ সম্বরণ করিতেই হইবে।

৪৬। মধ্যে মধ্যে এক এক দিন উপবাস দিলে শরীর খুব ভাল থাকে; এমন কি, অনেক পীড়ার আক্রমণ হইতেও রক্ষা পাওয়া যায়।

৪৭। কাজ করিতে করিতে যদি ক্লান্তি বোধ হয় তবে কাজ বন্ধ রাখিয়া বিশ্রাম করিবেন। ক্ষমতার অতিরিক্ত কাজ করিতে যাওয়া বিবেচনাসঙ্গত নয়, নিরাপদও নয়। কাজ না করিলে যতটা ক্ষতির সম্ভাবনা—ক্লান্ত শরীরে কাজ করিলে তদপেক্ষা অনেক বেশী ক্ষতি হইয়া থাকে।

৪৮। শয়ন গৃহের মেঝে অনাবৃত থাকা ভাল; কিন্তু বিলাসিতার খাতিরে তাহা সর্ব্বদা কার্পেট ইত্যাদি মণ্ডিত করিয়া রাখায় অনিষ্ট হয়; উহাতে অনেক রোগের বীজ আশ্রয় লইতে পারে।

৪৯। পীড়িত ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা প্রফুল্ল রাখিবার চেষ্টা কর উচিত। তবে অবশ্য তাহার কোনও ক্ষতি না হয়, সে দিকেও লক্ষ্য রাখিতে হইবে।

৫০। চুরি, ডাকাতি, খুন, জখম, মিথ্যা-ভাষণের ন্যায় শরীর অসুস্থ থাকা একটা পাপ বলিয়া মনে করা উচিত। যাহাতে সে পাপের ভাগী না হইতে হয়, সে দিকে সকলকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। সমাজেরও এ দিকে লক্ষ্য থাকা কর্ত্তব্য।

'স্বাস্থ্য-সমাচার'।

উত্তর-বঙ্গের সাহিত্য সেবা সম্বন্ধে দু'একটী কথা।

গত চৈত্র মাসের পরিচারিকায় উত্তর বঙ্গের সাহিত্য-সেবা নামে একটী প্রবন্ধ বাহির হইয়াছে। প্রবন্ধের ভালমন্দ লইয়া আমাদের কোনো তর্ক নাই বরং লেখকের সংগ্রহ ও প্রকাশের কৃচ্ছ্রসাধনার জন্য পাঠক-সাধারণের নিকট হইতে ধন্যবাদই তাঁর প্রাপ্য। তবে আমরা এইটুকু মোটে বলিতে চাই যে এ প্রসঙ্গে পুরাণ, ব্যাকরণ, কাব্য, ইতিহাস, উপন্যাস অবশেষে বিবিধ প্রভৃতি নানা শ্রেণী বিভাগ করিয়া তিনি বিভিন্ন অংশের ভিন্ন ভিন্ন লেখক-গণের যে পরিচয় দিতে চাহিয়াছেন—তাহা যেন গ্রামটাকে খানিকটা ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। তা' ছাড়া আবার কিছু বাদও পড়িয়াছে। উত্তর বঙ্গের—শুধু উত্তর বঙ্গের কেন বঙ্গেরই উদীয়মান এবং উদিত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকদের মধ্যে যাঁর আসন—তাঁহাকে শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র বাবুর তালিকায় তলায়ও একটু স্থান দেওয়া হয় নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত যে প্রবাসী, নারায়ণ, ভারতী, প্রবর্ত্তক প্রভৃতি সাময়িক কাগজে প্রবন্ধ লেখেন তা নয় সম্প্রতি তাঁর সাহিত্য-সম্বন্ধীয় প্রবন্ধগুলি পুস্তকাকারে "সাহিত্যিকা" অভিধান লইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

আর আমাদের বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই শুধু এই কথাটা শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্র বাবুকে গোচর করিবার জন্যই এই কয় ছত্র বাজে সাহিত্য—আশা করি জিতেন্দ্র বাবু আমার প্রগল্‌ভতা ক্ষমা করিবেন।

শ্রীবিমলচন্দ্র চক্রবর্ত্তী।

(২)

বিগত চৈত্র সংখ্যা পরিচারিকায় "উত্তর বঙ্গের সাহিত্য সেবা" নামক একটী প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, তাহাতে কতকগুলি ভ্রম-প্রমাদ দৃষ্ট হয়। নিতান্ত আবশ্যক বোধে নিম্নে কয়েকটীর উল্লেখ করা গেল ;—

৩৩২ পৃঃ—"উত্তর বঙ্গের আর একজন প্রাতঃস্মরণীয় কবি ভূম্যধিকারীর যত্নে, উৎসাহে ও পুরস্কার ঘোষণায় বাঙ্গলা ভাষার আদি নাটকের জন্ম হয়।"

ইহার বহু পূর্ব্বে শঙ্করদেব "সীতা স্বয়ম্বর" ও "কৃষ্ণগুণ মালা" নাটক রচনা করিয়া তাহার ভাবনা (অভিনয়) প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। শঙ্করদেবের রচনায় আসাম অঞ্চলের প্রাদেশিকতা ব্যতীত অন্য কোন পার্থক্য নাই। প্রবন্ধ লেখকও শঙ্করদেবকে উত্তর বঙ্গের সাহিত্যিক শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন।

৩৩৫ পৃঃ—"একমাত্র রাম সরস্বতী পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রাজা নরনারায়ণের আজ্ঞায় সমগ্র মহাভারতের অনুবাদ করেন।"

মহারাজ নরনারায়ণ ১৬শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রাজপদে আসীন ছিলেন। ১৫শ শতাব্দীর শেষভাগে তিনি রাজা ছিলেন না।

৩৪০—"কোচবিহারের রাজা সমরসিংহের সভাপণ্ডিত পীতাম্বর রচিত মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও শ্রীমদ্ভাগবত পুরাণ দেখিতে পাওয়া যায়।"

প্রকৃত বিবরণ এই; —সমরসিংহ কুমার আজ্ঞা পরমাণে তার,

কৃষ্ণকেলী পীতাম্বর ভণে। ১ম স্কন্ধ ভাগবত।

কুমার সমরসিংহ আজ্ঞা পরমাণে,

পয়ার প্রবন্ধে শিশু পীতাম্বর ভণে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ।

সমরসিংহ নামে কেহ কোচবিহারের রাজা ছিলেন না। "কুমার সমরসিংহের" পরিচয় প্রদানে এস্থলে অনাবশ্যক।

—খান্ চৌধুরী।